সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা, ১৯৪৭-৭১ সাল

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ইফাত আরা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৬-০৭
পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৭৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-১২
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা, ১৯৪৭-৭১ সাল

পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ইফাত আরা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৬-০৭
পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৭৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-১২
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য ইফাত আরা এর **"সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা, ১৯৪৭-৭১ সাল"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কেউ কোথাও গবেষণা করেননি। আমি অভিসন্দর্ভের চুড়ান্ত পান্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং তা পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলের সুপারিশ করছি।

ঢাকা
মে ২০১৫

(ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা, ১৯৪৭-৭১ সাল"** শিরোনামের এই গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

ইফাত আরা
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৬-২০০৭
পুন; রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৭৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-২০১২
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
মে ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে ভারত ও পাকিস্তান উভয় অঞ্চল থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে কয়েক লক্ষ লোকের দেশান্তর ঘটে। ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে পূর্ববাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক দেশত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে এ দেশত্যাগ যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েই শুরু হয়েছিল তা নয়। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু গমন শুরু হয়েছিল যখন দেশবিভাগ ও বঙ্গবিভাগ মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সামজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলা তথা ঢাকা জেলা থেকে বিপুলসংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের দেশত্যগের ঘটনা ঘটে।
"সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা, ১৯৪৭-৭১" বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করি এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য। পরবর্তীতে বিষয়টিকে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য রেজিস্ট্রেশন করি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমাকে তথ্য সংগ্রহ চালিয়ে যেতে হয় এবং দীর্ঘ সময় সাপেক্ষে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।
এই গবেষণাকর্মের জন্য পাকিস্তান ও ভারতীয় সরকারি নথিপত্র, প্রকাশিত সরকারি রিপোর্ট, পত্রপত্রিকা, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী থেকে আমি দীর্ঘদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ করি। গবেষণা কর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নথি সংগ্রহ করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সরকারী নথির একমাত্র উৎস বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস্ ও লাইব্রেরী। সেখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নথি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি। তবে কিছু নথি দেখার জন্য আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে সংরক্ষিত বিভিন্ন বিভাগ (Home, Public Relation, Requisition, Land Requisition,) এর নথি থেকে দীর্ঘদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ শুরু করি তবে এ সকল নথি থেকে আমার গবেষণাকর্মের বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য খুব কমই সংগ্রহ করতে পারি। ন্যাশনাল আর্কাইভস্ এর ক্যাটালগ দেখে আমি ধারনা করি যে, সেখানে সংরক্ষিত Home (Political) confidential Record বিভাগের নথিতে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ন্যাশনাল আর্কাইভস্ কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতার কারণে এই বিভাগের নথি দেখতে আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। আমার গবেষণার সময়কাল ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস্ এ নথি সংরক্ষিত ছিল ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। তবে ২০০৯ সালে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নথি গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। আমি আমার গবেষণাপত্র চুড়ান্ত না করে পুনরায় তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে নথি থেকে কোন ফটোকপি করার অনুমতি দেয়া হয়নি। ফলে সেগুলো থেকে হাতে লিখে তথ্য সংগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়।

১৯৪৭ সাল থেকে সরকারী নথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও তথ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে সংবাদপত্র। ন্যাশনাল আর্কাইভস্ এ সে সময়কার পত্রিকা সংরক্ষিত থাকলেও পত্রিকাগুলো খুবই জীর্ণ অবস্থায় ছিল ফলে সেগুলো গবেষকদের দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর পত্রিকাগুলো দেখার অনুমতি পেলেও সেগুলো থেকে কোন ফটোকপি করার অনুমতি দেয়া হয়নি। ফলে সেগুলো থেকে হাতে লিখে তথ্য সংগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্ম শাখায় সংরক্ষিত পত্রিকা থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তবে সে লেখাগুলো খুবই অস্পষ্ট এবং সে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে হাতে লিখে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক যেহেতু পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সেজন্য ভারতীয় সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ করাটাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে সকল নথি সংগ্রহ করার জন্য আমি পশ্চিমবাংলা রাজ্য লেখ্যাগার (পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক আর্কাইভস্), পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সচিবালয় গ্রন্থাগার, ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার, সেন্টার ফর স্যোসাল সায়েন্স স্টাডিজ এর গ্রন্থাগার (কলকাতা ও বৈষ্ণবঘাটা) থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। আমি সেখানে বিদেশী বিধায় পশ্চিমবাংলা রাজ্য লেখ্যাগার, পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সচিবালয় গ্রন্থাগারে কাজ করার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে প্রায় দুই মাস সময় লেগে যায়। ২০০৭ সালে পশ্চিমবাংলা রাজ্য লেখ্যাগার এ আমি প্রায় তিন মাস ধরে হাতে লিখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি। তবে সেখানে কাজ করার সময় আমি হাতে লিখে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি সে খাতা সেখানে জমা রেখে আসতে হত, এমনকি আমি কাজ করার সময় আমি যেন কোনভাবে দ্বিতীয় কপি না লিখতে পারি সেদিকে সবসময় নজর রাখা হতো। কাজ শেষ করে আমি চলে আসার সময়ও খাতাটা দিয়ে দেয়া হয়নি। পশ্চিমবাংলা রাজ্য লেখ্যাগার এর নিয়ম অনুযায়ী ১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময়ের কোন তথ্য এস.বি কর্তৃক যাচাই না করে গবেষকদের দেয়া হয় না, সে কারণে আমার সংগৃহিত তথ্য রেখে দেয়া হয় যাচাই করে পরবর্তীতে পাঠানো হবে বলে। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরও তা আমাকে পাঠানো হয়নি। পরবর্তীতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেও আমার পক্ষে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক মুল্যবান তথ্য আমার গবেষণাপত্রে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ

আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ। দেশত্যাগকারী ব্যক্তিবর্গ ও ঢাকায় বসবাসকারী তাদের আত্মীয় স্বজনদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি। ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের ঢাকাস্থ আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয়। অনেকেই এই স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কেননা তাদের মনে বিভিন্ন ভীতি কাজ করেছে যে হয়তো সাক্ষাৎকার প্রদানের ফলে বাসস্থানের স্থানীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে এতে তাদের জীবনযাত্রা, পেশা, বা সম্পত্তির ওপর প্রভাব পড়বে কিনা। ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তিরা সহায়তা করলেও তারাও কিছুটা ইতস্তত বোধ করেছেন কারণ এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে হয়তো তাদের নিজেদেরই কোন আত্মীয়র বিষয়ে কোন অজানা অপ্রীতিকর কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে এতে তারা বিব্রতকর পরিস্থিতি বা ক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন। বিশেষ করে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কেননা হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোন না কোন ভাবে ভোগ করছেন স্থানীয় মুসলমানরাই। এর মধ্যেই কয়েকজন এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে নারায়ণগঞ্জে একটি এলাকার সাক্ষাৎকার গ্রহণের চেষ্টা করা হলে সেখানে কেউ সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজী হয়নি। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণে আমাকে ঢাকা জেলার কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেন গাজী সালসান, গাজী সুফিয়ান, জনাব বিল্লাল হেসেন, আবুল কালাম আজাদ, বাবুল চৌধুরী প্রমুখ।

পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র ও উদ্বাস্তু কলোনিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের চেষ্টা করে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল ঢাকা জেলার লোক খুজে বের করা। কয়েকজনকে পাওয়া গেলেও অপরিচিত কাউকে তারা সাক্ষাৎকার প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। অনেকে নিরাপত্তা বাহিনীর ভয় দেখায়।

পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. অনুরাধা মুখার্জী, ড. ত্রিদীব চক্রবর্তী প্রমূখ এর সহায়তায় কলকাতা, বর্ধমান, নদীয়ায় কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে সক্ষম হই যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে আমাকে কয়েকবার ভারতে গমন করতে হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ কামালের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গবেষণা পরিচালনা করা হয় এবং অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়। এই গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে অধ্যাপক আহমেদ কামালের অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও অকৃত্তিম স্নেহ ছাড়া আমার এ গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হত না। আমার এ গবেষণাকর্ম পরিচালনায় এ বিষয়ে তার পান্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ, ধৈর্য্য এবং আন্তরিক সহযোগিতার ফলে এ অভিসন্দর্ভটিকে বর্তমান রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি আমার গবেষণা কর্মের প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শ দিয়েছেন, ধৈর্য সহকারে আমার সমস্যাগুলো শুনেছেন এবং সমাধান করেছেন, খসড়া পান্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় কয়েকবার পড়েছেন, সংশোধন করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এর উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের থেকে প্রয়োজনীয় বই পত্র দিয়েও সহযোগিতা করেন। তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের নিকট। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা আমার গবেষণাকর্ম সম্পর্কে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। যার উৎসাহে আমি এ বিষয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড.কে.এম মোহসীন। তাঁর উদার সহযোগিতা ও পরামর্শ আমার এ কাজটিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছেন। তিনি সবসময় গবেষণাকর্ম সুষ্ঠু ভাবে কাজটি সমাধানের ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস্ এর পরিচালক থাকাকালীন সময়ে আমাকে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস্ এ সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুল্যবান পরামর্শ প্রদান করে গবেষণাকর্মটিকে সম্মৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের অনেক শিক্ষক আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ডিরেক্টর ড.বিনায়ক সেন যার সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পরামর্শ আমার কাজকে এগিয়ে নিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের থেকে প্রয়োজনীয় বই পত্র দিয়েও সহযোগিতা করেন। আমি ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে রিসার্চ অফিসার হিসেবে কাজ করি। সে সময় ও তার পরবর্তীতে তিনি সবসময় আমাকে আমার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সেলিম, ড. খোদেজা খাতুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক গোলাম রব্বানী আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহে আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেন।

কলকাতাস্থ সেন্টার ফর স্যোসাল সায়েন্স স্টাডিজ এর পরিচালক ড. গৌতম ভদ্র সেন্টারের গ্রন্থাগারে তথ্য সংগ্রহ করায় আন্তরিক সহযোগিতা এবং তার মুল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। সেন্টরের শিক্ষক মানস রায়, রাজর্ষী দাশগুপ্ত তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, আর্ন্তজাতিক বিভাগের অধ্যাপক ড. ত্রিদীব চক্রবর্তী, অনুরাধা মুখার্জী তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমার গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে আমাকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন আর্কাইভস্ ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়। আমার গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ও ইতিহাস বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগারে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয় সেখানে আমি সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতা লাভ করি।

আমার গবেষণাকর্মের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার থেকে। সেখানে আমি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নথিপত্র ও দুস্প্রাপ্য পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। এ কাজে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন ডেপুটি ডিরেক্টর সালমা ইসলাম, এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মীর ফজলে আহমদ চৌধুরী, হাসানুজ্জামান হায়দারী, ইলিয়াস মিঞাঁ, রিসার্চ রুম এ্যাসিস্ট্যান্ট মমতাজ বেগম সহ সেখানকার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার গ্রন্থাগার, ডি.বি হেডকোয়ার্টার গ্রন্থাগার, বার কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলকাতাস্থ পশ্চিমবাংলা রাজ্য লেখ্যাগার, পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সচিবালয় গ্রন্থাগার, ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), সেন্টার ফর স্যোসাল সায়েন্স স্টাডিজ এর লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন।

ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণে আমাকে ঢাকা জেলার কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেন গাজী সালসান, গাজী সুফিয়ান, বিল্লাল হেসেন, আবুল কালাম আজাদ, বাবুল চৌধুরী প্রমুখ।

পশ্চিমবাংলায় হিন্দু শরণার্থীপ্রধান এলাকায় সাক্ষাৎকার গ্রহণে পশ্চিমবাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সহায়তা প্রদান করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. অনুরাধা মুখার্জী, ড. ত্রিদীব চক্রবর্তী এবং গবেষণা সহকারী জয়দীপ এবং তার বন্ধু ভাস্কর ও শিলা বসাক এবং গৌতম রায়, শান্তি দাস, চন্দন চ্যাটার্জী, দীলিপ বিশ্বাস, প্রদীপ হোম চৌধুরী, সন্দীপ দাস, বাদল সেন প্রমূখ এর সহায়তায় কলকাতা, বর্ধমান, নদীয়ায় কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে সক্ষম হই। আমার গবেষণাকর্মের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণে সহায়তাকারী এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রতি, পশ্চিমবাংলায় গমনাগমনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করার জন্য। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃপক্ষ ও সোসাইটির “Professor Safiqur Rhaman Research Grant, 2007” এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের প্রতি আমাকে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করার জন্য ফেলোশিপ ও প্রয়োজনীয় বর্ধিত সময় প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতাস্থ পশ্চিমবাংলা রাজ্য লেখ্যাগার ও বিভিন্ন কাজ করার অনুমতি পেতে সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী ভারতের বাংলাদেশ হাই কমিশনের সুপারিশপত্র জমা দিতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী আমাকে প্রত্যেকবার কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের সুপারিশপত্র জমা প্রদান করতে হয়েছে। আর সেই কারণে আমাকে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তা সংগ্রহ করতে হয়েছে। বাংলাদেশ মিশনের শিক্ষা কাউন্সেলর জনাব সৈয়দ এ.বি জাফর আহমেদ (২০০৭ সালে) ও পরবর্তীতে জনাব মোহাম্মদ নূরুল হুদা আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন। তাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বন্ধু হৈমন্তী রায়, মাহবুবা হাসনাত, স্নেহলতা নাগ, মশিউর রহমান, শামীমা রহমান, রেহানা সুলতানা, আতা মল্লিক, দেবীপ্রসাদ মন্ডল, সাহানা ভট্টাচার্য, ভ্রাতৃপ্রতীম কামাল হোসেন, আজিজুল রাসেল, প্রমুখ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে যিনি আমাকে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে সবসময় উৎসাহিত করেছেন মানসিকভাবে সাহস যুগিয়েছেন তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ের কর্মকর্তা মন্নুজান বেগম। আমি তার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইতিহাস বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোশারফ হোসেন এর প্রতি যিনি দীর্ঘদিন ছোট ভাই এর মত সবসময় আমার পাশে থেকেছেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

এ গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে আমাকে কয়েকবার পশ্চিমবাংলায় গমন করে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আকসাদুল আলম এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষক মেহের নিগার জুন আমার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কলকাতায় অবস্থানকালীন সময়ে আমাকে সর্বাত্মক ও আন্তরিক সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে যাদের সহযোগিতা না পেলে সেখানে অবস্থান করা কঠিন হয়ে উঠতো সেই আনন্দ ড্যানিয়েল, অধরা সুলতানা যাকে পাশে পেয়েছি বোনের মত, একজন মাসীমা যিনি মায়ের মত সবসময় আমাকে আগলে রেখেছেন, পশুপতি সাহু ও তার পরিবার, নদীয়ার শান্তি দাস, দাউদ হায়দার ও তার পরিবার, বাবুল চৌধুরী (সিলেট), রূপম ও তার বাবা- মা, যাদের ভালবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছি সবসময় তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি আমার জান্নাতবাসী বাবার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞ আমার মা, ছোট বোন জাহিরা হাসিন (সুমি), ছোট ভাই তারিক মনসুর, খালিদ মনসুর এর প্রতি যাদের ধৈর্য্য ও সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না।

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র..........i

ঘোষণাপত্র..........ii

মুখবন্ধ..........iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার..........v

সূচিপত্র..........viii

ম্যাপের তালিকা..........ix

পরিশিষ্ট তালিকা ix

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা.......... ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান ২৪

তৃতীয় অধ্যায় : ভূমি ব্যবস্থাপনা ও হিন্দুদের দেশত্যাগ ৭১

চতুর্থ অধ্যায় : ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান ৯৫

পঞ্চম অধ্যায় : ১৯৫০ সালের দাঙ্গা ও হিন্দুদের দেশত্যাগ ১১৭

ষষ্ঠ্য অধ্যায় : ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা ও হিন্দুদের দেশত্যাগ ১৪৯

সপ্তম অধ্যায় : ঢাকা জেলা ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দুদের অভিযোগ সমূহ ১৮১

অষ্টম অধ্যায় : প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা.......... ২০৪

নবম অধ্যায় : ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ও দেশত্যাগকারী হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ২২৯

দশম অধ্যায়: ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত পুনর্বাসন কার্যক্রম ২৬৫

একদশ অধ্যায়: উপসংহার ৩০১

পরিশিষ্ট ৩১৬

তথ্যসূত্র ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাপের তালিকা

১০.১ Calcutta wards where Hindu refugee replased Muslim inhabitants, 1964, পৃষ্ঠা ২৬২
১০.২ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, পৃষ্ঠা ২৬৯
১০.৩ Major Bengali Refugee Resettlement Sites, পৃষ্ঠা ২৮০

পরিশিষ্ট তালিকা

পরিশিষ্ট ১ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন পৃষ্ঠা ৩১৬
পরিশিষ্ট ২ ১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন ভূমি আইন পৃষ্ঠা ৩১৭
পরিশিষ্ট ৩ পূর্ববাংলার সরকার ও মুসলমান বিরোধী লিফলেট পৃষ্ঠা ৩১৮-৩১৯
পরিশিষ্ট ৪ পূর্ববাংলা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির দাঙ্গা বিরোধী আবেদন ১৯৬৪ পৃষ্ঠা ৩২০
পরিশিষ্ট ৫ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কারণের শতকরা হার ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসনের শতকরা হার ১৯৪৬-১৯৭০ পৃষ্ঠা ৩২১
পরিশিষ্ট ৬ ভারতে হিন্দু শরণার্থীদের আয় ভিত্তিক তালিকা ও সরকারী সাহায্য পৃষ্ঠা ৩২২
পরিশিষ্ট ৭ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির জেলাভিত্তিক অবস্থান পৃষ্ঠা ৩২৩
পরিশিষ্ট ৮ পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের ঢাকায় অবস্থানকারী আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাবলী ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ পৃষ্ঠা ৩২৪
পরিশিষ্ট ৯ পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাবলী ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ পৃষ্ঠা ৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবাংলা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হিসেবে ভারতের ও পূর্ববাংলা মুসলমান প্রধান হিসেবে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার প্রাক্কালে দুই দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান জনগণ দেশত্যাগ করে। মুসলমানগণ ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ও অন্যান্য প্রদেশ ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা মোহাজের নামে পরিচিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই স্বাধীনতাকালীন সময়ে তাদের ধনসম্পদ নিয়ে এবং চাকুরীজীবীরা অপশন দিয়ে দেশত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[১] ভারত সাংবিধানিকভাবে হিন্দু রাষ্ট্র নয়। ১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যার হার ছিল মুসলমান- ৭৬.৮৫%, হিন্দু ২২.৩৪%, অন্যান্য- ১.১১%। ১৯৪১-১৯৫১ সময়কালে ১.৮ মিলিয়ন, ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে ১.১ মিলিয়ন,[২] ১৯৬১-১৯৭৪ সময়কালে ১.৫ মিলিয়ন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে।[৩] ১৯৭৪ সালে হিন্দু জনসংখ্যার হার হয় ১৩.৬%।[৪] সেসময়ে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ৭৫% লোক তাদের ৯৫% অল্পবয়সী মহিলা এবং ৯০% যুবক সহ দেশত্যাগ করে।”[৫] পাকিস্তানে যত হিন্দু রয়ে গেল তারা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে রাতারাতি দেশের যে অংশের প্রতি তাদের মন টানে, সে অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।[৬] ১৯৪৭-৭১ সময়কালের উপমহাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের চিত্র ব্যাখ্যা করে Ronald Skeldon বলেন,

> “The aftermath of colonialism saw vast displacement of population. Partition of British India in 1947, the intra-sub continental conflicts of the 1960s and 1970s, including the creation of Bangladesh in 1971, caused some of the largest movements of population in man’s history.”[৭]

ভারত পাকিস্তানের শরণার্থীর সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে প্রথম জরিপ করে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। তাদের জরিপ অনুযায়ী স্বাধীনতাকালীন সময়ে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমান শরণার্থী ৭.২ মিলিয়ন এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা ৭.৪ মিলিয়ন।[৮]
১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময় বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবাংলা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হিসেবে ভারতের ও পূর্ববাংলা মুসলমানপ্রধান হিসেবে পাকিস্তানের অর্ন্তভূক্ত হয়। বহু সংঘাতপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বঙ্গ শব্দটি “বঙ্গ দেশ”, “গৌড়ীয় বাংলা”, “সুবে বঙ্গাল”, “বঙ্গীয় ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী”, “পূর্ববঙ্গ ও আসাম”, “বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সী”, “পূর্ববঙ্গ”, “পূর্ব পাকিস্তান” এবং শেষ অবধি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট

---

[১] Census of Pakistan, 1951, vol. 3, East Bengal, Karachi, 1953, page 25
[২] Masihur Rahman Khan, Pattern of External Migration to and from Bangladesh.1901-1961, The Bangladesh Economic Review, Vol.2. No.2, Dacca, 1974, page 605-609.
[৩] Sharifa Begum, Population Birth, Death and Growth Rate in Bangladesh: 1951-74 (Article),The Bangladesh Development Studies, Vol.xviii, No.2, Dhaka, June 1990, page 87
[৪] Population Census of Bangladesh 1974, National Volume, Dacca, 1977, page 23
[৫] Samar Guha, Non-Muslims Behind the Curtain of East Pakistan, Author, Calcutta, 1950, page 17
[৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৭
[৭] Ronald Skeldon, Migration in South Asia: an Overview, The Population Division, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Bangkok, 1983, page 2
[৮] M. Nazrul Islam, Pakistan and Malayasia Geographic and Demographic Dimention A Comparative Study in National Intregration, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1985, Page 13

সীমারেখার 'বাংলাদেশ' এই নামকরণে স্বাধীন ও স্বার্বভৌম হয়েছে।[৯] বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ) অতীত ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী যুগে যুগে এই নদীবিধৌত নির্দিষ্ট সীমারেখার স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু বহিরাগত শক্তি এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকাকে বারংবার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। কখনও রাঢ় এলাকা পশ্চিমবঙ্গের সংগে আবার কখনওবা বিহার, উড়িষ্যা- এমনকি যুক্তপ্রদেশের অংশবিশেষের সঙ্গে।[১০] ১৯৪৭ সালে অবশ্য দুই বাংলা এক রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এতে মুসলিম লীগ এবং কয়েকজন কংগ্রেস নেতার চেষ্টা ছিল কিন্তু পরিষদের ৯৮% হিন্দু সদস্যের ভোটে তা বাতিল হয়। এ বিভক্তি সম্পর্কে আহমেদ কামাল বলেন,

> "ধর্মীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবেচনা এই নতুন রাষ্ট্রের নিয়ামক ছিল না, এর বিশেষ রাজনৈতিক ভূসংস্থান নির্ধারিত হয়েছিল বিদায়ী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং প্রতিযোগী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির স্বেচ্ছাচারী কার্যাবলী দ্বারা।"[১১]

বাংলা সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ৮৩.৯৫%, মুসলমান জনসংখ্যার ৬৩.৮০% এবং অমুসলমান জনসংখ্যার ৪১.৭৮% পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে বলা হলেও সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া মুসলমান প্রধান হলেও এর সামান্য কিছু অংশ পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। কলকাতা পশ্চিমবাংলাভুক্ত হয়। মালদহের (৫৭% মুসলমান) কেবল নবাবগঞ্জ মহকুমা পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। নদীয়ার ৬১% মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দুই তৃতীয়াংশ পশ্চিমবাংলাভুক্ত হয়। নদীয়ার কেবল কুষ্টিয়া মহকুমা পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। দিনাজপুরকে দুই ভাগ করে দুই বাংলাকে দেয়া হয়।[১২] ১৯৪১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ হল এবং পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকা পূর্ববঙ্গ হারাল; নচেৎ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলকাতা, ২৪ পরগনাসহ সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ যা এখন ভারতের অংশ–তা পূর্ববঙ্গের অপরিহার্য অংশ হত।[১৩] বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমা নির্দেশ করা হয় কিছুটা বিদেশী রাষ্ট্রের অর্থাৎ ইংরেজদের ব্যবসায়িক স্বার্থে।[১৪]

পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ও তাদের দেশত্যাগ

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই হিন্দু জমিদার, তাদের কর্মচারীবৃন্দ, এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের বেশিরভাগই দেশ ত্যাগ করে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়কালে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে পূর্ববাংলার হিন্দুদের ছিল দৃঢ় অবস্থান কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই তারা স্বপরিবারে পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন, এ সম্পর্কে সমর গুহ বলেন,

> "In prepartition days East Bengal was extraordinarily rich in political workers and organisations. Bat after partition, conditions in Pakistan have compelled almost all political workers to migrate to India."[১৫]

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই হিন্দু জমিদার, তাদের কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে তাদের সম্পত্তি বদল করতে শুরু করে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় সকলেরই কলকাতায় সম্পত্তি ও ব্যবসা ছিল যা তারা জুন জুলাই মাসের মধ্যে দেশত্যাগের পাশাপাশি সম্পত্তিও বদলি করতে থাকে।

---

৯ এম.আর.আখতার মুকুল, চল্লিশ থেকে একাত্তর, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৫৫

১০ এম.আর.আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭

১১ আহমেদ কামাল, পূর্ববাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তি: জনগনের প্রতিক্রিয়া, কালের কল্লোল, বাংলাদেশ ১৯৪৭- ২০০০, মৌলি প্রকাশনি, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬,

১২ সীমানা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৩-৩০

১৩ কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৪

১৪ ফারুক আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৩

১৫ Samar Guha, op-cit, page 29

এদের অনেকের কলকাতায় আত্নীয়-স্বজন ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা চাকুরীজীবী ছিলেন তারা চাকুরীর জন্য ভারতকেই বেছে নিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্ববাংলা ছিল মূলতঃ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। আর এ অঞ্চলে উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহৃত হতো কলকাতা কেন্দ্রিক শিল্পকারখানায়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ববাংলার ৭৫% ভূমির জমিদারী লাভ করেছিল হিন্দু জমিদাররা।[১৬] সুতরাং পূর্ববাংলার ভূমি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করতেন কলকাতা কেন্দ্রিক সম্পদশালী হিন্দু সম্প্রদায়।[১৭] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর এ সকল জমিদার ও ব্যবসায়ীরা স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে। তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশত্যাগ করেন। স্বাধীনতাকালীন সময়ে যারা দেশত্যাগ করেছেন তাদের ভারতে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে জয়া চ্যাটার্জী বলেন, “Many of East Bengal’s bhadralok, therefore had somewhere to go in West Bengal; they had relatives or friends who, at the very least, could offer them a temporary roof over there heads when they arrived as refugees.”[১৮]

স্বাধীনতাকালীন সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগ এবং ভারতীয় মুসলমানদের পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণের ফলে পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ব্যাপকভাবে নেতিবাচব প্রভাব পড়ে। এ প্রভাবের চিত্র তুলে ধরে নজরুল ইসলাম বলেন,

> “With the Partition of India in 1947 these industrialists, agricultural landlord and business magnets quickly liquidated their asset and property and left for India. Thus the East left largely with only the land and virtually no real capital or business skill.--------East Pakistan’s economic loss, on the other hand, due to the partition was great and was not compensated by the immigrants from India.”[১৯]

পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ছাড়াও খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করেনি। বাস্তবতাকে স্বীকার করতে না পেরে ’৪৭- এর দেশ বিভাগের সময় আর্যদের উত্তরসূরীর দাবীদার বর্ণ হিন্দুরা এদেশ ত্যাগ করেছেন।[২০]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যায় এর উদ্ধৃতি দিয়ে আহমেদ কামাল বলেন, “পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে এক আকস্মিক পরাজয়, হতাশা ও বিশ্বাস ভঙ্গের অনুভূতি পূর্ববঙ্গের উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দুগোষ্ঠীর মনকে ভারাক্রান্ত করল।”[২১] সে সময়ে পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রকৃতি, ধরণ ব্যাখ্যা করে সমর গুহ বলেন,

> “Leading people of the non-Muslim society and its social conscious elements,- -- have migrated in very great numbers to Indian Union. --- People of upper and middle classes who are still pursuing their

---

[১৬] M. Nazrul Islam, op-cit, Page 9
[১৭] M. Nazrul Islam, op-cit, Page 15
[১৮] Joya Chatterji, The Spoil of partition BENGAL AND INDIA, 1947-67, Cambridge University press India Pvt. Ltd., New Delhi, 2007, page 115
[১৯] M. Nazrul Islam, op-cit, Page 15
[২০] এম.আর.আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭
[২১] Letter from S.Bhattacharia, Pressident Hindu Sevak Sanha. উদ্ধৃত- আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪

professions in East Bengal, are living there alone or only with one or two elderly women members of their families."[২২]

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই হিন্দু জমিদার, তাদের কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের বেশিরভাগই দেশ ত্যাগ করে। '৪৭ এর আগস্টের পূর্ব থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে তাদের সম্পত্তি বদল করতে শুরু করে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় সকলেরই কলকাতায় সম্পত্তি ও ব্যবসা ছিল। এদের অনেকের কলিকাতায় আত্মীয় স্বজন ছিল। প্রথম পর্যায়ে হিন্দু উচ্চবর্ণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপকহারে দেশত্যাগের পেছনেও শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপত্তাহীনতা নয়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাও তাদেরকে পূর্ববাংলা ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। হিন্দু সম্পপ্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করে বিধানচন্দ্র রায় বলেন, "The economic security of the middle class people has also suffered greatly, as a result of the gradual disintegration of the joint family system and the general loss of their landed property."[২৩]

পূর্ববাংলা ত্যাগকারী পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীর ভাগের আয়ের উৎস ছিল পূর্ববাংলার জমি থেকে আয়। ফলে এই শ্রেণীরই চাকুরীর সমস্যা বেশী দেখা দেয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পশ্চিমবাংলা সরকার ভারতীয় সরকারের সঙ্গে একত্রিতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। তারা চাকুরীর বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যা যুবক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলা ছিল কৃষি সম্মৃদ্ধ কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা একটি অঞ্চল। স্বাধীনতাকালীন সময়ে পূর্ববাংলার অবস্থা বর্ণনা করে এম.নজরুল ইসলাম বলেন,

> "Since East Pakistan was the hinterland of Calcutta during the colonial period, it could not develop any port facilities, nor was any effort made to discover, mineral deposits. Although a riverine land, electricity generation was insufficient and East Pakistan remains a predominantly agrarian part of Pakistan."[২৪]

হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা চাকুরিজীবী ছিলেন তারা চাকুরীর জন্য ভারতকেই বেছে নিয়েছিলেন। এর কারণ সম্পর্কে গোলাম কবির বলেন,

> "The mass migration of Hindus and transfer of assets began as early as June and July 1947. Calcutta was the center of Bengal's financial, commercial and professional activity, and the Hindus had traditional links with this city."[২৫]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলায় হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণীর দেশত্যাগের ফলে তাদের স্থান দখল করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানরা।[২৬] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দুই দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে রামমনোহর লোহিয়া বলেন,

---

[২২] Samar Guha, op-cit, page 16-17

[২৩] Bidhan Chandra Roy, Towards a Prosperous India, Speeches and Writings of Bidhan Chandra Roy, Atulya Ghosh, Chairman, Board of Editors, Calcutta,1964, Page 297

[২৪] M. Nazrul Islam, op-cit, Page 38

[২৫] Muhammad Ghulam Kabir, Minority Politics in Bangladesh, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980, Page 5

[২৬] Muhammad Ghulam Kabir, ibid, page 13

> "হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা এড়াবার জন্যই দেশ বিভক্ত হয়। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে দাঙ্গা প্রচণ্ড রূপেই দেখা দেয়।-----ছ' লক্ষ নারী পুরুষ ও শিশু খুন হয়।----এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক এর ফলে ছিন্নমূল হয় এবং নূতন করে বাচঁবার জন্য তারা এমন সব অঞ্চলে গিয়ে বাসা বাধঁবার চেষ্টা করে যেসব অঞ্চলে বন্ধু বলতে তাদের কেউ নেই, সমগ্র ইতিহাসে, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়ে হোক, দেশান্তর গমনের এত বড় নজির আর নেই।"[২৭]

হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং সামাজিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেশত্যাগের ফলে এর প্রভাব পূর্ববাংলায় বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ককে এবং পরবর্তীতে অন্যান্যদের দেশত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে কোন অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ও সম্প্রদায়ের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে দুই সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারস্পরিক দূরত্ব ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই। এ সম্পর্কে দীপেশ চক্রবর্তী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন,

> "মা ছিলেন ঘোরতর বাঙাল।---- মার বলা গল্পে পাটের কোম্পানির সাহেব ছিলেন, হিন্দু আত্মীয়স্বজন ও কাছের মানুষেরাতো ছিলেনই, এমনকি পাটের ব্যবসায়ী মারয়াড়িরাও বাদ যেতেন না। কিন্তু একটা ফাঁক থেকেই যেত পূর্ববাংলার কোন মুসলমান চরিত্র মা-র গল্পে থাকতেন না। শুধু মার কথাই বলি কেন? গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত নামী ও গুণী হিন্দু বাঙালিদের সাহিত্যে গুটিকয়েক ছোট গল্পে ছাড়া অন্য কোথাওতো স্মরণীয় মুসলমান চরিত্র আমরা বিশেষ পাইনি। -----অথচ অবিভক্ত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষতো মুসলমানরাই। তাদের বাদ দিয়েতো আমাদের কথা হয়ও না। একদিকে ভাবতাম, মামাবাড়ির বহুবিস্তৃত সম্পর্কের জালে একটি মুসলমান পরিবারও ধরা পড়েনি?"[২৮]

হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক দূরত্ব যে কতটা গভীর ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানস রায় এর অভিজ্ঞতায়, এই সামাজিক দূরত্বই পরবর্তীতে হিন্দুদের পূর্ববাংলায় বসবাস করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। তিনি বলেন,

> " ভিন্ন ভিন্ন জায়গা জমি থেকে চলে আসা নানান পরিবার আর তাদের পৃথক পৃথক সব নিজস্ব গল্প। ----মুসলমান উপস্থিতি এসব গল্পে লেগেই থাকতো কিন্তু একমাত্র সেই চিরন্তন কৃষকের রূপকল্পে।----এসব গল্পে কোন জায়গা দেয়া হত না –তার আচার, তার বিশ্বাসের পৃথিবীর; নিরন্তর বাদ পড়ত মধ্যবিত্ত মুসলমানের চরিত্র"[২৯]

কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নিজ দেশ ছেড়ে অন্য একটি শহর বা দেশে আশ্রয় গ্রহণ বা স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে তবে এই কারণগুলোকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। তা হল 'Push factors' (ঠেলে দেওয়া) ও 'Pull factors' (টেনে নেওয়া)। কোন ব্যক্তি যে স্থান বা দেশে বাস করছে সেখানে সে যে কোন কারণে যেমন অর্থনৈতিক কারণ বা সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার বা তার পরিবারের জন্য সে আর নিরাপদ মনে করছে না, ফলে সে দেশ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে, এ ধরনের কারণগুলিকে ঠেলে দেওয়া বলে অভিহিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি যে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে সে স্থান বা দেশের কিছু বিষয় বা সুযোগ সুবিধা রয়েছে যা তাকে বা তাদেরকে সে স্থান বা দেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং তাদের মনে ধারণা জন্মায় যে সে সেখানে বর্তমানের তুলনায় নিরাপদে থাকবে বা ভাল থাকবে সে

---

[২৭] রামমনোহর লোহিয়া, ভারত ভাগের অপরাধী যারা, সাহিত্য প্রকাশন ট্রাষ্ট, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩

[২৮] দীপেশ চক্রবর্তী, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া (প্রবন্ধ), পুজাঁ সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০

[২৯] মানস রায়, কাটা দেশে ঘরের খোঁজ, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, স্কুল অব কালচারাল টেক্সট্‌স্ অ্যান্ড রেকর্ডস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সেরিবার্ন, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৫,

Dhaka University Institutional Repository

কারণগুলিকে টেনে নেওয়া বলে অভিহিত করা হয়। একটি অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটা বা ঘটবে বলে স্থানীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক ভীতি সৃষ্টির ফলে সেখানকার লোকজনের এলাকা ত্যাগ করা হচ্ছে ঠেলে দেওয়া (পুস ফ্যাক্টর)। যে অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে সে অঞ্চলের প্রতি যে কোন কারণে আকর্ষন অনুভব করা হচ্ছে টেনে নেওয়া (পুল ফ্যাক্টর)। আর কোন অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি বা সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে বা ঘটেছে বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অন্য কোন দেশের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারণা চালিয়ে ভীতি সৃষ্টি করা, যার ফলে ভয় পেয়ে সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই কারও অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাওয়াও এক ধরনের টেনে নেওয়া। আবার প্রথম কারণটির জন্য কোন ব্যক্তি বা পরিবার সেখানেই যাবে যেখানে সে অর্থনৈতিক এবং সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার বসবাসের জন্য অনুকূল মনে করবে বা যে কোন সুবিধাজনক পরিবেশের আশ্বাস পাবে। "Lee's laws divides factors causing migration into two groups and factors: push and pull factors: push factors are things that are unfavourable about the area that one lives in, and pull factors are things that attract one to another area."[৩০]

পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের পেছনে এ দুটি ফ্যাক্টরই কাজ করেছে। ১৯৪৭ সালে হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তানের বিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্ববাংলার হিন্দুদের বিশেষ করে হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে আশংকা সৃষ্টি হয় বা ধারণা জন্মায় যে তাদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আধিপত্য বা সম্মান বজায় রেখে পূর্ববাংলায় বসবাস করা সম্ভব হবে না। ফলে তারা সে সময় পূর্ববাংলায় কোন দাঙ্গার ঘটনা না ঘটলেও ভারতে বিশেষ করে কলকাতায় চলে যায় কেননা এ সকল উচ্চবর্ণের বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী, পড়াশুনা প্রভৃতি কোন না কোনভাবে কলকাতার সঙ্গে সংযোগ ছিল, অধিকাংশ উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই বাংলার সম্মৃদ্ধ শহর হিসেবে কলকাতায় বাড়ি ছিল। এমনকি অপশন প্রথা ঘোষণা করা হলে অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের চাকুরীজীবী শ্রেণী ভারতকেই নিজেদের সুবিধাজনক স্থান হিসেবে বেছে নেয়। প্রথম ধাপে যে ১.১ মিলিয়ন হিন্দু দেশত্যাগ করে তাদের মধ্যে ১৯৪৮ সালের ১ জুন পর্যন্ত। গ্রাম ও শহরের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর চাহিদার ভিত্তিতেও দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে। এ সময় পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দুদের মধ্যে ৩৫০,০০০ জন শহুরে এবং ৫৫০,০০০ জন গ্রামীণ ভদ্রলোক।[৩১]

যে কোন লোক তাদের বসবাসের সুবিধা অসুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাসস্থান পরিবর্তন করে। এ সম্পর্কে Chirantan Kumar বলেন,

> "People are found to move from one place another, sometimes in search of better opportunities, when they see some of their needs and desires are not adequately fulfilled in their present location, sometimes present location, sometimes just to maintain the status quo when they see their present situation seems to be a declining one."[৩২]

ব্রিটিশ ভারতে পশ্চিমবাংলা অনেক দিক দিয়েই ভারতের এক সম্মৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত ছিল। বিধান রায় পশ্চিমবাংলার সম্মৃদ্ধির বর্ণনা দিয়ে বলেন, "West Bengal contains the biggest city in the Indian

---

[৩০] `A Theory of Migration' University of Pennsylvania, jstoor 2060063, Push factors are- Not enough jobs, Few opportunities, Primitive conditions, Desertification, Famine or drought, Political fear or persecution, Slavery or forced labour, Poor medical care, Loss of wealth, natural disasters, Death threats, Lack of political or religious freedom, Pollution, poor housing, Land lord/ Tenants issues, Bullying, Poor chances of marrying, condemned housing (radon, gas etc.), War. Pull factors are- Job opportunities, Better living condition, Political or religious freedom, Enjoyment, Education, Better medical care, Attractive climates, Security, Family links, Industry, Better chances of marrying

[৩১] Joya Chatterji, op-cit, page 115

[৩২] Chirantan Kumar, Migration and Refugee issue Between India and Bangladesh, Scholar's Voice: A new way of thinking, Vol.1, No1, Biannual Publication of Centre for Defence Studies Research and Development, 2009, Page 64

Union. Her minerel and industrial wealth is large. Her industrial activities are the pride of this country."[৩৩]

পশ্চিমবাংলার এই সম্মৃদ্ধি হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগের পেছনে 'টেনে নেওয়া' হিসেবে কাজ করেছে। প্রথম ধাপে দেশত্যাগী হিন্দুদের প্রধান আগ্রহ ছিল কলকাতা। এ সময় কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে কলকাতা নগরী 'টেনে নেওয়া' হিসেবে কাজ করেছে। কলকাতা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে ১৯৪৭-৫০ সাল সময়ের আশ্রয় গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, "Thus about 38.5 p.c of the other migrants who came during theses years have been attracted to the city on account of such causes has proximity to relations or the head of the family being in Calcutta or marriage or better educational facilities or transfer in service."[৩৪]

সরকার সরকারী চাকুরীজীবীদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র হিসেবে ভারত বা পাকিস্তানকে বেছে নেয়ার সুযোগ ঘোষণা করলে হিন্দু চাকুরীজীবীদের অধিকাংশ ভারতকেই চাকুরীর ক্ষেত্র হিসেবে পছন্দ করে। তারা মনে করেছিল যে "if they opted for India, they went with a guarantee of a job, often with the added benefit of tied accommodation.[৩৫]

সরকারী চাকুরীজীবী ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও পশ্চিমবাংলায় ভাল চাকুরী পাবে বলে আশা করেই পূর্ববাংলা ত্যাগ করে। "Such people calculated that ------In India might have a struggle to find their feet, but at least they would be among `their own people'.[৩৬]

গ্রামীণ কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর দেশত্যাগের পেছনেও দুই ধরনের কারণই ভূমিকা রেখেছে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশত্যাগ করার ফলে সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় একদিকে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হারায় কেননা তাদের মধ্যে বেশীরভাগ পেশাজীবী শ্রেণীরই আয়ের প্রধান উৎসই ছিল এসকল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধীনে বিভিন্ন কাজ করে। অনেকে মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো না। ফলে তারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। ফলে তারা দেশত্যাগ করে হিন্দুপ্রধান এলাকায় চলে যাওয়াকেই সুবিধাজনক মনে করেছে। জয়া চ্যাটার্জী তাদের মানসিক অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

> "Lower down the social ladder, Hindu artisans made similar calculation, albeit in a lesser key. With skills and craft associated with their cast and used to working their predominantly Hindu patrons, they concluded that they had a better chance of deploying their talents in the west, particularly after many of their patrons had left East Bengal for India."[৩৭]

এছাড়াও ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং স্থানীয়ভাবে ঘটে যায় কিছু সাম্প্রদায়িক বা আইন শৃঙ্খলা অবনতির কিছু ঘটনা। এসবই হিন্দুদের দেশত্যাগের পেছনে 'ঠেলে দেওয়া' হিসেবে কাজ করেছে।

---

[৩৩] Bidhan Chandra Roy, op-cit, Page 299
[৩৪] THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO ECONOMIC SERVAY 1954-1955, 1957-58, Calcutta, West Bengal State Govt., Page 203
[৩৫] Joya Chatterji, op-cit, page 115
[৩৬] The Department of Anthropology's 1951 servay, উদ্ধৃত Joya Chatterji, op-cit, page 115
[৩৭] Joya Chatterji, op-cit, page 115

সাধারণ কৃষক শ্রেণীকে স্বল্পমূল্যে অধিক পরিমাণ জমি প্রাপ্তির প্রলোভন দেখানো হয়। ফলে তারা তাদের নিজেদের বাড়ি ও জমি বিক্রয় করে যে অর্থ লাভ করে তা নিয়ে ভারতে চলে যায়। সেখানে ঢাকা তথা পূর্ববাংলার তুলনায় কম মূল্যে বেশী জমি ক্রয় করে সেখানেই স্থায়ী হয়েছে। (অবশ্য অনেকের যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও কোন টাকা যোগাড় করতে পারেনি তারা যায়নি অথবা অনেকে পছন্দমত জমি বা কাজ না পেয়ে পূর্ববাংলায় ফিরে এসেছে)। ভারতে তাদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক সবরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে বলে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের দেশত্যাগী হিন্দুরা তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদেরকে কাজের সুযোগ করে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়েও দেশত্যাগে আগ্রহী করে তোলে। এসব 'টেনে নেয়া' হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। জয়া চ্যাটার্জী হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি ভারতীয় সরকার ও পশ্চিমবাংলা সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন যা পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। তিনি বলেন, "As refugees fled to the west from eastern Bengal in ever large numbers, government of Delhi and in Calcutta reluctantly began to accept responsibility for the problem of resettling and rehabiliting them."[৩৮]

দাঙ্গা বা স্থানীয়ভাবে ঘটে যাওয়া কিছু আইনশৃঙ্খলা অবনতির কিছু ঘটনা হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে এটা পুস ফ্যাক্টর। তাদের মনে এই নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই। হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন উস্কানীমূলক এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে সেখানকার বিশৃঙ্খল ও ভয়াবহ পরিস্থিতির কাল্পনিক চিত্রের বর্ণনা যা বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকা, লিফলেট, পেম্পলেট, নাটক এবং ছোট ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও তারা তাদের বক্তব্যে পূর্ববাংলার হিন্দুদের জন্য ভারতই একমাত্র নিরাপদ জায়গা বলে প্রচার করতে থাকেন। দেশত্যাগকারীদের মধ্যে অনেকে কলকাতায় চাকুরী করতেন এবং তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গ্রামে বাস করতেন, তাদের মনে প্রচারণা চালিয়ে যে ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। এ ক্ষেত্রে দেশত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে পুস ও পুল দুটো ফ্যাক্টরই ভূমিকা পালন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে কোন কারণটি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে সেটা নিরূপণ করাও কঠিন ব্যাপার। এর ব্যাখ্যা দিয়ে কলকাতা শহরে আশ্রয় গ্রহণকারীদের এক জরিপে বলা হয়,

> "Here the reason given for migration might be- head of the family employed in Calcutta, -though the real cause at work was communal disturbance. Thus not only there is some overleaping, but also of a mixture of causes at work in bringing about migration. Migration is often a multidimensional process,- the result of a mixer process."[৩৯]

১৯৪০-৪৬ সময়কালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরকারের রেশনিং প্রথা চালুর ফলে এ সময় কলকাতায় আশ্রয় প্রার্থীর হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ফলে বিহার ও পূর্ববাংলা বিশেষ করে নোয়াখালী থেকে অনেক লোক কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সময় মোট আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে ৫% দাঙ্গার কারণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।[৪০]

১৯৪৬-৫০ সময়কালে, ১৯৪৬ সাল থেকেই পূর্ববাংলা থেকে ধীরে ধীরে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটছিল। তা চলে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশী দেশত্যাগ হয় ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে। "The first year marked the

---

[৩৮] Joya Chatterji, op-cit, page 107
[৩৯] THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO- ECONOMIC SERVEY 1954-55, 1957-58, Page 205
[৪০] ibid, Page 196

increased flow in the post partition period. -----these refugees came with all their familly.[৪১]

১.১ নং সারণীতে কলকাতা শহরে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে দেশত্যাগের কারণ গুলোর শতকরা হিসাব দেখানো হয়েছে। এই টেবিলের তথ্য থেকে দেখা যায় যে কলকাতা শহরে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে যে সকল শরণার্থী দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগ করেছেন তাদের সংখ্যা ৫২.২% থেকে মডিফাই করে হয়েছে ২.৯%। এদের শতকরা হার হ্রাস পাওয়ার কারণ হচ্ছে অনেকে দাঙ্গার সময় এলেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণের সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে শুধুমাত্র ১৯৫০ সালের দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগের হার ২.৯%।[৪২] এখানে ঠেলে দেয়ার কারণ দাঙ্গা হলেও অন্যান্য কারণগুলি যাকে আমরা টেনে নেয়া বা পুল ফ্যাক্টর বলছি দেশত্যাগের ক্ষেত্রে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সারণী ১.১

Causes of migration in defferent periods 1940-58

Causes of Migration	1940-46 actual	1947-50 actual	1957-58 (as modified above)
No land to Cultivate	3.8%	2.8%	5.8%
Unemployment	41.8%	21.3%	43.4%
Prospects of better Employment	18.3%	9.8%	20.0%
Lack of educational Facilities	3.4%	1.3%	2.6%
Communal factor	5.2%	52.2%	2.9%
Transfer of service	0.57%	0.65%	1.3%
Proximity to relations etc	23.1%	10.8%	22.0%
Others	2.6%	0.3%	0.66%

Source- THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO- ECONOMIC SERVEY 1954-55, 1957-58, West Bengal State Govt., Page 199

এই সারণীর তথ্য বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা দিয়ে জরিপ কমিটি বলে,

> "Certain interesting conclusions could be deduced from this table. ----- But as we stated earlier, it was quite likely that a section at least of the refugees who came to the city on account of communal disturbances would have come in search of jobs or due to the working of some social or non economic factors."[৪৩]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর দিল্লী চুক্তির পর অনেক হিন্দু পূর্ববাংলায় ফিরছিল। সে সময় এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে পন্ডিত নেহেরু হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ব্যাখ্যা করে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন। পন্ডিত নেহেরু মনে করেন যে, অনেক হিন্দু যারা পূর্ববাংলায় ফিরেছে তারা ভারতীয় সরকারের কাছে যে সকল সুযোগ সুবিধা

৪১ ibid, Page 198
৪২ ibid, Page 198
৪৩ ibid, Page 199-200

আশা করেছিল তা তারা পায়নি বলেই নিজ বাসস্থানে ফিরেছে, সুতরাং হিন্দুদের সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন,

> "যদি বলা হয় যে, উত্তর প্রদেশ থেকে যারা দিল্লীতে আসবে তাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করা হবে তবে উত্তর প্রদেশ থেকেও বহুসংখ্যক লোক দিল্লীতে এসে সমাগত হবে। তিনি মনে করেন যে দুই বাংলার মিলন বা পূর্ববাংলা থেকে সকল অমুসলমানদের পূর্ববাংলা ত্যাগ করাই একমাত্র সমাধান নয়।[৪৪]

বাংলার ইতিহাসে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাঁচা পাট প্রায় সবটাই উৎপন্ন হত পূর্ববাংলায়। আর আভ্যন্তরীণ পাটকলগুলির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। কলকাতা কেন্দ্রীক পাটকলগুলির প্রায় একচ্ছত্র মালিকানা ছিল ব্রিটিশ শিল্পপতিদের হাতে। যখন পাটের গুরুত্ব বেড়ে যায় তখন থেকেই পাট ব্যবসা ব্রিটিশ ও হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। Lambert বলেন, "Then the cash crop of jute became important, the broker-of bailing, shipping, milling, and marketing were controlled through British and Hindu commercial firms in Calcutta."[৪৫]

এই পাটকলগুলিতেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীর সংস্থান হয়েছিল। পূর্ববাংলার বহু মুসলমান শ্রমিক এ সকল চটকলগুলিতে কাজ করত। বাংলার বিভক্তির ফলে পাট চাষ এলাকা পড়ে পূর্ববাংলায় আর পাটকলগুলা পড়ে পশ্চিমবাংলায়। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা উভয় স্থানে সংকটের আশংকা সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবাংলার পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করে ভারতের প্রয়োজনীয় পাটের চাহিদা পূরণ ও পাট চাষীর প্রয়োজনীয়তা পূর্ববাংলার হিন্দু চাষীদের দেশত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় ও ভারতের পাট উৎপাদন উপযোগী অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলতে ভারতীয় সরকার, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মহলের আগ্রহ ছিল। ভারতীয়দের পূর্ববাংলার চাষীদের প্রতি আগ্রহ পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করে ভারতে স্থায়ী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা কেন?

ঢাকা পূর্ববাংলার সর্বাধিক জনবহুল জেলা। এই জেলার কয়েকটি থানার জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর পল্লী এলাকাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যান্য জেলার তুলনায় ঢাকা জেলা জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রতি বর্গমাইলে ঢাকা জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৫৪১ জন[৪৬] যা বাংলাদেশের সকল জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ। হিন্দু জনসংখ্যার হার ১৯৪১ সালে ছিল পূর্ববাংলায় ২৮.০%, ঢাকা জেলায় ৩২.২১[৪৭] যা সকল জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৯৫১ সালে ঢাকার হিন্দু জনসংখ্যার হার ছিল উচ্চবর্ণ-১০.২১, নিম্নবর্ণ-১০.৪২%।[৪৮] ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের অবস্থান এবং দেশত্যাগের কারণ, দেশত্যাগের হারের চিত্র ভিন্ন। ঢাকা জেলার হিন্দুদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক হিন্দু জমিদার উচ্চশিক্ষিত ছিল, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, চাকুরীজীবি, জমিদারদের কর্মচারীবৃন্দ প্রভৃতি শ্রেণী বর্ণ হিন্দু নামে পরিচিত। কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণী নিম্নবর্ণ হিসেবে পরিচিত।

---

[৪৪] দৈনিক আজাদ, ১৮ অক্টোবর ১৯৫০

[৪৫] Richard D Lambert, RELIGION, ECONOMICS, AND VIOLENCE IN BENGAL Background of the Minorities Agreement, Middle East Journal, Vol. 4, 1950 (July), page 313

[৪৬] Census of Pakistan, 1951, vol. 3, East Bengal, page 25

[৪৭] ibid, page 25

[৪৮] Census of Pakistan, 1961, vol. 2, East Bengal, page 11-13, Karachi, 1964

ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল দৃঢ়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যার ৫৮.৫% ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ১৭ জন কমিশনারের ১০ জন ছিল হিন্দু।[৪৯] বিভিন্ন ভবন, দোকান, বাজারের ৮৫% ছিল হিন্দু মালিকানা। হিন্দু মালিকানায় ৭১৭৫ টি বাড়ি ছিল, ১৯৫০ সালে এ সংখ্যা হয় ৯২০ টি।[৫০] স্কুলে ৩২৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ২৮৮৯ জন এবং ২১১৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ২০৭০ জন হিন্দু। ১৯৫০ সালে ছাত্রসংখ্যা হয় ৮৭০ জন এবং ছাত্রীসংখ্যা হয় ৩৪৮ জন, কলেজে হয় ৮৪৬ জন। বার এসোসিয়েশনে ৩১০ জন আইনজীবীর মধ্যে ২৮০ জন ছিলেন হিন্দু। হিন্দু মালিকানায় দোকানের সংখ্যা ছিল ১৪৯৯টি, ১৯৫০ সালে তা হয় ১৭৫টি।[৫১]

পূর্ববাংলা ত্যাগকারী পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে ১৭.৯% ঢাকা জেলার, যা সকল জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ হার।[৫২] পূর্ববাংলায় ঢাকার হিন্দুদের অবস্থান ও গুরুত্ব তুলে ধরে সমর গুহ বলেন, "Dacca serves as the index of the position of non-Muslims in East Pakistan today."[৫৩] সুতরাং তাদের দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার পেছনের কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ঢাকা পূর্ববাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার ফলে নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলসমূহে জনবসতি অতি দ্রুত বেড়ে যায়। কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে ঢাকার নগরায়ণ প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়। মোহাজের কলোনী স্থাপন এবং শিল্পের প্রসারের ফলে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জে নগরায়ণ ঘটে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ববাংলা থেকে ৪২,৯৩,০০০জন[৫৪] হিন্দু পশ্চিমবাংলায় গমন করে, তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মুসলমান পূর্ববাংলায় আসে। পশ্চিমবাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের পুনর্বাসন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ফলে এ জেলায় দুই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হারের তারতম্যের পাশাপাশি দুই সম্প্রদায়ের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েরও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সকল কারণে ঢাকা শহরসহ পুরো ঢাকা জেলার উপর অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি প্রভাব পড়ে। ঢাকা জেলা থেকে বিভিন্ন কারণে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে। ঢাকা শহর সহ এ জেলায় ১৯০৫ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলেও এ জেলার বৃহৎ অংশই ছিল দাঙ্গামুক্ত কিন্তু সে সকল অঞ্চল থেকেও দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে।

ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বাভাবিকভাবে এক ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। একদিকে সে সময়ের পূর্ববাংলার প্রশাসনিক, অথনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতা, অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক লোভি মানুষের ভূমি, সম্পদ ইত্যাদির প্রলোভনের শিকার, কিছু সরকারী কর্মকর্তার দুর্ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ভবিষ্যতের জন্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। এই ভীতি ও অনিশ্চয়তাকে আরও বেশী বাড়িয়ে তোলে ভারতীয় সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভারতে ডেকে নেয়ার প্রবণতা। তারা একদিকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন ঘটনার অসত্য, অতিরঞ্জিত বর্ণনা, উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রচার করে ভীতি সৃষ্টি করতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্নভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য সেখানে তাদের জন্য সৃষ্ট অনেক সুযোগের প্রলোভন দেখায়। ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে ১.১ মিলিয়ন[৫৫] হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে। যদিও এ সময় পূর্ববাংলায় বা ঢাকা জেলার কোথাও কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। ১৯৬১-১৯৭৪ সময়কালে ১.৫ মিলিয়ন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে।[৫৬] এ সময়কালে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব পরে। ঢাকা জেলা ত্যাগকারী শরণার্থীরা বেশিরভাগ আশ্রয় গ্রহণ করে কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায়। তবে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পেশার সঠিক হিসাব জানা যায়নি কারণ প্রথম

---

৪৯ Samar Guha, op-cit, page 7
৫০ Samar Guha, op-cit, page 7
৫১ Samar Guha, op-cit, page 7-12
৫২ Report on the Sample Servey for estimating the Socio Economic Characteristics of displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the West Bengal, West Bengal State Govt., page 1
৫৩ Samar Guha, op-cit, Page 16
৫৪ ত্রিদীব চক্রবর্তী, (সম্পাদিত), ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, পৃষ্ঠা ১
৫৫ Masihur Rahman Khan, op-cit, page 605-609
৫৬ Sharifa Begum, op-cit, Page 59

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে তারাই দেশত্যাগ করেছে যাদের পরিবারের কোন সদস্য আগের থেকেই পশ্চিমবাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করছে অথবা চাকুরী সূত্রে বসবাস করছিল।[৫৭]

ভারতে তাদের জন্য সুযোগের প্রালোভন না থাকলে হিন্দুরা পূর্ববাংলায় থেকেই তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু তারা দেশত্যাগ করে ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকেই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। সেখানে গিয়ে তারা বিভিন্ন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে তবুও হিন্দুদের পূর্ববাংলা ত্যাগ বন্ধ হয়নি। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মুসলমান কৃষকরা তাদের হিন্দু ভাইদের মত দেশত্যাগ করে যায়নি।[৫৮] পাকিস্তানের জন্ম হয় দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত সময়ে। এছাড়া পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দর্যোগ, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দুর্ভোগের শিকার হয়ে মুসলমান সহ অন্যান্য ধর্মের লোকেরা কোন কোন সময়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে পুনরায় তাদের বাসস্থানে ফিরেছে কিন্তু ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করে চলে যায়নি।

বর্ধমান জেলার কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রামের ঢাকা কলোনি, নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী থানার ঢাকা পাড়া এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারীরা তাদের এলাকার পূর্বে দেশত্যাগকারী উচ্চবর্ণের লোকদের পরামর্শে দেশত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস শুরু করেন। সেখানে কম মূল্যে জমি কিনতে পেরে তারা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়েছেন। ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ঢাকা জেলার প্রায় চার/ পাচঁশত পরিবারের সকলেই সেখানে ঢাকার তুলনায় স্বল্পমূল্যে বেশি জমি কিনতে পেরেছেন বলে তারা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়েছেন। তাদেরকে সহায়তা করেছেন ঢাকা ত্যাগকারী তাদের এলাকার উচ্চবর্ণের লোকেরা। তারা দাঙ্গা বা কোনরকম হয়রানির শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেননি। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং তাদের ঢাকার বাড়ির উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যারা আগে পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছিলেন।

একটি অঞ্চলে কোন আইন শৃঙ্খলা অবনতির ঘটনা ঘটলে সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের বাসিন্দারাই তার শিকার হয় এবং স্থানীয়ভাবে এবং সরকারী প্রশাসনের সহযেগিতায় তারা তা প্রতিকার বা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কারণ সে মনে করে যে সমস্ত প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে যেভাবেই হোক তাকে সেখানেই বাস করতে হবে। যেমন মনে করা যায় কোন পরিবার প্রধান কলকাতায় চাকুরী করেন বলেই তিনি তার পরিবারের সদস্যদের দাঙ্গায় নির্যাতনের ভয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন, কিন্তু তার এ সুযোগটি না থাকলে তিনি হয়তো দাঙ্গাকালীন সময়ে সরে গিয়ে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে পরিস্থিতি শান্ত হলে পুনরায় তার নিজ বাড়িতেই ফিরে আসতেন।

কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় এ সকল প্রতিকূলতার মোকাবেলা করার চেয়ে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়াটাকেই নিরাপদ ও সুবিধাজনক মনে করেছে। নদীয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করে জয়া চ্যাটার্জী বলেন, "most responded had simply concluded that they had no future in a 'Muslim country', expecting their prospects to be better in India.[৫৯]

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে ঠেলে দেয়া ও টেনে নেয়ার মধ্যে কোন একক কারণ নিরূপণ করা কঠিন। পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশত্যাগের পেছনে ঠেলে দেয়ার বিষয় নিয়ে অনেক লেখা, গবেষণা, বক্তৃতা, বিবৃতি হয়েছে, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণভাবে সকলেরই ধারণা আছে। তবে যে বিষয়টি অবহেলিত তা হচ্ছে ভারতে টেনে নেয়ার বিষয়টি যা পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো কিছু ধারণা রয়েছে, তবে বিশদভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়নি বা গবেষণা হয়নি। আমার গবেষণায় 'ঠেলে দেয়ার' সঙ্গে অবহেলিত 'টেনে নেয়ার' বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে চাই।

---

[৫৭] Report on the Sample Servay for the Estimating the Socio Economic Characteristics of displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the West Bengal, page 2

[৫৮] আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

[৫৯] Joya Chatterjee, op-cit, Page 113

হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং সামাজিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেশত্যাগের ফলে এর প্রভাব পূর্ববাংলায় বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ককে এবং পরবর্তীতে অন্যান্যদের দেশত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পূর্ববাংলার বিশেষ করে ঢাকা জেলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে যে সকল কারণ রয়েছে তার মূল্যায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে "সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা ১৯৪৭-৭১" বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অন্যান্য গবেষণা

বাংলাদেশের ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ নিয়ে কিছু লেখালেখি হলেও তা খন্ডিত, অপরিকল্পিত। অনেক লেখায় সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে এবং লেখকের নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন থাকায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি গ্রন্থে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে এবং কিছু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে সে সময়কার পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতে পূর্ববাংলার হিন্দুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কিছু গবেষণাকর্ম এবং সরকারী নথিপত্র ও বিভিন্ন রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

এ বিষয়ে কয়েকজন গবেষক পূর্ববাংলার হিন্দু সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক কিছু গবেষণা করেছেন কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি।

Mohammad Ghulam Kabir, 'Minority Politics in Bengal' গ্রন্থে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৯৪৭-৭১ সময়কালের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তুলে ধরেছেন।[৬০]

Samar Guha `Non Muslim Behind the Curtain of East Pakistan' গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে পূর্ববাংলায় বিশেষ করে ঢাকা জেলার হিন্দুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেন। ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়, কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটলেও, তারা ভাল আছে মনে হলেও তারা নিরব অত্যাচারের শিকার হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। তার এই লেখাটি পূর্বে ১৯৫১ সালে ধারাবাহিবভাবে 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হত। তবে তার এই বর্ণনা সরকারী পর্যায়ে মনে করা হত অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত এবং অসত্য। তার এ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয়।[৬১] কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি এবং পরবর্তীতে পুস্তকারে প্রকাশিত হয়।[৬২]

বদরুদ্দীন উমর তার 'পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন। এ সময়ের বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সময়ের হিন্দু-মুসলিম, বিহারী- বাঙ্গালি দাঙ্গার বিভিন্ন দিক আলোচনা করছেন।[৬৩]

বদরুদ্দীন উমর তার 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' গ্রন্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পূর্ববাংলার কৃষক সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেছেন।[৬৪]

---

[৬০] Muhammad Ghulam Kabir, Minority Politics in Bangladesh, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980

[৬১] Home, Political, B Proceedings, Vol. 62, File- April- 52, 9-11, Government of East Bengal (GOEB)

[৬৩] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫

[৬৪] বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, ১৯৮০

আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ যৌথভাবে লিখেছেন 'ভাষা আন্দোলন ঃ অর্থনৈতিক পটভূমি'। এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে পূর্ববাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ ও এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন ও তার পরিণতি সংক্রান্ত বিষয়।[৬৫]

আবু আল সাইদ তার 'অখণ্ড বাংলা আন্দোলন', 'দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থে বাংলা ভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ও অবস্থান তুলে ধরেন।[৬৬]

Dr. Sukumar Biswas এবং Fhiroshi Sato যৌথভাবে লিখেছেন 'Riligion and Politics in Bangladesh and West Bengal'। এ গ্রন্থে ১৯৪৭-১৯৭১ সাল সময়কালের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন সুকুমার বিশ্বাস, আর Fhiroshi Sato করেছেন ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা ও আরও কয়েকটি দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন।.
সুকুমার বিশ্বাস পূর্ববাংলার দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন শুধুমাত্র ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার ভিত্তিতে। যদিও এ ঘটনাগুলোর পুলিশী তদন্ত হয়েছে পূর্ববাংলা সরকার কর্তৃক, যার কোন উল্লেখ তিনি করেননি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পুলিশী তদন্তের কিছু রিপোর্টের যে তথ্য তিনি উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়। তিনি ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় পূর্ববাংলার আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, সাধারণ জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা পূর্ববাংলার পত্রপত্রিকার সাংবাদিকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধে যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেননি।[৬৭]

শৈলেষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দাঙ্গার ইতিহাস' গ্রন্থে পূর্ববাংলার ও ভারতের বিভিন্ন সময়ের দাঙ্গার বর্ণনা এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার গ্রন্থে ভারতীয় বিভিন্ন দাঙ্গা ও এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ করে সাম্প্রদায়িকতা নয়, অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেছেন।[৬৮]

জয়া চ্যাটার্জী তার 'বাংলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ, ১৯৩২-১৯৪৭' গ্রন্থে ১৯৩২-১৯৪৭ সময়কালে বাংলার হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৬৯]

Joya Chatterji তার 'The Spoils of Partition BENGAL AND INDIA, 1947-1967' গ্রন্থে ১৯৪৭-১৯৬৭ সময়কালে যারা বাংলা ভাগ চেয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কতটুকু পূরণ হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। প্রথম অংশে বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি তুলে ধরেছেন কেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাগের জন্য চাপ দিয়েছিল। দ্বিতীয় অংশে তিনি আলোচনা করেছেন এ সময়ে হিন্দু নেতৃবৃন্দ যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জনগণের ওপর তার কতটা প্রভাব পড়েছে। এ সময়ে যে ৬ মিলিয়ন হিন্দু পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করেছে তারা নতুন প্রদেশে কিভাবে লড়াই করে তাদের আশ্রয়, চাকুরী, নিরাপত্তা খুজে নিয়েছে, নেতৃবৃন্দ তাদের পুনর্বাসনের জন্য কি ধরনের বন্দোবস্ত করেছেন তার চিত্র তুলে ধরেছেন। এ অংশে তিনি যে সকল মুসলমান পশ্চিমবাংলা ত্যাগ

---

৬৫ আতিউর রহমান, ও লেনিন আজাদ, ভাষা আন্দোলন ঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০
৬৬ আবু আল সাইদ, অখণ্ড বাংলা আন্দোলন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯,
আবু আল সাইদ, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১
৬৭ Sukumar Biswas, and Hiroshi Sato, RILIGION AND POLITICS IN BANGLADESH AND WEST BENGAL, A STUDY OF COMMNUL RELATIONS, Joint research Programme series No. 99, INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES, Tokyo, 1993
৬৮ শৈলেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৯ বাং
৬৯ জয়া চ্যাটার্জী, বাংলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ, ১৯৩২-৪৭, অনুবাদ- আবু জাফর, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩

করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অংশে তিনি পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৭০]

Profullo Kumar Chakraborti 'Marginal Men' গ্রন্থে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান, তাদের দেশত্যাগ, এ সময়কার ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তুলে ধরেছেন।[৭১]

Atulya Ghosh (Chairman, Board of editors), Asoke Kumar Sarkar, G.E.Powel, Pramathnath Bishi, Subimol Roy, Jugal Srimal, A.R. Mukherjee, P.S Mathur, A.K. Mukherjee, S.S Dasgupta সম্পাদিত ডাঃ বিধান রায়ের বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি, বিধান সভার ভাষণ, বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তব্য, প্রভৃতি নিয়ে সংকলিত গ্রন্থ 'Towards A Prosperous India, Speeches and Writings of Bidhan Chandra Roy". এ গ্রন্থে তৎকালীন ভারতীয় বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান, পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ববাংলার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী পূর্ববাংলার হিন্দুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

Ronald Skeldon, `Migration in South Asia: an Overview' গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে জনসংখ্যা নিজ দেশ ত্যাগের বিভিন্ন কারণ ও সে সব দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেছেন। এটি The Population Division, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৭২]

M.Nazrul Islam, তার `Pakistan and Malayasia Geographic and Demographic Dimension A Comparative Study in National Intregration' গ্রন্থে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান এর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন যা একটি দেশের স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে।

Pranati Choudhury, `Refugee in West Bengal. A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlement within the CMD' গ্রন্থে পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলায় হিন্দু শরণার্থীদের জন্য পুর্নবাসন ব্যবস্থা ও আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেছেন। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা কলোনিগুলোর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তার এই গবেষণামূলক গ্রন্থে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের বক্তব্য, বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা, লোকসভা ও বিধান সভার সদস্যদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[৭৩]

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তাঁর 'ভারত স্বাধীন হল' স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। সে সময়কার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব, তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ, ভারতের সাধারণ লোকের বিভিন্ন সময় দাঙ্গা সৃষ্টি, হিন্দু মুসলমানদের দেশত্যাগের ঘটনাবলী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে।[৭৪]

---

[৭০] Joya Chatterji, 'The Spoils of Partition BENGAL AND INDIA, 1947-1967, Cambridge University press India Pvt. Ltd., New Delhi, 2007

[৭১] Prafulla. K. Chakrabarti - Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal, Naya Udyog, Kolkata, 1999

[৭২] Ronald Skeldon, MIGRATION IN SOUTH ASIA: AN OVERVIEW, The Population Division, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Bangkok 1983

[৭৩] Pranati Chaudhury, Refugee in West Bengal. A Study of the Groth and Distribution of Refugee Settlements within the CMD, Occasional Paper No 55, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, 1983

[৭৪] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত স্বাধীন হল, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, অনুবাদ- সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬

আবুল মনসুর আহমদ, তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' এ আলোচনা করেছেন স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভারতের বিশেষ করে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন।[৭৫]

কামরুদ্দীন আহমেদ তার 'বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ে তিনি কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মকর্তা হিসেবে পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, শ্রমিক সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, সরকারের মনোভাব, ভারত-পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংখ্যালঘু সমস্যা, পূর্ববাংলার হিন্দু মন্ত্রীদের আচার আচরণ অনেক বিষয়কে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, বুঝেছেন যা বিভিন্ন সময় পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশত্যাগকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।[৭৬]

'তাজউদ্দীন আহমেদ এর ডায়রী ১৯৪৯-৫০' এতে তাজউদ্দীন আহমদ তার প্রতিদিনের কাজ এর বিবরণ তুলে ধরেছেন। সে সময় এর পূর্ববাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে তার এ ডায়রীতে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় সে সময়কার সমাজকর্মী, রাজনীতিবীদ, ছাত্র নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।[৭৭]

রামমনোহর লোহিয়া, 'ভারত ভাগের অপরাধী যারা' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থ থেকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলসহ বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অবস্থান সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়।

এম.আর.আখতার মুকুল, এর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'চল্লিশ থেকে একাত্তর', 'ভাসানী মুজিবের রাজনীতি'। দুটি গ্রন্থে চল্লিশের দশক থেকে পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববাংলায় সংঘটিত দাঙ্গা সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন।

S.K Ghosh তার 'RIOTS Prevention and Control' গ্রন্থে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে তার নিজের দেখা অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি আলোচনা করেছেন কিভাবে বিভিন্ন দাঙ্গার সময় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর একটি অংশ দাঙ্গাকারীদেরকে সাহায্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এ কারণেই দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।[৭৮]

ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক শংকর ঘোষ তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'হস্তান্তর' এ স্বাধীনতাকালীন ও পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলা ও ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালীর দাঙ্গার বর্ণনা, দাঙ্গা সংক্রান্ত বিষয়ে তৎকালীন সময়ের সাধারণ জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী ভ্রমণের সময় সফরসঙ্গী হয়ে তার সঙ্গে ছিলেন।[৭৯]

---

[৭৫] আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা, ২০০৬
[৭৬] কামরুদ্দীন আহমেদ, বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী, জোবেদা খানম, ঢাকা, ১৯৭৯
[৭৭] তাজউদ্দীন আহমেদ, এর ডায়রী ১৯৪৯-৫০, প্রতিভাস, ঢাকা ২০০০
[৭৮] S.K. Ghosh, RIOTS Prevention and Controlents, EASTERN LAW HOUSE, Calcutta, 1972
[৭৯] শংকর ঘোষ, হস্তান্তর, স্বাধীনতার অর্ধশতক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার পরিবারের সন্তান তপন রায় চৌধুরী তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘বাঙালনামা’ গ্রন্থে সে সময়ের জমিদার পরিবারগুলোর দুরবস্থার কিছুটা চিত্র তুলে ধরেছেন। সে সময়ের জমিদারী ব্যবস্থায় আয় কমে যাওয়া, জমিদারী প্রথার অবসানের প্রেক্ষাপটে হিন্দু জমিদারদের পূর্ববাংলা ত্যাগ, পেশাগত কারণে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তার জীবনের বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন।[৮০]

মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারের সন্তান মিহির সেনগুপ্ত তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘বিষাদ বৃক্ষ’ তে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নূতন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দূরবস্থার চিত্র তার নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ সময়ের বিভিন্ন সংকটের পাশাপাশি নিজের পরিবারের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার (এ ধরণের ঘটনা অনেক পরিবারেই ঘটেছে) চিত্র তুলে ধরেছেন, যা তাদেরকে চরম দুরবস্থায় নিপতিত করে। এমনকি তার যে সকল ভাই বোনেরা কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তারাও চরম দুরবস্থা ভোগ করেছেন। তার বর্ণনা থেকে সেই সময়ের পূর্ববাংলায় অবস্থানকারী ও দেশত্যাগকারী উভয়েরই অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।[৮১]

শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ ‘উদ্বাস্তু’ তে পশ্চিমবাংলায় গৃহীত সরকারী ও বেসরকারী পুনর্বাসন প্রকল্পের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সরকারী পুর্নবাসন প্রকল্পের কর্মকর্তা হিসেবে সে সময় সরকারের নির্দেশে তাকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এছাড়াও তিনি স্বাধীনতাকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিকতা ও তাদের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৮২]

ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী তার ‘কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪)’ গ্রন্থে কলকাতার বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠা ও বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।[৮৩]

অনিল সিংহ তার ‘পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন’ গ্রন্থে পশ্চিমবাংলায় ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক ও সরকারীভাবে যে সকল পুর্নবাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে সকল আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৪]

ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ’ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে কলকাতার বিভিন্ন কলোনিতে বিশেষ করে যাদবপুর, টালীগঞ্জ এলাকার কলোনিগুলোতে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী হিন্দু ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার রয়েছে। তাদের সাক্ষাৎকার থেকে বেরিয়ে এসেছে এ কলোনিগুলোর গড়ে ওঠা, এর উন্নয়নে কলোনিবাসী নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য। এর সঙ্গে আরও উঠে এসেছে তাদের পূর্ববাংলায় অবস্থানকালীন অবস্থা, তাদের দেশত্যাগের কারণ ইত্যাদি সব স্মৃতিচারণ।[৮৫]

মানস রায় তার স্মৃতিচারণমূলক লেখা “কাঁটা দেশে ঘরের খোঁজ” এ তার পরিবার সহ অন্যান্য পরিবার, তার নিজের বেড়ে ওঠা, কলোনি জীবন থেকে তার বেড়িয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। এটি প্রকাশিত হয়েছে ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ’ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে।

---

[৮০] তপন রায় চৌধুরী, বাঙ্গাল নামা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭

[৮১] মিহির সেন গুপ্ত, বিষাদ বৃক্ষ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৫

[৮২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০

[৮৩] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), ১ম খণ্ড, ইন্দু বরণ গাঙ্গুলী, কলকাতা, ১৯৯৭

[৮৪] অনিল সিংহ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৫

[৮৫] ত্রিদিব চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সেরিবার্ন স্কুল অব কালচারাল টেক্সট্‌স্ অ্যান্ড রেকর্ডস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

মানস রায় তার স্মৃতিচারণমূলক `Growing up Refugee' প্রবন্ধে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তুদের কলকাতার কলোনি জীবনে বসবাস ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এটি History Workshop Journal, Issue no.23, 2002 এ প্রকাশিত হয়েছে।

কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'জবরদখলের স্মৃতি ঃ তিনটি সাক্ষাৎকার' প্রবন্ধে বিজয়গড় কলোনির তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এতে এ সময় তাদের দেশত্যাগের কারণ, কলোনি প্রতিষ্ঠা, স্টেশন থেকে ব্যক্তিদের নিয়ে এসে কলোনিতে আশ্রয় প্রদান, সরকারের চাহিদা অনুযায়ী কাগজপত্র তৈরী করা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি ঐতিহাসিক পত্রিকায় বর্ষ ৯, ১/২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৮৬]

Gyanesh Kudaisya, `DIVIDED LANDSCAPES, FRAGMENTED IDENTITIES: EAST BENGAL REFUGEES AND THEIR REHABILITATION IN INDIA 1947-79' প্রবন্ধে ভারতে পূর্ববাংলার শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি হিন্দু শরণার্থীদের জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে তিনি হিন্দু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের পেছনে ভারতের জন্য লাভজনক পরিকল্পনার বিবরণ বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে তা তুলে ধরেছেন। D.A. LOW সম্পাদিত 'FREDOM, TRAUMA, CONTINUITIES, Northern India and Independence' গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়েছে।[৮৭]

Richard D.Lambert, 'RELIGION, ECONOMICS, AND VIOLENCE IN BENGAL, Background of the Minorities Agreement' প্রবন্ধে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকালীন ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান ও ভারতের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন। এ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি 'Middle East Journal Vol. 4, 1950 এ প্রকাশিত হয়েছে।[৮৮]

কুসুম লতা 'বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগোলিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা পত্রে (এম.এস.সি থিথিস, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) হিন্দু জনসংখ্যার একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে।[৮৯]

Masihur Rahman Khan তাঁর 'Pattern of External Migration to and from Bangladesh 1901-1961' প্রবন্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

পশ্চিমবাংলা সরকারের কিছু সরকারী রিপোর্ট থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের রিলিফ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের কিছু তথ্য জানা যায়। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য:-

i) Relief and Rehabilitation of displaced persons in West Bengal 1956
Rehabilitation of refugees: a statistical survey 1955

---

[৮৬] কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জবরদখলের স্মৃতি, ঐতিহাসিক, সম্পাদক- অরুণ দাসগুপ্ত, বর্ষ ৯, ১/২, কলকাতা,

[৮৭] Gyanesh Kudaisya, `DIVIDED LANDSCAPES, FRAGMENTED IDENTITIES: EAST BENGAL REFUGEES AND THEIR REHABILITATION IN INDIA 1947-79' (Article), FRDOM, TRAUMA, CONTINUITIES Northern India and Independence, Editors-D.A Low, Howard Brasted, Studies on Conttemporary South Asia, No. 2, Sage Publications, New Delhi, 1995

[৮৮] Richard D Lambert, RELIGION, ECONOMICS, AND VIOLENCE IN BENGAL Background of the Minorities Agreement, Middle East Journal, Vol. 4, 1950 (July)

[৮৯] কুসুম লতা, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগোলিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ (এম. এস.সি থিসিস) ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ (অপ্রকাশিত)

Dhaka University Institutional Repository

ii) Report on Rehabilitation of displaced persons From East Pakistan At ex-camp Sites in West Bengal, COMMITTEE OF REVIEW OF REHABILITION WORK IN WEST BENGAL, 19TH REPORT, Ministry of Labor, Employment and Rehabilitation
iii)Relief and Rehabilitalion of Displased persons in West Bengal, 1957

iv) Report on Educational and Medical Facilities for the Permanent Liability Homes and Infirmaries in West Bengal, 15th report, 1974

v) THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO- ECONOMIC SERVEY 1954-55, 1957-58,

vi) Report on the Sample Survey for Estimating on Socio-Economic Characteristics of Displaced Person Migrating from Eastern Pakistan to the State of West Bengal, Calcutta, 1951

vii) R.R Committee's Report, Govt. of West Bengal, 1981

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের বিষয়ে বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত হয়েছে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায় তাদের নিরাপত্তাহীনতার কারণেই বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেছেন। কিন্তু সে সময় ভারতে তথা পশ্চিমবাংলায় যে সকল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছিল এবং ভারতীয় পক্ষ থেকে পূর্ববাংলায় বাস করা নিরাপদ নয় বলে প্রচারণা চালিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে সে সময় ভীতি সৃষ্টি করে, অন্যদিকে সেখানে তাদের বসবাস উপযোগী পরিবেশ রয়েছে বা তৈরী করেছে বলে প্রচার করে হিন্দুদের দেশত্যাগকে প্রভাবিত করে তুলেছে, যদিও তা ছিল শরনার্থীদের তুলনায় অপ্রতুল। বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রচারণার ফলে পুনর্বাসন ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশী লোক বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় দেশত্যাগ করেছেন এবং অনেকে দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। সে বিষয়ে কোন লেখা বা গবেষণা হয়নি। আমি আমার গবেষণায় সে বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণার উৎস

এ বিষয়ে গবেষণার জন্য বিভিন্ন গবেষণা কর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নথি পত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সরকারী নথিপত্র, পাকিস্তান ও ভারতের প্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, গবেষণামূলক গ্রন্থ, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
সরকারী নথিপত্রে হিন্দু জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত চিঠি, বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত তথ্য ও তার তদন্ত রিপোর্ট, জমিজমা সংক্রান্ত তথ্য এবং ভারতীয় ও পশ্চিমবাংলা সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও যে সকল চুক্তি হয়েছে সে সকল নথি পত্র রয়েছে।

ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যাদের আত্মীয় স্বজন দেশত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ভারতে চলে গিয়েছেন তাদের এবং ঢাকা জেলা ত্যাগকারী ব্যক্তিবর্গ যারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার ব্যাপ্তি

আমার গবেষণার সময়কাল ১৯৪৭-১৯৭১ সাল। এ সময়কালের পূর্ববাংলার জনসংখ্যা পরিস্থিতি, হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলায় অবস্থান, এ সময়কালের পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠির সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান, হিন্দুদের অবস্থান, ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দুটি বড় দাঙ্গাসহ বিভিন্ন এ সময়কালের বিভিন্ন ছোট বড় সাম্প্রদায়িক সমস্যা, হিন্দুদের মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রে বসবাসের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ, দেশত্যাগের পেছনে পত্র পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। দেশত্যাগের পেছনে পূর্ববাংলায় সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি ছিল ভারতীয় সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ও তাদের ভারতে স্থায়ী আবাস সৃষ্টিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়:- ভূমিকা

ভূমিকায় পূর্ববাংলা বিশেষ করে ঢাকা জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, দেশত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান, স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অবস্থান ও ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভারত পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকালীন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের এবং ১৯৪৭-৭১ সাল সময়কালে হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা, পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণার উৎস ও গবেষণার যৌক্তিকতা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:- ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। পূর্ববাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হলেও এই বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার সবসময় একই রকম ছিল না বা জনসংখ্যার হার সকল জেলায় একই ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। সকল জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব সব ক্ষেত্রে এক নয়। এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সব ধর্মের লোকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ১৯০১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শতকরা হিসাবে মুসলমানদের তুলনায় বেশি হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের হার সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়ে ব্যাপক হারে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে। দেশের সার্বিক জনসংখ্যা বিস্তারের চিত্র হিন্দু জনসংখ্যা বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রায় একই। হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। সব পেশার লোকও সমান হারে দেশ ত্যাগ করেনি তবে হিন্দু জনসংখ্যা যে শুধুমাত্র দেশত্যাগের কারণেই হ্রাস পেয়েছে তা নয়।
এ অধ্যায়ে পূর্ববাংলার সার্বিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি, হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ, দেশত্যাগের অঞ্চলভিত্তিক হার ও এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়:- ভূমি ব্যবস্থাপনা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ

পূর্ববাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ববাংলায় তেমন কোন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। পূর্ববাংলায় জমিদারদের বেশীরভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং অধিকাংশ হিন্দু জমিদার বাস করতেন কলকাতায়, তারা পূর্ববাংলার জমির খাজনা থেকে অর্জিত অর্থ নিয়ে অনেকেই কলকাতায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। দেশত্যাগের পেছনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার একটি ভূমিকা থাকে যার কিছুটা ঘটেছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার আইন পরিষদে পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় যার অঙ্গিকার মুসলিম লীগ স্বাধীনতার পূর্বেই করেছিল। ফলে

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই হিন্দু জমিদার, তাদের কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বেশিরভাগই দেশ ত্যাগ করে। ঢাকা জেলার ভূমির পরিমাপ, বণ্টন সংক্রান্ত আইন, অন্যান্য জেলার তুলনায় ভিন্ন এমনকি ঢাকা জেলার বিভিন্ন অংশের পরিস্থিতিও ভিন্ন। ঢাকা জেলার ভূমির এক বড় অংশ (ঢাকার নওয়াব এস্টেট ও ভাওয়াল এস্টেট) ছিল 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্' এর অধীনে, ফলে এর বণ্টন ব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন। অন্যদিকে ভারতের আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার সহ বিভিন্ন প্রদেশে ভূমি আইনের পরিবর্তন, ভূমিসংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ, সর্বোপরি হিন্দু শরণার্থীদেরকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বাড়ি নির্মাণ ও কৃষি জমি দান ১৯৪৭ এর আগস্টের পূর্ব থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ও পরবর্তীতে ভারতে তাদের সম্পত্তি বদল করে অথবা বিক্রয় করে চলে যেতে আগ্রহী করে তোলে এবং তারা ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করতে শুরু করে। ১৯৫১ সালে East Bengal Evacuees Bill, West Bengal Evacuee Property Ordinance, The Assam Evacuee Property Act, Tripura Evacuee Property Ordinance, পাশ হয় দুই দেশের হিন্দু মুসলমান দেশত্যাগকারী জনগণের সম্পত্তি ফিরে পাওয়া, বিক্রয় বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সুবিধাজনক করার উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়:- ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান

ঢাকা বাংলাদেশের একটি ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। ঢাকা জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার সবসময় একই রকম ছিল না বা জনসংখ্যার হার জেলার সকল অঞ্চলে একই ভাবে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সব ক্ষেত্রে এক নয়। এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সব ধর্মের লোকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জেলার সার্বিক জনসংখ্যা বিস্তারের চিত্র ভিন্ন, হিন্দু জনসংখ্যা বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রায় একই। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধিও জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। সব পেশার লোকও সমান হারে দেশ ত্যাগ করেনি তবে হিন্দু জনসংখ্যা যে শুধুমাত্র দেশ ত্যাগের কারণেই হ্রাস পেয়েছে তা নয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক অবস্থান ভিন্ন তাই দেশত্যাগের কারণও ভিন্ন ভিন্ন।
এ অধ্যায়ে ঢাকা জেলার সার্বিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি, হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলাসহ ঢাকা জেলার হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ, দেশত্যাগের অঞ্চলভিত্তিক হার ও এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:- ১৯৫০ সালের দাঙ্গা পরিস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলায় সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত ছিল। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেশত্যাগের হার বৃদ্ধি পায়। এ সময় একদিকে পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের উস্কানিমূলক বক্তব্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত দাঙ্গার ফলে অনেক মুসলমান পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করছিল, অন্যদিকে খুলনা জেলার বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামের একজন আসামি গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অব্যাহত উস্কানীমূলক বক্তব্য এবং কিছু পত্র পত্রিকার প্রচারণার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। ভারত থেকে মুসলমানরা চলে আসতে থাকে এবং পরবর্তীতে পূর্ববাংলায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় ঢাকা শহর ও এই জেলার বেশ কিছু অঞ্চল আক্রান্ত হয়। দাঙ্গা এখানে স্থায়ী হয়েছিল চার/ পাঁচদিন, পূর্ববাংলা থেকে মোট দেশত্যাগকারী ৫২.৮৩% এর মধ্যে ১৭.৮৮%[১০] হিন্দু দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এ অধ্যায়ে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত, বিস্তার, জনগণের ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা, দাঙ্গায় ভারতীয় সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, পত্রপত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১০] Joya Chatterji, op-cit, page 112

ষষ্ঠ অধ্যায়:- ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা পরিস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ

১৯৫০ সালের পর ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত হযরত মুহাম্মদ (স:) এর চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে ভারতে দাঙ্গা শুরু হয় পরে তা বিস্তার লাভ করে পূর্ববাংলায়। এ সময়ও ঢাকা ও এর আশে পাশের এলাকায় দাঙ্গা বিস্তার লাভ করে। দাঙ্গা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র চার/পাঁচদিন, ঢাকা জেলা সহ পূর্ববাংলা থেকে মোট দেশত্যাগকারীর মধ্যে ৬.৯৩% হিন্দু দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৯১] এ অধ্যায়ে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত, বিস্তার, জনগণের ভূমিকা, পত্রপত্রিকার ভূমিকা এবং এসময় ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যা দাঙ্গা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়:- সরকারী পদক্ষেপ ও ঢাকা জেলার পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দুদের অভিযোগ সমূহ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও জনগনণকে বহুবিধ সমস্যার সমুখীন হতে হয়। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত ও মোহাজের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, অফিস আদালতের জন্য স্থান নির্ধারণ করা, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করে সেগুলোর সমাধান করা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সংগে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি। স্বাধীনতাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার, পরবর্তীতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে দেশত্যাগে প্রভাবিত করে। প্রশাসনে সরকার অপশন ঘোষণা করলে হিন্দু সরকারী কর্মচারীগণ অপশন দিয়ে ভারতে চলে গেলে সাধারণ হিন্দু সমাজের মনে মানসিক দুশ্চিন্তার ছাপ ফেলতে সহায়তা করে এবং তাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।[৯২] এসময় সরকার অনেক বাড়ি, দোকান, গোডাউন ইত্যাদি অধিগ্রহণ করে বিভিন্ন প্রয়োজনে। সরকারী বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপকে অনেক সময়ই সংখ্যালঘু তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে হিন্দু জনগণের বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়:- হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

একটি দেশের জনসাধারণের মানসিকতার গঠনে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পত্র পত্রিকা, রেডিও, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি প্রচার মাধ্যম দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। কোন ঘটনার মিথ্যা প্রচারণা করে, উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রচার করে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তা আরও ভয়াবহ করে তুলতে প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রচার মাধ্যম ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। প্রচার মাধ্যম এর নেতিবাচক প্রচারণার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আন্ত:ডোমিনিয়ন সম্মেলনে ও বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে দুই দেশের শান্তি রক্ষার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এখানে প্রচার মাধ্যমে যে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হয় তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ১৯৫০ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চুক্তির ফলে ১২ লক্ষ হিন্দু দেশে ফিরে এলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ধারা কম বেশী অব্যাহত থাকে কারণ, দিল্লী চুক্তির বিরোধিতা করে বেঙ্গল প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, বেঙ্গল পুনর্বাসন সংস্থা ও ভারতীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তাদের প্রচারণা অব্যাহত রাখে। মিথ্যা প্রচারণার অভিযোগে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয় পূর্ববাংলার শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকায়। কিন্তু ভারতীয় পত্রিকার সাংবাদিকগণ তাদের প্রচারণা অব্যাহত রাখে। পূর্ববাংলা সরকার ও বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদকে বিভ্রান্তিমূলক ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বলে মন্তব্য করে এবং এ

[৯১] Joya Chatterji, op-cit, page 112
[৯২] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৪,

সকল সংবাদ, সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট বারবার অনুরোধ জানায় ও এ পত্রিকাগুলো পূর্ববাংলায় নিষিদ্ধ করে।

ভারতীয় বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, লিফলেট একদিকে পূর্ববাংলার হিন্দু জনগণের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় হিন্দুদের মুসলমান বিরোধী করে তুলেছে। বহু লিফলেট, পুস্তিকা রয়েছে যার প্রকাশকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ববাংলা সরকার ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এর প্রতিকারের জন্য উস্কানীমূলক ও অসত্য বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বার বার পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হলেও পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।[৯৩] এ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায় :-হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগে ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

দেশত্যাগের পেছনে শুধুমাত্র পূর্ববাংলায় সংঘটিত ঘটনাই দায়ী নয়, এর পেছনে আরও অনেক কারণ রয়েছে যা হিন্দুদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। গবেষণা কর্মের তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে হিন্দুদের দেশত্যাগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এখানে সংঘটিত ঘটনাবলীই দায়ী নয়, প্রতিবেশী দেশ ভারতের সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাও দেশত্যাগকে প্রভাবিত করেছে। দেশভাগের আগে থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দেয়ার জন্য আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছিল। ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ অধ্যায়ে ভারতীয় সরকার ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায় :- ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাকালীন সময়ে হিন্দু সম্প্রায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করা আরম্ভ হলে এসকল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়। সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের জন্য তাদের শ্রেণী ও পেশা অনুযায়ী পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকার প্রায় ৮৫,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে পশ্চিমবাংলায় ৫২৮ টি কলোনি স্থাপন করে। এর মধ্যে ২৮৮টি শহরাঞ্চলে এবং ২৪০টি গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলের কলোনিগুলোর মধ্যে ১৪৫টি সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক।[৯৪] এছাড়াও মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ অধ্যায়ে হিন্দু শরণার্থীদের জন্য ভারতীয়দের পক্ষ থেকে যে পুনর্বাসন কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়:-উপসংহার

এ অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের সারাংশ ও উপসংহার আলোচনা করা হয়েছে।

[৯৩] Home, Political, B Proceedings, Vol. 66, File No. 105-132, Jan.-53 page-52, GOEB

[৯৪] Pranati Chaudhury, op-cit, page 16

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এমনকি ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও পূর্ববাংলা জনসংখ্যা বহুল এলাকা ছিল। ১৮৭২ সালে যখন প্রথম দশকওয়ারি আদমশুমারী হয় তখনও পূর্ব বাংলা ছিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এর কারণ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে বলা যায় এই এলাকার নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত উর্বর কৃষিভূমি। যা যুগে যুগে বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে। এছাড়াও এ এলাকার নদীগুলো ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত এবং বঙ্গোপসাগর যা এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহজ যোগাযোগ ঘটিয়েছে। বিদেশীরা বিভিন্ন সময়ে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ধর্ম প্রচারে এসে এখানে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেছেন এবং এখানকার স্থানীয় লোকের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। এমনকি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও লোক এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। তার জন্য বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদনই প্রধান কারণ বলে মনে করেন আতাহারুল ইসলাম।[১] ষোল শতক থেকে কিছু সংখ্যক বৃহৎ নদীর গতিপথে পরিবর্তন সূচিত হয়। পর্যাপ্ত কৃষি-উৎপাদন ও উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ অন্যান্য অঞ্চলের বাস্তুত্যাগিদেরকে নবগঠিত এই ব-দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ করে।[২] অধিক জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে অনেক সময় দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক স্থানে আবাস স্থাপন করেছে তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে।

পূর্ববাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হলেও এই বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার সবসময় একই রকম ছিল না বা জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি সকল জেলায় একই ভাবে ঘটেনি। সকল জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব সব ক্ষেত্রে এক নয়। এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সব ধর্মের লোকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর উভয় দেশের বিপুল সংখ্যক লোক দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ হওয়ায় পাকিস্তানের হিন্দু জনগণের একটা অংশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে আবার পাকিস্তান মুসলমান প্রধান এলাকা বলে ভারতের অনেক মুসলমান ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সকল অঞ্চল থেকে যেমন সমান হারে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেনি তেমনি পাকিস্তানের সকল অঞ্চল থেকেও সমান হারে দেশ ত্যাগ করেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই হারের যথেষ্ঠ পার্থক্য রয়েছে। সকল জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে সকল ধর্মের লোকের সম্পৃক্ততা ও তাদের সামগ্রিক কর্মকান্ডের পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বৃহত্তর ঢাকা জেলার পরিস্থিতিরও পার্থক্য রয়েছে।

জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি

ভারতে ১৮৭২ সালে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গণনা শুরু হয়। এই গণনার ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারী হয় ১৯৭৪ সলে।[৩]

ভারতের জনসংখ্যা ঊনিশ শতকের শেষ নাগাদ প্রায় একই রকম ছিল। এর স্বাভাবিক কারণ হিসাবে ধারণা করা হয় এ সময় জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় একই ছিল। বিংশ শতকের প্রথম থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা বেড়ে যায় এবং মৃত্যু হার হ্রাস পায়। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের জনসংখ্যা আবার ঊনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারী রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জনসংখ্যা কখনো খুব বেড়ে গেছে আবার কখনো বৃদ্ধির হার খুবই কম, অর্থাৎ এ সময় মৃত্যু হার বেড়ে গেছে।

---

১ এম আতাহারুল ইসলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি(প্রবন্ধ) বাংলাদেশের (সামাজিক) ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৫১,

২ এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫১

৩ গণনার স্বাভাবিক সময় অনুযায়ী গণনা হওয়ার কথা ছিল ১৯৭১ সালে কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলে পুরো ১৯৭১ সাল জুড়ে। স্বাধীন দেশে বিভিন্ন সমস্যার ফলে গণনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। Population Census of Bangladesh 1974, National Vol., Dacca 1977

১৯৩১-১৯৪১ সময়কালে পার্থক্য ৭.৪ মিলিয়ন। এই সংখ্যা এর পূর্বের গণনার তুলনায় অস্বাভাবিক। আবার **১৯৪১-১৯৫১** সাল সময়কালে এই বৃদ্ধির হার এত কম যে এটিও স্বাভাবিক জন্ম হারের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবেই কম।

সারণী- ২.১ এ ১৯০১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে- **১৯০১-১৯৩১** সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির হার খুব বেশী বৃদ্ধি পায়নি কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭৪ পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে।

সারণী- ২.১

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দশকওয়ারি বৃদ্ধির হার ১৯০১ - ১৯৭৪

আদমশুমারী দশক	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)	বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)
১৯০১	২৮.৯	০.০০৭২
১৯১১	৩১.৬	০.০০৮৯
১৯২১	৩৩.৩	০.০০৫২
১৯৩১	৩৫.৬	০.০০৬৭
১৯৪১	৪২.০	০.০১৬৫
১৯৫১	৪১.৯	-০.০০২
১৯৬১	৫০.৮	০.০১৯৩
১৯৭৪	৭১.৩	০.০২৬১

সূত্র: এম আতাহারুল ইসলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি(প্রবন্ধ), বাংলাদেশের (সামাজিক) ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৬৬

সারণী-২.২

১৯০১- ১৯৭৪ সাল সময়ে বাংলাদেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)

আদমশুমারী দশক	জন্মহার	মৃর্তুহার
১৯০১-১৯১১	৫৩.৮	৪৫.৬
১৯১১-১৯২১	৫২.৯	৪৭.৩
১৯২১-১৯৩১	৫০.৪	৪১.৭
১৯৩১-১৯৪১	৫২.৭	৩৭.৮
১৯৪১-১৯৫১	৪৯.৪	৪০.৭
১৯৫১-১৯৬১	৫১.৩	২৯.৭
১৯৬২-১৯৬৫	৫৫.০	১৮.৫
১৯৬৫-১৯৭৪	৪৮.৩	১৯.৪

সূত্র: এম আতাহারুল ইসলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি(প্রবন্ধ), বাংলাদেশের (সামাজিক) ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৬৬

১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়কালের গণনায় দেখা যায় এ সময় জন্মহার ও মৃত্যুহারে মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। সারণী ২.২ এ ১৯০১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়কালের জন্মহার ও মৃত্যুহার এর পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।[৪]

সারণী- ২.৩ এ পূর্ববাংলার শহর ও গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘণত্ব দেখানো হয়েছে।

[৪] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৬

সারণী ২.৩

অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যার ঘণত্ব (প্রতি বর্গফুট)

সাল	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪
মোট ঘণত্ব	৫৭৬	৬৮৩	১০২০
শহরাঞ্চল	৪,৭৫১	৮,৫৬০	
গ্রামাঞ্চল	৫২৪	৫৮৯	

সূত্র- Bangladesh population Census 1981, National Series, Dhaka, 1983, Tab-2, page-xxxiv

১৯৪১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সারণী ২.৪ এ ১৯৪১ সালের সরকারী আদমশুমারী রিপোর্ট ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ব্যক্তিগতভাবে করা আদমশুমারীর রিপোর্টের তথ্য দেয়া হল।

সারণী-২.৪

১৯৪১ সালের সরকারী ও প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এর আদমশুমারী তথ্য

	জেলাসমূহ	মুসলিম		হিন্দু		অন্যান্য	
		সরকারী। প্রশান্ত		সরকারী। প্রশান্ত		সরকারী। প্রশান্ত	
১.	ঢাকা	৬৭.২৯	৬৭.৩০	৩২.২১	৩২.২০	১.৪৯	০.৫০
২.	ময়মনসিংহ	৭৭.৪৩	৭৭.৪০	২১.৫২	২১.৫২	১.০৩	১.১
৩.	ফরিদপুর	৬৪.৭৭	৬৪.৮০	৩৪.৭৩	৩৪.৮০	.৩৮	.৪০
৪.	বাকেরগঞ্জ	৭২.৩৩	৭২.৩০	২৭.০১	২৭.০০	.৬৫	০.৭০
৫.	বগুড়া	৮৩.৯২	৮৪.০০	১৪.৮৭	১৪.৮০	১.২৯	১.২০
৬.	দিনাজপুর	৫০.১৯	৫০.২০	৪০.২০	৪০.২০	৯.৫৯	৯.৬০
৭.	রংপুর	৭১.৪১	৭১.৪০	২৭.৮৯	২৭.৮৯	.৫৮	.৭০
৮.	রাজশাহী	৭৪.৬৪	৭৪.৩০	২০.৯৪	২১.০০	৪.৪০	৪.৪০
৯.	কুষ্টিয়া/নদীয়া	৬১.২৫	৬১.২০	৩৭.৩৮	৩৭.৪০	১.৩৫	১.৪০
১০.	পাবনা	৭৭.০৬	৭৭.১০	২২.৫০	২২.৫০	.৪৩	.৪০
১১.	যশোহর	৬০.২০	৬০.২০	৩৯.৪৪	৩৯.৪০	.৩৫	.৪০
১২.	খুলনা	৪৯.৩৫	৫০.৩০	৫০.৩১	৫০.৩০	.৩২	.৩০
১৩.	ত্রিপুরা	৭৭.০৯	৭৭.১০	২২.৭৯	২২.৮০	.১১	.১০
১৪.	নোয়াখালী	৮১.৩৫	৮১.৪০	১৮.৫৯	১৮.৬০	.০৫	.০০
১৫.	সিলেট	৬০.৭১	৬০.৭০	৩৬.৮৮	৩৬.১০	২.৪০	২.৪০
১৬.	চট্টগ্রাম	৭৪.৫৪	৭৪.৬০	২১.২৭	২১.৩০	৪.১৮	৪.১০
১৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম	২.৯৮	২.৮০	১.৯৭	২.০০	৯৫.০৮	৯৫.২০

সূত্র: Census of Pakistan 1951, vol.3 East Bengal, Karachi, 1953, Page 27
অমলেন্দু দে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ২০৮

১৯৪১ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার হিন্দু ও মুসলমান লোকসংখ্যার যে তালিকা প্রস্তুত করেন তা থেকে হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান জেলা সমূহের লোকসংখ্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।[৫] ১৯৪১ সালের সরকারী আদমশুমারী গ্রহণযোগ্য হয়না এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের গণনার তথ্য গ্রহণযোগ্য হয়। এই সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দুটি তথ্য প্রায় কাছাকাছি। দুটি তথ্যের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী হিসাবে দেখা যায় হার কম আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এই হিসাব সমান। অমলেন্দু দে'র মতে যদি প্রশান্তচন্দ্রের গণনা সঠিক হয় তবে ১৯৪১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা অতিমাত্রায় বেশী হওয়ার একটি

[৫] অমলেন্দু দে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভাব্য কারণ হিসাবে দায়ী করা যায় ১৯৩১ সালের গণনার সময় বয়কটের কারণে কম গণনা করা হয় বলে অনুমান করা হয়।

১৯৪১ সালের গণনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৯৪১-১৯৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে ঘটে যায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৩১ সালে রাজনৈতিক কারণে জনসংখ্যা গণনা হ্রাস পায়। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলো গণনা বয়কট করে। ফলে গণনার সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে ধারণা করা হয় যে এ সময় লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৪১ সালের গণনায় দেখা যায় লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] ১৯৪১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রাজনৈতিক বলে উল্লেখ করা হয়।[৭] জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে গণনার সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী করে দেখান।[৮] এই সময়ে সাম্প্রদায়িক এবং বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটি আলোচিত হয়।[৯]

১৯৪১ সালের গণনার এই ঘটনার পর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দুই সম্প্রদায়ই এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করার পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরী করেছেন। স্বাধীনতা লাভের সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এসময় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দুটি দেশ বিভক্ত হয়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান, হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে ভারত। ফলে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কারণে দুই দেশেরই ব্যাপক সংখ্যক লোক দেশত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যায় অর্থাৎ ব্যাপক শরণার্থী বিনিময় ঘটে। ফলে ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালের গণনার তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সময় কালের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ঘটে যার প্রভাব পড়ে ১৯৫১ সালের গণনায়। ফলে ১৯৫১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম হয়েছে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী রিপোর্টে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো হচ্ছে,

> "প্রথমতঃ- ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বার্মা ও আসামের পতনের পর পূর্ববাংলার বিভিন্ন বর্ডারে শত্রুপক্ষ চলে আসে এবং জনগণ বিভিন্ন শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকে। অনেক লোক সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, উপকূল রক্ষী এবং বিভিন্ন যুদ্ধ সংক্রান্ত সংগঠনে যোগ দেয়ার ফলে প্রায় এক লক্ষ লোক তাদের পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে জন্মহার কমে যায়।
>
> দ্বিতীয়তঃ-১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, কলেরার প্রাদুর্ভাব এবং গুঁটি বসন্তের প্রাদুর্ভাবে অনেক লোক মারা যায়। দুর্ভিক্ষ, এর পূর্বের বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বিশেষ করে ১৯৪২ সালে ভোলার ঘূর্ণিঝড় এর ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জনগণ তাদের বাড়িঘর হারায়, ছেলে মেয়ে মারা যায়। অনেকে তাদের গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় ১৭,১৪০০০ লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি মহামারী আকারে চলতে থাকে। এ সময়ে মোট মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩৩,৩৫০০০ বলে গণনা করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক সাধারণ মৃতের সরকারী হিসাব পাওয়া যায়। সাধারণ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী দুর্ভিক্ষের কারণে মৃতের সংখ্যা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ।
>
> তৃতীয়তঃ- এ সময় খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য, দুস্প্রাপ্যতা বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে ফলে জন্মহার কমে যায়।
>
> চতুর্থতঃ- এ সময় ভারত, পাকিস্তান উভয় দেশে কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ফলে ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম পাকিস্তানে এবং অনেক হিন্দু ভারতে গমন করে ফলে দু দেশে সম্প্রদায়গত জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে।"[১০]

পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ৪১.৯ মিলিয়ন যা বেড়ে ১৯৬১ সালে হয় ৫০.৮ মিলিয়ন এবং ১৯৭৪ সালে হয় ৭১.৩ মিলিয়ন। মাত্র ২৩ বছরে ৭০ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ঘটনা বাংলার ইতিহাসে

---

৬. মন্তব্য করেন নৃতত্ত্ববিদ তারকচন্দ্র দাস। অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮

৭. Census of Pakistan -1951. vol.1. Page 62

৮ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮

৯ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ২০৮

১০ Census of Pakistan-1951, Vol.3, East Bengal, page 30

অভূতপূর্ব। যদিও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ফলে মৃত্যু হারের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৪ সালে।[১১] দুই দশকের মধ্যে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বাংলার জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মৃত্যুহার কমে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে বলা যায় বিভিন্ন মহামারী রোগের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি ও টিকা আবিষ্কারের ফলে লোক মৃত্যুর হার কমে যায়।[১২]

জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা বিন্যাস

পূর্ববাংলার সব জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব এক নয়। প্রতি জেলার জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এমনকি প্রতিটি জেলায় জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিতেও পার্থক্য রয়েছে। সব জেলায় জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান নয় বলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কারণেই জেলার জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে জনগণের জীবিকা নির্বাহের উৎস। এর উপরও এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কুসুমলতা তার গবেষণায় জনসংখ্যার ঘনত্বের প্রধান দুটি নিয়ামকের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে-(ক) ভৌগোলিক নিয়ামক (খ) অর্থনৈতিক নিয়ামক।[১৩]

এগুলোকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ- ভূপ্রকৃতি, নদী বিন্যাস, মাটির উর্বরতা, জলবায়ু।[১৪] ভৌগোলিক পরিবেশ জনসংখ্যার বসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- পাহাড়ী এলাকায়, ঘন জঙ্গল পূর্ণ এলাকায় বসবাসের জন্য অসুবিধাজনক, ফলে এখানে জনবসতি কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, সুন্দরবন অঞ্চল, ঢাকার দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষা উত্তরাঞ্চলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব কম। সমতল এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশী। কেননা এখানে ভূমির উর্বরতার দরুণ যে কোন ফসল উৎপাদনে সুবিধা। নদীবহুল এলাকায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়।

১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম এবং মৃত্যুহার বেশী থাকার কারণকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন রোগের মহামারী আকারে বিস্তার, ইত্যাদিকে দায়ী করা যায়।[১৫] ১৯২১ সালের আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী থাকার মূল কারণ ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগব্যাধি। তৎকালীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলায়ও এক্ষেত্রে অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[১৬]

২.৫ নং সারণীতে দশক অনুযায়ী জেলাওয়ারি জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সারণী অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, দেশের উত্তরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯৭৪ সালে বৃদ্ধির হার অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী। রাজশাহী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল ছিল। ১৯২৩ নাগাদ অধিকাংশ জঙ্গল সাফ করা হয় এবং এর ফলে জলবায়ুগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। পরবর্তীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যবসার সুযোগ সুবিধা কৃষির উন্নতির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১৭]

[১১] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৬
[১২] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৬
[১৩] কুসুমলতা, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগলিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ, পৃষ্ঠা ২৭
[১৪] কুসুমলতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭
[১৫] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৭
[১৬] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪৮
[১৭] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০৯

সারণী- ২.৫

জেলাওয়ারি প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯০১-১৯৭৪

জেলা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪
দিনাজপুর	৪৪৪	৪৬১	৪৮১	৮৫৭	৫২৭	৫৪৪	৫৫৯	৯৮৫
রংপুর	৫৯৫	৬৫৮	৬০১	৭১৫	৭৯০	৭৯২	১১৩০	১৪৭২
বগুড়া	৫৯৯	৬৮৯	৭৩৮	৭৬১	৮৫৫	৮৬৮	১০৭৫	১৪৮৬
রাজশাহী	৫২৩	৫৫০	৫৫৮	৫৪৮	৬০৪	৬০৮	৭৮৮	১১৬৮
পাবনা	৮৩৭	৮৪২	৮১৮	৮৪৯	১০০১	৯৩৬	১১৫৭	১৪৭৭
কুষ্টিয়া	২৪৬	৬১৪	৫১৭	৪৮৯	৬৭১	৬৪৭	৮৮২	১৩৭৪
যশোর	৬৩৩	৬১৪	৬১১	৫৯৬	৬৫১	৬৫৬	৮৭৭	১২৮৮
খুলনা	৩১১	৩৩৮	৩৬১	৩৯৯	৪৭৭	৫০৯	৬০০	৭৬৮
বাকেরগঞ্জ	৫৯৫	৬৪৭	৭০৪	৭৯১	৯৪৩১	১০৩১	১১৭৬	১৪০৭
পটুয়াখালী	-	-	-	-	-	৬৮৪	৭৩২	৮৯৫
ময়মনসিংহ	৬৩০	৭২৭	৭৭৭	৮২৪	৯৫৮	৯১৭	১০৯৩	১৪৮৮
টাঙ্গাইল	-	-	-	-	-	৯৪৩	১১৪৩	১৫৮৭
ঢাকা	৯৫৫	১০৬৯	১১৫৭	১২৫৮	১৫৪১	১৪৯২	১৯০৯	২৬৪৩
ফরিদপুর	৬৮৯	৭০৮	৭৮৬	৮৩৭	১০২৬	১০৫১	১৩১১	১৫০৭
সিলেট	৪১৬	৪৫৯	৪৭১	৫০৫	৫৮০	৬২৮	৭৩৭	৯৯৫
কুমিল্লা	৮৪৫	৯৭০	১০৬৫	১২০৮	১৫২৫	১৫০০	১৭৯৪	২২৪৫
নোয়াখালী	৭১৫	৮১৯	৯২২	১০৬৮	১৩৮৮	১৪২৭	১৪৬৮	১৫৯১
চট্টগ্রাম	৫২৭	৫৮৭	৬৩৭	৬৯৯	৮৩৮	৯০২	১১৩৯	১৫৪৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৫	৩১	৩৫	৪৩	৪৯	৫৭	৭৫	১০০
বাংলাদেশ	৫৩৪	৫৮৩	৬১৪	৬৫৬	৭৭৬	৭৬১	৯২২	১২৬৬

সূত্রঃ- Bangladesh Population Census-1981, National Series, Dhaka 1983, Page. 37-38

আতাহারুল ইসলাম বাংলার জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধিকে আলোচনা করেছেন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। চারটি পর্যায়ের ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। চারটি পর্যায় থেকে একটি সাধারণ ধারণা করা যায় যে একটি দেশে জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশও এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। একটি এলাকা যদি অর্থনৈতিক ভাবে সম্মৃদ্ধ হয় অর্থাৎ মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিবেশ যেমন ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কারখানার কাজের সুযোগ থাকে তবে সেখানে অন্য দেশ থেকে লোক এসে বসতি স্থাপন করে আবার সে দেশের এ সকল সুযোগ সুবিধার অভাব বা সেখানকার শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা মানুষকে দেশত্যাগ করে অন্য দেশে বা অন্য এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

“ ১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ (১৫০০-১৭৬০)
২. অর্থনৈতিক বিপর্যয় দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ (১৭৬০-১৯২১)
৩. মৃত্যুহার হ্রাসের সূচনাপর্ব (১৯২১-১৯৭৪)
৪. জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির যুগ (১৯৭৪- পরবর্তী যুগ)”[১৮]

১৯১১-১৯২১ সাল পর্যন্ত আদমশুমারীর সময় কালে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে। এই নিম্নমুখী হারের জন্য দায়ী করা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া। তারকচন্দ্র দাস এই কারণগুলোকেই দায়ী করেন।[১৯]

---

[১৮] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫০
[১৯] অমলেন্দু দে. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১১

দিনাজপুরে লোকসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে সাঁওতালরা এসে বসতি স্থাপন করায় এখানকার লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেই জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময় জনসংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, রংপুর এলাকার লোক দেশত্যাগ করে বার্মা, আসাম, কুঁচবিহার, জলপাইগুড়িতে বসতি স্থাপন করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে মুসলমানরা নিজ এলাকায় ফিরে এলে এখানকার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার বিষয় বিবেচনা করে অনেক শহর এলাকা গড়ে উঠে। নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে কিছু শহর গড়ে উঠলে সেখানে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন চট্টগ্রাম ও খুলনায় সমুদ্র বন্দর থাকায় এখানে লোকসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। কেননা এখানে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে এ সকল এলাকায় লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কুষ্টিয়া জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম, ১৯০১-১৯২১ সময়কালের মধ্যে এর শতকরা হিসাবে তারতম্য ছিল ১১.৫৩%। ১৯৫১-১৯৭৪ সালে সেই তারতম্য হয়েছে ১৩.০৪%। কুষ্টিয়া জেলার একাংশে জলনিষ্কাশণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে এখানে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। জনসংখ্যা হ্রাসের এই অন্যতম কারণ মনে করা হয় এ জেলার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।[২০] পরবর্তীতে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

এই পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে ২.৫ ও ২.৬ নং সারণী থেকে। এই সারণী গুলোতে ১৯০১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব, বৃদ্ধির তারতম্যের শতকরা হিসাব এবং ১৯১১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময় কালের প্রতি আদমশুমারীর শতকরা বৃদ্ধির জেলাওয়ারি হিসাব দেয়া হয়েছে। শহর এলাকার মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর রংপুরের সৈয়দপুর, লালমনিরহাটে রেলওয়ে কারখানা এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রয়োজনে অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। ফলে এখানে লোকসংখ্যা বেড়ে যায়। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচাইতে বেশী। জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির জেলাওয়ারি তারতম্য আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সারণী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একে একটি শ্রেণীকরণ করা যায়।

ক. ”সব কটি পর্যায়েই খুলনা, ঢাকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির গড়পড়তা হারের চেয়ে অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়পড়তা হারের চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পায়। তবে ১৯৫০ সালের পরবর্তীকালে এইসব জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার সমগ্র দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির শতকরা হারের চেয়ে নীচে নেমে যায়।

গ. রংপুর ও বগুড়ার জনসংখ্যা ১৯০১-১৯১১ দশক ও ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে উচ্চতর হারে বৃদ্ধি পায়। তবে ১৯২১-১৯৪১ সন মেয়াদে এই বৃদ্ধি তেমন বেশী ছিল না।

ঘ. যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনার জনসংখ্যা ১৯০১-১৯২১ সময়কালে হ্রাস পায় এবং ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শ্লথ গতিতে। কিন্তু ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে তা বেড়ে যায় দ্রুত। কিন্তু বিশেষ করে যশোর, কুষ্টিয়া জেলায়।

ঙ. রাজশাহী ও দিনাজপুরের লোকসংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় কেবল ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে।”[২১]

[২০] জেলা গেজেটিয়ার কুষ্টিয়া ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৫৯

[২১] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৭

সারণী-২.৬

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার লোকসংখ্যার তারতম্য ১৯০১-১৯৭৪ (শতকরা হিসাবে)

	১৯০১-১৯২১	১৯২১-১৯৪১	১৯৫১-১৯৭৪
রাজশাহী বিভাগ		১৩.৮৩	৮৫.৫৯
দিনাজপুর	৮.৩৫	৯.৫০	৮৯.৭৮
রংপুর	১৬.০২	১৪.৪৩	৮৬.৭৬
বগুড়া	২২.৪৭	১৬.৪১	৭৪.৫৪
রাজশাহী	৬.৫৮	৮.৪০	৯৩.৫৭
পাবনা	-২.২৯	২২.৪৩	৭৭.৬৫
খুলনা বিভাগ	৬.৩৯	২৫.২৫	৭২.২৬
কুষ্টিয়া	-১১.৫৩	১৭.৪৩	১১৩.০৪
যশোর	-৩.৭৭	৬.৭৫	১০৩.০০
খুলনা	১৬.১০	৩২.১০	৭১.৮০
বাকেরগঞ্জ	১৪.৪৪	৩৪.০০	৪৯.০১
ঢাকা বিভাগ	২০.৬৪	২৮.৪২	৬৮.৭৪
ময়মনসিংহ	২৩.৪৬	২৪.৫১	৬৬.৭২
ঢাকা		৩৩.১৭	৮৬.৮৯
ফরিদপুর	১৩.৭৭	৩০.৩০	৪৬.৩২
চট্টগ্রাম বিভাগ	২১.৫৬	৩৭.০০	৫৮.৯৮
সিলেট	১৩.১৩	২৩.২৪	৫৫.৫৬
কুমিল্লা	২৬.০৪	৪৩.১৯	৫৩.৪৫
নোয়াখালী	৩১.১৪	৫১.২৮	৫৬.১৪
চট্টগ্রাম	১৮.৫১	৩৩.৯৬	৭১.৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩৮.৮৫	৪২.৬০	৭৬.৯০
বাংলাদেশ	১৪.৯৫	২৬.০৯	৭০.৪৬

সূত্রঃ- আতাহারুল ইসলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (প্রবন্ধ), বাংলাদেশের (সামাজিক) ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৫০

হিন্দু জনসংখ্যা পরিস্থিতি

দেশের সার্বিক জনসংখ্যা বিস্তারের চিত্র, হিন্দু জনসংখ্যা বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রায় একই। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং সকল ধর্মের লোকেরই বসতি স্থাপনের সময় উর্বর ভূমি, নদ-নদীর অবস্থা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রভৃতি দিক বিবেচনা করেই বসতি স্থাপন করেছে। সমতল ও উর্বর মৃত্তিকা প্রধান জেলাসমূহে যেমন ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম যশোর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু বসতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছে মুসলমানদের ক্ষেত্রে।[২২] এখানে উল্লেখ্য হিন্দুদের এক বিরাট অংশ জেলে সম্প্রদায় ফলে দেশের হাওড় এলাকা (যেমন সিলেট ও নেত্রকোণা জেলা) এবং বিল অঞ্চলে (যেমন:- গোপালগঞ্জ, খুলনা, যশোর) অঞ্চলে হিন্দু বসতি যথেষ্ঠ ঘন।[২৩] বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ১৯০১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শতকরা হিসাবে মুসলমানদের তুলনায় যথেষ্ঠ হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের হার সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়ে ব্যাপক হারে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের হ্রাস বৃদ্ধির হার সব সময়ে একই রকম ছিল না। সব পেশার লোকও সমান হারে দেশ ত্যাগ করেনি তবে হিন্দু জনসংখ্যা যে শুধুমাত্র দেশ ত্যাগের কারণেই হ্রাস পেয়েছে তা নয়।

[২২] কুসুমলতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

[২৩] কুসুমলতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

সারণী ২.৮

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক শতকরা হার ১৯০১-১৯৭৪

আদমশুমারী দশক	মুসলমান	হিন্দু	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
১৯০১	৬৬.১	৩৩.০	-	-	০.৯
১৯১১	৬৭.২	৩১.৫	-	-	১.৩
১৯২১	৬৮.১	৩০.৬	-	-	১.৩
১৯৩১	৬৯.৫	২৯.৪	-	-	১.২
১৯৪১	৭০.৩	২৮.০	-	-	১.৮
১৯৫১	৭৬.৯	২২.০	-	-	১.১
১৯৬১	৮০.৪	১৮.৫	০.৩	০.৭	০.১
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৩	০.৬	০.২

সূত্রঃ- Census of Pakistan, 1951. Vol.1, Karachi, 1953, page 27
Bangladesh Census Report, 1974, National Vol. Dhaka 1977, tab. 21, page 24,

১৯৬১ সালের গণনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, খুলনা বিভাগে শতকরা হিসাবে উচ্চবর্ণের হিন্দু বেশী। তফসীলি সম্প্রদায় খুলনা জেলায় সবচেয়ে বেশী। খুলনা জেলায় তফসীলি সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ৩৯.৪%। যশোর, সিলেট, ফরিদপুর ও দিনাজপুর জেলার হিন্দু জনসংখ্যার হার সবসময়ই বেশী ছিল। বগুড়া, নোয়াখালী, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং রংপুর জেলার হিন্দু জনসংখ্যার হার সবসময়ই কম। শতকরা হিসাবে কুষ্টিয়া জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা সবচেয়ে কম। ঢাকা বিভাগে মুসলমান জনসংখ্যা বেশী। ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ১.৫% হারে। রাজশাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে হ্রাসের হার কম।

২.৯ নং সারণীতে ১৯৩১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হয়েছে। সারণী গুলোতে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার যে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে তার চিত্র সুস্পষ্ট। জনসংখ্যা বৃদ্দির হার সব জেলার এবং সকল গণনার সময়কালে সেখানে হ্রাসে দিকেই রয়েছে। তবে সকল জেলার এই হ্রাসের হার সমান নয়।[২৪]

২.১০ নং সারণীতে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে। তবে এই সারণী গুলোতে লক্ষ্য করে দেখা যায় যে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমূখী ১৯৪১-১৯৫১ সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশী। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই হ্রাসের মাত্রা বেশী।

[২৪] রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এস.জি পানানডিকার, P. K.Wattal এর মতামত এর ভিত্তিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে হিন্দুদের ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিন্দুদের বিশেষ করে উচ্চবর্ণের সামাজিক আচার আচরণ এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস যা তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বাঁধা। ফলে শতকরা হিসাবে মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমেই নিম্নমূখী। বিস্তারিত অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১২-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.৯ (ক)

বাংলাদেশের জেলাওয়ারি মোট জনসংখ্যা এবং ধর্মভিত্তিক শতকরা হার ১৯৪১-১৯৫১

জেলার নাম	১৯৪১				১৯৫১					
	মোট জনসংখ্য	মুসলি	হিন্দু	অন্যান্য	মোট জনসংখ	মুসলিম	হিন্দু		খ্রিষ্টান	অন্যান্য
							উচ্চবর্ণ	নিম্নবর্ণ		
দিনাজপুর	১৯২৬৮৩৩	৫০.১৯	৪০.২০		১৩৫৪৪৩২	৬৪.৫২	৪.৮২	৩০.৩১	০.২৮	০.০০
রংপুর	২৮৭৭৮৪৭	৭১.৪১	২৭.৮৯	.৬৮	২৯১৬৪৭৬	৭৯.৭৮	৪.৩২	১৫.৮০	০.০৪	০.০০
বগুড়া	১২৬০৪৬৩	৮৫.৯২	১৪.৪৭	১.১৯	১২৭৮১৮৫	৮৭.২৫	৫.৩৮	৭.৩১	০.০৫	০.০১
রাজশাহী	১৫৭১৭৫০	৭৪.৬৪	২০.৯৪	৪.৪০	২২০৫০৫৭	৮০.৩৪	৮.৯৪	১০.৪৫	০.২৩	০.০৪
পাবনা	১৭০৫০৭২	৭৭.০৬	২২.৫০	.৪৩	১৫৮৪৩০৩	৮৩.৬৭	৮.৭৬	৭.৫০	০.০৬	০.০১
কুষ্টিয়া	১৭৫৯৮৪৬	৬১.২৫	৩৭.৩৮	১.৩৫	৮৮৪১৫৭	৯১.৫৫	৪.৯৫	৩.০৬	০.৪৩	০.০১
যশোর	১৮২৮২১৬	৬০.২০	৩৯.৪৪	০.৩৫	১৭০৩০২২	৬৮.৬২	১২.৪২	১৮.৮৭	০.০৮	০.০১
খুলনা	১৯৪৩২১৮	৪৯.৩৫	৫০.৩১	০.৩২	২০৭৫৫০৬	৫৪.৫৫	১৩.০২	৩২.২০	০.২২	০.০১
বাকেরগঞ্জ	৩০৪৯০১০	৭২.৩৩	২৭.০১	.৬৫	৩৬৪২১৮৫	৭৯.৫৬	৬.৭০	১২.৯৭	০.৩১	০.৪৬
পটুয়াখালী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ময়মনসিংহ	৬০২৩৭৫৮	৭৭.৪৩	২১.৫২	১.৪৩	৫৭৮৪৭৪৫	৮২.৯০	৮.৭১	৭.৬৬	০.৫৭	০.১৬
ঢাকা	৪২২২১৪৩	৬৭.২৯	৩২.২১	১.৪৯	১০৭২৭৮১	৭৮.৮৮	১০.২১	১০.৪২	০.৪৭	০.০২
ফরিদপুর	২৮৮৮৮০৩	৬৪.৭৭	৩৪.৮৩	.৩৮	২৭০৯৭১১	৭০.৭৯	৮.৩০	২৪.৫৬	০.৩৫	০.০০
সিলেট	-	৬০.৭১	৩৬.৮৮	২.৪০	৩০৫৯৩৬৭	৬৭.৭৭	১৮.০০	১৩.৫১	০.১৮	০.৫৪
ত্রিপুরা/কুমিল্লা	৩৮৬০১৩৯	৭৭.০৯	২২.৭৯	.১১	৩৭৯২২০০	৮১.৩৮	১২.২১	৬.৩০	০.০১	০.০
নোয়াখালী	২২১৭৪০২	৮১.৩৫	১৮.৬৯	.০৫	২২৭৪০৪৭	৮৪.২২	১১.৯৭	৩.৭৫	০.০৪	০.০২
চট্টগ্রাম	২১৫৩২৯৬	৭৪.৫৪	২১.২৭	৪.১৮	২৩০৮৮৮২	৭৭.৩৮	১৫.৩৮	৩.৪৬	০.০৮	৩.৭০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৪৭০৫৩	২.৯৪	১.৯৭	৯৫.০৮	২৮৭২৭৪	৬.২৯	১১.৯২	২.৩৪	১.৩০	৭৮.১৫
বাংলাদেশ			২৮.০৩		৪১৯৩২৩২৯	৭৬.৮৫	৯.৯৯	১২.০৫	০.২৫	০.৮৬

সূত্র -Census of India – 1941. Vol. IV Bengal, Calcutta, 1943, Page 44
Census of Pakistan – 1951, Vol. 3, East Bengal, Karachi, 1953, Page 27

সারণী- ২.৯ (খ)

বাংলাদেশের জেলাওয়ারি মোট জনসংখ্যা এবং ধর্মভিত্তিক শতকরা হার ১৯৬১-১৯৭৪

জেলার নাম	১৯৬১						১৯৭৪					
	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম	হিন্দু		খ্রিষ্টান	অন্যান্য	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্টান	অন্যান্য
			উচ্চবর্ণ	নিম্নবর্ণ								
দিনাজপুর	১৭০৯৯১৭	৮৪.১১	৪.৮৪	২৫.৮৮	০.৫২	০.১৩	২৫৭০৫৭২	৭৫.১	২৩.৭	-	০.৫	০.৭
রংপুর	৩৭৯৬০৪৩	৮৮.৬২	৪.৮৫	১১.৯০	০.০৮	০.০৩	৫৪৪৬৯১৬	৮৭.৬	১২.০	-	০.২	০.২
বগুড়া	১৫৭৪১০৫	৮১.৭৪	৫.৭৮	৫.৪৭	০.০৭	০.০৫	২২৩১০০৩	৯২.১	৭.২	-	০.৪	০.২
রাজশাহী	২৮১০৯৬৪	৮৬.৫৫	৮.৮৯	৮.৪২	০.৩৭	০.৬৫	৪২৬৮৪১৭	৮৬.১	১৩.০	০.১	০.২	০.৭
পাবনা	১৯৫৯০৬০	৭৫.৬৭	৭.৩২	৬.০২	০.১০	০.০১	২৮১৪৬৪৫	৯০.৪	৯.২	-	০.৩	০.১
কুষ্টিয়া	১১৬৬২৬২	৭১.৮৫	৪.৭১	২.৮৬	০.৪৩	০.০০	১৮৮৩৬৩৫	৯৫.২	৪.৭	-	-	০.১
যশোর	২১৯০১৫১	৬০.২০	১১.৪২	১৬.৬১	০.১০	০.০২	৩৩২৬৭৭৮	৭৮.১	২১.৯	-	-	-
খুলনা	২৪৪৮৭২০	৮২.০৫	১১.৬৭	২৭.৭৫	০.৬০	০.০৪	৩৫৫৭৪৬০	৭১.২	২৮.৩	০.০	০.১	০.১
বাকেরগঞ্জ	৪২৬১৭৬৭	৮৭.১৮	৬.৪৭	১০.৯১	০.২৯	০.২৯	৩৯২৮৪১৪	৮২.৮	১৭.০	-	০.০	০.১
পটুয়াখালী	-	-	-	-	-	-	১৪৯৮৯৮৭	৮৮.৮	১০.৯	০.৩	০.১	-
ময়মনসিংহ	১০১৮৯০৯	৭৩.৮৩	৬.৯৫	৪.৯৭	০.৬৭	০.২৩	৭৫৬৬৮২৫	৯৩.৪	৬.০ ১২.০	০.০	০.৫ ০.২	০.১ ০.২
ঢাকা	৫০৯৫৭৪৫	৭৯.৬০	৮.৭০	৮.৩৯	০.৪২	০.০০	৭০১১৮০৭	৮৭.৮	১১.৪	০.০	-	০.১
ফরিদপুর	৩১৭৮৯৪৫	৭৩.১২	৭.১৯	১৮.৬৭	০.২৯	০.০২	৪০৫৭৬০৭	৭৬.৪	২৩.৩	-	-	০.০
সিলেট	৩৪৮৯৫৮৯	৮৭.৭১	১৫.৮২	১০.৭৮	০.১৯	০.০৯	৪৭৫৯২৮১	৮২.৬	১৬.৯	০.১	০.২	০.২
ত্রিপুরা/কুমিল্লা	৪৩৮৮৯০৬	৮০.৭০	৯.৬১	৪.৭৮	০.০১	০.০৬	৫৮১৯১৭৬	৯০.২	৯.৭	০.১	০.০	১.৬
নোয়াখালী	২৩৮৩১৪৫	৮৭.৭১	৯.৭২	২.৫১	০.০১	০.০৬	৩২৩৪০৬১	৯২.৮	৭.২	০.০	০.০	০.২
চট্টগ্রাম	২৯৮২৯৩১	৮০.৭০	১৩.৩৪	৩.২২	০.১০	২.৬৪	৪৩১৫৪৬০	৮৩.৮	১৪.১	১.৯	০.১	১.৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩৮৫০৭৯	১১.৭৭	১১.৩৬	১.০১	০.৬৪	৭৩.২২	৫০৮১৯৯	১৮.৯	১০.৪	৬৬.৫	২.৬	৬৬.৫
বাংলাদেশ	৫০৮৪০২৩৫	৮০.৪৩	৮.৬৩	৯.৮২	০.২৯	০.৮৩	৭১৪৭৭৭৪৮	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.৬

সূত্রঃ Census of Pakistan- 1961 Vol.2, East Bengal, Karachi, 1964, -II-14
Bangladesh Population census report-1974, National vol. Dacca, 1977, Page 67, 24
Bangladesh Population census report-1981, Dhaka, 1983, Page 75-76
কুসুমলতা, বাংলাদেশ হিন্দু জনসংখ্যা ভৌগোলিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ, পৃষ্ঠা ১৩

সারণী ২.১০

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু জনসংখ্যার জেলাভিত্তিক বণ্টন ১৯৩১-১৯৭৪

জেলার নাম	১৯৩১	১৯৪১ উচ্চবর্ণ	নিম্নবর্ণ	উচ্চবর্ণ	১৯৫১ নিম্নবর্ণ	উচ্চবর্ণ	১৯৬১ নিম্নবর্ণ	হিন্দু	১৯৭৪ তফশীলি সম্প্রদায়
দিনাজপুর	৭৯৩৮৩২	৩৮৭৩৮	৩৮৭২৬৪	৪১৮৭৩৫৩	৫০৫২২৫০	৪৩৮৬৬২৩	৪৯৯৩০৪৬	১৮৯৭৪৮	৪১৭৯০২
রংপুর	৭৪৬৫৪৬	৪০৮৫২২	৩৯৪৩২৭	১২৭৭০৫	৪৬০৮৫০	১৪৬১৬৬	৪৫২৮৩১	২৬৫৯৮৯	১৮৬৬২৭
বগুড়া	১৭৭৬২৯	৯৭২৩১	৯০৩০১	৬৮৭৬৮	৯৩৪৪৫	৯০৯১৪	৮৬১৪৫	৯৮২২৭	৬৪৬৯৫
রাজশাহী	৩২৬০১৮	১৬৭৬২২	১৬১৬০৮	১৯৭১৬৫	২৩০৫০১	২৪৯৭৯৭	২৩৬৬৯৫	২৭৭৫০৬	২৮০১৬০
পাবনা	৩৩২৩৬৭	১৯৩৪৫	১৯০২০	১৩৮৮২২	১১৮৭৯৪	১৪৩৩৫৯	১১৭৮৭৫	১৬১৯৫৯	৯৮১২৮
কুষ্টিয়া/নদীয়া	৫৭৪০৪৬	৩২৫৬৫৮	৩৩২৯২	৭৬৪২৩৬	১৪৭৯৭৩৫	৫৪৮৯৬	১৫৪১৪৮২	৪৩৮৫৯	৩৪২৭৬
যশোর	৬৩৪২৩০	৩৬১১৮৫	৩৫৯৮৯৩	২০৬১৯৭	৩১১৮৯২	২৫০০৭৭	৩৬৩৮৫৩	৮৮৫৮৪৮	৪৪২৭৬৭
খুলনা	৮১৬৬২০	৫০৯৭৯১	৪৬৭৯০২	২৭০১৩১	৬৬৮৩৭৩	২৮৫৮৩২	৬৭৯৪০৩	১৯১৫৮২	৬৪৬৬০১
বাকেরগঞ্জ	৮১২৫৮৫	৪৯০৬৩০	-	২৪৪১৬৩	২৭৫৭৩৩	৪৭২৩৮০	৪৬৪৮৫০	৩১৭৯৭৮	৩৪৮১৫৭
পটুয়াখালী	-	-	৪৮০৪৪৪	-	-	-	-	৬৮৩৫৩	৯৪২৯০
ফরিদপুর	৮৪৭০৬৪	৫২৫৭৯৪	৬৫৭৪৫৬	২৩০১৬৮	৫৬৬৫৪৬	২২৮৫০৬	৫৯৩৫৫৮	২৪৪৮৮২	৬৯৮৯৩৯
ঢাকা	১১২৪৮৯৩	৭০২৬৭৬	৬৫১৫৬৫	৪১৫৮৭৩	৪২৪২৮৫	৪৪৩২২২	৪২৭৫৪	৪৮৬০৩৪	৩৮১০৯৭
ময়মনসিংহ	১১৭৪৩২৮	৬৪৫০৭৩	-	৫০৫১১৩	৪৪৩২৮৯	৪৮৭৯০২	৩৪৯০৩৯	৩৩৮৭৫৮	১১৭৬২৪
টাঙ্গাইল	-	-	-	-	-	-	-	১৯৩৭৮৯	-
সিলেট		-	-	৫৫০৬৪৬	৪১৩৩৮৬	৫৫২১২৭	৩৭৬১৪৮	৪৯১৮২৩	৩১১৮৫৭
কুমিল্লা	৭৫০৭২৪	৪৪২৫২৭	৪৩৭৪৩৩	৪৬২৯২৭	২৩৮৯১৮	৪২১৭৩৬	২০৯৫৭২	৩৯৪৩৪৪	১৬৯৭৭০
নোয়াখালী	৩৬৬৩৯১	২১২২৯৫	১৯৯৯৬৬	২৫০৮১০	৬৯৪৩১	২৩১৭৫৮	৫৯৬৪৬	১৯১৬১৩	৯৪২৯০
চট্টগ্রাম	৩৯২৩৫২	২৩২৮১০	২২৫২৬৪	৩৭৬৫৫০	৯৫৭৫০	৩৯৮০৫৪	৯৬০৭২	৪৯৮৮৫০	৬০৭৬৫৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩৩৭৭৬	২১৩৪	২৭৪৭	৩৪২৫৪	৬৭৩০	৪৩৭৫৮	৩৮৮৬	৪৬০৫২	৭১২১
বাংলাদেশ								৪৯২৬৪৪৮	

সূত্রঃ- Census of India – 1931. Vol.V, Part-1, Bengal and Sikkim. Calcutta, Page 221
Census of India – 1941. Vol. IV Bengal, Calcutta, 1943, Page table-36-40
Census of Pakistan – 1961, Vol. 2, East Bengal, Karachi, 1964, page 99-101

২.১১ সারণীতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার দেখানো হয়েছে। এতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই বৃদ্ধির হার সবসময় নিম্নমুখী তবে ১৯৪১-১৯৫১ সালে এই বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হওয়ার বিভিন্ন কারণ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪১-১৯৫১ সাল সময় কালে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশী। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ তাদের দেশত্যাগপূর্বক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ। ১৯৬১-১৯৭১ সময়কালে হ্রাসের কারণ হচ্ছে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপুল সংখ্যক লোক ভারতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধের শেষে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অংশ ভারতে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

পূর্ববঙ্গের বিল অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা বেশী লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় হচ্ছে জেলে। ফলে হাওড়, বিল এলাকায় এদের আধিক্য বেশী। সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড় এলাকা ও খুলনা, যশোর ও ফরিদপুর জেলার বিল এলাকা এই জেলে সম্প্রদায় বেশী। এছাড়া সিলেটে চা বাগানের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল হিসাবে চট্টগ্রাম ও খুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের হার বেশী। কেননা সেখানকার উপকূলীয় এলাকার লোকের প্রধান পেশা হচ্ছে মৎস আহরণ ও এর উপর ভিত্তি করে অন্যান্য কর্মকাণ্ড। চট্টগ্রাম জেলা বন্দর এলাকা হওয়াতে সেখানে লোকের ব্যবসা বাণিজ্য সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ রয়েছে।

সারণী-২.১১

হিন্দু জনসংখ্যার জেলাভিত্তিক শতকরা হিসাব ১৯০১-১৯৭৪

জেলার নাম	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১ উচ্চবর্ণ নিম্নবণ	১৯৬১ উচ্চবর্ণ +নিম্নবর্ণ	১৯৭৪ উচ্চবর্ণ +নিম্নবণ
দিনাজপুর	৪৭.৬০	৪৬.৯৮	৪৫.২২	৪০.২০	৪.৮২ ৩০.৩১	৪.৮৪ ২৫.৮৮	৩.৬০
রংপুর	৩৩.৮৪	৩১.৫৫	২৮.৭৭	২৭.৮৯	৪.৩৮ ১৫.৮০	৩.৮৫ ১১.৯৩	৭.৬২
বগুড়া	১৭.০৫	১৬.৬৪	১৬.৩৫	১৪.৮৭	৫.৩৮ ৭.৩১	৫.৭৮ ৫.৪৭	৩.১২
রাজশাহী	২১.৫৫	২১.৩৭	২২.৮১	২০.৯৫	৮.৯৪ ১০.৪৫	৮.৮৯ ৮.৪২	৫.৯৭
পাবনা	২৮.৪০	২৪.০৬	২৪.০৬	২২.৫০	৮.৭৬ ৭.৫০	৭.৩২ ৬.০২	৩.৯৪
কুষ্টিয়া/নদীয়া	-	-	-	-	৪.৯৫ ৩.০৬	৪.৭১ ২.৮৬	
যশোর	৩৮.০২	৩৮.১১	৩৭.৯৫	৩৯.৪৪	১২.৪২ ১৮.৮৭	১১.৪২ ১৬.৬১	৪.৬৫
খুলনা	৪৪.৬০	৫০.০৩	৫০.২২	৫০.৩১	১৩.০২ ৩২.২০	১১.৬৭ ২৭.৭৫	.৯৪
বাকেরগঞ্জ	২২.৬৫	২৮.৭৫	২৭.৬৫	২৭.০১	৬.৭০ ১২.৯৭	৪.৪৭ ১০.৯১	৫.৫০
পটুয়াখালী							২.১০
ময়মনসিংহ		২৮.০১	২৫.৮৮	২৪.২৭	২২.৮৯	৬.৯৫ ৪.৯৭	১০.৫৮
টাঙ্গাইল							২.৯১
ঢাকা		৩৭.২৭	৩৭.৭০	৩৪.২০	৩২.৭৭	৮.৭০ ৮.৩৯	১০.৬৫
ফরিদপুর		৩৭.৮৬	৩৬.৫২	৩৬.২৫	৩৫.৮৬	৭.১৯ ১৮.৬৭	৫.৬৪
সিলেট		-	-	-	৪০.৮৭	১৫.৮২ ১০.৭৮	৬.৬৬
কুমিল্লা		-	-	-	২৪.১৪	৯.৬১ ৪.৭৮	৮.১৪
নোয়াখালী		২৪.০৫	২৩.০৬	২২.৩৫	২১.৪৭	৯.৭২ ২.৫০	৪.৫২
চট্টগ্রাম		২৪.৭২	২৩.০৩	২২.৫৮	২১.৮৩	১৩.৩৪ ৩.২২	৬.০৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম		৮৭.৪৬	১১.৮০	৫৭.৯০	১৭.২৭	১১.৩৬ ১.০১	০.৭১
বাংলাদেশ		৩৩.০	৩১.৫	৩০.৬	২৯.৪০	৮.৬৩ ৯.৮২	১৩.৫

সূত্রঃ- বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগলিক ও জ্যামিতিক বিশ্লেষণ, কুসুমলতা, পৃষ্ঠা ১৩
Census of Pakistan – 1961, Vol. 2, East Bengal, Dacca, 1964, page 11-14
B Bangladesh Census Report-1974, National Vol, Dacca, 1977, page-190

সারণী- ২.১২

আদমশুমারী দশক অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ১৯৪১-১৯৭৪

জেলা	১৯৪১-৫১	১৯৫১-৬১	১৯৬১-৭৪
দিনাজপুর	-১.২	০.৯৯	১.১৩
রংপুর	-৩.২৬	০.১৭	০.৭
বগুড়া	-১.৪৭	০.৮৭	-০.৬৭
রাজশাহী	-০.৭৩	১.২৯	১.০৬
পাবনা	-৩.৯২	০.১৪	-০.০২
কুষ্টিয়া	-১৫.৮	২.২	০.০৪
যশোর	-২.৩৫	১.৭	১.৩২
খুলনা	-০.৪১	০.২৮	০.৩২
বরিশাল	-৩.৬২	০.৩৩	০.৮৭
ময়মনসিংহ	-০.৯২	-৩.৪৬	-১.৩
ঢাকা	-৪.৮২	০.৩৬	-০.০৩
ফরিদপুর	-১.৬	০.৪৫	১.০৭
সিলেট	-১.২	০.০২	-১.০৮
কুমিল্লা	-২.২৬	-২.৩৪	-২.৩৩
নোয়াখালী	-০.৫৮	২.০৪	-১.৭
চট্টগ্রাম	-০.৪১	০.৪৫	১.৭২
পার্বত্য চট্টগ্রাম	-১৭২	১.৫	০.৮৭
বাংলাদেশ	-০.০২	০.১৫	০.২৪

সূত্রঃ- বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগোলিক ও জ্যামিতিক বিশ্লেষণ, কুসুমলতা, পৃষ্ঠা ৭৭

ঢাকা বিভিন্ন সময়ে রাজধানী হওয়ার ফলে ঢাকার জনসংখ্যার স্বাভাবিকভাবেই বেশী। এর প্রভাব রয়েছে হিন্দু জনসংখ্যার আধিক্যের ক্ষেত্রেও। ১৯৭৪ সালের গণনার সময় আরও দুটি জেলা নতুন হয়েছে। বাকেরগঞ্জ জেলাকে বিভক্ত করে করা হয়েছে পটুয়াখালী এবং ময়মনসিংহ জেলা থেকে হয়েছে টাঙ্গাইল। ফলে বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার জনসংখ্যা বিশেষ করে হিন্দু জনসংখ্যা হিসাবে তারতম্য ঘটেছে।

নগরভিত্তিক জনসংখ্যা

একটি দেশে জনসাধারণের শহর এবং গ্রামে বসবাসের হার থেকে সে দেশের উন্নয়নের সার্বিক পরিস্থিতি ধারণা করা সম্ভব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শহরে বসবাসের শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে সেই সম্প্রদায়ের জীবন যাপনের মান নিরূপন করা যায়। দেশ বিভাগের পূর্বে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শহরে বাস করত। ৮৫% বাড়িঘর এবং সম্পদের মালিক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। শহরবাসী মোট লোকের মধ্যে ৬০% ছিল হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকেরা।[২৫] ঢাকা এবং চট্টগ্রামে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকারখানার এবং সরকারী চাকুরীতে তাদের আধিপত্য। যদি কেউ কেবল শহরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখত তাহলে তার মূলে ধারণা জন্মাত যে বাংলাদেশ একটি হিন্দু প্রধান প্রদেশ।[২৬] কারণ প্রত্যেকটি শহরেই হিন্দুদের প্রাধান্য। কুসুমলতা তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে উত্তরাঞ্চলে রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে হিন্দু বসতির পরিমান অধিক হলেও তাদের পৌর শহরে বসবাসের হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম। কারণ সেখানে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ কম এবং অন্যদিকে সেখানকার উর্বর কৃষিভূমি হওয়াতে হিন্দুদের অধিকাংশ গ্রামেই থেকে গেছে।[২৭]

[২৫] Muhammad Ghulam Kabir, Minority Politics in Bangladesh, Page 3
[২৬] অন্নদা শংকর রায়, যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৩
[২৭] কুসুমলতা, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ৩২

Dhaka University Institutional Repository

এই দুই জেলায় সংখ্যাগত দিক থেকে হিন্দু বেশী থাকায় এ এলাকা থেকে দেশত্যাগের হার কম।[২৮] ২.১৩ নং সারণীতে ১৯০১-১৯৭৪ সালে এখানে নগরায়ণের হার ছিল ২.৪৩% এবং ১৯৭৪ সালে তা বেড়ে হয় ৮.৮%। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের নগরায়ণের হার আলাদাভাবে পাওয়া যায় ১৯৫১ সাল থেকে ।

সারণী-২.১৩

বাংলাদেশে নগরায়ণের হার ১৯০১-১৯৭৪

সাল	নগরায়ণের শতকরা হার (বাংলাদেশ)	মুসলমান নগরায়ণের হার (শতকরা)	হিন্দু নগরায়ণের হার শতকরা
১৯০১	২.৪৩	মোট শহরবাসীর	মোট শহরবাসীর
১৯১১	২.৫৪		
১৯২১	২.৬৪	৪০%	৬০%
১৯৩১	৩.০২		
১৯৪১	৩.৬৬		
১৯৫১	৪.৩৩	৩.৮২	৫.৩
১৯৬১	৫.১৯	৫.০০	৫.৩৬
১৯৭৪	৮.৮		

সূত্র: Bangladesh Population Census 1974, National Vol., Dacca, 1977, Page 36

দেশের অন্যান্য যে সব অঞ্চলে হিন্দু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সেই সকল অঞ্চলের পৌর শহরগুলোতে হিন্দুদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫১ সালে হিন্দুদের শহরে বসবাসের হার ছিল ৫.৩%। অর্থাৎ জাতীয় গড় ৪.৩৫% এর চেয়ে অনেক বেশী। এ সময় মুসলমান নগরায়ণের হার মাত্র ৩.৮২%। ১৯৬১ সালে এই হার বেড়ে হয় ৫.৩৬%। ১০ বছরে এই হার বেড়েছে ৩৩%।[২৯] ১৯৬১ সালে আরও ১৪টি নতুন শহর গড়ে উঠে।

১৯৭৪ সালে শহরবাসীর সংখ্যা হয় ৮.৭৮% যা ১৯০১ সালে ছিল ২.৪৩%। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল কম। ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে এই হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।[৩০]

ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের তুলনায় নগরায়ণের হার বেশী হয় চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে।[৩১]

নগরায়ণের ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে ঢাকা জেলায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গড়ে উঠে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী অফিস, বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে এই জেলার অন্যান্য জেলা থেকে লোক ঢাকায় আসতে থাকে।[৩২]

সারণী ২.১৪ থেকে বাংলাদেশে নগরায়ণের বৃদ্ধির শতকরা হার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

---

[২৮] Bangladesh Population Census 1974, National Series, Page 36
[২৯] কুসুমলতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪
[৩০] কুসুমলতা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪
[৩১] Bangladesh Population Census Report-1981, National Series. Dhaka, 1983, Page 37-38, Government of Bangladesh, GOB
[৩২] ibid, Page 37-38

সারণী-২.১৪

জনসংখ্যার নগরায়নের ভিত্তিক শতকরা হার ১৯৬১-১৯৭৪

সাল	১৯৬১	১৯৭৪
বাংলাদেশ	৫.১৯	৮.৭৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪.৬৯	৭.৫৪
বান্দরবন	-	১১.৪৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫.৯২	৯.৭৮
চট্টগ্রাম	১২.৪৯	২০.৯৮
কুমিল্লা	৩.১৭	৪.২৪
নোয়াখালী	১.৪৪	২.১৫
সিলেট	২.০৩	২.৭৭
ঢাকা বিভাগ	৭.০১	১৩.৬০
ঢাকা	১৪.৭৯	২৯.৫৭
ফরিদপুর	২.৪৭	২.৮৭
জামালপুর	৪.৩৪	৪.৬৪
ময়মনসিংহ	১.১১	৫.৯৫
টাঙ্গাইল	১.৫৯	৫.২৪
খুলনা বিভাগ	৪.২৮	৭.৩৯
বরিশাল	৩.৪৯	৩.৯৩
যশোর	৩.৪৪	৫.৪৩
খুলনা	৭.০৪	১৪.৬৩
কুষ্টিয়া	৫.৪২	৮.৩০
পটুয়াখালী	১.৩	২.৫০
রাজশাহী বিভাগ	৪.২০	৫.৩১
বগুড়া	২.৯৮	৩.৭১
দিনাজপুর	৪.২১	৪.৪১
পাবনা	৫.০৮	৭.৬২
রাজশাহী	২.২৮	৫.৭৮
রংপুর	৪.২০	৪.৮২

সূত্রঃ Bangladesh Population Census Report-1981, Nationl Series, Dhaka, 1983, Page 37-38

ঢাকার পরেই স্থান লাভ করে খুলনা ও চট্টগ্রাম। বিভাগীয় শহর ও সমুদ্র বন্দর নগরী হওয়াতে এখানে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠে। এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুযোগ বৃদ্ধির কারণে দ্রুত লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে । এর পরেই স্থান লাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়া। সবচেয়ে কম নগরায়ণের হার ফরিদপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, পটুয়াখালী।[৩৩] দেশের উত্তরাঞ্চলে নগরায়ণের হার সবচেয়ে কম। এর কারণ হিসাবে বলা যায় এখানে সমুদ্র বন্দর বা বড় কোন নদী বন্দর না থাকায় গ্রামের মানুষকে খুব বেশী আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাছাড়া এখানকার উর্বর কৃষিভূমি থাকায় তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রাম ছাড়তে হয়নি।[৩৪]

ধর্মান্তর

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের হ্রাসের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল ধর্মান্তর। বিভিন্ন সময়ে আদমশুমারীর জরীপে দেখা যায় খ্রিষ্টান এবং বৌদ্ধ জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২.৯ (খ) নং সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের আলাদা ভাবে গণনা করা হয়নি। এদেরকে “অন্যান্য” হিসাবে গণনা

[৩৩] ibid, Page 37-38
[৩৪] ibid, Page 37-38

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। ১৯৫১-৬১ সালে খ্রিষ্টানদের আলাদা ভাবে গণনা হলেও বৌদ্ধদের “অন্যান্য” হিসাবে গণনা করা হয়েছে। তবে ১৯৭৪ সালে বৌদ্ধদের আলাদা গণনা করা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে শুধুমাত্র জন্মহার বৃদ্ধিই এদের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ নয়। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে অন্য ধর্ম বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ও উপজাতির মধ্য থেকে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ।

হিন্দু ধর্মে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে সবসময়ই অস্পৃশ্য এবং তারা উচ্চবর্ণের কাছে নির্যাতিত। এ কারণে এদেশে মুসলমান ধর্মপ্রচারকরা আসার পরে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকরাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আকৃষ্ট করতে পেরেছে হিন্দুদের বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। আবার কিছু ক্ষেত্রে তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে।

ধর্মান্তরও ঘটেছে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন হারে। বাকেরগঞ্জ জেলায় চণ্ডালদের মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা অতি সহজে ধর্মান্তরের কাজে অগ্রসর হতে পেরেছিল।[৩৫]

কুষ্টিয়া জেলার খ্রিষ্টানদের বেশীর ভাগই হিন্দুদের মধ্য থেকে। ঊনিশ শতকে নদীয়া জেলা ছিল খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় নদীয়া জেলার হিন্দু প্রধান অংশ পড়ে ভারতের অধীনে ফলে কুষ্টিয়া জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা কম।

১৯৪১ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় আগত সাঁওতালদেরকে হিন্দু হিসাবে গণনা করা হয়েছিল। ১৯৫১ সাল থেকে তাদেরকে হিন্দু ধর্ম থেকে বাদ দিয়ে খ্রিষ্টান এবং “অন্যান্য” হিসাবে গণনা করা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশী ধর্মান্তর ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে। তারা হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়নি। তারা নিজ নিজ জাতিগত ধর্ম পালন করত এবং এদেরকে গণনা করা হয়েছে অন্যান্য হিসাবে। ১৯৭৪ সালের গণনায় দেখা যায় এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর হার সবচেয়ে বেশী। সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৬৬.৫% বৌদ্ধ। অথচ ১৯৬১ সালের গণনায়ও বৌদ্ধদের আলাদাভাবে গণনা করা হয়নি। অর্থাৎ ১৯৬১-১৯৭৪ সময়কালেই তাদের ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশী।

অভিবাসন

যে কোন দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিতে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মুখ্য উপাদনসমূহের মধ্যে অভিবাসন অন্যতম। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আধিক্য এবং হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস উভয় ক্ষেত্রেই এটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই পূর্ববাংলা থেকে বর্হিগমন করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে জনগণ বসতি স্থাপন করেছে। তবে এই বর্হিগমনের হার সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা গেছে বিংশ শতাব্দিতে দুইবার। বিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু কিছু জেলায় জনসংখ্যা আধিক্যের কারণে বিশেষ করে কৃষক শ্রেণী নিজেদের বাস্তুত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় গমন করে।[৩৬] মহীশুর, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ সহ বাংলা প্রদেশের উপরই সর্বাধিক জনসংখ্যার চাপ ছিল। এই চাপ অব্যাহত ছিল ১৯১১ সাল পর্যন্ত।[৩৭] পরবর্তীতে ১৯১১-১৯২০ সময়কালে এদেশে আগমনের হার হ্রাস পায়। কোন কোন জেলায় জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে এ শতকের প্রথম থেকে বর্হিগমন করতে থাকে।[৩৮]

---

[৩৫] জেলা গেজেটিয়ার-বাকেরগঞ্জ-১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৫২

[৩৬] ডেভিসের মতে ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক আন্তস্থানান্তর ঘটে। ভারতের পুরুষদের এই আন্তস্থানান্তর ছিল পূর্বমুখি। দেখিয়েছেন যে ১৮৯১-১৯৩১ সন মেয়াদে এই আন্তস্থানান্তরের ফলে ভারতের অন্যসব বড় প্রদেশের তুলনায় বাংলারই ভাগে পড়ে সর্বাধিক সংখ্যক স্থানান্তরকারী। বিস্তারিত, এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৯

[৩৭] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫১

[৩৮] এম আতাহারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ২.১৫

আসামে বসতি স্থাপনকারী বঙ্গজ বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব-১৯১১-১৯৩১

বছর	বাংলায় জন্ম মোট (হাজারে)	ময়মনসিংহে জন্ম (হাজারে)	আসাম উপত্যকায় গণনাকৃত (হাজারে)	ময়মনসিংহে জন্ম ও আসাম উপত্যকায় বসবাসরত বাঙালীর শতকরা হিসাব
১৯১১	১৯৪	৩৭	১২০	৩০.৮
১৯২১	৩৭৬	১৭২	৩০১	৫৭.১
১৯৩১	৫৭৫	৩১১	৪৯৬	৬২.৭

সূত্রঃ- এম আতাহারুল ইসলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি (প্রবন্ধ), বাংলাদেশের (সামাজিক) ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৬০

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলায় বর্হিগমন এবং অভিগমন দুটোই ঘটে। দেশ বিভাগের ফলে এখানে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে ফলে এদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান পূর্ববাংলায় চলে আসে এবং সেই সাথে চলে আসে এখান থেকে যারা বাস্তুত্যাগ করে বার্মা, আসাম, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি, কুঁচবিহারে বসতি স্থাপন করেছিল সেই সকল বাস্তুত্যাগীরা। ফলে এদেশে যেমন হিন্দু জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় তেমনি মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর পূর্বে যে সকল বর্হিগমনের ঘটনা ঘটেছে সে ক্ষেত্রে ধর্মের কোন ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট ১৬,৭৮,১৮৫ জন ভারতে অভিবাসন করে।[৩৯]

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে বিহারী মুসলমানরা শরণার্থী হিসেবে পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালের বিহারে ভয়াবহ দাঙ্গার পর থেকেই বিহারী মুসলমানরা বিভিন্ন সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে বাস করতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে তারা পূর্ববাংলার ঢাকা, পাবনা, যশোর, রংপুর, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), দিনাজপুর, খুলনা প্রভৃতি জেলার আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪০] পূর্ববাংলা সরকারের আদমশুমারীর হিসেবের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থার হিসেবের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

১৮ জুলাই ১৯৫১ তারিখের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনা বাহিনী পাঠানোর যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল তার প্রতিবাদ করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পত্রিকায় বিবৃতি দেন। সেটি পত্রিকার প্রকাশিত হলে Ministry of Foreign Affairs থেকে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, এতে হিন্দুদের দেশত্যাগের হার বৃদ্ধি পাবে, কারণ এর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে হায়দেরাবাদে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪১] জেলা প্রশাসকগণ যাতে সতর্ক থাকে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। জেলা প্রশাসকগণ তাদের জেলা থেকে এ সময় দেশত্যাগের কারণ ও পরবর্তীতে হিন্দুগণ তাদের বাস্তুভিটায় ফিরে আসলে কি ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার রিপোর্ট পেশ করেন।[৪২]

পূর্ববঙ্গ সরকারের ২৩ আগস্ট ১৯৫১ তারিখের প্রেসনোটে বলা হয়, দুই সরকারের যৌথ গণনার হিসেবকে গণনা করেছে কিছু সংস্থা যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই যৌথ গণনার ফলাফলে পার্থক্য রয়েছে। প্রধান

[৩৯] Joty Sen Gupta, Eclips of East Pakistan, RENCO, Calcutta, 1965, page 137

[৪০] Mafizuddin Ahmed, EBLA Fourth Session, 11 March 1950, Vol. 4, No. 8, Page 259

[৪১] District Magistrate Bakerganj, Office of the District Magistrate and Collector of Bakergang, Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol.4, File No. Jan-52/478, পৃষ্ঠা ১২০, GOEB

[৪২] ibid, পৃষ্ঠা ১২০

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীদ্বয়ের চুক্তিতে বলা হয়েছিল পূর্ববাংলার ও পশ্চিমবাংলার চেকিং স্টেশনগুলিতে যে গণনা হবে তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য এবং যে সংবাদই প্রকাশিত হবে। এ ব্যাপারে কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হবে তা নির্ধারিত হয় ১৯৫০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এর "Chief Secretaries" সম্মেলনে। পশ্চিমবাংলার সরকার কয়েক ধরনের যাত্রীদেরকে হিসেবে ধরেনি বলে জানানো হয় পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে।

> (i) "যে সকল যাত্রী পূর্ববাংলায় এসেছে ঠিকই কিন্তু তারা পশ্চিমবাংলার উত্তরের জেলাগুলোতে আসাম, ত্রিপুরায় যাতায়াত করে।
> (ii) স্থানীয় যাত্রী যারা বর্ডার এলাকায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করে।
> (iii) টিকেটহীন যাত্রী
> (iv) চোরাচালানী"[৪৩]

প্রেসনোটে বলা হয় যে, যদি পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার যৌথ গণনা প্রকাশিত হয় তাহলে ভারত ও পশ্চিমবাংলা সরকার যে পূর্ববাংলা থেকে ব্যাপক হারে হিন্দুদের দেশত্যাগ ঘটছে সেই অভিযোগ দূর হবে। ১ আগষ্ট হতে ২২ আগস্ট পর্যন্ত যে সকল হিন্দু পূর্ব পকিস্তানে প্রবেশ করেছে। তাদের সংখ্যা পূর্ববাংলা ত্যাগকারীদের অপেক্ষা ১৭৫০৯ জন বেশী। ১৯৫০ সালের ১২ এপ্রিল হতে ১৯৫১ সালের ২২ আগস্ট পর্যন্ত প্রদেশে আগত হিন্দুদের সংখ্যা ৫১৬৭২৫ জন বেশী।[৪৪] পূর্ববঙ্গ সরকারের ২৩ আগস্ট এক প্রেসনোটে আরও বলা হয়,

> "গত ২০ শে আগস্ট তারিখে কলিকাতায় সংবাদপত্র গুলিতে ভারত সরকারের যে প্রেসনোটে প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাস্তুত্যাগীর সংখ্যার তারতম্যের কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারত কিন্তু দর্শনাও বেনাপোলের দুই সরকারের কর্মচারীগণ যুক্তভাবে যাত্রীদের যে সংখ্যা সংগ্রহ করিতেছেন উহা হইতে এই কথাই প্রকাশিত হয় যে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"[৪৫]

দেশত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলাভিত্তিক পরিচয়

ভারতীয় সরকারের এক গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই সকল জেলা থেকেই দেশত্যাগ করে শুধু মাত্র সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মালদা (পাকিস্তান) জলাপাইগুড়ি (পাকিস্তান) এবং পশ্চিম পাকিস্তান ব্যাতীত। দেশত্যাগকারী নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বেশীরভাগ ফরিদপুর, নদীয়া (পাকিস্তান) ঢাকা এবং যশোর জেলার।

হিন্দুরা নিজেদেরকে পূর্ববাংলায় নিরাপত্তাহীন ভাবতে শুরু করে কলকাতার দাঙ্গা এবং নোয়াখালী ও বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর। তাদেরকে আরও ভীত করে তোলে যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ নিশ্চিত হয়ে যায়। এ সময় হিন্দু ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করে এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি ট্রান্সফার করে ১৯৪৭ সালের জুন জুলাই মাসের মধ্যে। পূর্ববাংলার হিন্দু জমিদার, এবং অন্যান্য শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণীর পূর্ব থেকেই কলকাতার যোগাযোগ ছিল।

অনেকেরই কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং বাড়ি ঘর ছিল। কলিকাতা ছিল বাংলার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং পেশাগত কার্যক্রমের কেন্দ্র এবং এর সঙ্গে হিন্দুদের পূর্ব থেকেই যোগাযোগ ছিল।[৪৬] ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের সময় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত, পেশাজীবি শ্রেণী, বর্ণভেদে পূর্ববাংলা থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তুলনামূলক ভাবে বেশী চলে

---

[৪৩] ibid, পৃষ্ঠা ১২০
[৪৪] Minutes of the Conference of Darsana,. P.2 Resolution: 7, October 1950, পৃষ্ঠা-4, Statement "A" 01, Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol.4, File No. Jan-52/25, GOEB
[৪৫] দৈনিক আজাদ, ২৪ আগষ্ট ১৯৫০
[৪৬] Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, Page 5

যায়।[৪৭] পরবর্তীতে অবশ্য ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করতে থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে ১৯০১ সালের ৩৩.৩% থেকে কমে ১৯৭৪ সালে হয় ১৩.৫%।[৪৮] ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন হিন্দু দেশত্যাগ করে। ১৯৫০ এর দাঙ্গার পর প্রায় ১ মিলিয়ন লোক দেশত্যাগ করেছে। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫,৫৭,৯২০ জন হিন্দু লোক দেশত্যাগ করে ভারতে গমন করে।[৪৯]
সারণী ২.১৬ তে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের শতকরা হার দেয়া হল।

সারণী ২.১৬

পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে দেশত্যাগকারীর শতকরা হার

১.	ঢাকা	১৭.৯
২.	ফরিদপুর	১১.৬
৩.	বরিশাল	১০৭
৪.	নদীয়া (পাকিস্তান)	৯.৭
৫.	যশোর	৭.০
৬.	ময়মনসিংহ	৬.৩
৭.	রাজশাহী	৬.১
৮.	খুলনা	৫.৫
৯.	ত্রিপুরা	৪.৯
১০.	রংপুর	৪.৬
১১.	নোয়াখালী	১.২
১২.	পাবনা	৪
১৩.	দিনাজপুর (পাকিস্তান)	২.৫
১৪.	বগুড়া	১.৮
১৫.	চট্টগ্রাম	১.৮

সূত্র: Report on the Sample Servey for Estimating the Socio- Economic Characteristics of Displaced Persons migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, Calcutta, 1951, page 1-3

ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর দেশত্যাগকারীর হিন্দুদের বেশীর ভাগ রাজশাহী, দিনাজপুর এবং বগুড়া। রাজশাহী- ৫১৭৪, দিনাজপুর- ৩২৩৭ এবং বগুড়া থেকে ১৩৩৮ টি পরিবার দেশত্যাগ করে।[৫০]

সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মালদা, জলাপাইগুড়ি (পাকিস্তান) ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগকারীর হার খুবই কম। দেশত্যাগকারীদের মধ্যে, লিঙ্গ ভিত্তিক, বয়স ভিত্তিক হার নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি কারন যারা পূর্ববাংলা ত্যাগ করেছে তারাই সপরিবারে দেশত্যাগ করেছে।[৫১] তাদের দেশত্যাগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয় এ সময় পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু পরিবারের মধ্যে ৭৬.৪% উচ্চবর্ণ, সিডিউল কাস্ট ২০.৮% ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ২.৫%, ০.৩% অন্যান্য। এসময় সিডিউল কাস্ট এর তুলনায় উচ্চবর্ণ হিন্দুরাই বেশী দেশত্যাগ করে। তাদের বেশীর ভাগই কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায় গমন করে। আর সিডিউল কাস্টদের বেশীরভাগই গমন করে ২৪ পরগনা ও নদীয়ায়।[৫২]

সারণী ২.১৭ তে পূর্ববাংলা ত্যাগকারী নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শতকরা হার দেয়া হল।

[৪৭] Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, page 5
[৪৮] Bangladesh population Census Report, 1974, National Vol. page 22
[৪৯] ibid, page 22
[৫০] Report on the Sample Servey for estimating the Socio- Economic Characteristics of Displaced Persons migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, page 2, GOWB
[৫১] ibid, page 3-4
[৫২] ibid, page 2-3

সারণী: ২.১৭

দেশত্যাগকারী নিম্নবর্ণের হিন্দু

ফরিদপুর এর	১৪৪৯৫
নদীয়া	১০৯৮৭
ঢাকা	১০২০৯
যশোহর	প্রায় ৯৬৩৬
রাজশাহী	৭৪৪৭
খুলনা	৬২১৪
রংপুর	৬১২৪
বরিশাল	৫৮২৭
পাবনা	৫১০০

সূত্র:Report on the Sample Servey for estimating the Socio- Economic Characteristics of Displaced Persons migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, calcatta, 1951, page 1-3

দেশত্যাগকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

দেশত্যাগকারী হিন্দুদের ৪৮.২% শিক্ষিত। এর মধ্যে ১১.৮% পড়তে পারে, ১৯.৮% M.E স্টান্ডার্ড, ১০.৪% ম্যাট্রিক পর্যন্ত ৩.৬% ম্যাট্রিক পাশ ১.১% আন্ডার গ্রাজ্যুয়েট, .০.৭% গ্রাজ্যুয়েট, ০.১% পোস্ট গ্রাজুয়েট ০.১% লিগ্যাল শিক্ষা, ০.১% প্রকৌশলী, ০.২% হিসাব নিকাশ করতে পারে অথবা কুটির শিল্পে দক্ষ। ম্যাট্রিক- ৭৮,১৯৩ জন। আন্ডার গ্রাজুয়েট ২৩,৯৫২ জন। গ্রাজ্যুয়েট- ১৫,১৭৯ জন। পোস্ট গ্রাজ্যুয়েট ২,৩৮৩ জন। অন্যান্য যোগ্যতা ২০৮৭, কৃষিজীবি ১৮৯, ডাক্তারী ৫১১৮, আইন ১২৯৮, প্রকৌশল ১২৬৪ জন। কুটির শিল্পে দক্ষ ৪৬০০ জন। এটা লক্ষণীয় যে, স্টান্ডার্ড শিক্ষিতরাই বেশী দেশত্যাগ করেছে।[৫৩]

পূর্ববাংলা ত্যাগ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। তার মধ্যে কৃষিকাজ, শিল্পকারখানা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরীতে নিয়োজিত হয়, আর রয়েছে ছাত্র।

৫৮৬৩৩০ জন হিন্দু শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় সুযোগ মত বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং পাশাপাশি কাজের যোগ্য, মোট প্রায় ১৩,৫২,৭৭৫ জন কোন কাজ পায় নি। এই রিপোর্টে যে হিসাব দেখানো হয়েছে তারা সকলেই পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু পরিবার এর মোট সংখ্যা তাদের পরিবার প্রধানসহ। এমন কি যে সকল পরিবারের প্রধানরা আগে থেকে পশ্চিমবাংলায় চাকুরী করতেন।

পরিবার প্রধানদের পেশার যে হিসাব দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, "It has to be remembered that the farmers referred to the occupations of the head of the families, all of whom were not necessaslly migrants."[৫৪]

এই রিপোর্টে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সে সকল পরিবারের প্রধানদের ও হিসাবে গণনা করা হয়েছে যারা অনেক আগে থেকেই পশ্চিমবাংলায় বসবাস করছিল। মেডিকেল ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যে হিসেব দেয়া হয়েছে তাতে ২,৭৩০ জন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, ১৮২৬ জন হোমিওপ্যাথ, ২৪৯৩ জন কবিরাজ, ১০৬৮ জন হাতুড়ে ডাক্তার, ৯৬৬ জন নার্স ও আয়া, ৪৬৬ জন দাতের ডাক্তার, ৪৯ জন টিকা দানকারী পশ্চিমবাংলায় তাদের পেশা গ্রহণ করে।[৫৫]

[৫৩] ibid, page 4
[৫৪] ibid, page 4
[৫৫] ibid, page 5

২.১৮ নং সারণীতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দুদের পেশা উল্লেখ করা হল।

সারণী ২.১৮

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুদের পেশা	
পেশা	সংখ্যা
কৃষিজীবী	১,৭৬১৬৯১ জন
শিল্প ও অন্যান্য চাকুরী	৩,৪১,৩৮৪ জন
ক্ষুদ্র পেশা	৬৮,২৫৫ জন
ছাত্র	২০৪৩২৩ জন

সূত্রঃ Report on the Sample Servey for estimating the Socio-Economic Characteristics of Displaced Persons migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, Calcutta, 1951, page 5

মোট ১১,১১৬ জন শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগদান করেন। কলেজ ও ইংরেজি হাইস্কুলে ৩৯৫৪ জন, নিম্ন মাধ্যমিক (M.E) স্কুলে ১,০৪১ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩১০০ জন, গৃহশিক্ষক হিসেবে ৩০২১ জন যোগদান করেন। ৪৯,২৬৮ জন সরকারী চাকুরী পায়। যারা ১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছে এবং স্বাধীনতাকালীন সময়ে চাকুরীর অপশন নিয়ে পশ্চিমবাংলায় এসেছে তাদেরকেও গণনা করা হয়েছে। পূর্ববাংলা থেকে দেশত্যাগকারী হিন্দুরা ভারতে গিয়ে কেউ কেউ নিজেদের পুরোনো পেশায় কাজ পেয়েছে আবার কেউ অন্য পেশা গ্রহণ করেছে। মোট ২১,৫৩,২২৮ জন দেশত্যাগীর মধ্যে ১,৫৭,৪৩৭২ জনের কোন পেশা ছিল না তারা পশ্চিমবাংলায় চাকুরী পায়। প্রায় ১০৩,২৮৭ জন দেশত্যাগী পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে কোন চাকুরী ছিল, তারা পশ্চিমবাংলায় আরও ভাল চাকুরী পায়।[৫৬]

পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত আয়

কিছু পরিবার পাকিস্তান থেকে আয় গ্রহণ করত। ৪১,৯২৩ পরিবার পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত আয় গ্রহণ করত। বছরে ৭২৬ টাকা করে প্রতি পরিবার গ্রহণ করত। ৩,৮৭,৩৪৯ পরিবার পাকিস্তান থেকে কোন আয় গ্রহণ করত না। শরণার্থীদের ১,০০,৬৭৭ জন পশ্চিমবাংলায় নিজ বাড়িতে বসবাস করত।[৫৭]

ভারতীয় সরকারের সাহায্য গ্রহণকারী

অনেক পরিবার ভারতের সরকারী সহযোগীতা গ্রহণ করে চাষের জমি, ভবন তৈরী, চাকুরী, কৃষি ঋণ, বাড়ি তৈরী, ব্যবসা, কৃষিকাজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করত। ১৬,১৬২ পরিবার সরকারী জমি সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালের শেষ পর্যায়ে এবং ১৯৫১ সালের প্রাথমিক পর্যায়ে শরণার্থীগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্য ঋণ গ্রহণ করে। ১৯৫১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭৭,০০০ পরিবার সরকারী সাহায্যের জমি ও আর্থিক ঋণ গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর দেশত্যাগী হিন্দুগণ পূর্ববাংলা ফিরতে আগ্রহী ছিল, তবে তা সংখ্যার খুব বেশী নয়। পুরো পশ্চিমবাংলায় তা ছিল ০.৫% যারা পূর্ববাংলায় নিজেদের বাড়িতে ফেরে। ২০,৯৫৬ পরিবারের মধ্যে ২,৩৪২ পরিবার তালিকা ভুক্ত হয়নি বা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি। কারণ তারা পাকিস্তানে ফিরতে আগ্রহী ছিল। এদের বেশীর ভাগ ছিল কলকাতা, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায়। ১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে পূর্ববাংলা ত্যাগকারী

[৫৬] ibid, page 6
[৫৭] ibid, page 7

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুরা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ১৫ অক্টোবর ১৯৪৬ থেকে মোট ২১,৪৩,২২৪ জন এবং ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১,২০০,৪৭৯ জন। ১৫ জানুয়ারী ১৯৫১ পর্যন্ত মোট ৪,২৯,২৭২ পরিবারের ২,৩০৮০০৪ জন সদস্যর মধ্যে ৫৬% সদস্য পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সালের ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত।[৫৮]
এদের মধ্যে ১২৯,২৭২ পরিবারের মধ্যে ১,৮৯,৬৭১ পরিবার শহরে স্থায়ী হয়। মোট পরিবারের ৪৪.২% শহরে এবং ৫৫.৪% স্থায়ী হয় গ্রামাঞ্চলে। ২,১৪৩,২২৮ জন হিন্দুর মধ্যে ৯৭৮,৬০৪ জন অর্থাৎ ৪৫.৭% শহরে এবং ১,১৬৪,৫২৪ জন হিন্দু ৫৪.৩% গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী হয়।[৫৯]

মোহাজের

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান ও ভারতের ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরা, আসাম, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম এসে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের বলা হয় মোহাজের।
১৯৫১ সালের আদমশুমারী হিসাব অনুযায়ী ৬,৯৯,০৭৯ জন মোহাজের পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশ্রয় গ্রহণ করে রাজশাহী বিভাগে এবং এরপরই স্থান পায় ঢাকা বিভাগ। রাজশাহী বিভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে ৪,৯৪,২৮৯ জন এবং ঢাকা বিভাগে ১,৬২,৮৫৫ জন। এদের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলায় আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ১,৩৭,৩২১ জন এবং সবচেয়ে কম পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায়। এমনকি পুরো চট্টগ্রাম বিভাগে মাত্র ৪১,৯৩৫ জন মোহাজের আশ্রয় গ্রহণ করে।
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা এবং ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ফলে মোহাজের আগমনের হার বৃদ্ধি পায়। এ সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য হতে মুসলমান বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারতীয় সরকার। ফলে ১৯৬৩ সালের মার্চ থেকে হাজার হাজার মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। বিচারপতি আব্দুল জব্বার খানের নেতৃত্বে গঠিত মোহাজের তথ্যানুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৫০ সালের ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আগত মুসলমানদের ৯৫% ভারতীয় নাগরিক।[৬০] উদ্বাস্তুরা জানায় যে, উচ্ছেদ নোটিশ ইস্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কেউ এর প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদের প্রতি শব্দের জন্য ৫ টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড ধার্য্য করা হয়।[৬১]

ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপকহারে বিতাড়ন বন্ধের জন্য পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত সে বিষয়ে কর্ণপাত করেনি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের ফলে পাকিস্তানের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে আশংকা প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাকে লেখে যে ভারতীয় উদ্বাস্তুর এই অপ্রতিরোধ্য স্রোত পাকিস্তানের জন্য সমস্যার আয়তন প্রত্যেহই বাড়িয়ে তুলছে।[৬২] পূর্ববাংলায় যে সকল মোহাজের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ছিল পাকিস্তান ও পূর্ববাংলা সরকারের উপর একটি বাড়তি চাপ। এ সময় সরকারের পক্ষে স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষিত ও বদলী হয়ে আসা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছিল এক জটিল পরিস্থিতি।

[৫৮] ibid, page 7
[৫৯] ibid, page 7
[৬০] দৈনিক আজাদ, ২৩ মার্চ ১৯৬৩
[৬১] ঐ, ২৩ মে ১৯৬৩
[৬২] দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর ১৯৬৩

২.১৯ নং সারণীতে পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী মোহাজেরদের সংখ্যা উল্লেখ করা হল।

সারণী ২.১৯

জেলাভিত্তিক মোহাজের পুনর্বাসন

বাংলাদেশ	৬,৯৯,০৭৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪১,৯৩৫
চট্টগ্রাম	১৯,৩৭৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১,১৪৬
নোয়াখালী	১,২৭৯
সিলেট	১৪,২১৯
ত্রিপুরা	৫,৮২১
ঢাকা বিভাগ	১,৬২৮৫৫
ঢাকা	১৯,৪২৫
বাকেরগঞ্জ	২,৪১৮
ফরিদপুর	৫,৩১৭
ময়মনসিংহ	৬৩,৬৯৫
রাজশাহী বিভাগ	৪,৯৪,২৮৯
বগুড়া	১৮,০৩৫
দিনাজপুর	৭৪,৩৭৯
যশোর	৪৩,০৭৭
খুলনা	২৬,০৫৯
কুষ্টিয়া	১.৩৭,৩২১
পাবনা	১৯,৯৩৩
রাজশাহী	৭৫,৯০০
রংপুর	৯৯,৫৮৫

সূত্রঃ Census of Pakistan, 1951, Vol. 3, East Bengal, Karachi, 1953, Page 39

এ সময়কার অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ভারত থেকে আসা মোহাজেরদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে M.Nazrul Islam বলেন,

> "The bulk of the refugees into the Eastern part of Pakistan were poor peasants uneducated and unskilled labours from the low-income level who, instead of helping the flaging economy of East Pakistan to grow, became a liability for it. Again it is alleged, that in many cases, the Muslim officials whose service were transferred to the government of Pakistan after the partition, improve their rank and siniority.----few Muslim imigrant landlords were heard. It was alleged that these people often succeeded in acquiring properties------by manipulating the official responsible for allotment and rehabilitation of the refugees. The continued political influences of the refugees plus the destressed economic condition of the East wing increased the social conflict and mutual resenment between the refugees and the natives on one side."[৬৩]

১৯৬৩ সালের শুরু থেকেই আসাম থেকে মুসলমানগণ বিতাড়িত হয়ে পূর্ববাংলার সিলেটে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। মুসলমানদের বিতাড়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। আশংকা করা হচ্ছিল যে আসাম ও ত্রিপুরা থেকে খুব শীঘ্রই মুসলমান আগমন বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববাংলার মোহাজের সমস্যা বড় হয়ে উঠবে এবং এ সকল

[৬৩] M.Nazrul Islam, Pakistan and Malayasia Geographic and Demographic Dimention A Comparative Study in National Integration, Page 15

মুসলমান মোহাজেরদের জন্য ঘরবাড়ি, জমি, চাকুরী ও জীবিকার অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানবে বলে আশংকা করা হচ্ছিল।[৬৪]
১৯৬৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আসাম ও ত্রিপুরা হতে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা ৮৪ হাজার ৩০৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গ হতে পূর্ববাংলায় এসে ৯ হাজার ৮৬৮ জন মোহাজের বিভিন্ন জেলায় নাম তালিকাভুক্ত করে। নাম তালিকাভুক্ত না করা উদ্বাস্তুর সংখ্যাও প্রচুর।[৬৫]

মোহাজের পুনর্বাসন

স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একটি বড় কাজ ছিল ভারতের পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, আসাম, এমনকি হায়দেরাবাদ সহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেশত্যাগ করে আসা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করা। শরণার্থীদের খাদ্য, বাসস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববাংলা সরকারকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। একটি জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগ ও শরণার্থী হিসেবে অন্য একটি দেশে বসবাস করা, ত্যাগ করা দেশ ও আশ্রয় গ্রহণকারী দুই দেশের জন্যই আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। কোন দেশে শরণার্থীরা বাধ্য হয়ে ঢুকে পড়লে সে দেশ মানবতার কারণে আশ্রয় দান করে, কিন্তু আশ্রয় গ্রহণকারীরা সে দেশে দীর্ঘদিন বাস করলে তা সে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। Chirantan Kumar ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

> "if the refugees live in the host country for a prolonged period, they mix with the local people which change the demographic situation there and causes many social economic problems, i.e., it increases the burden of the government in terms of economy, development, law and order, etc. as well as many social tension also as it generates unemployment, poverty, unpatriotic feelings ect.[৬৬]

১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে সরকার খুলনা শহরের দুই মাইল দূরে এবং যশোরে একটি করে মোহাজের কলোনি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬৭] মুসলমান মোহাজেররা পূর্ববাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে ছিল এই বাড়তি জনসংখ্যার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা অন্যদিকে যে সকল মুসলমান চাকুরীজীবীরা বদলী নিয়ে পূর্ববাংলায় চলে আসে তারা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে এসে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে কেননা এ সময় পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে গ্রাজুয়েট অফিসারের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য আর হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী বদলী নিয়ে পূর্ববাংলা ত্যাগ করায় সে সকল শুন্য স্থান পূরণ করে ভারতীয় মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণী। আর এ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতায় ভারত থেকে আগত জমিদাররা যা তারা ভারতে হারিয়েছে তার সমপরিমাণ বা তার থেকেও বেশী সম্পত্তি নিজেদের নামে বন্দোবস্ত এবং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য অধিগ্রহণ করে।
পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একটি বড় কাজ ছিল ভারতের পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, আসাম, এমনকি হায়দেরাবাদ সহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেশত্যাগ করে আসা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করা। শরণার্থীদের খাদ্য বাসস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববাংলা সরকারকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এদের বেশীর ভাগই কৃষিজীবী শ্রেণী যারা আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে। এদের বেশীর ভাগই আশ্রয় গ্রহণ করে শহর এলাকায়। আবার

---

[৬৪] দৈনিক আজাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
[৬৫] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৩
[৬৬] Chirantan Kumar, Migration and Refugee issue Between India and Bangladesh, Page 66
[৬৭] দৈনিক আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯

এদের জন্য কৃষি জমিরও প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা এবং ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ফলে মোহাজের আগমনের হার বৃদ্ধি পায়। এ সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
আর বিহার থেকে আগত অবাঙালীরা কাজ পায় শিল্প এলাকায়। এদের আগমনের ফলে শহর এলাকায় লোকসংখ্যা বেড়ে যায়। এদের কিছু অংশ পুনর্বাসিত হয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপনায়।[৬৮]

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'পাকিস্তান মোহাজের পুনর্বসতি ফাইনান্স কর্পোরেশন' পূর্ববঙ্গ শাখা স্থাপিত হয়। এই কর্পোরেশন মোহাজের পুনর্বসতির উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টায় মোট ৩,২০,৯৫৯ টাকা মূলধন প্রদান করে। যে সমস্ত মোহাজের অর্থ সাহায্য পেলে নিজেরাই ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে তাদেরকে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪,৪২,৪৪৬ টাকা ঋণ প্রদান করে। মোহাজের পুনর্বসতির জন্য ১৯৫০ সালে মোহাজের কর ধার্য করা হয়। মোহাজের কর বাবদ আদায়কৃত ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মোহাজের পুনর্বসতির কাজে ব্যয় করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার মোহাজের পুনর্বসতির জন্য ৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে।[৬৯] ১৯৫১ সালের ২৩ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান নাগরিক আইন পাশ করে। এই আইনের সুযোগ দেয়া হয় ভারত থেকে আগত সরকারী চাকুরীজীবি মুসলমানদের।[৭০] নাগরিকত্ব আইনে বলা হয়,

> "In the case of migrants from India arriving in Pakistan on or after the 13th April 1951and before the 1st January, 1952 a certificate of registration as a citizen of Pakistan can only be granted after they have obtained a domicile certificate."[৭১]

ভারত থেকে আগত মোহাজের পুনর্বাসন ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে গভর্নর ফিরোজ খান নুন জনগণের নিকট আবেদন জানান। এতে ভারত থেকে আগত মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মোহাজেরদের প্রতি তাদের সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য একটি ফান্ড গঠনে উৎসাহিত হন। তাদের উৎসাহে গঠিত হয় 'Governor's Refugee Relief Fund'। একটি সাব কমিটি গঠন করা হয় তৎকালীন ব্যবস্থাপক পরিষদের স্পীকার তমিজউদ্দীন খানকে সভাপতি করে। জেলা প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে শাখা অফিস এর দায়িত্ব দেয়া হয়। ট্রেজারার এর দায়িত্ব পালন করবেন জেলা কর্মকর্তা।[৭২] ফান্ডের জন্য আবেদনে গভর্নর জনাব নুন বলেন,

> "Within the last three months over one million refugees have come over to East Pakistan. Large sums of money are needed to give them immediate relief. Still larger sums are required for their rehabilitation. It is not, however, possible for Government alone to meet the requirements of the situation. The people must join hands with the Government, in providing relief to the distressed.-----

[৬৮] Census of Pakistan, Vol. 3, East Bengal. 1951, Page 39
[৬৯] পাকিস্তানি খবর, ১ম বর্ষ, ২৫ শ সংখ্যা, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ পৃষ্ঠা ৩
[৭০] Home, Political (C.R) B. Proceedings Vol.18, B May 1953. Page 17 GOEB
[৭১] ibid, Vol.21, B July 1953, GOEB
[৭২] Home, Public Relation B. Proceedings Vol.1 GOEB

> “I appeal to all persons of good will to come to their help and to donate large sums of money for the noble cause of aid and succour the refugee.[৭৩]

পূর্ববঙ্গে আগমনকারী মোহাজেরদের জন্য ১৯৫০ সালের ৩ জুন পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এ সময়ে মোহাজেরদের বস্ত্র বিতরনের জন্য কায়েদে আজম ফান্ড থেকে ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। মোহাজেরদের শিশুদের জন্য ৭০ হাজার পাউন্ড গুড়া দুধ বিতরণ করা হয় এবং জরুরী তহবিল হতে ১৮ লক্ষ পাউন্ড গুড়া দুধ বিতরণের জন্য পাওয়া যায় যা থেকে ৪ লক্ষ পাউন্ড দুধ বিতরণের জন্য বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়।[৭৪]
৪ জুন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে মোট ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৬ জন মোহাজের আগমন করে। এদের মধ্যে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮৩ জনকে গ্রামে ও শহরের উপকণ্ঠে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ২ হাজার জনকে রিলিফ কমিশনারের অধীনস্ত এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরোর মাধ্যমে চাকুরী দেয়া হয়।[৭৫]
১৯৫০ সালের ৫ জুন সাংবাদিক সভায় রিলিফ কমিশনার পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী মোহাজেরদের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগের বর্ণনা দেন। তিনি জানান যে, প্রাদেশিক সরকার ৫ জুন পর্যন্ত সময়ে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয়ে মোহাজের দোকানদারের পুনর্বসতির জন্য দিনাজপুর শহরে তিনশত দোকান নির্মাণের জন্য মঞ্জুর করা হয়।[৭৬]

মোহাজেরদের আগমনের ফলে পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প কারখানাগুলোতে এদেরই প্রাধান্য ছিল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমানরা ছিল পূর্ববাংলার মুসলমানদের তুলনায় বেশী শিক্ষিত। ফলে পূর্ববাংলায় বেশীরভাগ চাকুরীর ক্ষেত্রে এদের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। বিহার থেকে আগত মোহাজেররা উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী, ফলে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী তাদেরকে ব্যবহার করে বাঙালীদের দমন করার ক্ষেত্রে। ভারত থেকে আগত মোহাজেররা বিশেষ করে বিহারীরা পূর্ববাংলার হিন্দুদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানে আগত বিহারীরা এখানকার বাঙালীদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। তদের সুসম্পর্ক ছিল শাসক শ্রেণীর সঙ্গে, যে সম্পর্কের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে হাত মিলায় এবং সাহায্য করে গণহত্যায়। পূর্ববাংলায় আগত মোহাজেররা হিন্দুদের ফেলে যাওয়া বাড়ি, মিলকারখানা দখল করে। অনেক হিন্দু পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে তাদের বাড়ি ঘর ব্যবসা বাণিজ্য বেদখল হয়ে যাওয়ায় তারা আবার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়।
১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকার আদেশ জারী করেন যে, যে সমস্ত হিন্দুর ঘরবাড়ি খালি আছে সেখান আশ্রয় দিতে হবে। যে বাস্তুত্যাগী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ বা আসামে চলে গিয়েছিল তাদের পরিত্যক্ত জায়গায় মুসলমানদের আশ্রয় দেয়া হল। খালি হিন্দু বাড়িগুলিতে জোর করে রিফিউজীদের আশ্রয় দেয়া হয়। সে সময় হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন। তারা রিলিফ ডিপার্টমেন্ট ও মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানকে জানান যে, জোর করে হিন্দুদের বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থীদের বসিয়ে দেয়া হলে কোন হিন্দু থাকতে পারবে না। একই বাড়িতে হিন্দু মুসলমান একত্রে থাকা সামাজিক রীতি অনুসারেও সম্ভব নয়।[৭৭] মোহাজেরদের আগমনের ফলে পাকিস্তানের দুই অংশেই সমস্যার সৃষ্টি হয় বলে মন্তব্য করেন এম. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, Rather the socio–economic background of the refugees had had a direct impact upon the demographic, economic and social conditions of each wing of Pakistan.[৭৮]

[৭৩] লিফলেট Appeal for Governor’s Refugees Fund., Public Relation, B. Proceedings Vol.1, GOEB
[৭৪] দৈনিক আজাদ, ৬ জুন ১৯৫০
[৭৫] ঐ, ৬ জুন ১৯৫০
[৭৬] ঐ, ৬ জুন ১৯৫০
[৭৭] বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ৮ মার্চ ১৯৫১, ৫ম অধিবেশন ১৯৫১. ভলি-৫, নং-২ পৃষ্ঠা ২৬৭
[৭৮] M.Nazrul Islam, op-cit, Page 15

স্বাধীনতাকালীন সময়ে পূর্ববাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং দেশত্যাগের প্রকৃতি ও ধরণ

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হলেও পূর্ববাংলার রাজনীতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পূর্ববাংলার প্রতিটি শহরের বেশিরভাগ ভবন এবং সম্পদ ছিল হিন্দুদের। শহরের ৮৫% বাড়ির মালিক ছিল হিন্দুরা। কৃষিজমির বড় অংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে। জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু এবং ৯০% প্রজা মুসলমান। পূর্ববাংলার জাতীয় সম্পদের প্রায় ৮০% এর মালিক ছিল হিন্দুরা। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সাধারণ চাকুরীতে ৭০% এর বেশী এবং প্রায় ৮০% উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের।[৭৯] পূর্ববাংলার জাতীয় সম্পদের প্রায় ৮০% এর মালিক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক নেতা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ও স্বাধীনতাকালীন সময়ে পূর্ববাংলার হিন্দুদের অবস্থান বর্ণনা করে সমর গুহ বলেন, “In every aspect- political, economic, educational, cultural, social- the collective life of East Bengal is mostly a creation of Hindu minority.”[৮০] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সর্বপ্রথম পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে ভারতের পশ্চিমবাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার ফলে। এই দাঙ্গা সবচেয়ে বিস্তার লাভ করে ঢাকা শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এর ফলে বহু লোক হতাহত হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্বে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দেশত্যাগ করেনি। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের বেশিরভাগ লোক কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে প্রতিনিয়ত ধর্মীয় ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ববাংলার হিন্দুদের অবস্থান বর্ণনা করে K.B. Sayeed এর উদ্ধৃতি দিয়ে গোলাম কবির বলেন,

> “They also had a near monopoly in professions such as law, medicine and teaching. The vast majority of Government servants were Hindus. They were also the highest landlords of the province.”[৮১]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের রাজনীতি ও হিন্দুদের অবস্থান

১৯০৫ সালে ‘পূর্ববাংলা ও আসাম’ নামে নতুন প্রদেশ গঠন করে বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ হলে একে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার রাজনীতি গড়ে উঠেছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ হলে প্রদেশব্যাপী সূচনা হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তীব্র আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ। এই বিরোধের কারণ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।[৮২] বাংলা বিভাগ কলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ছিল অশনি সংকেত। পূর্ববঙ্গের কৃষকদের অর্থেই তারা পেয়েছিল বিলাসবহুল জীবনের নিশ্চয়তা। কলিকাতা কেন্দ্রিক শ্রেণীসমূহের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ইংরেজ শাসকের এই পদক্ষেপ তাদের কাছে হিন্দু বিরোধী চক্রান্ত হিসেবেই মনে হয়।[৮৩] তবে তফসীলি হিন্দুরা এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেননি, এই আন্দোলনকে তফসিলী হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপার বলে মনে করে তা থেকে দুরে থাকেন।[৮৪] মুসলিম নেতৃত্ব বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায় এবং এই আইন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত

---

[৭৯] Samar Guha, Non Muslim behind the Curtain of East Pakistan, page 33
[৮০] Samar Guha, ibid, page 33
[৮১] Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, Page 5
[৮২] লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩
[৮৩] লেনিন আজাদ, ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩
[৮৪] অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩

হয় মুসলিম লীগ। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতি সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে জয়া চ্যাটার্জী বলেন,

> "পূর্বে জমিদার প্রজা, সুদ ব্যবসায়ী- ঋণ গ্রহীতা ও জোতদার-বর্গাদারদের মধ্যকার উত্তেজনা শুধু স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা প্রাদেশিক রাজনীতিতে বিস্তৃত হয়। আগে জমি সংক্রান্ত বিরোধে কোন কোন এলাকায় মাঝে মাঝে রং চড়ানো হত, এখন তা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাদেশিক রাজনীতির মেরুকরণে শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়।"[৮৫]

আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করা হলে হতাশ হয় পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। এই প্রেক্ষাপটেই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রসার লাভ করে। ইসলাম দৈনন্দিন রাজনীতিতে সেই সময় এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দাবী সমূহও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত হত।[৮৬]

বিভিন্ন কারণে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, এর যতটা ছিল ধর্মীয় তারচেয়ে অনেক বেশী ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পাওয়া না পাওয়ার হিসাব। বিশেষ করে যুক্তবঙ্গে মুসলমান শাসনের সময়কার কিছু আইন এ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এ সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তপন রায় চৌধুরী বলেন,

> "বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের অবস্থা অবশ্য তখন খুবই সঙ্গিন। একে বিদেশী শাসনের আওতায় চাকরি-বাকরির সম্ভাবনা কম, তার উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চাকরি মুসলমানরা পাবে এই নিয়ম হওয়ায় হিন্দুদের যুক্তবাংলায় চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ এই নিয়ম যখন চালু হল, তখন প্রায় নব্বই ভাগ চাকরি হিন্দুদের হাতে। আনুপাতিক সংখ্যাটা নব্বই থেকে পঞ্চাশে নামাতে হলে কার্যত হিন্দুদের চাকরি দেওয়া বন্ধ করতে হয়। সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে নতুন নীতির ফল প্রায় তাই দাঁড়িয়েছিল। ----প্রায় সম্পূর্ণভাবে চাকরী নির্ভর বাঙালি হিন্দুর সত্যিতেই মরণদশা ঘটেছিল।----- পরীক্ষায় ফাস্ট সেকেন্ড হয়েও বেকার থাকার সম্ভাবনা বিভীষিকার মত বাঙালি হিন্দুর মনকে আচ্ছন্ন করে থাকতো।--- ফলে অনেকেই ভাবতো যে, মুসলমান আর ইংরেজ যোগসাজসে হিন্দুর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে। আর হিন্দু জমিদার এবং কুসিদজীবী যে তাদের মুখের ভাত কাড়ছে, বর্ধিষ্ণু কৃষক সম্প্রদায় থেকে নতুন মুসলমানের এ তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে কংগ্রেস জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী রাখে, সেই কৃষকই যে কৃষক এবং অধমর্ণের ন্যায্য দাবির সমর্থনে আইন পাশ করতে রাজি হয়নি, সে কথাই বা তারা ভোলে কি করে?"[৮৭]

হিন্দু মহাসভা ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে হিন্দু মুসলমান এলাকাভিত্তিক ভাগ করার প্রস্তাব রাখেন। সাথে সাথে হিন্দু মালিকানাধীন সবগুলো পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ দাবী করে। প্রবাসী ১৩৫৩ বাং কার্তিক–চৈত্র সংখ্যায় লেখা হয়,

> "বাংলায় কোন জাতীয়তাবাদী বাঙালী আছে যে ঐ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া স্বাধীন হইতে চাহেনা। বাংলার বেশ খানিকটা যদি স্বাধীন হয়--- সকল জাতীয়তাবাদীর একটা আশ্রয়স্থল, একটা দুর্গ থাকিবে যেখানে কোন বাঙালী দাড়াইয়া বলিতে পারিবে "আমি স্বাধীন, আমি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক।"[৮৮]

---

[৮৫] জয়া চ্যাটার্জী, বাংলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ, ১৯৩২-৪৭, পৃষ্ঠা ৮৭

[৮৬] আহমেদ কামাল, পূর্ববাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তি: জনগনের প্রতিক্রিয়া, পৃষ্ঠা ৩৫

[৮৭] তপন রায় চৌধুরী, বাঙাল নামা, পৃষ্ঠা ১৪৩

[৮৮] প্রবাসী, ৪৬শ ভাগ, ২য় খন্ড, ১৩৫৩ কার্তিক-চৈত্র, পৃষ্ঠা- ৫৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা, রক্ত-সম্বন্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল।[৮৯] কিন্তু দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এক অস্বাভাবিক পরিবেশ, পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা জাতি- প্রশ্নটির স্বাভাবিক সমাধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সকল স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তার তুলনায় বেশী গুরুত্ব লাভ করে এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতি- প্রশ্নটি উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হলেও বস্তুত একই অবস্থার কারণে তা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বের বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে।[৯০] স্বাধীনতার সময় অবিভক্ত বাংলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির ১৯৪৭ সালের বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি ঘোষণার পর দেশবিভাগের প্রশ্নে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।[৯১] এতে ব্রিটিশ সরকারের অনীহা ছিল কিন্তু এতে বাংলার গভর্নর স্যার এফ. বারোজ মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলা দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৯২]

কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনী বঙ্গভঙ্গের দাবীকে সমর্থন করে বলেন এটা হতেই হবে।[৯৩] বঙ্গীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে নিয়মিত পত্রপত্রিকায় বক্তব্য ছাপতে থাকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বঙ্গভঙ্গের জোড় দাবী জানিয়ে বলেন, পাকিস্তান হোক আর নাই হোক বাংলা ভেঙ্গে আমরা দুটি প্রদেশ গড়ার দাবী জানাচ্ছি। ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণে এন, সি চ্যাটার্জী বলেছিলেন, হিন্দুদের জন্য অবশ্যই বাংলা ভেঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গড়তে হবে। এটা ভাঙা নয় এটা হিন্দুদের জীবন মরা প্রশ্ন।[৯৪.]

বাংলা বিভক্তির আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতাস্থ বাঙালী-অবাঙালী শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রভাবশালী দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ বিভিন্ন পত্রিকা যেমন অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড বাংলা বিভক্তির সমর্থনে হিন্দু জনমত গঠনে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়।[৯৫] অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বিপক্ষে মতামত যাচাই করলে দেখা গেল জরিপে অংশ গ্রহণকারীদের শতকরা ৯৮.৩% হিন্দু বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং মাত্র .০৬% জন হিন্দু বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে।[৯৬]

শরৎ বসু, কিরণ শংকর রায়, সত্যরঞ্জন ধরিত্রী এবং অখিল দত্ত ছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে। অখিল দত্ত, সর্দার প্যাটেলের কাছে এক চিঠিতে দাবী করেছিলেন যে, বাংলা ভাগ করা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও সামাজিক সবদিক থেকেই হবে একটা মারাত্মক ভুল। কিন্তু প্যাটেল ১৯৪৭ সালের ১১ মে এক বিবৃতিতে জানান যে, মুসলমানরা যদি পাকিস্তানের দাবীতে ভারত বিভাগ চায় তবে অবশ্যই বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হবেই।[৯৭]

দুই বাংলারই তফসিলী সম্প্রদায় বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিল। পূর্ববঙ্গের তফসিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২১ এপ্রিল দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে তার বক্তব্যে এ বিষয়ে গণভোটের দাবী জানান। দাঙ্গা সম্পর্কে তিনি বলেন যে বাংলা ভাগ দাঙ্গা সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। এতে বাঙালী হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা হবেনা।[৯৮]

---

[৮৯] হারুন-অর রশিদ, অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, (প্রবন্ধ) বাংলাদেশের ইতিহাস (রাজনৈতিক), সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪০৮

[৯০] হারুন-অর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৮

[৯১] হারুন-অর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৯

[৯২] আবু আল সাইদ, , সাতচল্লিশের অখণ্ড বাংলা আন্দোলন, পৃষ্ঠা ২৮

[৯৩] আবু আল সাইদ`, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু, পৃষ্ঠা ৬১

[৯৪] হারুন-অর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৯

[৯৫] হারুন-অর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১০

[৯৬] আবু আল সাইদ, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু, পৃষ্ঠা ৬১

[৯৭] আবু আল সাইদ, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু, পৃষ্ঠা ৬১

[৯৮] আবু আল সাইদ, সাতচল্লিশের অখণ্ড বাংলা আন্দোলন, পৃষ্ঠা ২৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি এমন ছিল যে বাংলার ভাগ্য জনগণের উপর নির্ভর করছিল না, নির্ভর করছিল সম্পূর্ণ বাইরের তিনটি শক্তির আপস ও চুক্তির উপর। এই তিনটি শক্তির মধ্যে দুটি শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বে প্রস্তুত ছিল বাংলাকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে পৃথক অবিভক্ত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করতে; কিন্তু স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলনা অন্য শক্তি অর্থাৎ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এবং তাদেরই চাপে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বাছাই করে নেওয়ার। এই তিনটি সম্ভাবনা ছিল: (১) সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব হিন্দুস্থানে অথবা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারে (২) বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হতে রাজি হয়ে এক অংশ হিন্দুস্থানে এবং অন্য স্থানে পাকিস্তানে যেতে পারে; এবং (৩) বাংলা ও পাঞ্জাব ঐক্যবদ্ধ থেকে পৃথক রাষ্ট্র হতে পারে।

২ মে বারোজকে মাউন্ট ব্যাটেন জানালেন, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আর একটা বিকল্প হিসাবে বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সমস্ত ভোট দাতাদের মতামত গ্রহণ করার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।[৯৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে সংকটের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের উপর অর্থাৎ হিন্দু ও পার্শি বড় বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করছিল ভারতবর্ষে তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। মুসলিম নেতৃত্বের অপেক্ষা এই সব ব্যাপারে তারা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন।[১০০]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অবিভক্ত 'স্বাধীন' বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাবকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছিলেন।[১০১] অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনার প্রতি গান্ধীর সমর্থন ছিল। ১৯৪৭ সালের ৮ মে ও তার পরবর্তী কয়েকদিন শরৎ বোস, আবুল হাশিম, কিরণশঙ্কর রায়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মহম্মদ আলি ও সত্যরঞ্জন বক্সি ঐক্যবদ্ধ বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে সোদপুরে গিয়েছিলেন। আবুল হাশিম গান্ধীকে বলেছিলেন, "বাঙালীদের একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই ইতিহাস যা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐক্যবদ্ধ করেছে। হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, বাঙালী বাঙালী এবং ১০০০ মাইলেরও বেশি দূরের পাকিস্তানীদের শাসনকে ঘৃণা করে।"[১০২]

১৯৪৭ সালের ১৭ মে একটি স্মারক লিপিতে ভারত সচিব লিস্টওয়েল বলেছিলেন যে, "ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং নিজের সংবিধান নিজে রচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বাংলাকে এবং সম্ভবত পাঞ্জাবকেও দেবার পক্ষে যুক্তি আছে।"[১০৩] ডোমিনিয়ন প্রধান মন্ত্রীদের কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে এটলী উপমহাদেশে দুটি বা সম্ভবত তিনটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতের বা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নে সরকারের প্রত্যেকটা কাজ বা আইনের পিছনে দুই তৃতীয়ংশ হিন্দু সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় বিধান সভায় বাংলা ভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিধায়কদের মধ্যে নির্বাচন হয়। মুসলমান প্রধান এলাকার মুসলমান সদস্যগণ বাংলাকে এবং অস্তিত্বমান বিধান সভাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে এবং ৯৮% হিন্দু সদস্য বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট প্রদান করেন।[১০৪]

যদিও বলা হয় যে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে অনেক অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া মুসলমান প্রধান হলেও এর সামান্য কিছু অংশ পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। বাংলা সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার মোট ৬৩.৮০%, এবং মোট জনসংখ্যার ৮৩.৯৫% এবং অমুসলমান জনসংখ্যার ৪১.৭৮% পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। কলিকাতা পশ্চিমবাংলাভুক্ত হয়।[১০৫] কিন্তু কলকাতাই ছিল বাংলার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের

---

[৯৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ২৯০
[১০০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯০
[১০১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭
[১০২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৬
[১০৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯০
[১০৪] বিস্তারিত সাইদ, অখন্ড বাংলা আন্দোলন, পৃষ্ঠা ২৮
[১০৫] সীমানা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস- ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৩-৩০

কেন্দ্রস্থল। কলকাতার সমুদ্রবন্দর কলকারখানা ভারতের হাতছাড়া হয়ে যাবে নেহেরু এটা সহ্য করতে পারেননি।[১০৬]

ধর্মীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবেচনা এই নতুন রাষ্ট্রের নিয়ামক ছিল না, এর বিশেষ রাজনৈতিক ভূসংস্থান নির্ধারিত হয়েছিল বিদায়ী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলগুলির স্বেচ্ছাচারী কার্যাবলী দ্বারা।[১০৭] আর ভারতের যে অংশ বিচ্ছিন্ন একই সময়ে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত হল তার মধ্যে যারা জবরদস্তিভাবে পাকিস্তানী হয়ে গেল, অথচ মন পড়ে রইল ভারতে তাদের মনে কি ধরনের অনুভূতি জাগল? হায় ভগবান, সে কথা ভাবা যায় না।[১০৮]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও হিন্দুদের অবস্থান

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভাব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পূর্ববাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পর হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানসিক সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাদের এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন,

> "স্বাধীনতা, পাকিস্তান ও বঙ্গভঙ্গের সংবাদে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে।-------তাঁদের মধ্যে যেন যাদুদণ্ডের স্পর্শ লাগলো। ----বৃদ্ধি পেল, হিন্দুদের কাছে মর্যাদা লাভের আকাঙ্খা।[১০৯]
>
> "পুরুষানুক্রমে মুসলমানগণ হিন্দু বাড়িতে যে সীমাহীন অমর্যাদা, অপমান ও অবহেলা ভোগ করেছে – পাকিস্তান হওয়ায় তাদের যেন অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটলো বলেই তারা আনন্দিত বোধ করলো। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানদের সেই আনন্দ প্রকাশের রীতি পদ্ধতি ও ভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রভুত্বশালী হিন্দু সমাজের মান মর্যাদাকে আঘাত করল এবং ঐসকল ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হিন্দুগণ তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে দেশত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করল।"[১১০]
>
> "হাটে, বাজারে, রাস্তাঘাটে হিন্দুদের সঙ্গে কথা বার্তার ধরণ পাল্টাতে শুরু করছে সভ্যতা ও শিষ্টতার ধারা।.......বৃদ্ধি পেল, হিন্দুদের কাছে যথেষ্ট মর্যাদা লাভের আকাঙ্খা ....অনেক ক্ষেত্রে নানাধরণের অমানবিক বা অভব্য ঘটনার গুজব ও এক কান থেকে অপর কানে, সঞ্চারিত হতে শুরু করে এবং অস্বাভাবিকভাবেই তাতে ভীতির সঞ্চার হত।[১১১]

কলকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভৎসতা ও দেশ বিভাগের সম্ভাবনায় শঙ্কিত সম্পদশালী হিন্দুদের একাংশ পাকিস্তান প্রশাসন কায়েম হবার পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বিকল্প বাসস্থান নির্মাণ, বিনিময় বা বাড়ি ভাড়া করে দেশত্যাগ করেছিলেন অথবা স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন।[১১২]

১৯৪৩ এর পূর্বে ঢাকার এক চামড়ার ব্যবসা ছাড়া আর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের হাতে। ঢাকার আর একটি বিশেষত্য ছিল এই যে, সেখানে মাড়ওয়াড়িরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীদের হাতে ছিল। ঢাকা জেলা মুসলমান প্রধান হলেও ঢাকা শহরের শতকরা ৬০ জন অধিবাসী ছিল হিন্দু।[১১৩]

---

[১০৬] আবুল হোসেন, ভারত বিভাগ ও অন্যান্য লেখা, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৩

[১০৭] আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬,

[১০৮] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯,

[১০৯] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), পৃষ্ঠা ১৩

[১১০] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

[১১১] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

[১১২] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

[১১৩] প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যা ১৩৫২, পৃষ্ঠা ১৫০

স্বাধীনতাকালীন সময়ের প্রথম ধাপে উচ্চশ্রেণীর পূর্ববঙ্গ ত্যাগের প্রধান কারণটি ছিল মনস্তাত্ত্বিক। অবস্থাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায় কিছুতেই পাকিস্তানকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বংশ-পরম্পরায় পূর্ববঙ্গে তারা জমি ভোগ করেছেন, সামাজিক মর্যাদা পেয়েছেন; এখন তাঁরা অনুভব করছিলেন, দেশটার অধিকার আর তাদের হাতে রইল না। নিজভূমে তারা পরবাসী হয়ে গেলেন।[১১৪] সে সময়ের নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে রাজশাহীর বিপ্লবী নেতা প্রভাস লাহিড়ী বলেন, "কই আমি তো তাদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে ধ্বনি দিতে পারছি না! ... কে বুঝবে এই মরমের ব্যাথা? ... . হয়তো বা অভিমানী মনের একটা নিরর্থক অভিমান মাত্র।"[১১৫]
লাহিড়ীর অভিমানসূচক অভিব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যর্থতাবোধ, যা পূর্ববাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও অধিকসংখ্যক হিন্দুর মনে জাগ্রত হয়েছিল।[১১৬]
শঙ্খ ঘোষ বলেন,

> "অবস্থাপন্ন হিন্দুর মনে হল : 'মাথা উঁচু করে চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলে এখন। ---- এখন তো ওরাই সব। -----দাঙ্গা হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ ? যে কোন সময় কিছু একটা ঘটলেই হলো।"---এইভাবে কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আতঙ্ক থেকেই দেশত্যাগ।[১১৭]

কিছু স্থানে হিন্দু পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া এত বেশি তিক্ত ছিল যে, দেশত্যাগের পূর্বে তারা সরকারী সম্পত্তির ভাংচুর করেছিল। সিলেট হাসপাতালের হিন্দু কর্মচারীরা হাসপাতালের সম্পদ ভাংচুরের পর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়।[১১৮]
মুন্সিগঞ্জের সাবজেলের হিন্দু কেরানী ও বন্দীরা স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন বরাদ্দ বাড়তি রেশন এর কোটা বর্জন করে।[১১৯]
স্বাধীনতাকালীন সময়ে পূর্ববাংলার যারা কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তাদের অনেকের পূর্ববাংলায় ফিরবার ইচ্ছে থাকলেও তাদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার কারণে আর পূর্ববাংলায় ফেরা হয়নি। অনেকের মনে হয়েছে এ সুযোগে কলকাতায় একটি বাড়ির ব্যবস্থা থাকলে ঢাকার বাড়ি থাকার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসু হবে। প্রতিভা বসু তার পরিবারের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে,

> "দেশ ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছিল, দাঙ্গা যখন মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছিল সারা ভারতের আনাচে কানাচে, হিন্দুরা যখন মুসলমানের ভয়ে অস্থির এবং মুসলমানরা হিন্দুদের ভয়ে, এই সময় অনেক মুসলমান এপিঠের বাড়ি বদল করে ওপিঠে চলে যাচ্ছিল, অনেক হিন্দু ওপিঠের বাড়ি বদল করে এপিঠে চলে আসছিল।--- "কলকাতায় একটা বাড়ি থাকার দাম আর ঢাকাতে একটা বাড়ি থাকার দাম কি এক?"[১২০]

এ পরিস্থিতিতে প্রতিভা বসু তার বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের ঢাকার বাড়ি বদল করে নিতে কিন্তু তার বাবা রাজি হননি। তার বাবা সে সময় পারিবারিক কারণে ঢাকার বাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় অবস্থান করতে গিয়েছিলেন। অনেকের মত প্রতিভা বসুর কাছেও ঢাকার থেকে কলকাতায় একটা বাড়ি থাকা অনেক লাভজনক মনে হয়েছে।[১২১] কিন্তু পরবর্তীতে তার আর ঢাকায় ফেরা হয়নি।

---

[১১৪] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ- দেশত্যাগ, পৃষ্ঠা ৬০
[১১৫] প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ,, পাক ভারতের রূপরেখা, পৃষ্ঠা ২৮-২৯, উদ্ধৃত- সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, দেশভাগ- দেশত্যাগ, পৃষ্ঠা ৬১
[১১৬] আহমেদ কামাল,, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪
[১১৭] শঙ্খ ঘোষ, সুপুরীবনের সারী, পৃষ্ঠা-৫০, ৫৯, উদ্ধৃত- সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১
[১১৮] অজয় ভট্টাচার্য, নানকার বিদ্রোহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭ উদ্ধৃত- আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪
[১১৯] আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪
[১২০] প্রতিভা বসু, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৫ বাং, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০,
[১২১] প্রতিভা বসু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০

Dhaka University Institutional Repository

যাদবপুরে সে সময় ষোল টাকা জমা দিলে পাঁচ কাঠা জমি পাওয়া যেত। জমি পেয়ে তাতে রিফিউজিরা নিজেরা বেড়া দিয়ে বসবাস করার মত ঘর তুলে নিত।[১২২] প্রতিভা বসু সেকবর জানতে পেরে তার বাবার জন্য এরকম একটি বাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ সরকারের বক্তব্য ছিল, নির্যাতনের কারণে নয়, আর্থিক উন্নতির স্পৃহায় 'সাহায্য' পাওয়ার আশায় হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছেন। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হলেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। অবস্থাপন্ন হিন্দুরা দেশত্যাগ করায় কারিগর শ্রেণীর লোকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, তাদের হাতে আর কাজ ছিল না।"[১২৩]

পূর্ববাংলায় জমিদার ও রায়তের মাঝে প্রায় আড়াই লক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী ছিল।[১২৪] অতএব এই আড়াই লক্ষের এবং তাদের অনুচরদের যে বিপুল সংখ্যা, তাদের বিক্রমে তাবদ সাধারণ মানুষ ছিল নাজেহাল।[১২৫] তবে তাদের কিছু সদাচারও ছিল। সেই সদাচারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই বিভিন্ন সময়ের প্লাবতার মুহূর্তে, এদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রাণ পর্যন্ত বাজি রেখেছে।[১২৬]

পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। মুসলমানরা সরকারী দপ্তরে, ব্যবসা বাণিজ্য কল-কারখানায় চাকুরী প্রাপ্তির অধিকতর সুযোগ চেয়েছিল। .....কিন্তু তা সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করল; কারণ প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সংবাদপত্রগুলি এই ধর্মনিরপেক্ষতার দিকটাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এর উপর ধর্মের রং চড়াল।[১২৭]

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশত্যাগ পরবর্তীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য শ্রেণীর সদস্যদেরকেও দেশত্যাগে প্রভাবিত করবে বলে আশংকা প্রকাশ করে ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের পক্ষ থেকে একজন সদস্য বলেছিলেন,

> "The minority community of Vikrampore and a feeling of security so long we are there, but, if we have to leave the place, we apprehend, that they will migrate in greater numbers of West Bengal."[১২৮]

পরবর্তীতে তার আশংকা সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিশালী অনেক ব্যক্তি তৎকালীন পরিবর্তীত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান হারিয়ে মনঃক্ষুণ হয়ে পূর্ববাংলার সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। মিহির সেন পূর্ববাংলায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের অবস্থান সর্ম্পকে তার জ্যাঠামশাইয়ের মনোভাব তুলে ধরে বলেন,

> "আমি জানি দেশের অবস্থা কি এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ যে কি তাও বেশ ভাল করেই বুঝে নিয়েছি। ----এ দেশে সংখ্যালঘুরা কোনদিনও রাষ্ট্রীয় ক্রমে কিছুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না। সে প্রচেষ্টাও প্রথমাবধি দেখা যায়নি। দেশভাগ হবার পর এরা আর এ দেশের মানুষ বলে নিজেদের ভাবতে পারছে না। তবে আমার উদ্দেশ্য এই যে অন্যভাবে যখন পারছি না তখন বুদ্ধির জোরে যতটা পারি এদের সর্বনাশ করে যাব।--- তিনি সব কিছুর উদ্গাতা হয়েও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতেন। কিন্তু তাবৎ কর্মের সূত্রটি থাকতো তারই হাতে।[১২৯]

---

[১২২] প্রতিভা বসু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০
[১২৩] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯
[১২৪] মিহির সেনগুপ্ত, বিষাদ বৃক্ষ, পৃষ্ঠা ২২৫
[১২৫] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৫
[১২৬] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৫
[১২৭] কামরুদ্দীন আহ্মদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৫২
[১২৮] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.10, File no. -B Jan, 53/ 441.GOEB
[১২৯] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০০

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় অনেক ক্ষেত্রে যেখানেই হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু বা ক্ষমতাশালী সেখানে তারা তাদের ক্ষমতার ব্যবহার করেছে। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পটুয়াখালী বার এ্যাসোশিয়েসনের বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন হিন্দু। তারা বার লাইব্রেরীতে পাকিস্তান রেডিওর খবর বন্ধ করে অল ইন্ডিয়া রেডিওর খবর প্রচার করার জন্য প্রস্তাব পাশ করে। এ ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান মুসলমান আইনজীবীগণ।[১৩০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ববাংলায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তনের সূচনা করা হয় কিন্তু স্বাধীনতার পর তা সম্পূর্ণ বদলে যায়। "With independence and partition, accompanied by an unprecedented communal; holocaust, the existing political matrix was completely changed."[১৩১] ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট পাকিস্তানের প্রথম পরিষদ অধিবেশন বসে করাচিতে। এই অধিবেশনে অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের সিডিউলকাস্ট প্রতিনিধি বাবু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দুদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালের ১৩ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, "পাকিস্তান ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, নীতি, সংস্কৃতি ও ধন সম্পত্তি পুরোপুরি রক্ষিত হইবে।---- কোনরূপ ব্যবধান না রাখিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হইবে এবং সর্ববিষয়ে তাহারা পাকিস্তানের নাগরিক রূপে গণ্য হইবে।"[১৩২]
এই অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সংখ্যালঘুদের অধিকার সর্ম্পকে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

> "---no matter what his colour, caste, creed, is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. ---You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan."[১৩৩]

সংবিধানে পাকিস্তানের সাংবিধানিক নাম 'Islamic Republic of Pakistan' হলেও সকল ধর্মের জনগণের সমান অধিকার নিশ্চিত করে 2.-(1)ধারায় বলা হয়,

> "To enjoy the protection of the law, and to be treated in accordance with law, and only in accordance with law, is the inalienable right of every citizen"[১৩৪]
> (a) "every citizen has the right to profess, practice and propagate any religion ; and
> (b) every religious denomination, every sect thereof has the right to establish, maintain and manage its religious institution."[১৩৫]

পরিষদ অধিবেশনে সংবিধান সংক্রান্ত খসড়া আলোচনার সময় হিন্দু সদস্যগণ ওয়াকআউট করেন, প্রতিবাদ করেন অনেক মুসলমান সদস্য। তাদের অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পূর্ববাংলার মুসলমানদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে হিন্দুদের পূর্ববাংলা ত্যাগের পেছনে সংবিধান এর কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে, কেননা ১৯৫৬ সালে প্রণীত হওয়ার পূর্বেই ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে।

---

১৩০ Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 14, File No. B.Dec.48/ 147-159, GOEB
১৩১ Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, page 13
১৩২ দৈনিক আজাদ, ১৪ জুলাই ১৯৪৭
১৩৩ Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, Page 21, CAP debates, 11 August, 1947, Vol.1(2) page 13
১৩৪ The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. part 1, no. 2.-(1), page 3
১৩৫ ibid, part 1. no. 15 (a) (b) page 10

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম আর মুসলিম লীগ থাকা উচিৎ নয়, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এরকম মত ছিল বলে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের জানা ছিল। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এর কাউন্সিল অধিবেশনে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ পাকিস্তানের অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও উম্মুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।[১৩৬]

স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রতিবাদে, জাতিগত দাবীদাওয়া এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলে। ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগ। এরপর ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ, ১৯৫১ সালে যুবলীগ, ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট, যা ছিল পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সূচনা হয় পূর্ববাংলার জনগণের জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। কৃষকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক কৃষক আন্দোলন (তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ) গড়ে ওঠে। এসময় পূর্ববাংলায় জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সরকার বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে, সবশেষে পূর্ণতা লাভ করে ১৯৭১ সালের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এসবই ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জাতিগত অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘুদের সংখ্যানুপাতে চাকুরী, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ২১% আসন সংরক্ষিত ছিল। সংখ্যালঘুদের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩০ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য ছিল।[১৩৭] কয়েকজন হিন্দু মন্ত্রী এবং বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।
১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা সরকার মন্ত্রী পরিষদের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যে কোন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে শুন্য পদের ৩০% এর জন্য সরাসরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকে নিয়োগ দেয়া হবে। প্রেসনোট প্রকাশ করে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।[১৩৮]
১৯৪৯ সালের হিসাব অনুযায়ী পূর্ববাংলার পুলিশ বিভাগে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৬৯৮ জন এর মধ্যে গেজেটেড অফিসার ৯ জন, নন গেজেটেড ১৬৮৯ জন চাকুরী করে। এদের মধ্যে নিম্নবর্ণের ৩৬৮ জন অফিসার ছিলেন। এদের মধ্যে ঢাকা জেলায় ১ জন গেজেটেড, ১২৯ জন নন গেজেটেড এবং নিম্নবর্ণের ১ জন গেজেটেড এবং ৩৬৭ ২৭ জন নন গেজেটেড অফিসার ছিলেন।[১৩৯]
১৯৫০ সালের মধ্যে হিন্দুদের ১১৫ টি রেজিস্টার্ড কোম্পানির অফিস পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় বদল করে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৪০]

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার সংবিধানে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করে। তবে কিছুসংখ্যক নেতা ব্যতীত প্রায় সকল নেতাই ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবেই মনে করতেন, যা বিভিন্ন সময়ে তাদের বক্তব্য বিবৃতি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ভারত (সাংবিধানিকভাবে) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ায় এ বিষয়টিকে তারা তাদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে আড়াল করার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছেন।[১৪১] বিভিন্ন সময় সরকার নিরপেক্ষ আচরণ প্রকাশ করলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবীদের চাপের মুখে অসহায় হয়ে পড়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা হচ্ছিল।

---

১৩৬ আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা ২৭৫,
১৩৭ দৈনিক আজাদ. ২৩ মার্চ ১৯৬৮, পাকিস্তান দিবস সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৬
১৩৮ Political (Home) Publicity, B Proceedings, Vol 27, File no. Mar- 1949/ 178 GOEB
১৩৯ Home, Police, B Proceedings, File p 39-27/ 49, Vol.80, 1949 GOEB
১৪০ Home, Political (CR), B Proceedings, Vol. 2, File no. Nov. 50/ 1021-1124, GOEB
১৪১ কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১২৮

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলার যে সকল হিন্দু নেতা স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করে চলে যাননি তাদের মধ্যে কিছু কিছু নেতার আচরণ ও মনোভাব ছিল রহস্যজনক[১৪২], ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অবস্থান এবং সাধারণ হিন্দু জনগণের প্রতি হিন্দু নেতৃবৃন্দের দায়িত্বের প্রতি আস্থা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করা কষ্টকর। নেতৃবৃন্দের কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে সরকারের সঙ্গে জনগণের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ এক বৎসরব্যাপী দাঙ্গার ওপর উভয় সম্প্রদায় যবনিকা টেনে দিয়েছিল। তাই একসময়ে মনে হয়েছিল পূর্বাঞ্চলে দেশবিভাগ হওয়া সত্ত্বেও হয়তো শান্তি অক্ষুন্ন থাকবে। অন্তত প্রথম দিকে আপাতদৃষ্টিতে শান্তি অক্ষুন্নই ছিল।[১৪৩] হিন্দু নেতৃবৃন্দ দেশের প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হন। পাকিস্তান গণপরিষদের তের জন অমুসলমান সদস্যের মধ্যে ছয় জন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতেন, পঁয়ত্রিশ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের মধ্যে মাত্র কয়েকজন স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলায় বাস করতেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ভারতে বসবাসকারী সদস্যগণ অধিবেশন শুরু হলে করাচী ও ঢাকায় অবস্থান করতেন, তারপর পুনরায় কলকাতায় চলে যেতেন।[১৪৪]

পারস্পরিক সম্পর্ক

দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্নে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ দানা বাঁধে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালী সফরে আসা বিশিষ্ট সাংবাদিক শংকর ঘোষ পঞ্চাশ বছর আগের নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে পুরনো কথা মনে করে বলেন,

> “আজ লজ্জা পাচ্ছি এই সব ক্যুরিয়ার নিয়োগ ও প্রেস ক্যাম্পের রান্নাবান্নার কাজে কোনওদিন মুসলিম নিয়োগের কথা আমরা ভাবিনি। প্রকাশ্যে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও জাতীয়তার কথা বললেও অন্তরে আমরা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলাম। তাই আমাদের কোন কাজে মুসলিম নিয়োগ করার কথা আমাদের মনে আসতো না। আমাদের ক্যুরিয়াররা সকলেই হিন্দু ছিল। কিন্তু তাদের উপর কোনদিন হামলা হয়নি, তাদের কাছ থেকে গাঁধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত খবরের কাগজের লোকদের চিঠিপত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টাও হয়নি।--- পারস্পারিক যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় তা দূর করা কোন ভাবে সম্ভব হয়নি।”[১৪৫]

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মনে। এছাড়া স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের পথে বাঁধার সৃষ্টি করবে এবং উভয় বঙ্গেই এর গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শ্রী উপেন্দ্রকিশোর সরকার তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে লিখেন,

> “অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে দায়িত্বশীল শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাহাদের মুখাপেক্ষী অসহায় নরনারীর প্রতি অনুরূপভাবেই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া কাণ্ডজ্ঞানশুন্য হইয়া পলায়নকারীর ন্যায় স্থানান্তিকে চলিয়াছেন।-----পলায়নকারীদের শান্তি ও শৃংখলার পথে বিঘ্নদায়ক কার্যকলাপে স্বদেশত্যাগে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক জনসাধারণের মনোবল ক্রমশঃ ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িতেছে।--- সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন কোন সাম্প্রদায়িক লোকের অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীকে আকড়ে ধরে সংখ্যালঘুদের মনে শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তান ও এর কোটি কোটি মানুষের মনোভাব নির্নয় করা সঙ্গত হবেনা এবং এতে সংকট আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।[১৪৬]

---

[১৪২] কামরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১
[১৪৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
[১৪৪] Samar Guha, op-cit, page 29
[১৪৫] শংকর ঘোষ, হস্তান্তর, পৃষ্ঠা ১৩১
[১৪৬] দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ পৃষ্ঠা ১ কলাম-৩,৪

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অবস্থাপন্ন হিন্দুদের সম্মানহানী হওয়ার ভয়ের পাশাপাশি কাজ করতো তাদের মেয়েদের নিয়ে ভয়। প্রভাবশালী মুসলমানরা আশ্বস্ত করলেও তারা যে খুব একটা আস্থা রাখতে পারেন নি, তা তাদের বিভিন্ন সময়ের দেশত্যাগই প্রমাণ করে। মিহির সেনগুপ্ত তার অভিজ্ঞতায় বলেন যে তার গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই বক্সীবাবুকে অনেকে আশ্বস্ত করলেও তিনি মেয়েরা বড় হয়েছে বলে খুব একটা আশ্বস্ত হতেন না। তিনি আতংকিত হয়ে একসময় গ্রাম ত্যাগ করেন।[১৪৭]

> "কারণ ইতিমধ্যে আশেপাশের বেশ কয়েকটা বনেদি পরিবার, যেমন উকিলবাড়ি, চাটুজ্জে বাড়ি, গাঙ্গুলী বাড়ি, সবাই কখন যেন বাড়ি তালাবদ্ধ করে বা কেউ কেউ কোন তালেবর মিঞা সহেবদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে ওপারে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে গেছেন। অবশ্য তারা সপরিবারেই গেছেন। তাদের ছেলেপুলেরা বহু আগে থেকেই 'কইলকাতায়' চাকুরিজীবী। সেখানে তাদের একটা অগতির গতি ঠাঁই ছিল।----
>
> পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার বাতাবরণ, এমন একটা স্তরে তৈরী হয়ে গিয়েছিল গৃহস্থ কন্যা-বধূরা তাঁদের রাখাল, বাগাল, ভাতুয়াদের পর্যন্ত সমীহ করতে শুরু করেছিলেন, যদিও তারা কোন অপকর্ম কোনও দিনও করেনি।[১৪৮]।

দাঙ্গা শেষ হয়ে গেলেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটছিল। লোকমুখে সেই সকল ঘটনা আরও অতিরঞ্জিত হয়ে গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে হিন্দু গ্রামগুলোতে আখেরী ভাঙ্গন শুরু হয়।[১৪৯] দাঙ্গার সময় কিছু দাঙ্গাকারী মুসলমানরা কিছু সাম্প্রদায়িক অত্যাচার অনাচারের ঘটনা ঘটায়। তবে পরবর্তী শান্ত সময়ের পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। এ বিষয়ে মিহির সেনগুপ্ত তার অভিজ্ঞতায় বলেন,

> "মহালের প্রজারা কখনই আমাদের পরিবারের কর্তাদের সাথে কখনওই করেনি, যাতে মনে হতে পারে যে তারা এইসব দাঙ্গা বা গণহত্যার ব্যাপারে কখনওই অংশগ্রহণ করে আমাদের কোতল করতে পারে। বস্তুত তাদের কাছে দাঙ্গা, দেশভাগ, মানুষের অস্থির অসহায়তার আশ্রয় খোঁজা, এগুলোর কোন সঠিক খবরও বোধহয় ছিল না। ----তারা দেশভাগ, জমি ভাগের বিষয়টি সম্যক অনুধাবন করেননি।---
>
> এই রাষ্ট্রের শুরুয়াতে সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝাটের যে প্রকরণ ছিল, পরে তা পাল্টায়।------পরে রাষ্ট্র স্থিতিশীল হলে এবং রাষ্ট্র পুরুষেরা ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণে যে যাদুবল সম্প্রদায়গতভাবে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে বিজ্ঞ হলে, এ ধারাটি পরিবর্তীত হয়।"-- তিনি আরও বলেন, "সাম্প্রদায়িক হিসেবে ঘোষিত এ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের নাগরিকদের সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজ। অতএব রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। তবে এই রাষ্ট্র ঘোষিতভাবে সংখ্যালঘুকে তাদের ধর্মাচরণে বাঁধা দিতে চায়না, বরং উৎসাহিত করে, যেন তারা তাদের ধর্মানুযায়ী জীবনযাপন করে। কারণ অন্যথায় বর্হিবিশ্বে বদনাম হয়। রাষ্ট্র চায় হিন্দু হিন্দুই থাকুক, মুসলমান মুসলমান। সমবেতভাবে এরা যেন অন্য কিছু হতে না চায়, না পারে। অন্তত অসাম্প্রদায়িক মানুষ যেন হতে না চায়। ------তারা তাদের মত থাকুক, আমরা আমাদের মত।"[১৫০]

তাদের দেশত্যাগের ফলে আতংক সৃষ্টি হলেও এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দ মৌন ভূমিকা পালন করার পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে শ্রী সরকার বলেন, তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে বঙ্গভঙ্গজনিত যে আতংক সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশমিত করার জন্য আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানিয়ে বলেন,

---

[১৪৭] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০-৪১
[১৪৮] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮
[১৪৯] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬
[১৫০] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

> "লক্ষ লক্ষ ভাগ্যকে কেন্দ্র করিয়া একটি কিছু রাজনৈতিক খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কোন দল বিশেষের অদৃশ্য হাত এই বাস্তুত্যাগের মূলে সক্রিয় রয়েছে।----তাহারা এই সংকটে হতাশ না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য গ্রামে গ্রামে বাস্তুত্যাগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।"[১৫১]

সরকার সরকারী চাকুরীজীবীদের জন্য অপশন ঘোষণা করলে হিন্দু চাকুরীজীবীদের অনেকে পাকিস্তানের জন্য অপশন দেন, তেমনি একজন মুসলমান আই,সি,এস ভারতের জন্য অপশন দেন, যদিও তার বাড়ী পূর্ববঙ্গে ছিল। হিন্দু অফিসারদের অনেকে পাকিস্তানের জন্য অপশন দেন। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর এক ডেপুটির সঙ্গে যে ব্যবহার করেন তার বর্ণনা দেন অন্নদা শংকর রায়। কর্মকর্তা তার ডেপুটিকে প্রশ্ন করেন, "পাকিস্তানে থাকতে চান? কেন থাকতে চান? হিন্দুস্থানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে। হিন্দুস্থানের পঞ্চমবাহিনী হতে?" অন্নদা রায় হিন্দুদের মনোভাবের প্রকাশ করে বলেন,

> "এই অবিশ্বাসই আমাদের হিন্দু মুসলমানের কাল হল। যেমন করে হোক, পাকিস্তানে একটা দিনও নয়। গুণ্ডার ছোড়ার চেয়েও ধারালো উপরওয়ালার কলম, তিনি রিপোর্ট দিবেন যে, লোকটা গুপ্তচর। আর সহকর্মীদের জিবও তেমনি বিষাক্ত।"[১৫২]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও সমাজের কাঠামো বিধ্বস্ত হল। পুরানো অর্ধ-সামন্তবাদী সমাজে জনসাধারণ আস্থা হারাল। বাংলার দুর্ভিক্ষ বাংলার সমাজ জীবনে এনে দিয়েছিল এক বিস্ময়, যার জন্য সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জেগেছিল। সমাজের উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব হয়েছিল ব্যাপক।[১৫৩]

হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়

তৎকালীন সময়ে অভিজাত হিন্দু সমাজও বিভিন্ন কারণে ভেঙ্গে পড়েছিল। এ সময়ে হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীন দুর্বলতার বর্ণনা দিয়ে মিহির সেনগুপ্ত বলেন,

> "হিন্দু সমাজটি তখন একেবারেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে অবশিষ্ট হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে একটি নৈতিক অধঃপতন আস্তে আস্তে পরিলক্ষিত হতে থাকে। পারিবারিক শাসন আলগা, অভিভাবকেরা উদাসীন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হওয়া মেয়েদের বিয়ে-থা দেওয়া হচ্ছে না। সে এক মাৎসান্যায়ী অবস্থা।"[১৫৪]

সামাজিক অবস্থান

যে সকল হিন্দুরা দেশত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে যাচ্ছিল তারা সেখানে পৌঁছে তারা পূর্ববাংলার এমন সব বর্ণনা দিচ্ছিল যা সেখানে তাদের প্রতি ভারতীয় সরকার ও জনগণের সহানুভূতি লাভে সহায়তা করে। অনেক সময় তাদের বর্ণনা সত্যি হলেও অধিকাংশ সময়ই তা হয়ে উঠতো অতিরঞ্জিত। এছাড়াও এই ধরনের কাহিনীগুলি একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয় যে এই সময়ে যারা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে আসছিল তারা মানসিক নিপীড়ন হেতুই চলে আসছে। পাকিস্তান হবার পর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হেতু এখন তাদের সেখানে মান-সম্ভ্রম ইজ্জৎ নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়, এই তাদের ধারণা হয়েছে। পূর্বের পরিবেশ সমাজে যে সম্মান পেতে তারা অভ্যস্ত তা এখন পাওয়া যায় না। বরং পাওয়া যায় উদ্ধত ব্যবহার এবং পদে পদে সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত সেখানে অন্যায় অত্যাচার। মেয়েদের ইজ্জৎ রাখা সেখানে দুষ্কর। নিজের ভিটেমাটি কেউ সহজে ত্যাগ করে না। এরা যে করেছে, তা বাধ্য হয়েই করেছে। এরা ভদ্রশ্রেণীর উন্নত রুচির মানুষ। এদের অপমানবোধ

---

[১৫১] দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ১, কলাম-৩,৪
[১৫২] অন্নদা শংকর রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯
[১৫৩] আহ্মদ, কামরুদ্দীন, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৬২
[১৫৪] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০০

তীক্ষ্ণ। তাই অত্যাচার চরমে ওঠবার আগেই, যখন তা মানসিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তখনি তারা চলে এসেছে। শান্তিরঞ্জন সেন গুপ্ত বলেন,

> "সকলেই যে দাঙ্গার মধ্যে এসেছেন তা কিন্তু নয়। এই যে আমরা এপারে এসেছি আমরা কিন্তু riot affected নয়। আমরা বুঝেছি ওখানে আর থাকা যাবেনা। ওখানে নিরাপত্তার দারুণ অভাব এাঁই অনুমান করে এপারে চলে এসেছে। আমরাইতো রাত্রে পালিয়ে এসেছি ডাকাতির ভয়ে। আগে মুসলমানরা এসে ঘরে ঢুকতোনা ওদের জন্য আলাদা জলচৌকী ছিল। আমরাও একদিন হয়তো ওদের প্রতি injustice করেছি। তখন তারাও রাস্তায় বেরুলে আমাদের দেখে জামার কলারটা টেনে আমাদের প্রতি ভ্রুকুটি করতো। অনেকে এসে আবার ঘরে ঢুকে সোজা চেয়ারেই বসে যেত।"[১৫৫]

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেক অংশ দেশত্যাগ করেনি, দিল্লী চুক্তির পর অনেকে ভারতে গিয়ে সুযোগ সুবিধা না পেয়ে ফিরে এসেছে আবার উচ্চ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোক ফিরে এসেছিলেন শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তির স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে।[১৫৬] হিন্দু জনগন পূর্ববাংলা ত্যাগ করেনি, তারা ছিল কৃষক, কৃষিশ্রমিক, জেলে, তাঁতী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে তারা সচেতন ছিল না, আর যারা তাদেরকে বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন সেই উচ্চ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাবুরা ভারতে স্থায়ীভাবে চলে গিয়েছিলেন।[১৫৭] যারা ভারতে থেকে গিয়েছিলেন আর যারা পূর্ববাংলায় ফিরেছিলেন তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সমর গুহ বলেন, "An analysis of the nature of return migration will reveal that unceasingly conscious non Muslims are coming away to India, whereas unconscious and backward people are going back to East Bengal.[১৫৮]

দেশত্যাগের পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকারের আদেশ জারীর ফলে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে পরিষদ সদস্য বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন,

> "হিন্দু বাড়িতে জোর করে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর দিল্লী চুক্তির পর কথা দিয়েছিল যে হিন্দুদের বাড়ীঘর ফিরে পাবে। তারা কখনও মনে করে না যে তারা নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে থাকবে। তারা বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যে তারা ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে তারা দেখে যে তাদের বাড়ীঘর অপহৃত বা বন্ধ করা হয়েছে। সরকার বন্ধ করা মাল নিলাম করবার হুকুম দিয়েছিলেন। দশ হাজার টাকার জিনিস এক হাজার টাকা করে নিলাম হয়েছে। আজ হিন্দুরা সত্যই বিপন্ন। তারা সাহায্যপ্রার্থী। Relief Department নিশ্চই অবগত আছেন যে তাদের কাছে কি পরিমান হাজারে হাজারে নালিশ করা হয়েছে। গভর্নমেন্ট নির্বাক। Relief Department চুপচাপ। দিল্লী চুক্তি হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কাহারও বাড়ীঘর না থাকে ব্যবস্থা করা হোক। S.D.O কে বলা হয়েছে। গভর্নমেন্টকে কে বলা হয়েছে। Minority Minister for Pakistan, Honourable Dr. Malik কে বলা হয়েছে। কেউ কিছু প্রতিকার করে নাই। -----সমস্ত হিন্দু বাড়ী ঘর ছাড়ে নাই, বিপদের সময় তারা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের গরু বাছুর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সম্পত্তি সরকার Seize করেছে।"[১৫৯]

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভিযোগের উত্তরে খাজা নাজিমুদ্দিন দেশ বিভাগের ও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দায়ী বলে অভিযোগ করেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,

---

[১৫৫] কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জবরদখলের স্মৃতি ঃ তিনটি সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক, বর্ষ ৯, ১/২

[১৫৬] Samar Guha, op-cit, page 26

[১৫৭] Samar Guha, op-cit, page 23-24

[১৫৮] Samar Guha, op-cit, page 26

[১৫৯] বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ৮ মার্চ ১৯৫১, ৫ম অধিবেশন ১৯৫১, ভলি-৫, নং-২, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

"কলকাতার চতুর ব্রাহ্মণ কায়স্ত গণ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে দেশ বিভাগে রাজী করায় এই বলিয়া যে ৬ মাসের মধ্যেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইবার আবেদন করিবে এবং তখন পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভাগ্যবিধাতারূপে পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিচার, শাসন ও পুলিশ বিভাগ এবং বিভিন্ন অফিসে নিযুক্ত অসংখ্য কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া যায়। কলিকাতা হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ হইত। হঠাৎ সমস্তই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।----কিন্তু যখন পাকিস্তান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং পাকিস্তানের ভারতে অর্ন্তভুক্তির সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইয়া গেল তখন শুরু হইল ব্যপক বাস্তুত্যাগ। হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অশিক্ষিত হিন্দুদিগকে (ইহাদের অধিকাংশই তফসীলি সম্প্রদায়ের) দেশত্যাগ করিতে রাজী করিল।------এই বাস্তুত্যাগের পেছনে একটা ষড়যন্ত্র ছিল।"[১৬০]

রাজনৈতিক অবস্থান

হিন্দু, মুসলমান ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগের ঘটনা ঘটলেও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বাঙ্গালী হিন্দু নেতৃবৃন্দ। স্বদেশী আন্দোলন, বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এর মূল কেন্দ্র ছিল পূর্ববাংলা এবং নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ। তবে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে গ্রামাঞ্চলের হিন্দু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্রমে ও অজ্ঞাতসারে ভারতে সরে পড়ার ঘটনা।[১৬১]

নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ বিশেষ করে উচ্চবর্ণের নেতৃবৃন্দ কলকাতায় বাস করতেন আর যারা পূর্ববাংলায় ছিলেন তাদেরও অধিকাংশই পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশই দেশভাগের পর পাকিস্তান ত্যাগ করেছিলেন।[১৬২] তবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা ছিলেন যারা পরবর্তীতে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর মুসলমান নেতৃবৃন্দও মনে করেন যে পাকিস্তানে আর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রয়োজন নেই সকল নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'চীফ সেক্রেটারি' সম্মেলনে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু বোর্ড গঠন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৬৩] ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড এর মোট ৩১৯ টি মিটিং হয়, এর মধ্যে ঢাকা জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড এর ২১ টি মিটিং হয়। প্রাদেশিক সংখ্যালঘু কমিশনের ২০ তম মিটিং হয় ১৯৫৩ সালের ২৬ জুন।[১৬৪]

১৯৫২ সালের ১০ মার্চ কুমিল্লার মহেশ প্রাঙ্গনে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও তফসীলি নেতা রাজকুমার মণ্ডল। এই সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ তফসীলিদের আসন সংরক্ষিত রেখে যুক্ত নির্বাচনের দাবী জানান।[১৬৫]

কংগ্রেস নেতা হারানচন্দ্র বর্মন এক বিবৃতিতে এ সম্মেলনে তফসীলিদের আসন সংরক্ষিত রেখে যুক্ত নির্বাচনের দাবীর সমালোচনা করে বলেন যে, সম্মেলনে কয়েকজন সুবিধাবাদী নেতার মনের অসহায়ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

[১৬০] দৈনিক আজাদ, ১ এপ্রিল ১৯৫২
[১৬১] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[১৬২] Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, page 17
[১৬৩] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.1 , GOEB
[১৬৪] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.42, File. January 55/ GOEB
[১৬৫] দৈনিক আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মন ভারতে পড়ে আছে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এখানে আছে। তিনি সংখ্যালঘুদের তাদের নিজেদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ দানের আহ্বান জানান।[১৬৬]

১৯৫২ সালের ১৯ এপ্রিল পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচন বিল ২৯-১০ ভোটে গৃহীত হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে বয়স্কদের ভোটাধিকার ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। এই বিলের আলোচনাকালে মোট ২১ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। পরিষদের আসন সংখ্যা বন্টন করা হয়-মুসলমান ২৩৭ (মহিলা ৯), তফসীলি ৩৮ (মহিলা ২), সাধারণ ৩১ (মহিলা ১), বৌদ্ধ ২, খ্রিষ্টান ১ জন। তফসীলি সম্প্রদায় ও বৌদ্ধদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ আইন সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, বিলটি গৃহীত হইল বটে, কিন্তু এর পরিনাম পাকিস্তানের পক্ষে ভাল হইবে না। বর্ণ হিন্দুগণ একে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী আইনের সাথে তুলনা করেন।[১৬৭]

গণপরিষদে বিলটি উত্থাপিত হলে গণপরিষদ সদস্য প্রেমহরি বর্ম্মণ জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচারের দাবী করেন। মিঃ বর্ম্মনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে পাকিস্তানী তফসিলী ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ বলেন যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী পূর্ববঙ্গের তফসীলিদের সাধারণ দাবী। কাজেই জনমত গ্রহণের জন্য বিলটি সাধারণে প্রচারের প্রয়োজন নেই।[১৬৮]

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইউব খান সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ৪৯৬৫ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয়।[১৬৯]

ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ সময় হিন্দু নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঢাকায় রাজনৈতিক দলের একটি অফিস ছিল যেখানে থাকতেন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের (হিন্দু মুসলমান দুই ধরনের লোকই ছিল) সদস্যরা নভেম্বর/ ডিসেম্বর মাসে সে বাড়ি ঘেরাও করলে মহারাজের আদেশে সেখানকার কর্মীরা পালিয়ে কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[১৭০]

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাটের প্রভাব

কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলা সমৃদ্ধ থাকায় এ অঞ্চল ভারতের শস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল প্রাচীনকাল থেকে। ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারকারী পণ্য 'পাট'। যা পূর্ববাংলার প্রধান অর্থকরী কৃষি পণ্য হিসেবে সোনালী আশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। স্বাধীনতা পূর্বকালীন ও পরবর্তীকালীন সময়ের ভারত ও পাকিস্তানের দুই দেশেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে পাট অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে পাটের। স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে পাটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে Omkar Goswami বলেন,

> "the last quarter of nineteenth century witnessed singnificant growth in jute and gunny trade, excellent profits, and a solid expansion of industrial capacity as well as the area under raw jute. -----Besides directly employing over 110,000 workers, the industry was the source of livelihood for over four million peasant households and the raison *d'etre* of thousands of middlemen- from the itinerant petty village

[১৬৬] ঐ, ১৬ মার্চ ১৯৫২
[১৬৭] ঐ, ২০ এপ্রিল ১৯৫২
[১৬৮] ঐ, ১৫ এপ্রিল ১৯৫২
[১৬৯] Muhammad Ghulam Kabir, op-cit, page 70
[১৭০] মণীন্দ্র পাল, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদনা ত্রিদীব চক্রবতী, পৃষ্ঠা ১১৭

peddlers (*farias*) of east Bengal to the Marwari speculators and *fatka* traders hedged and traded in jute futures in the back- alleys of Dalhousie Square in Calcutta."[১৭১]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলের ৭৫% পড়ে পূর্ববাংলায় অর্থাৎ পাকিস্তানে আর সকল পাটকলগুলো পড়ে ভারতীয় অংশ পশ্চিমবাংলায়।[১৭২] যা দুই দেশেরই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে পাট উৎপাদনকারী অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর বাস পূর্ববাংলায় এবং কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবসায়ী ও পাটশিল্পকেন্দ্রিক অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের বাস ছিল কলকাতায়। এ ক্ষেত্রেও দুই দেশেরই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। কাঁচামাল হিসেবে পাটের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছিল পূর্ব ও উত্তরবাংলার জেলাসমূহ আর আভ্যন্তরীণ পাটকলগুলির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। কাঁচামাল হিসেবে পাট পূর্ব ও উত্তর বাংলা থেকে খুব সহজে কলকাতায় পৌছানো সহজ হতো কারণ কলকাতার দূরত্ব ৪০০ মাইলের বেশী নয়।[১৭৩] কলকাতা কেন্দ্রিক পাটকলগুলির প্রায় একচ্ছত্র মালিকানা ছিল ব্রিটিশ শিল্পপতিদের হাতে। যখন পাটের গুরুত্ব বেড়ে যায় তখন থেকেই পাট ব্যবসা ব্রিটিশ ও হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। Lambert বলেন,

"In the two Bengals this impasse struck directly at the very foundation of their economics –jute. ----- "When the cash crop of jute became important, the broker-of bailing, shipping, milling, and marketing were controlled through British and Hindu commercial firms in Calcutta."[১৭৪]

পাট উৎপাদনে মাঠ পর্যায় থেকে পাটজাত পন্য ব্যবহারকারী পর্যায় পর্যন্ত কয়েক স্তরে মধ্যস্বত্ব শ্রেণী গড়ে উঠে। ফলে বাংলার সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দিয়ে গোস্বামী বলেন,

"Between the fields and the final consumers jute went through seven to nine layers of intermediaries, three transport systems, the mill sectors with its conflicting entrepreneurial groups, speculators, shippers, balers, eleven industry and trade associations and importers with varying degrees of countervailing power.[১৭৫]

এই পাটকলগুলিতেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীর সংস্থান হয়েছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে পাটের দাম বেড়ে যায়। ১৯০৬-০৭ সালে পাটের দাম ১৯০৪ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। পাটের দাম ও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে পাট উৎপাদনও উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয়। সব কিছু মিলে পূর্ববাংলার কৃষকদের হাতে বাড়তি পয়সা আসতে থাকে। সন্দেহাতীতভাবেই কৃষকদের কাছে তা বঙ্গবিভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই তা ধরা পড়ে।[১৭৬]

উত্তর ও উত্তরপূর্ব বাংলার পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহে কৃষকদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে রেখেছিল পাট ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কর্মকাণ্ড। তাদের কর্মকাণ্ডকে কৃষকরা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দেখতো কেননা কাঁচা পাটের বাজারে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি দাম ওঠা নামা তারা বুঝতো না। ১৯২০ শতকে পাটের বাজারে

---

[১৭১] Omkar Goswami, Industry, Trade, and Peasant Society the Jute Economy of Eastern India 1900-1947, Oxford University Press, Delhi, 1991, Page 4-5
[১৭২] Omkar Goswami, ibid, Page 5
[১৭৩] Omkar Goswami, ibid, Page 2
[১৭৪] Richard D Lambert, RELIGION, ECONOMICS, AND VIOLENCE IN BENGAL Background of the Minorities Agreement, page 310-313
[১৭৫] Omkar Goswami, op-cit, Page 6
[১৭৬] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

মন্দার পরে পাট চাষীদের কাছে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাজন ও পাট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন ছড়া ও গান লিখে প্রকাশকরা প্রচার করতে থাকে ফলে এ সময় কৃষকদের আক্রোশ জমিদারদের চেয়ে পাট ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ওপর বেশী ছিল।[১৭৭]

পাটকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ১৯৩০ সালে কিশোরগঞ্জে বড় ধরনের গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অনেক মুসলমান ধর্মীয় নেতাই মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের কাজ করার জন্য প্ররোচিত করেছেন। গোলযোগ সাম্প্রদায়িক ছিল না বলে মন্তব্য করেন তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি এর কারণ সম্পর্কে বলেন,

> "গোলযোগ সমূহ মূলতঃ অর্থনৈতিক এবং ---গত বছরটি পাট চাষের অত্যন্ত খারাপ বছর ছিল এবং এটা আশংকা করা যাচ্ছে যে এবারও অধিকতর খারাপ না হলেও তেমনি খারাপ হবে। কোন সম্প্রসারিত অঞ্চলে এবার প্রচুর ফলন হবার সম্ভাবনা অথচ কার্য সময়ের স্বল্পতার জন্য কলকারখানায় চাহিদা কমে যাবে। বর্তমান প্রতি মণের ৫/৮ টাকা দাম মেটানোর জন্য খুবই অপর্যাপ্ত।----তা ছিল সাম্প্রদায়িকভাব সম্বলিত মূলতঃ অর্থনৈতিক।----এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি যেখানে মহাজন ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় দেখানো হয়েছে বা লুট করা হয়েছে এবং হিন্দুকে হিন্দু বলেই নাজেহাল করা হয়েছে।"[১৭৮]

কথিত আছে যে কিশোরগঞ্জের ঘটনার সময় ভাওয়াল ও ঢাকা থেকে এসেছেন এবং কৃষকদেরকে প্ররোচিত করেছেন।[১৭৯] এ সময় ঢাকায় অনেক লুটতরাজের ঘটনা ঘটে। যে সকল মুসলমান লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেছিল তারা বিশ্বাস করতো যে, "ঢাকার নবাব সাহেব তেরটি জেলার মালিক হয়েছেন এবং তিনি আদেশ দিয়েছিলেন তিনদিন ধরে হিন্দুদের বাড়ী লুট এবং পোড়ানো হলেও কোন মুসলমানকে গ্রেফতার বা অভিযুক্ত করা যাবে না।"[১৮০]

১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারত ও পুর্ববাংলা দুই অঞ্চলই পাটের কারণে সংকটের সম্মুখীন হয়, কেননা পাটকল বিহীন পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলার পাটের বাজার সংকটের মুখে পড়ে। অন্যদিকে পাটকল সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে সংকট সৃষ্টি হয় ভারতের পশ্চিমবাংলায় কাচাঁমালের অভাবে। ভারতীয় পাটকলগুলো পাকিস্তানের পাটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ভারতীয় সরকার এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পাটের প্রধান বাজার ছিল ভারত। পাকিস্তানের ৬৫ শতাংশ পাট রপ্তানি হত ভারতে এবং অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ রপ্তানী হত বিশ্বের অন্যান্য দেশে। ১৯৪৭ সালের পরেও ভারতের সাথে পাটের বাণিজ্য পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন থেকে যায়।[১৮১] ১৯৪৮ সালে ভারতে টাকার অবমূল্যায়ণ করা হলে তার সাথে সাদৃশ্য রেখে পাকিস্তান টাকার অবমূল্যায়ণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর পরিনাম ভোগ করতে হয় পূর্ববাংলার পাট চাষীদের। বাণিজ্য সম্পর্ক রহিত হবার ফলে পাট উৎপাদনকারীরা বিপদের সম্মুখীন হয়। এ বিরোধের গুনাগুণ যাই থাকুক না কেন, এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের পুরো বোঝাটাই পড়ে পূর্ববাংলার পাট চাষীদের ঘাড়ে। পাটের বিক্রি ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় পাট চাষীদের আয় মারাত্মকভাবে কমে যায়। পাটের মূল্য সূচক ১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৯ সালের মার্চ এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০০ থেকে ৭১ এ নেমে আসে।[১৮২]

---

[১৭৭] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার ভূমিসম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িকতা ১৯২৬-১৯৩৫, সমাজ নিরীক্ষণ, ২৬/ ১৯৮৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, পৃষ্ঠা-৫৩

[১৭৮] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪

[১৭৯] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪

[১৮০] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮

[১৮১] রেহমান সোবহান, বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস (অর্থনৈতিক) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৬৪৬

[১৮২] রেহমান সোবহান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪৬

১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময়ে ভারতে পাটের সংকট সেখানকার অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে, "Its regional economy, particularly the Jute sector, had suffered great disruptions and it did not have the resources to bear the additional burden to relief and rehabilitation." [১৮৩]

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ হতে পাট না পাওয়ার দরুন পাটকলগুলি সংকটজনক অবস্থানে পৌছে। ফলে ভারত সরকার পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করার নির্দেশ প্রদান করে।[১৮৪]
কাটোয়ায় অনুষ্ঠিত উদ্বাস্তুদের এক সম্মেলনে বক্তৃতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আহবান জানিয়ে বলেন,

> "কাটোয়া, কালনা এলাকায় এসে উদ্বাস্তুগণ পাট উৎপন্নের ব্যবস্থায় অগ্রণী হয়েছে এই সমস্ত এলাকায় পূর্বে কোন কালে পাট জন্মিত না। এই উদ্বাস্তুদের সম্পদ বলে মনে করতে হবে। উদ্বাস্তুরা যদি মারা যায় ভারত ধ্বংসের পথে যাবে। উদ্বাস্তুরা জাতির সম্পদ। তাদের পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি গ্রামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলের অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য। - - - বন জঙ্গল কেটে, খাল, বিল ও পতিত জমি সংস্কার করে জায়গা জমির উন্নতি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ হতে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দূর করতে হবে।"[১৮৫]

পূর্ববাংলা প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হলেও ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলায় কোন পাটের কল ছিল না এগুলো সবই গড়ে উঠে কলিকাতার আশেপাশে। বাংলা ভাগ হওয়ার ফলে পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং পাট কলগুলো দুই অঞ্চলে পড়ে। ফলে ভারতকে পাটের জন্য পূর্ববাংলার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। East Pakistan was the world's largest producer of raw jute and almost no capacity to produce any jute manufactures:[১৮৬]
১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই বিপর্যয় শুরু হয় কারণ ভারতের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ কমে আসছিল। কারণ এ সময় পাকিস্তান থেকে ভারতে পাট রপ্তানি কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ সময় ভারত সরকার পাট শিল্পকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।[১৮৭] স্বাধীনতার পর ভারতীয় পাট শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করছিলেন। কাঁচামালের অভাবে ১৯৫০ সালে ৯ মার্চ থেকে ১০ দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে যাবে বলে পশ্চিমবাংলা থেকে ঘোষণা করা হয়।[১৮৮]

পাক ভারত সিটি মুসলিম লীগ এর সভাপতি প্রস্তাব করেন যে, ভারতে যে পাট রপ্তানী হবে তার প্রতি বেলের উপর এক টাকা হারে কর ধার্য করে সে টাকা পাট চাষীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।[১৮৯] পূর্ববাংলা সরকার ১৯৫২ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে পূর্ববাংলায় শতকরা ৭৫ ভাগ পাট চাষ হ্রাস করা হবে। পূর্ববাংলার ব্যবসায়ী মহল এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।[১৯০]

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন অঞ্চলে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ ও এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে পূর্ববাংলা সরকার ১৯৫২ সালের ২০ ডিসেম্বর এক ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারে বলা হয় যে পাট চাষের জমির পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কিত যে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন ছিল, পাট উপদেষ্টা বোর্ড

---

[১৮৩] Gyanesh Kudaisya, DIVIDED LANDSCAPES, FRAGMENTED IDENTITIES: EAST BENGAL REFUGEES AND THEIR REHABILITATION IN INDIA 1947-79, Page 112
[১৮৪] দৈনিক আজাদ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮
[১৮৫] দৈনিক যুগান্তর, ১১.১০.৫০ B Proceedings, Dep. Home (Political), Vol. 6, File No.
[১৮৬] M.Nazrul Islam, op-cit, Page 38.
[১৮৭] পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পাদক, দৈনিক আজাদ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০
[১৮৮] দৈনিক আজাদ, ৪ মার্চ ১৯৫১
[১৮৯] ঢাকা প্রকাশ ২৫ মার্চ ১৯৫২
[১৯০] ঐ, ১ আগষ্ট ১৯৫২

বৈঠকে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্তে পৌছেন যে পাট চাষী ও ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাট চাষকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে যাতে করে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন করা সম্ভব হয়।
সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, "সীমান্ত এলাকার পাঁচ মাইলের মধ্যে পাট চাষ করা একেবারে বন্ধ করতে হবে।"[১৯১]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী ইশেতেহার ২১ দফায় উল্লেখ করে, "পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।"[১৯২] তবে পরবর্তীতে তা কার্যকর হয়নি।

কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মকর্তা কামরুদ্দীন আহমদ এ সম্বন্ধে পশ্চিমবাংলার চীফ সেক্রেটারি এস.এন রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চেষ্টা করেন যে, শরণার্থীর চাপে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি যখন বিপর্যস্ত তখন এর পরও পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের চলে আসার জন্য সরকার তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন কেন? এর উত্তরে এস.এন রায় বলেন যে, সরকার পাট উৎপাদক নমঃশুদ্র কৃষকদের জমি দেন, লাঙ্গল দেন, পাটের বীজ সরবরাহ করেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে পাট উৎপাদন করার মত জমি আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা পাট বুনতে চায় না। তাদের ধারণা যে পাটের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের তুলনায় পূর্ববঙ্গের কৃষকরা অনেক বেশী কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান।"[১৯৩]

পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংরার কালনা, কাটোয়া অঞ্চলে পতিত ডাঙ্গা জমিতে এই উদ্বাস্তুদেরই প্রচেষ্টায় সাফল্যের সঙ্গে পাট উৎপাদন করে ভারতের পাটের চাহিদা পূরণ করেছিল। কারণ সে ধরনের জমি ও পরিবেশের সঙ্গে তারা পরিচিত এবং পাট চাষের রীতিতেও তারা অভ্যস্ত।[১৯৪]

পূর্ববাংলা সরকারের পাট সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ভারতীয় সরকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কারণ পশ্চিমবাংলার পাটকলগুলি মূলতঃ পূর্ববাংলার পাটের উপর নির্ভরশীল ছিল। পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত নিজেদের দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করায় গুরুত্ব প্রদান করে যাতে করে পূর্ববাংলার পাটের ওপর নির্ভর না করতে হয়। পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত নিজেদের পাটের চাহিদা মেটানোর পর পাট রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতে কৃষি বিশেষ করে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসর ১৯৬৩ সাল ছিল ভারতে পাট শিল্পে উৎপাদনে খুব ভাল একটি বৎসর যেমন ছিল ১৯৬২ সালে। ১৯৬৩ সালে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের টার্গেট ছিল ১.৩ মিলিয়ন টন।[১৯৫] তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার পাট এর উন্নয়নে বরাদ্দ করে ৩ কোটি টাকা।[১৯৬] পাট উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ভারত পাটের বাজার সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়ে ওঠে। সেখানে পাটের বাজার উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলে জানান ফিনান্স মিনিস্টার। তিনি বলেন, "The Indian jute Industry will presumably take full advantage of this financial provision for market research activity."[১৯৭]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতাকালীন সময়কালে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, এমনকি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবকিছুই গড়ে

---

[১৯১] ঐ, ২১ ডিসেম্বর ১৯৫২
[১৯২] মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫
[১৯৩] কামরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯
[১৯৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০
[১৯৫] Statement by Shri Saila Kumar Mukharjee, Minister in Finance, presenting budget for 1964-65, page 2
[১৯৬] ibid, page 2
[১৯৭] ibid, page 2

উঠেছিল ভূমি বণ্টন বা ব্যবস্থাপনার উপর। বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনামলে ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সরকারের শাসনামলে ভূমির মালিকানা ও কর আদায় সংক্রান্ত কিছু আইন পাশ হয়, যা পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় স্বাধীনতা পূর্বকালীন অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থানে থাকা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে বিভিন্ন ভূমি বন্দোবস্ত আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
ভূমি ব্যবস্থাপনা আইন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান

কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে পূর্ববাংলার ভূমি রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। ব্রিটিশ শাসনামলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট বিভিন্ন আইনের ফলে জমিদার- রায়ত সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং বৃদ্ধি পায় প্রজা অসন্তোষ। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে খাজনা আদায় করার মাধ্যমে জমিদাররা হয়ে ওঠে জমির মালিক। জমিদারদের সাথে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের চিরাচরিত সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।[১] পূর্বে যে জমির মালিক ছিল কৃষিকার্যরত খোদ কৃষক, সেই জমির মালিক এ-বার হল পূর্ববর্তীকালের রাজস্ব আদায়কারী সরকারী এজেন্ট- জমিদার।[২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিতে বাংলাদেশের কৃষকদের পুরুষানুক্রমিক স্বত্ত্ব উচ্ছেদ করে শুধু যে জমিদারদেরকেই স্বত্ত্ব প্রদান করা হয় তাই নয় এর মাধ্যমে সাধারণভাবে জমি পরিণত হয় পণ্যে।[৩] সুপ্রাচীনকাল থেকে পূর্ববাংলায় যে ভূমিব্যবস্থা চলে আসছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। প্রচলিত কৃষকের স্বত্ত্ব ও ভূমি সংস্কারের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকল না।[৪] এর ফলেই গড়ে ওঠে দুটি শ্রেণী, খাজনা আদায় ও ভোগকারী এবং খাজনা প্রদানকারী। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমাজে সৃষ্টি করে ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন কিন্তু ভূমির আয়ের ওপর নির্ভরশীল এক অভিজাত ও মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণীর। এ শ্রেণীর অবস্থান ব্যাখ্যা করে সৈয়দ আহমদ বলেন,

> "The social status and economic advantage given to the `landed aristocrats' by the regulation of 1793, made some of them take the unwise course of eat, drink and be merry, neglecting the proper management of their estates.---
> The idea of managing the estate on business principle was altogether absent from the minds of the zaminders. Some even decided to live in town and back there sunshine of government favour leaving agents behind to manage their estates. These `absentee' zamindars and others used to collect land revenue from tenants by appointing a host of officers who with all their inefficiency, were oppressive and unsympathetic."[৫]

শুরু হয় শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শাসক ও শোষিতের মধ্যে। এই দ্বন্দ্বই একসময় পরিণত হয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায়। বেশীর ভাগ রায়ত ছিল মুসলমান। হিন্দু জমিদার, কর্মচারী, মহাজন (ঢাকার সাহা) কর্তৃক নিপীড়িত মুসলমান জোতদার, প্রজা ও ভাগচাষীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয়া সহজ ছিল।[৬] ব্রিটিশ যুগে যতগুলো কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে তার সবই ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত রায়ত শ্রেণীর বিদ্রোহ, সেখানে কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ ছিল না। উভয় শ্রেণীর রায়তই বিদ্রোহ করেছিল হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর জমিদারদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে এই বিরোধই ধর্মীয় বিরোধ হিসেবে প্রচার করা ছিল শোষকশ্রেণীর একটি সুবিধাজনক উপায় যাতে করে তারা নিজেদের সুবিধা বজায় রাখতে পারে। কৃষিসম্পদই যে সকল সমাজের প্রধান ভিত্তিভূমি সে সকল সমাজেই

---

[১] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৪৫
[২] বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২০
[৩] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫
[৪] মেসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৪
[৫] Syed Ahmed, Subinfeudation in the Land System of East Bengal, Pakistan Economic Journal, August 1950,(Quarterly), Vol. 2, No.1, Page 65-66
[৬] অমলেশ ত্রিপাঠী , স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬১

সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎপত্তি।[৭] তথাকথিত হিন্দু মুসলমান বিরোধের যে রূপ তা কোন ধর্মীয় বিরোধ নয় বরং এই বিরোধকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় রূপ দিয়েছে দুই ধর্মেরই মধ্যবিত্ত প্রভাবশালী শ্রেণী।[৮] সব দ্বন্দ্বের মূলাধার জমি। মানুষের মধ্যে যতসব দ্বন্দ্ব বিরাজমান, তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি, জমির মালিকানা।[৯] ভূমির মালিকানা, উৎপাদন ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে Raihan Sharif বলেন,

> "In an agricultural country, land revenue system must <u>needs</u> play a significant part in the country's economy; and in so far as the relation between the ownership and cultivation of land, and the rights and status of actual cultivators is [are] concerned a clear-cut system is the first condition of agricultural prosperity."[১০]

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়। রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের অঙ্গিকার ছিল স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা। স্বাধীন পাকিস্তানের সরকার হিসেবে মুসলিম লীগ উদ্যোগ গ্রহণ করে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের। দেশত্যাগের প্রথম পর্যায়ে হিন্দু উচ্চবর্ণের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই দেশত্যাগ করে। এরাই ছিল ভূমি অভিজাত শ্রেণী। যেখানে শতকরা নব্বই জন চাষী মুসলমান সেখানে শতকরা নব্বইভাগ জমি হিন্দুর।[১১] ফলে এদেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব পাকিস্তান একটি কৃষি নির্ভর অঞ্চল তাই পূর্ববাংলার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি ভূমি। পূর্ববাংলার সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও গড়ে উঠেছিল ভূমি মালিকানার উপর ভিত্তি করে।[১২] The rent farming process has created a large number of successive grades of middlemen with the zamindar at the top and the cultivating ryot [raiyat] at the bottom."[১৩]
বিভিন্ন সময়ে সংঘাত দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়েছে ভূমিকে কেন্দ্র করে। বার বার সংঘটিত হয়েছে কৃষক আন্দোলন। দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববাংলায় অব্যাহত ছিল জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদার বিরোধী আন্দোলন। মেসবাহুল এর বিশ্লেষণ করে বলেন,

> "পত্তনিদার, দরপত্তনিদার এবং জমিদারদের প্রতিনিধি কর্মচারীরাই হল শহরবাসি জমিদারদের একমাত্র প্রতিনিধি।----ঊনিশ শতকের বাংলার চাষীরা এমনি অমানুষিক শোষণ, পীড়ন ও নির্যাতনে দিশেহারা হয়েই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল।[১৪] বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় ছিল প্রধাণতঃ মুসলমান। আর জমিদার মহাজন শ্রেণীর বেশীরভাগই ছিল হিন্দু। বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের দুই তৃতীয়াংশই মুসলমান।-- ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতেই শোষক হিন্দু জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে।"[১৫]

---

[৭] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার ভূমিসম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িকতা ১৯২৬-১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৬
[৮] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩
[৯] মিহির সেনগুপ্ত, **বিষাদ বৃক্ষ,** পৃষ্ঠা ১৫৭
[১০] Mohammad Raihan Sharif, ABOLITION OF ZAMINDARI A FINANCIAL PROPOSITION, Pakistan Economic Journal, August 1950,(Quarterly), Vol. 2, No. 1 Page 55
[১১] অন্নদা শংকর রায়, যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ১৯
[১২] লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি, পৃষ্ঠা ১০
[১৩] Syed Ahmed, op-cit, Page 66
[১৪] মেসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫
[১৫] মেসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০

জমিদার বিরোধী আন্দোলন পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যায়।[১৬] ফলে '৪৭ পরবর্তী সময়ে ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জমিদার ও মহাজনদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, কৃষক ও খাতকদের মধ্যে মুসলমান বেশী। তাই শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী দাবীকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দাবী বলে প্রচার করা হয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার, আমলা ও মহাজনদের শোষণ এবং অত্যাচার পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্য অনেকটা দায়ী ছিল। হিন্দু মুসলমান বিরোধ কোন ধর্মীয় বিরোধ নয়, মূল বিষয় হচ্ছে বৈষয়িক স্বার্থ। প্রজাস্বত্বের প্রশ্নের সাথে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন এইভাবে জড়িয়ে পড়ার কারণ, বাঙলাদেশে শ্রেণী-বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র জমিদার ও কৃষক, মহাজন ও খাতক।[১৭] যেখানে শতকরা নব্বই জন চাষী মুসলমান সেখানে শতকরা নব্বই ভাগ জমি হিন্দুর। জমি থেকেই বাংলায় হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ। যেটা আসলে জমিঘটিত সেটাই ধর্মঘটিত হয়ে দাড়ায়।[১৮] জমিদার প্রজার বিরোধটা হিন্দু মুসলমান বিরোধ নয়। অথচ ওটাকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বলে চালিয়ে দিয়েছেন উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতি তথা কায়েমী স্বার্থের ধারক।[১৯]

জমিদারী প্রথায় সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

ভূমি-ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিতে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল তা হচ্ছে,

১. জমিদারঃ এরাই ছিল সমস্ত জমির আইনসঙ্গত মালিক। জমিদার ও তার কর্মচারীগণ কৃষক সমাজের ওপর সালামী ও উপঢৌকনসহ বিভিন্ন কর আরোপ করতে পারতো। জমিদারদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়,

(ক) বৃহৎ জমিদার বা মূল জমিদারঃ সরকারের কাছে রাজস্বের জন্য এরাই দায়ী থাকতো। এদের প্রধান অংশটি বিপুল বিত্তের অধিকারী হওয়ায় এরা শহরে বাস করত এবং কর্মচারী নিয়োগ করে জমিদারী পরিচালনা করত। পরিবার বিভক্ত হওয়ায় সম্পত্তি বিভক্ত হয়ে অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্র জমিদারী সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সরকারী কর সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে জমিদারী নিলামে উঠত। নিলামের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জমিদাররা মধ্যস্বত্বভোগী নিয়োগ করত অথবা জমিদারীর কিছু অংশ বিক্রয় করে দিত। এই বৃহৎ জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাদের ওপর জমিদারদের শোষন নির্যাতন ও সামাজিক অবহেলার ফলে কৃষক জনতা থেকে জমিদার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকা জেলায় জমিদার ও প্রজার হার ছিল ১:৮৪।[২০] Taj Ul-Islam Hashmi এর মতে "The zamindar-dominated sub region included districts of Dacca, Mymensing, Faridpur, Bakerganj (Barisal), Pabna, Rajshahi, and part of Bogra- Dinajpur- Rangpur."[২১]

(খ) মাঝারি জমিদারঃ এদের অধিকাংশই ছিল মধ্যস্বত্বভোগী। মূল জমিদার পরিবারের অনেকে এই স্তরে নেমে আসতো। জমিদারগণ অনার্জিত আয়ের লক্ষ্যে জমিদারী খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে পত্তনি দেয়ার ফলে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়। বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে সরকারকে দেয় রাজস্ব এবং জমিদারের পাওনা খাজনার মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য ছিল শুধু সে সমস্ত অঞ্চলেই মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হয়েছিল।[২২] মধ্যস্বত্বভোগীরা বাংলার কৃষি উন্নতিতে মনোযোগ দেয়নি। তাদের বেশীর ভাগ ছিল শহরবাসী বা পেশাদার মানুষ। এদের কাছে জমিদারীটা ছিল

---

[১৬] লেনিন আজাদ, ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[১৭] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০
[১৮] অন্নদা শংকর রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯
[১৯] অন্নদা শংকর রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪
[২০] Taj Ul-Islam Hashmi, Pakistan as a Peasant Utopia The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947, Westview Press, United States of America, 1992, Page 38
[২১] Taj Ul-Islam Hashmi, ibid, page 38
[২২] হাফিজুর রহমান ভূঞা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব, ১৮৫৪-১৯৬০, পিএইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (অপ্রকাশিত) পৃষ্ঠা ৬৩

ব্যবসার মত। এরা সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করার চেষ্টা করত ফলে তাদের সশরীরে গ্রামে উপস্থিত থাকতে হত। এরা বিত্ত বা শিক্ষাদীক্ষায় তেমন উন্নত ছিল না। অন্যদিকে প্রজাসাধারণের মধ্যে অনেকে বিত্ত ও শিক্ষা দীক্ষায় তাদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। এরাই ছিল গ্রামীণ ক্ষমতার শীর্ষে ফলে এদের সাথে সাধারণ কৃষক জনতার বিরোধ ছিল প্রত্যক্ষ।[২৩]

(গ) ক্ষুদে জমিদার বা জমির মালিকঃ এরা আসলে জমিদার হিসেবে পরিগণিত হত না। অধিকাংশই খুব দরিদ্র জীবন যাপন করত এবং নিজেদের জমি নিজেরাই চাষাবাদ করত। শতকরা ৯৫ ভাগের উপরে ছিল এরাই। এরা ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিস্বত্ত্বের মালিক।[২৪]

(২) প্রজা: কৃষকদের যে অংশটি নির্ধারিত খাজনার বিনিময়ে জমির ওপর ভোগাধিকার লাভ করেছিল মূলতঃ তারাই ছিল প্রজা। জমির ওপর তাদের চুড়ান্ত মালিকানা ছিল না কিন্তু জমির ওপর এদের দখলীস্বত্ব ছিল চূড়ান্ত। উৎপাদিত ফসলের ওপর এদের ছিল চূড়ান্ত অধিকার। উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্তির শর্তে এরা জমি বর্গা দিতে পারত। কৃষিজাত পণ্যের বিশেষ করে পাটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ এলাকার প্রজাগণ আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে সক্ষম হয়। এছাড়া আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ফলে অনেক কৃষক সন্তান লেখাপড়া শিখে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। তবে জমির দখলীস্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার অর্জিত হবার ফলে গ্রামে উদ্বৃত্ত কৃষক ও মহাজনদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ১৯২৮ সালের ‘বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন’ পাশ হবার পর এ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ই প্রজাদের মধ্যে যেমন দেখা যায় উদ্বৃত্ত কৃষক তেমনই ব্যাপক সংখ্যক প্রজা ভূমিহীন ও বর্গা কৃষকে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গের পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলিতেই জমি হস্তান্তরের হার ছিল সবচেয়ে বেশী।[২৫] ফলে এ এলাকার কৃষকদের মধ্যে অনেক বেশী সংখ্যায় উদ্বৃত্ত পরিবার গড়ে ওঠে। আর এ এলাকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেহেতু মুসলমান, ফলে উক্ত উদ্বৃত্ত পরিবারগুলির অধিকাংশই ছিল মুসলমান। ফলে গ্রামে অবস্থানরত মধ্যস্বত্ত্বভোগী মাঝারি জমিদারদের সাথে এই জোতদারদের অর্থনৈতিক পার্থক্য ছিল না, ফলে তারা মাঝারি জমিদারদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। অন্যদিকে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস থাকায় তাদের প্রতি সাধারণ প্রজার ছিল শ্রেণীগত অসন্তোষ। আর এই বিরোধের ফলে জোতদার শ্রেণী এ অঞ্চলের কৃষকদের নেতৃত্বে চলে আসে স্বাভাবিকভাবেই। জোতদারদের প্রভাব ছিল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহে। এদের অধিকাংশ মুসলমান হওয়াতে তারা এ অঞ্চলের প্রজাসাধারণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।[২৬] পূর্ববাংলার কিছু এলাকায় প্রজাদেরও আধিপত্য ছিল। Taj- Ul-Hashmi বলেন,

> “In the south-west, Jessore and Khulna, zamindars were not dominant either.-----The peasants in the coastal area of Khulna were mostly middle peasants having 6 to 12 acres on the average. The powerful peasants coveted a rise in social stutus. They virtually controlled the rural area in Rampal, Shymnagar, Dakope, and Paikgacha in southern Khulna.”[২৭]

জমিদার, তালুকদারদের সঙ্গে প্রজাদের শ্রেণীগত বিরোধই পরিণত হয়ে ওঠে হিন্দু মুসলমান বিরোধে।

(৩) বর্গা চাষী: যে সমস্ত কৃষকের নিজের কোন জমির ওপর স্বত্বাধিকার ছিল না, কিংবা অপর্যাপ্ত জমির ওপর সত্ত্বাধিকার ছিল তাদেরকে অন্যের স্বত্ত্বাধিকারভূক্ত জমিতে চাষাবাদ করতে হতো। এরা জমিতে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেবার শর্তে চাষাবাদ করতো। ১৮৫৯ সালের সম্পত্তি নিরাপত্তা আইন ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন হবার পর

[২৩] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২
[২৪] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২
[২৫] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২
[২৬] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩
[২৭] Taj Ul-Islam Hashmi, op-cit, page 39

জমিদারগণ খুব ঘন ঘন জমি হাত বদল করতে থাকে। ফলে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার বেকার হয়ে পড়ে। এই বেকারত্বের সুযোগে জমিদারগণ তাদের খাস জমিতে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেবার শর্তে চাষাবাদ করতে দিত। এভাবেই গড়ে ওঠে আধিয়ার ভাগচাষ বা বর্গা ব্যবস্থা। ১৯২৮ সালের আইনে এই ব্যবস্থাকেই আইনগত ভিত্তি দেয়া হয়। বর্গা কৃষকগণ প্রধানত জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল শ্রেণী হিসেবেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে।[২৮]

(৪) অধীনস্ত প্রজা: এরা বর্গা কৃষকদের তুলনায় কিছুটা উন্নত শর্তে চাষাবাদ করত। জমির ওপর এদের স্বত্বাধিকার ছিল না। এরা জমিদারকে খাজনা দিয়ে রশিদ নেবার কোন অধিকার ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে তারা জমিতে চাষাবাদ করলেও তাদের স্বত্ত্বাধিকার ছিল অনিশ্চিত। ভূমিভিত্তিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের এই নির্দিষ্ট রূপটি পূর্ববাংলার গ্রামীণ সমাজে এমন একটি বাস্তবতা তৈরী করে যা থেকে তৈরী হয় আরও কিছু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, গড়ে ওঠে ভিন্নতর কিছু শ্রেণী।[২৯]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে মালিকানাস্বত্ত্ব জমিদারদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও মধ্যস্বত্ত্বভোগী ও রায়তগণ জমিদারদের সাথে চুক্তির আওতায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে কিছু অধিকার ভোগ করতেন।

১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় পরিচালিত ক্যাডাস্ট্রাল জরিপে ভূমিস্বত্ত্বকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়।

১) উপরিস্থ স্বত্ত্ব: এর আওতায় জমিদারী স্বত্ত্ব, স্বাধীন তালুকদারী স্বত্ত্ব, খাসমহাল, সরাসরি সরকারের অধীনস্ত লাখেরাজ জোত ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত ছিল।

২) মধ্যস্বত্ত্ব: এর আওতায় সকল ধরনের তালুকি স্বত্ত্ব, নিস্কর, দেবোত্তর, ভাগোত্তর, লাখেরাজ জোত ইত্যাদি।

৩) নিচস্থ স্বত্ত্ব: এ রায়তি স্বত্ত্ব হতে খাজনা গ্রহণ করে নির্ধারিত একাংশ উপরিস্থ স্বত্ত্বাধিকারীকে প্রদান করত। নিচস্থ স্বত্ত্ব ছিল মূলত সকল ধরনের রায়তি ও নিম্ন রায়তি স্বত্ত্ব।

জমিদারগণ সাধারণত তাদের জমি চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দিত। এই রায়তগণ আবার সেই জমি বর্গাচাষী ও উপস্বত্ত্বভোগী রায়তদেরকে চাষ করতে দিত। জমি ভাড়া, উপভাড়া দেয়ার পদ্ধতিতে প্রায়শই প্রকৃত চাষী ও জমিদারদের মধ্যে মধ্যস্বত্ব সুবিধাভোগী শ্রেণীর এক দীর্ঘ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত মধ্যস্বত্ত্বভোগী বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল যেমন তালুকদার, পত্তনিদার, সেপত্তনিদার ইত্যাদি। জমির মালিক অথবা পত্তনিদারদের মধ্যে প্রকৃত চাষাবাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তারা ভূমি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত আত্মস্ত করতেই মূলতঃ আগ্রহী ছিল এবং তাদের মধ্যে খুব কমই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজন করে পুনরুৎপাদনের কাজে আগ্রহী ছিল।[৩০]

ঢাকা জেলার ভূমি রাজস্ব ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) রাজস্ব বিহীন এস্টেট, (২) সরাসরি সরকার কর্তৃক পরিচালিত এস্টেট, (৩) সরকার কর্তৃক রাজস্বপ্রাপ্ত এস্টেট। রাজস্বপ্রাপ্ত এস্টেটের কিছু ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কিছু ছিল অস্থায়ী বন্দোবস্ত খাসইজারা যা সরাসরি জমিদাররা নিযুক্ত করতো। এগুলো আবার রাজস্ব আদায়েয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল যেমন শানিলাত, পাটনী, সিকিম, মিরাশ, মুকবাসী। নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান কিন্তু পরিবর্তনশীল বন্দোবস্তের ভিত্তিতে ছিল হাওলা, কিছু ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্বের ভিত্তিতে যেমন বন্দোবস্তী এবং কায়েমী। কিছু ছিল অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল যেমন ইজারা। এ সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা আবার নিজেরা ভূমি চাষের জন্য বা রাজস্ব আদায়ের সাব বন্দোবস্ত দিত। সেগুলো হচ্ছে (১) স্থায়ী , অপরির্তনশীল এবং

[২৮] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩

[২৯] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩

[৩০] বিমলকুমার সাহা, ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি অর্থনীতি প্রযুক্তি ও কাঠামোগত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১২শ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪০১, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে যেমন দার-পাটনী, দার-মিরাশ ইত্যাদি। (২) অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল যেমন দার-ইজারা।[৩১]
সৈয়দ আহমদ একটি ছক এর মাধ্যমে ঢাকা জেলার ভূমি ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন।

সারণী ৩.১

Subinfudation in the land system of Dhaka at a glance

Zamindar
]
Tenure-holders

[Hereditary and Transferable
] Hereditary but not Transferable held at a fixed rent, such as Bandobosti kayemi
] Temporary but Transferable held at a rent, liable to enhanchment such as izara

[at a fixed rent, such as samilat, patni, sikim,mirash etc.
] dar-patni. dar-mirash ect.

] at a rent,liable to enhanchment such as haula
] nimhaula

] dar-izara

Source: Syed Ahmed, Subinfeudation in the Land System of East Bengal, Pakistan Economic Journal, August 1950,(Quarterly), Vol. 2, No.1, Page 68

মহাজনদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু মাড়ওয়ারি, জমিদার ও তালুকদারেরা। ইসলাম ধর্মে সুদ ব্যবসার ওপর বিধি নিষেধ থাকায় মুসলমান মহাজনের সংখ্যা ছিল খুবই কম। Bengal Provincial Banking Enquiry Committee রিপোর্টে দেখানো হয়েছে পূর্ববাংলার জেলাগুলোতে কৃষক পরিবারগুলির মাঝে যারা মহাজনী কারবার করে তারা প্রধানতঃ হিন্দু।[৩২] খুব সাধারণভাবেই হিন্দু মহাজনরা সাধারণ প্রজা তথা মুসলমান প্রজাদের কাছে এক শোষক শ্রেণী হিসেবে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার মুসলমান প্রজাদের রাজনৈতিক মেরুকরণে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৩] ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে গ্রামীণ জমিদারদের জমিদারী ক্ষমতাহীনতার ব্যাখ্যা দিয়ে বিমল সাহা বলেন,

> "গ্রামের ভূমি দখলকারী জোতদার শ্রেণী গ্রামীণ কৃষি কাঠামোর প্রভাবসম্পন্ন দল হিসেবে পরিগণিত হত। গ্রামের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল জোতদারদের হাতের মুঠোয়। তারা গ্রামের ভূমিদখলের কাঠামোর অধীনে তাদের কার্যকরী প্রভাবকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করতো।"[৩৪]

গবেষক নির্মল চন্দ্র এ সময়কার জমিদারদের ক্রমাগত ক্ষমতা হারানোর বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> "আনুষ্ঠানিকভাবে জমিদারী প্রথা অবলুপ্তির পূর্বে একশত বছর যাবত বড় জোতদার শ্রেণী ধীরে ধীরে গ্রাম এলাকায় জমিদারদের চেয়েও প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়।[৩৫] এভাবে জোতদার শ্রেণী বৃহৎ আয়তনের ভূমির ওপর প্রাধান্য অর্জন করে।"[৩৬]

[৩১] Syed Ahmed, op-cit, Page 68
[৩২] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫
[৩৩] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫
[৩৪] বিমলকুমার সাহা, পৃষ্ঠা ৪৭
[৩৫] বিমলকুমার সাহা, পৃষ্ঠা ৪৭
[৩৬] বিমলকুমার সাহা, পৃষ্ঠা ৪৭

সারণী: ৩.২

খাজনাভোগীদের (নির্ভরশীল বাদে) ধর্মগত অবস্থান প্রতি বিভাগের খাজনাভোগীদের শতকরা হিসেব			
বিভাগ	মুসলমান	উচ্চবর্ণের হিন্দু	অন্যান্য
রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে)	৩৭.২২	২০.০৪	৪২.৭৪
ঢাকা	৩৩.৪৪	৩৮.৫০	১৮.০৬
চট্টগ্রাম	৪৯.১৩	৩০.৭৪	২০.১৩

উৎস: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার ভূমিসম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িকতা ১৯২৬-১৯৩৫, সমাজ নিরীক্ষণ, ২৬/ ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫৫
দ্রষ্টব্য: সারণীতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্তদের উচ্চবর্ণের হিন্দু হিসেবে ধরা হয়েছে।

জমিদারী প্রথা ও পরিবর্তিত আইনসমূহ

১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালে গৃহীত ভূমি আইনের ফলে কৃষকদের এক দিকে ভূমির ওপর দখলী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে ভূমিহীন হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্রমবর্ধমান হারে ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং অধিকতর কঠিন শর্তে এরা ভূমি বন্দোবস্ত নিতে বাধ্য হয় কারণ এসময় কৃষির বাইরে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করার সুযোগ বাংলায় ছিল না বললেই চলে। ভূমি বন্দোবস্তের নতুন ধরনটি হল বর্গা বা আধিয়ারী। বিভিন্ন জেলায় এই ব্যবস্থা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকরা কিছু সুবিধা ভোগ করলেও সর্বাপেক্ষা লাভবান হয় জমিদার শ্রেণী। কেননা প্রতিটি জমিদারীর অধীনেই ছিল বিপুল পরিমাণ খাস জমি। জমিদাররা বা তাদের মধ্যস্বত্বভোগী ও স্বত্বাধিকারীরা এই জমি বর্গা বন্দোবস্ত দিতে শুরু করে। সুযোগ পেলেই তারা যে কোন জমিকে খাস জমিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। সরকার ভাগ চাষীদের জন্য কিছু বন্দোবস্তের চেষ্টা করলে জমিদারদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা করে।[৩৭] জমিদারেরা তাদের খাস মহলে বর্গা কৃষক বসাবার সুযোগ পেয়ে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক আত্মসাৎ করতে পেরেছিল কিন্তু আইন কার্যকর হলে সে সুবিধারও অবসান ঘটার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে জমিদাররা তাদের খাস মহাল থেকে বর্গা কৃষকদের উচ্ছেদ করতে থাকে।[৩৮] পরীক্ষামূলকভাবে শুধু ঢাকা জেলাতে জমিদারদের খাস জমির ওপর বর্গা চাষীদের প্রজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে। ঢাকা জেলাতে ৭৭ হাজারের বেশী সংখ্যক কৃষক খাস জমির প্রজা হিসেবে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। এই ব্যবস্থাকে আইনে পরিণত করা হয় ১৯২৮ সালে। জমিদারদের অধীনস্ত রায়তরা বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলেও ১৯২৮ সালের আইনের ফলে ভূমি ব্যবস্থায় কিছু সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়। এই বিলের কারণে বিপুল সংখ্যক বর্গা কৃষক কার্যত জমির মালিকে পরিণত হল। আর ব্যাপক ভাবে আঘাত এল জমিদার শ্রেণীর ওপর।[৩৯] এই বিলের ফলে জমিদার শ্রেণী যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা অনস্বীকার্য।[৪০]

১৯২৮ সালের ভূমি আইনের ফলে ব্যাপক সংখ্যক কৃষকের জমির ওপর প্রজাধিকার জন্মে। এই ব্যবস্থা কৃষক সমাজের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে হয় যখন বঙ্গভঙ্গকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক চলছিল। ভূমি আইনের এই সামান্যতম পরিবর্তনই ঢাকার ব্যাপক কৃষক সমাজের মাঝে বঙ্গভঙ্গ আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিফলিত হয়।[৪১]

জমির ওপর স্বত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর খুব সহজে জমি বন্ধক রেখে ঋণ পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। উৎস ছিল অবাঙ্গালী মাড়ওয়াড়ী সম্প্রদায়। তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল মহাজনী কারবার। এই পেশাজীবী মহাজনদের সংখ্যা ছিল ঢাকা জেলায় সর্বাধিক এবং তা প্রতি লক্ষে ২৮০ জন।[৪২] এছাড়া জমিদার, তালুকদার, জোতদার, ধনীকৃষক, উকিল মোক্তার, ব্যবসায়ী প্রায় সকল পেশার লোক মহাজনী কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১৯ টাকা থেকে ৩৭ টাকা পর্যন্ত এবং তা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেত। ১৯৩০-৪২ সালের

৩৭ লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮
৩৮ লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০
৩৯ লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০
৪০ লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০
৪১ লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮
৪২ লেনিন আজাদ ও আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বিপুল পরিমাণ জমি হস্তান্তর হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারী প্রথা একসময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর লাভজনক থাকে না।

ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ১,৫৩,২০০। এর মধ্যে ১,০২,০৩১ টি জমিদারী রাজস্ব দিত, বাকী ৫১,১৬৯ জমিদারী বা এস্টেট ছিল নিস্কর। সকল জমিদারী বেসরকারী মালিকানায় ছিল না। কয়েকটি ছিল সরকারী মালিকানায়। এগুলি খাসমহাল নামে পরিচিত ছিল।[৪৩] কমিশন ভূমি ব্যবস্থাপনায় কিছু আইন পরিবর্তনের সুপারিশ করে।[৪৪]

১. কমিশন জমিদারী ও সকল প্রকার মধ্যস্বত্ত্ব প্রথা বিলুপ্ত করার এবং রায়তকে সরাসরি সরকারের অধীনে আনয়ন করার প্রস্তাব করে।
২. জমিদারী ও মধ্যস্বত্বসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। ক্ষতিপূরণের হার হবে বর্তমান খাজনার দশগুণ এবং দেবোত্তর ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির বেলায় পচিঁশ গুণ। খাজনার অর্ধেক খাজনাভোগীদের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।
৩. সকল শ্রেণীর জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী এবং বর্গাদারী স্বত্বে বিলি করা জমির রায়ত খাজনাভোগী করতে হবে।
৪. সমস্ত বর্গাদার সরাসরি সরকারের প্রজা বলে গণ্য হবে। বর্গাদাররা দখলী রায়তের সমস্ত অধিকার পাবে না। বর্গাদারদের জমির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাজনা ধার্য করা যাবে।
৫. ভবিষ্যতে জমি যাতে রায়তের হাতে না যায় সেদিকে সরকার লক্ষ্য রাখবেন।
৬. দুটো কারণে সরকার খাজনা কমাবেন যদি বর্তমান খাজনা প্রচলিত খাজনার হারের চেয়ে বেশী হয় এবং জিনিসের দাম কমে যায়।
৭. সরকার খাসমহালগুলি অধিগ্রহণ করবেন।
৮. ফসল জামিন রেখে কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলি কৃষককে কৃষিঋণ দেবে।এজন্য জমি বন্ধক রাখার দরকার নেই।
৯. কমিশন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত আইনগুলি নথিবদ্ধ করার এবং প্রতি ত্রিশ বছরে ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্বের নতুন মূল্যায়ন ও বন্দোবস্ত করার জন্য সুপারিশ করে।[৪৫]

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর এর একটি প্রদেশ পূর্ববাংলার ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব পড়ে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের ওপর। ফলে এ সময় পূর্ববাংলা সরকার ভূমি সংক্রান্ত আইন বিশেষ করে জমিদারী উচ্ছেদের বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
এর পূর্বে যতগুলি গণকল্যাণকর কাজ আইন সভায় উত্থাপিত হয় তার সবগুলিকেই হিন্দু মেম্বাররা একযোগে বাধা দিলেন।[৪৬] জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে কংগ্রেস সহযোগিতা করেনি। এর কারণ পাওয়া যায় ফ্লাউড কমিশনের তদন্তের সময় কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বড় বড় হিন্দু নেতারা বলেন যে জমিদারী প্রথার উপর বাংলার কৃষি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। এ প্রথা উঠিয়ে দিলে সে কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং মধ্যবিত্ত শেণীর সামাজিক জীবন বিপন্ন হবে।[৪৭] জমিদারী প্রথা উঠলে মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে হিন্দু

[৪৩] হাফিজুর রহমান ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩
[৪৪] ১৯৩৮ সালে এ দেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সরকার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে প্রধান করে দি ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করা হয়। দুই বছর ভূমি ব্যবস্থার উপর ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ১৯৪০ সালে রিপোর্ট পেশ করে।
[৪৫] হাফিজুর রহমান ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩
[৪৬] বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ৪০
[৪৭] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

চাষীকূলেরও মুক্তি আসবে। এটা ঠিক হিন্দু সমাজের যে স্তর রাজনীতিতে নেতৃত্ব করেন তারা চাষী হিন্দুদের কেউ নন, এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্ণহিন্দু মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই তারা এর বিরোধিতা করেন।[৪৮]

১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেন তা পরবর্তী সাত বছরে বিভিন্ন কারণে যেমন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে জটিল তিক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ভারত ছাড় আন্দোলন এবং এ ধরনের অন্যান্য ঘটনার জন্য এ রিপোর্ট কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা জেলার ভূমিব্যবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় স্বতন্ত্র। বিভিন্ন সময়ের সংস্কার কার্যক্রমেও ঢাকা জেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঢাকা জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা ছিল অন্য সকল জেলা থেকে ভিন্ন। ঢাকা জেলার ভূমির বড় অংশ ছিল দুটি বড় জমিদারী এলাকায় এগুলো হচ্ছে, ঢাকার নওয়াব এস্টেট ও ভাওয়াল এস্টেট। ঢাকার নওয়াব এস্টেট পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কেন্দ্র ছিল ঢাকা শহরেই। কিন্তু ঢাকা শহর ও ঢাকা শহরের আশে পাশের প্রায় সকল জমির মালিক ছিলেন ভাওয়াল রাজা। ঢাকার নওয়াব এস্টেট ও ভাওয়াল এস্টেট ১৯০১ ও ১৯০৪ সালে সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর অধীনে চলে যায়। ফলে সে সময় থেকেই ঢাকা জেলার ভূমির অধিকাংশই পরিচালিত হত সরকারী বন্দোবস্তে।

ভাওয়ালের রাজা জমিদারীর কেন্দ্র জয়দেবপুরে বসবাস করতেন। ভাওয়াল রাজা বাংলার অন্যান্য জমিদারদের মত কোন মধ্যস্বত্ত্ব সৃষ্টি করেন নি। জমিদারী কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর দুই পুত্র অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করলে উত্তরাধীকারী সংকটের সৃষ্টি হয়। মেজ পুত্র দার্জিলিং এ মারা যাওয়ার দীর্ঘ বার বৎসর পর ঢাকায় ফিরে এসে নিজেকে মেজ কুমার হিসেবে দাবী করেন। ১৯৩৫ সালে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা হলে জমিদারের উত্তরাধীকারী বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে এবং জমিদারী সংক্রান্ত বহু মামলা অমিমাংসিত থেকে যায় ফলে এ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের অধীনেই থাকে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলে অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলের ভূমির সকল কর্মকাণ্ড সরকারী ভূমি সংস্কার বোর্ড পরিচালনা করে।[৪৯]

প্রজা সমিতি ও কংগ্রেস এর ভূমিকা

মুসলমানদের নিজস্ব আন্দোলন বলতে ছিল একমাত্র প্রজা আন্দোলন। এ আন্দোলন গোড়ায় ছিল মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদার দাবী। শুধু হিন্দু জমিদাররাই মুসলমান প্রজাদেরকে অবজ্ঞা করতেন এবং তাদের কাছারি বা বৈঠকখানায় এদের বসবার আসন দিতে অস্বীকার করতেন। তাদের দেখাদেখি তাদের আমলা ফয়লা আত্মীয় স্বজন, ঠাকুর- পুরোহিত, তাদের উকিল- ডাক্তাররাও মুসলমানদের তাদের প্রজা ও সামাজিক মর্যাদায় নিম্নস্তরের লোক মনে করতেন। এটা জমিদার প্রজার স্বাভাবিক সাধারণ সম্পর্ক ছিল না, ছিল হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক। কারণ একদিকে বামুন কায়েতরা কাছারি বৈঠকখানায় বসতে পেত। অন্যদিকে বর্ণ হিন্দুর কাছে নিগৃহীত হয়েও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তালুকদার বা ধনী মহাজনরাও মুসলমানদের সাথে বর্ণহিন্দুর মতই ব্যবহার করত।[৫০]

১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনীর বিতর্কের সময় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে আইনসভা মোটামুটিভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ হিন্দু সদস্য জমিদার পক্ষে এবং অধিকাংশ মুসলমান সদস্যরা প্রজার পক্ষে ভোট দেন।[৫১] প্রজাস্বত্বের সাথে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ার কারণ বাংলাদেশের শ্রেণী বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র- জমিদার ও কৃষক, মহাজন ও খাতক। আর জমিদার মহাজনদের অধিকাংশই হিন্দু এবং

[৪৮] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১
[৪৯] বাংলা পিডিয়া, সপ্তম খন্ড, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭
[৫০] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, (২০০৬), পৃষ্ঠা ১২৬
[৫১] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯

কৃষক খাতকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।[৫২] কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্বে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি। কৃষক সভা কৃষকদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। কৃষক সভার আন্দোলনের অঞ্চল সমূহ প্রধানতঃ নিম্নবর্ণ হিন্দু ও বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিস্বত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আন্দোলনগুলি এই সীমিত পরিসরের মাঝে এত গণচরিত্র ও জঙ্গিরূপ লাভ করে যে তা কোথাও কোথাও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেয়।[৫৩]

জমিদারদের অধীনস্ত রায়তরা বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলেও ১৯২৮ সালের আইনের ফলে ভূমি ব্যবস্থায় কিছু সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়। এই বিলের কারণে বিপুল সংখ্যক বর্গা কৃষক কার্যত জমির মালিকে পরিণত হল। আর ব্যাপক ভাবে আঘাত এল জমিদার শ্রেণীর ওপর।[৫৪] এই বিলের ফলে জমিদার শ্রেণী যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা অনস্বীকার্য।[৫৫] ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে দল নির্বিশেষে সব হিন্দু সদস্য জমিদার পক্ষে আর মুসলমান সদস্য প্রজার পক্ষে ভোট প্রদান করে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আইনসভা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।[৫৬]

বাংলা প্রজাস্বত্ত্ব আইনের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব বাংলা আইন পরিষদে উত্থাপিত হলে অত্যন্ত সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে যে আতাঁত গড়ে ওঠে তা অনেকের কাছেই প্রদেশের সংগঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কের সঠিক প্রতিফলন বলে মনে হয়েছে।[৫৭] বাংলার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক মেরুকরণে ১৯২৮ সালের ভূমি আইনের প্রভাব সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> "সংগঠিত রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভক্তির মৌলিক কাঠামোগত ভিত্তি এবং ১৯২৮ সনের ভূমি আইন বিতর্কের অভিজ্ঞতা যা নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পায়, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার নূতন মুসলমান নেতৃত্বের মাঝে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে।--- এখানেই নিহিত আছে শিক্ষা, পেশা অথবা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সাম্প্রদায়িক দাবীর বীজ।[৫৮]

১৯২৯ সালে স্বরাজ দল ও কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ দল ত্যাগ করে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন। সকল মুসলমান নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে যোগদান করে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও জমির ওপর কৃষকের পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণ প্রজা সমিতিতে যোগদান করতে থাকে।[৫৯] সারা বাংলায় ব্যাপকতর প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে আর এই প্রজা আন্দোলনের বিরোধিতা করে কংগ্রেস মুসলমান প্রজাদের আস্থা হারায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী জমিদারী প্রথার বিরোধিতা করে। হিন্দু বিরোধিতা আর জমিদার বিরোধিতার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।[৬০] সমগ্র বাংলার হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই ভাগ হতে থাকে। ত্রিশের দশকে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন সচেতন হয়ে ওঠে। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন পরিচালিত হত কলকাতা কেন্দ্রীক জমিদার ও অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ধীরে ধীরে বাংলার রাজনীতি নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের হাতে আসতে থাকে এবং জমিদার বিত্তশালীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিথিল হতে থাকে।[৬১] ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা সমিতির পক্ষ থেকে চৌদ্দ দফা দাবী সম্বলিত 'প্রজা সমিতির চৌদ্দ দফা' নামে মেনিফেস্টো প্রকাশ করা হয়। সেই মেনিফেস্টোতে বিনা ক্ষতিপূরণে

---

[৫২] আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (২০০৬), পৃষ্ঠা ৪৫
[৫৩] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৯
[৫৪] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০
[৫৫] বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন ও অর্থনৈতিক পটভূমি, পৃষ্ঠা ৮০
[৫৬] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩
[৫৭] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩,
[৫৮] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪,
[৫৯] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫
[৬০] আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬
[৬১] হাফিজুর রহমান ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নযর-সেলামী রহিতকরণ, খাজনা ঋণ মওকুফ, মহাজনী আইন প্রণয়ন, সালিশী বোর্ড গঠন, হাজা-মজা নদী সংস্কার, প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করণ, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন, শাসন ব্যয় হ্রাসকরণ, মন্ত্রী বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ, ও রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দাবী প্রভৃতি দাবী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই মেনিফেস্টো 'কৃষক প্রজার চৌদ্দ দফা' নামে পরিচিত হয়।[৬২] ১৯৩৯ সালে বাংলার অসহায় মহাজনী ঋণগ্রস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে প্রতিষ্ঠিত হয় ঋণ সালিশী বোর্ড। জমির ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা আর সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই পূর্ববাংলার মুসলমান কৃষকদেরকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীর পেছনে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করে। পরবর্তীতে প্রজা সমিতির জায়গা দখল করে মুসলিম লীগ খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক নামে ও দাবীতে।[৬৩]

কংগ্রেস কার্যতঃ প্রজা আন্দোলনের বিরোধী ছিল। ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন পাশের সময় কংগ্রেসের সদস্যরা একযোগে বিরোধীতা করেছিল সেটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। কংগ্রেস নেতারা প্রজা আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রাম বলতেন। তারা প্রচার করতেন যে, শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে আত্মকলহ ও বিভেদ সৃষ্টি করলে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যহত হবে।[৬৪] কংগ্রেসীরা শুধুমাত্র প্রজা আন্দোলনে সমর্থন দিলেন না তাই নয়। তারা কৌশলে এর বিরুদ্ধতা করে কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী দিয়ে তারা একটি কৃষক সমিতি খাড়া করলেন। সে সমিতির পক্ষ হতে প্রচার চলল যে প্রজা আন্দোলন আসলে জোতদারদের আন্দোলন। ঐ আন্দোলনে কৃষকদের কোন লাভ হবে না বরঞ্চ কৃষকদের দুর্দশা আরও বাড়বে। জোতদারদের শক্তি ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে। প্রমাণ হিসেবে তারা বর্গাদারদের দখলী স্বত্তের কথা তোলে। কংগ্রেসের সাথে প্রজা সমিতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাঁধে।[৬৫] পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ, যাদের অধিকাংশই ছিলেন স্বরাজ পার্টির সদস্য তারা জমিদারদের পক্ষে ছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় পরিষদ সদস্যদের ভূমিকার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

> "বাংলার সংগঠিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাঠামোগত সহজ ব্যাখ্যা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়ঃ কংগ্রেসের ছত্র ছায়ায় রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত প্রভাবশালী উচ্চবংশের হিন্দু ভদ্রলোক জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী লগ্নীকারীদের স্বার্থ ও সুযোগ সংরক্ষণ ও অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করছেন, অপরপক্ষে মুসলমান প্রজাদের সমর্থনপুষ্ট পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার মুসলমান নেতারা রায়তের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করছেন এবং কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।"[৬৬]

পূর্ববাংলার কৃষক আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র জমিদারদের বেশীরভাগ হিন্দু এবং সংখ্যাগুরু প্রজা মুসলমান বলেই যে হিন্দু বিরোধী হয়ে উঠেছে তা নয়। প্রকৃত সত্য ছিল এই যে মুসলমান খাজনাভোগীরা, তাদের অবস্থান যেখানেই হোকনা কেন, কৃষক সম্প্রদায়ের অংশ বলেই বিবেচিত হতেন।[৬৭]

কৃষক আন্দোলনকে যে অনেকে কৃষক বিরোধী জোতদার আন্দোলন বলতেন তা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। ১৯৩৩ সালে বাংলা সরকারের প্রচারিত এক প্রশ্নাবলীর উত্তরে ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির কার্যকরী কমিটির সভায় উপস্থিত বত্রিশজন সদস্যর মতে মাত্র তিন জন বর্গাদারকে দখলীস্বত্ত্ব দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। অন্যান্যেরা তীব্র ও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করেছিলেন।[৬৮]

---

[৬২] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৮৬
[৬৩] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১২৭ (২০০৬)
[৬৪] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫২
[৬৫] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩। কংগ্রেসের এই ভূমিকার জন্য কংগ্রেস নেতা আবুল মনসুর আহমদ কংগ্রেস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।
[৬৬] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪,
[৬৭] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫,
[৬৮] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭

রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, পলিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেও এ অঞ্চলের জোতদারদের প্রায় ৭০/৮০ ভাগই মুসলমান হওয়ায় অনেকেই এ আন্দোলনকে সুনজরে দেখতেন না। এমনকি এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন একজন মুসলমান- হাজী দানেশ।[৬৯]

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে কৃষক প্রজা সমিতির সম্মেলন হয় সিরাজগঞ্জে। এই সম্মিলনীতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে সব প্রস্তাবের মধ্যে জমিদারী উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নজর সেলামী বাতিল, জমিদারদের প্রিয়েমশনাধিকার রদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ, চক্রবৃদ্ধি সুদ বে-আইনি ঘোষণা, ইত্যাদি কৃষক-খাতকদের স্বার্থের দাবীসমূহ ছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী গৃহীত হয় তা হচ্ছে কৃষি খাতকদের ঋণ আদায়ের ওপর মরেটেরিয়ম প্রদান। এর ওপর ভিত্তি করেই ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাশ হয়েছিল এবং ১৯৩৭ সালে ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপিত হয়।[৭০]

হক মন্ত্রীসভার দ্বারা সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাংলার কৃষক খাতকের অর্থনৈতিক জীবনে একটা আর্থিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। কৃষক প্রজা সমিতির মূল দাবীগুলি আস্তে আস্তে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হতে থাকে। প্রজাস্বত্ত্ব আইন ও মহাজনী আইন পাশ হওয়ার এবং সালিশী বোর্ড স্থাপনের পর প্রজা সমিতির ‘বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ’ এর দাবীর বিপুলতা অনেকখানি হ্রাস পায়।[৭১] মুসলিম লীগকে মুসলমান জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ রূপে জমিদারী উচ্ছেদকে মুসলিম লীগের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ এর দাবী প্রাদেশিক কাউন্সিলে তোলা হলে বড় বড় কতিপয় নেতার প্রবল বিরুদ্ধতার ফলে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।[৭২] মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশেরও ছিল অবহেলার মনোভাব। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে অবহেলার মনোভাব সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের পূর্বে বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় মুসলিম লীগকে বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দান ও প্রস্তাব পাশ করতে হয়। তবে এই প্রস্তাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া না দেয়া সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না।

মুসলিম লীগ এর প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে ছিলেন না। বাংলাদেশে কংগ্রেমের কর্মসূচীর মধ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা কোনদিনই স্থান পায়নি। তাদের মধ্যে যারা বামপন্থী নামে বিখ্যাত তারা কোনদিন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কোনরকম প্রস্তাব আনেনি।[৭৩] হিন্দু কৃষকদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু নেই। ফলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে তাদের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক।[৭৪] মুসলিম লীগও প্রধানতঃ সামন্ত বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান হলেও কৃষকদের সমর্থনই ছিল তার রাজনৈতিক স্বার্থের মূল ভিত্তি। তাই নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের সাথে কৃষকদের স্বার্থের একটা আপাত সমন্বয় সাধনই ছিল বাংলাদেশ মুসলিম লীগ রাজনীতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।[৭৫]

ব্যবস্থাপক পরিষদে বিল উত্থাপন ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী পূর্ববাংলা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপন করেন। এটি ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল অবিভক্ত বঙ্গীয় বিধান পরিষদে পেশকৃত বিলের প্রায় অনুরূপ তবে কিছু কিছু ধারার পার্থক্য রয়েছে।
১৯৪৭ সালের বর্গাদার ও প্রজাস্বত্ব বিল থেকে এই বিলের পার্থক্য হচ্ছে,
ক) নতুন বিলে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ রাখা হয় দুইশত বিঘা, যা পূর্বে ছিল একশত বিঘা

[৬৯] এম আর আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫
[৭০] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, (২০০৬), পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫
[৭১] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, (২০০৬) পৃষ্ঠা ১৪৭
[৭২] আবুল মনসুর আহমেদ, প্রাগুক্ত, (২০০৬)পৃষ্ঠা ১৮৮-১৮৯
[৭৩] বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন ও অর্থনৈতিক পটভূমি, পৃষ্ঠা ১০৭
[৭৪] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৭
[৭৫] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭

খ) পূর্বেকার বিলে ভাগ চাষীর উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ ভাগ পাবার ও জমির ওপর অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই বিলে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।[৭৬]

ক্ষতিপূরণ বিষয়ে নেতৃবৃন্দ

মুসলিম লীগ সরকারের 'পূর্ববাংলা জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' পাশের চেষ্টাকে কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে কতগুলি জমিদারী নিয়ে নেয়ার যে প্রস্তাব হয় সে বিষয়ে শীতাংশুকুমার আচার্য বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ বড় জমিদাররা হিন্দু হওয়ার ফলে তা প্রস্তাবিত বিলটি একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে। আমাদের সন্দেহ হয় যে, প্রথম দফা বলিদানের পর উচ্ছেদের পরবর্তী পরিকল্পনাকে সরকার আর স্পর্শ না করে তাকে ঠাণ্ডা গুদামঘরে ফেলে রাখবেন।"[৭৭]
মনোরঞ্জন ধর দেশত্যাগী জমিদারদের জন্যও ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে বলেন, "যে সমস্ত জমিদার পূর্ববাংলা থেকে চলে যাচ্ছেন তারাও রাষ্ট্রের নাগরিক এবং তারাও নিজেদের আয়ের একটা ব্যবস্থা দাবী করতে পারেন।"[৭৮]
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বেশীরভাগ সদস্যই যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী উচ্ছেদের দাবী জানান। অনেক সদস্য জমিদারী প্রথা বজায় রাখার পক্ষেও মত জানান। অবলাকান্ত গুপ্ত বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এ Reactionary, প্রতিক্রিয়াশীল, corrupted এবং জনসাধারণের আস্থাহীন গভর্নমেন্টের হাতে আর অধিক ক্ষমতা দিতে কিছুতেই রাজী নই।"[৭৯]

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা না দেয়ার কথা বলে এবং গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা কংগ্রেসের মধ্যে জমিদারী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য কিভাবে সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালিয়েছিল অবলাকান্ত গুপ্তর বক্তব্য তারই একটি উদাহরণ।[৮০]
জমিদার উচ্ছেদ বিলটি যে সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে তোফাজ্জল আলী বলেন, "দশ বার বছর ধরে এ ব্যাপারে নানান চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। ফ্লাউড কমিশনের মত কমিশন বসানো হয়েছে, এর জন্য অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা ১৯৪৭ এর ৭ ই এপ্রিল একটি বিল পূর্বেই তৎকালীন বাংলার নিম্ন পরিষদে পেশ করেছিলেন।"[৮১]

তিনি ঢাকা জেলার একটি বড় স্টেটের জমিদার খাজা নাজিমুদ্দীনের পরিবারের কথা উল্লেখ করে বলেন যে এই আইনের দ্বারা পূর্ববাংলার একটি মহা পরাক্রমশালী মুসলমান পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[৮২]

জমিদারী অধিগ্রহণ ও ভূমি আইন কার্যক্রম

১৯৫১ সালের ১৬ মে হতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে যে সমস্ত জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর অধীনস্ত সেগুলো অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে নিয়মিত স্বত্বলিপি প্রণয়ন, খাজনার তালিকা, ক্ষতিপূরণের তালিকা, প্রস্তুতের পর অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট জমিদারী সমূহ পর্যায়ক্রমে অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩ (১) ধারা মোতাবেক সমস্ত বড় বড় জমিদারীগুলি এবং

[৭৬] বঙ্গীয় বিধান সভা পরিষদ, ২১ এপ্রিল ১৯৪৭, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ ৭ এপ্রিল ১৯৪৮
[৭৭] পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ভলিউম- ৪, নং ১, ১৯৪৯-৫০, পৃষ্ঠা ৫৮
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩
[৭৯] পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ভলিউম- ৪, নং ১, পৃষ্ঠা ১২৭
[৮০] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৩
[৮১] পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ভলিউম- ৪, নং-১, ১৯৪৯-৫০, পৃষ্ঠা ৮৭
[৮২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

২০ ধারা মোতাবেক ব্যক্তি মালিকানাধীন রাখা যায়না এমন সব জমি নোটিশে উল্লেখিত তারিখ হতে সরকার অর্জন করে। ১৯৫২ সালের মধ্যে প্রথমে বড় বড় জমিদারি সরকারী দখলে আনয়ন করা হয়। রংপুর, দিনাজপুরে অবস্থিত কোঁচবিহারের মহারাজার চাকলাজুত এস্টেট সর্বপ্রথম অধিগ্রহণ করা হয়। ডাইরেক্টরস অব ল্যান্ড রেকর্ডস এর সার্ভের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে ৪টি আঞ্চলিক বন্দোবস্ত কার্যক্রম শুরু করা হয়। ছোট ছোট জমিদারী ও অপরাপর যে মধ্যস্বত্ব ছিল সেগুলি জরিপের পর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করে বাংলা ১৩৬৩ সালে ১ বৈশাখ হতে সরকার অর্জন করে।[৮৩] জমিদারী সমূহের অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সময়ে ছোট বড় ৪৪৩টি জমিদারি সরকারী দখলে আনয়ন করা হয়। তবে এ সমস্ত জমিদারীর অধীনস্ত খাজনা গ্রহীতা (তালুক) পূর্বাবস্থায়ই রয়ে যায়।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ হেরে যায় এবং যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করে। ১৯৫৫ সালের শেষভাগে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী অবশিষ্ট সকল জমিদারী, তালুকদারি ও খাস জমি একই সাথে অধিগ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এ কার্যক্রমের জন্য অধিগ্রহণ আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই আইনের ফলে জমিদারী প্রথার অবসান হলো, রাইয়তরা জমির মালিক হলো, একটি পরিবার একশত বিঘা আবাদী জমি বা পরিবারের সদস্য প্রতি ১০ বিঘা আবাদী জমি হিসাবে যেটা অধিকতর হয় তৎসঙ্গে বসত বাটির জন্য ১০ বিঘা জমি রাখতে পারবে। চা, কফি, ইক্ষু, রাবার চাষ, কাশিযার পাতা চাষ, ফলের বাগান, শক্তিচালিত যান্ত্রিক আবাদের জন্য, বড় খামার, গো দুগ্ধ খামারের বেলায় এই আইন শিথিল করা হবে, ওয়াক্ফ লিল্লাহ বা দেবোত্তর সম্পত্তি এই আইনের আওতায় আসবে না।[৮৪]

১৯৫০ সালের পূর্ববাংলায় জমিদারী স্বত্ব বিলোপ করে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি মালিকানার উচ্চতর শিলিং নির্ধারন করলেও মুসলিম লীগ সরকার এই শিলিং বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কারণ মুসলিম লীগ জোতদার শ্রেণীর সংগঠন ছিল।[৮৫] যুক্তফ্রন্ট এর অনেক নেতা জোতদার শ্রেণীর ছিলেন। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় কোন শিলিং নির্ধারণ করা না হলেও ২১ দফায় ঘোষণা করা হয় যে, বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।"[৮৬]

জমিদারী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মামলা

জমিদারগণ এই আইনের বিরুদ্ধে মামলা করে, মামলা দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত চলে, এই সময়ের মধ্যে জমিদারগণ অতিরিক্ত জমি বেনামী সংরক্ষণ, স্বত্ব পরিবর্তন, পরিবারের সংখ্যা পরিবর্তন করে প্রচুর জমি নিজেদের দখলে রাখে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর প্রায় ৩১ কোটি টাকা সরকারকে খেসারত দিতে হয়।"[৮৭] ১৯৫১ সালের জমিদারী দখল আইনটি ক্ষমতা বহির্ভূত, বেআইনি ও অচল বলে ঘোষণা করার জন্য এবং উক্ত আইন প্রয়োগ করতে প্রাদেশিক সরকারকে বিরত রাখার জন্য ইনজাংশন প্রার্থনা করে মামলা দায়ের করা হয় 'ঠাকুর রাজ এস্টেট' এর পক্ষ থেকে। সরকারের বিরুদ্ধে এ মামলার শুনানীর জন্য কোর্টে উঠে ১৯৫১ সালের ২৬ নভেম্বর। এ এস্টেটের সম্পত্তি ঢাকা, বাখেরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জমিদারীর মোকদ্দমার দাবী ছিল ১০ লক্ষ টাকা। এ এস্টেটটি ১৯৫১ সালের ১৭ ডিসেম্বর সরকার কর্তৃক দখল নেওয়ার জন্য নোটিশ দেয়া হয়েছিল।[৮৮]

[৮৩] এম ইরতাজ আলম, বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসন আইন, দোয়েল মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১২-১৩
[৮৪] গাজী সালেহ উদ্দীন, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র পত্রিকা, ৪৪/ ১৯৯২ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, পৃষ্ঠা ৫২
[৮৫] মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস- ১৯৪৭-৭১, পৃষ্ঠা ১১৭
[৮৬] মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫
[৮৭] গাজী সালেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫২,
[৮৮] দৈনিক আজাদ, ২৭ নভেম্বর ১৯৫১

ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান

প্রজাস্বত্ব ও জমিদারী উচ্ছেদ আইনে ৩৩-৩৭ ধারায় ক্ষতিপূরণ এর হার নির্ধারণ ও প্রদান এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ প্রদান করে প্রজাস্বত্ব ও জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান এর ক্ষেত্র তালিকা প্রস্তুত ও ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করা হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদান এর ক্ষেত্র নির্ধারণে জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য খাজনা গ্রহীতাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রত্যেকের ব্যাপারে আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। ৩৭ নং ধারায় বলা হয়,

১. "মিতক্ষরা আইনের আওতায় হিন্দু অবিভক্ত যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে সকল খাজনা গ্রহীতাকে একক ধরে ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

২. অনুর্ধ পাচঁশত টাকা আয়ের যৌথ স্বত্বাধিকারী খাজনা গ্রহীতাগণের একই তালিকায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়।

৩. অধীনস্ত প্রজাগণ কর্তৃক বাৎসরিক ভিত্তিতে একজন খাজনা গ্রহীতাকে যে পরিমান খাজনা এবং কর দেয়া হত এর সমষ্টিকেই খাজনা গ্রহীতার মোট সম্পত্তি গণ্য করা হয়। খাজনা গ্রহীতার নিজস্ব রক্ষণীয় সম্পত্তির খাজনাও এর অর্ন্তভুক্ত থাকে।

৪. খাজনা গ্রহীতার প্রকৃত আয় নির্ধারণ করে তার মোট বাৎসরিক আয় হতে যে সকল বাৎসরিক দেনা বাদ দেয়া হয় তা হচ্ছে সরকারকে প্রদত্ত খাজনা এবং কর, কৃষি আয়কর, আয়কর, সেচ বা বাধঁ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ, মোট সম্পত্তির ২০% খাজনা আদায় খরচ।

উপর্যুক্ত মতে নির্ধারিত প্রকৃত আয়ের উপর ভিত্তি করে নিম্লোক্ত তলিকা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়।

সারণী: ৩.৩

ক. অনুর্ধ	৫০০/	টাকা আয়	প্রকৃত	আয়ের		১০	গুন
খ. "	২,০০০/	"	"	"	"	৮	"
গ. "	৫,০০০/	"	"	"	"	৭	"
ঘ. "	১০,০০০/	"	"	"	"	৫	"
ঙ. "	৫০,০০০/	"	"	"	"	৪	"
চ. "	১,০০,০০০/	"	"	"	"	৩	"
ছ. "	১০,০০০০০/	টাকার উর্ধে	"	"		২	"

সূত্র: হাফিজুর রহমান ভূঞা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব, ১৮৫৪-১৯৬০, পিএইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (অপ্রকাশিত), পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯

জমিদারদের জমির স্বত্বলিপি মৌজাভিত্তিক প্রস্তুত করা হলেও প্রতি জমিদারির জন্য একটি ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

৫. জমিদার বা তালুকদারদের সিলিং বর্হিভূত সম্পত্তি বা অরক্ষণীয় খাস সম্পত্তিরও খাস তালিকা প্রণয়ন করে এ ধরনের সম্পত্তি হতে বাৎসরিক প্রকৃত আয় নির্ধারণ করে উক্ত আয়ের ৫ গুণ অর্থ ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। যে সমস্ত সম্পত্তির কোন আয় নেই সেগুলোর একর প্রতি ১০ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। হাট বাজার তহসিল কাছারি ইত্যাদিরও ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।

৬. ধর্মীয় ও দাতব্য ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ চিরস্থায়ী বাৎসরিক বৃত্তি হিসাবে ১০ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাৎসরিক গড় খরচ বের করা হয়। নির্ধারিত এ খরচই বার্ষিক বৃত্তি বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে মঞ্জুর করা হয়। ট্রাস্টি সম্পত্তি উক্ত খরচ নির্বাহে সমর্থ না হলে সম্পত্তির বার্ষিক আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হত। অপরদিকে ট্রাস্টি সম্পত্তির আয় নির্ধারিত বৃত্তি হতে বেশী হলে অতিরিক্ত আয়ের ওপর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। ট্রাস্টকে সম আয়ের খাস জমি বরাদ্দ করেই মেটানো হত। এভাবে প্রতিটি ধর্মীয় ট্রাস্ট যেমন ওয়াক্ফ, দেবোত্তর, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত বৃত্তি তালিকা সংশ্লিষ্ঠ জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৮৯]

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া হল

[৮৯] হাফিজুর রহমান ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯

সারণী: ৩.৪

১৯৫২-৫৯ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ

সাল	প্রদত্ত টাকার পরিমান টাকা	আনা	পয়সা
১৯৫২-৫৩	৮০,২৭৫	০	০
১৯৫৩-৫৪	৮৯,২৯৯	১৫	৬
১৯৫৪-৫৫	৮০,৭০৫	১৪	৬
১৯৫৫-৫৬	৫৬,৯৯৯	১০	১০
১৯৫৬-৫৭	৮২,৬৯৫	৮	০
১৯৫৮-৫৮	১৬,২২২	৪	৮
১৯৫৮-৫৯	৩৫,৫৫৭	৪	১
মোট ক্ষতিপূরণ	৪,৪১,৭৪৯	৯	৭

সূত্র- Report of the Land Revenue Commission Revenue Department, Government of East Pakistan, July 1959

পূর্ববাংলার জমিদারী অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় ৩৬,৩৪,০১,১১১ টাকা। তার মধ্যে পূর্ববাংলা নিবাসী জমিদারদের জন্য ২৬,৪০,৭৭,২২৬ টাকা এবং অনিবাসী জমিদারদের জন্য ৯,৯৩,২৩,৮৮৫ টাকা। পূর্ববাংলায় জমিদারদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য ৩৫ লক্ষ তালিকা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে Resident খাজনা ভোগকারীদের ৫ বৎসর মেয়াদে নগদে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৯০] অনিবাসী মালিকদের 'Non Negotiable Bond' বার্ষিক কিস্তিতে ৪০ বছর মেয়াদে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। বছরে ৩% হারে সুদ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়।[৯১] [ধারা ৫৮(২)]

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাবেক মধ্যস্বত্ত্বভোগীগণ যাতে তাদের ক্ষতিপূরণের অর্থ কোন লাভজনক কাজ খাটাতে পারেন সে উদ্দেশ্যে আইনের ৫৮ ধারা মোতবেক চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ এককালীন নগদ অর্থে প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা আইন সাপেক্ষে পাকিস্তানের বাইরে বসবাসকারী সাবেক মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের আইনের ৫৮ ধারা মোতবেক নগদ ও বন্ডের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার ২৩১ টাকা নগদে ও ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা স্টেট ব্যাংকের হস্তান্তর অযোগ্য বন্ডের পরিশোধ করা হয়।[৯২] ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় বিভিন্ন থানায় যে পরিমান ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তা নিম্নের ৩.৫নং সারণীতে দেয়া হল।

সারণী-৩.৫

জমিদারদের সংখ্যা ও সাল ভিত্তিক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমান

নং	থানার নাম	১৯৬৩	১৯৬৩	১৯৬৪		১৯৬৫	
		সংখ্যা	প্রদত্ত টাকা	সংখ্যা	প্রদত্ত টাকা	সংখ্যা	প্রদত্ত টাকা
১.	মুন্সিগঞ্জ	৪৯৮	১৫,০৬৪.৩৪	২২	২৬৭৬৫.১৬	১১	৯,৭৯৬,৯৫
২.	টঙ্গীবাড়ি	৩৫৮	১০,১১৬.৪০	৭১	৩৬,৬১৯.৮৭	৬৪৮	৪৪,০৪৯.৮৮
৩.	লৌহজং	৪৮১	২২,৪৯৫.৮০	২৭	১৩,৮২৭.৮৭	৬০০	৪৯,২৬৩.৫৭
৪.	শ্রীনগর	৬০৯	১২,৮১০.৮৫	৩,৩১১	২,১৯,৭৮৯.১৬	৪,০৯৪	১,৭৩,১৪৫.৭৭
৫.	সিরাজদিঘা	৩৫৪	৮,৭৫৮.৫৬	২,৯১৯	১,১৫৭৫৩.৮৫	১,৯৫৯	৬৭,৫১৬.৭৫
৬.	গজারিয়া	১১৯	২,৭৫৫.৮৭	১	৪,১৪৩.৯৩	৮	৭৭,৪৫৯.৫৬
	মোট	২,৪১৯	৭২,০০১.৮২	৬৩৫১	৪,১৬,৮৯৯	৭,৩২০	৪,২১,২৩২.৮৪

সূত্র: পূর্ববাংলা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫, দ্বিতীয় অধিবেশন, ভলিউম-২, পৃষ্ঠা ২১৫

[৯০] Dacca District Gazetters, 1975, page 376

[৯১] ibid, page 376

[৯২] দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় নগদ- ৬,৮৫,০৫,৭৮৮ টাকা এবং বন্ড- ৮২,১৯,৭০০ টাকা।[৯৩] ১৯৬৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩৩৭ জন পাকিস্তানী হিন্দু ও ১৩৭৫৩ জন মুসলমান জমিদার ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করেন।
পরিষদ সদস্য জনাব নিজামউদ্দীন আহমেদ এর এক প্রশ্নের উত্তরে সংসদ সচিব আব্দুস সোবহান জানান যে, মোট ১৬০৯০ জনকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ১৩৭৫৩ জন মুসলমান ও ২৩৩৭ জন হিন্দু। মোট টাকার পরিমাণ ১০,০৭,৭৫৮.৬৩। ১৮৩৪১ জন হিন্দু দেশত্যাগ করেছে যাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৬,২৭,১৫৫.৮২ টাকা নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু দেয়া হয়নি।[৯৪] তবে অনেক ভারতীয় (পূর্ববাংলা ত্যাগকারী) হিন্দু লোক পাকিস্তানী হিন্দুদের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলেন বলে প্রাদেশিক পরিষদে জানানো হয়।[৯৫] জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ক্ষতিপূরনের টাকা প্রদান করা হত।[৯৬] জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর পাকিস্তান সরকারকে প্রায় ৩১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।[৯৭]

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইনের ফলে সামাজিক অবস্থা

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে পাকিস্তানী আমলে জমিদারী উচ্ছেদ পূর্বক চাষী প্রজাকে ভূমির মালিকানা দেয়া হয়। সরকার ও জমির মালিক চাষী প্রজার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উপরিস্থ স্বত্ত্ব, মধ্যস্বত্ত্ব ও নিম্নস্থ স্বত্ত্বের কাঠামো আইনের আওতায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত থাকলেও উপরিস্থ স্বত্ত্ব ও মধ্যস্বত্ত্বাধিকারীগণ প্রায়ই নিম্নস্থ স্বত্ত্বধিকারীগণের ওপর আইন বর্হিভূত প্রভাব খাটাত। প্রজাস্বত্ত্ব ও জমিদারি উচ্ছেদ আইনের ফলে গ্রামের কৃষক শ্রেণী জমিদার তালুকদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার দাপট হতে নিষ্কৃতি লাভ করে। শতাব্দীর অচলায়তন থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চারের সৃষ্টি হয়।[৯৮]
তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক আধিপত্য হারান জমিদারগণ। জমিদারদের ও মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা, যা দিয়ে তাদের সংসার চলত। এমনকি অনেক জমিদারদের ও মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের কলকাতার সংসার চলত এস্টেটের টাকায়।[৯৯] এ আইন বিলোপ হলে তাদের জমি থেকে আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায় অথচ সম্বৎসরের কৃৎকরণ, ঠাঁট বাট, তাদের অনুকরণেই জারী রেখেছে। দোল, দুর্গোৎসব, মাতৃদায়, পিতৃদায় এর ব্যাপারটা যেমন আছে, তেমনই তাদের সংসারে পোষ্য আছে বিধবা পিসি, মাসি, বোন, ভাদ্দর বৌ, এবং অনাথ পুষ্যি পোনারা। তাদের পালন পোষণের দায়।[১০০] জমিদারি প্রথায় বংশানুক্রমিকভাবে খাওয়া পরার সংস্থান থাকায় জমিদার, বা মধ্যস্বত্ত্বভোগী পরিবারের সদস্যেদের অনেকের মধ্যে অদ্ভুত এক উদ্দামহীনতা কাজ করছিল।[১০১] অনেক পরিবার সম্পত্তি বিক্রয় করার চিন্তা করেননি বলে অনেক পরিবারকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে হয়েছে।[১০২] জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে জমিদার পরিবার গুলোর অবস্থান সম্পর্কে তপন রায় চৌধুরী বলেন,

> "প্রায় সবারই প্রধান নির্ভর ছিল জমিদারী আয়ের উপর। এই আয় যে একদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে – এই সম্ভাবনা কেউই ঠিক উপলব্ধি করেছিলেন বলে মনে হয়না। হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে জমিদারী

---

[৯৩] Dacca District Gazetters, 1975, page 376
[৯৪] পূর্ববাংলা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ অধিবেশন, ২য় অধিবেশন, ভলিউম- ২৯, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২১৪-২১৫
[৯৫] পূর্ববাংলা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ দ্বিতীয় অধিবেশন ভলিউম-২ পৃষ্ঠা ২১২
[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১২
[৯৭] গাজী সালেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫২
[৯৮] হাফিজুর রহমান ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭
[৯৯] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫
[১০০] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫
[১০১] তপন রায় চৌধুরী, বাঙাল নামা, পৃষ্ঠা ১৬১
[১০২] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১

প্রথা উচ্ছেদ করবেন সে কথা সরাসরি বলেছিলেন।-----সে সব মিটিংয়ে যে সম্পত্তিনাশের সম্ভাবনা, এবং সে জন্য কি করা দরকার এ নিয়ে কখনও কোন আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"[১০৩]

মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের বা তার থেকে আরও ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে যেসব মধ্যস্বত্বভোগী আছে তাদের সমূহ সংকট। তাদের মধ্যস্বত্ত্বের খাজনার পরিমানের ব্যাপারটা টাকার অংকে আসতনা। কিন্তু খাস জমি থেকে উৎপাদিত পণ্য তাদের বাঁচিয়ে রাখে। পুরুষানুক্রমে অন্য কোন আর্থিক ক্রম তাদের নেই। এই খাস জমি তারা নিজেরা চাষ করত না। জমিদার জমি চাষ করেনা, প্রজাপত্তনির প্রজারাই তা চাষ করত। জমিদার ফসলের ভাগ পায়। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে যখন প্রজাপত্তনি, প্রজাস্বত্ত্ব আয়ের উপর জমিদারের কোন অধিকার থাকেনা তখন খাস জমিও জমিদারের থাকেনা। কেননা যে জমিদার খাজনারই আধিকারিক নয়, তার খাসের ফসলের অধিকার নেই। সে অধিকারও তার লোপ পায়। এ ক্ষেত্রে জনবল একটা নিয়ামক ব্যাপার এবং প্রজা না থাকলে তা সম্ভব হয় না।[১০৪] যে মধ্যস্বত্ত্বভোগীর বার্ষিক প্রজাপত্তনির আয় মাত্র হাজার বারশো টাকা, সেও খাসজমি শাসন করত প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বিঘা। ফলত, সেও কার্যত একটা তালুকদার। কিন্তু মধ্যস্বত্ত্ববিলোপ আইন পাশ হলে ধস নামে ছোট এবং মাঝারি মাপের মধ্যস্বত্ত্বভোগী সমাজে। তারাতো বড়দের মতো আগাম কোন ব্যবস্থা রাখেনি।[১০৫]

এ আইনের বলে যে এদেশীয় সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হল তাও নয়। তার খোলসটা শুধু পাল্টাল। ফলত মধ্যস্বত্ত্বলোপী আইন সাধারণ জনগণের আর্থিক লাভ যতটা না কার্যশীল হল, এক শ্রেণীর এবং অবশ্যই এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্লেশ বৃদ্ধি করে অনেক বেশী সমস্যা সৃষ্টি করল। সে সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ তো এইসব ছোট মাঝারি মাপের মধ্যস্বত্বভোগীদের ছিল না, এখন গোটা দেশের সংখ্যালঘুদেরও তা বিপর্যস্ত করে তুলল।[১০৬] মধ্যস্বত্ত্বভোগী পরিবারের সদস্যদের যে আর্থিক দূরাবস্থায় পড়তে হয় তার জন্য এ আইনের সাথে সাথে প্রকাশ হয় তাদের অকর্মণ্যতা ও শ্রমবিমুখতা এবং আভিজাত্যের অহংকার যার ফলশ্রুতিতে তাদের ভোগ করতে হয়েছে ভয়াবহ আর্থিক দৈনতা। কারণ তাদের বিশেষ করে যারা নিজেদের জমিদারী এলাকায় অবস্থান করছিলেন, যাদের আয়ের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা, তাদের ছিলনা কোন চাকুরী বা ব্যবসা, তারাই ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়। পারিবারিক স্থাবর অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় করাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। মিহির সেন তার পরিবারের ভয়াবহ আর্থিক সমস্যার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> "সম্পদ অর্জিত না হলে, তার প্রতি বোধ হয় কোন মমত্ব জন্মায় না। বিষয় সম্পদ থেকে সঞ্চয় করে রাখার কথা কোনদিনও ভাবেন নি। পিতৃপুরুষের সম্পত্তির মারফত কখনও দিয়াতাং ভুজাতাং, কখনও বা গয়ং গচ্ছ দিন যাপন। একসময় চাকর, দাস, দাসী মোচ্ছব। এখন বাসন বিক্রি করে খাওয়া ক্রমশ বাসন কোসন শেষ তো অন্যান্য মহার্ঘ্য বস্তু, সোনা রুপার অলংকার, রূপোর গ্লাস, সোনার থালা, রূপোর থালা, পুরোনো স্বর্ণ এবং রোপ্য মুদ্রা- সব বিক্রি বিক্রি আর বিক্রি। সর্বশেষ পিতামহ ঠাকুরের খেয়ালী সন্নেসীপনার সম্পদ, সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কী, না তার গুরুদেব শ্রীমত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাতিক্ষুদ্র সোনায় বাঁধানো ফোটো ফ্রেমের সোনাটুকু নরুন দিয়ে চেঁছে চটিয়ে তাও বিক্রি করে পেটভরা। সবই অবশ্য জলের দামে। কারণ আভিজাত্য যায়নি। ---এভাবেই বাড়ির জৌলুস আস্তে আস্তে শেষ হতে লাগল। বাসনপত্র সোনাদানা দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমশ তা ঢেঁকীঘর, গোয়ালঘর, 'বৌখনা' ঘর, এবং বৈঠকখানা ঘরগুলোর টিন, কাঠ, চেয়ার, টেবিল, দেরাজ, তক্তপোশ ইত্যাদিতে পৌঁছোলো। কর্তারা তখনও কর্মক্ষম পুরুষ। কিন্তু কর্মে আগ্রহ নেই।"[১০৭]

[১০৩] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০
[১০৪] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[১০৫] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[১০৬] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[১০৭] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯০ ৯১

মধ্যস্বত্বভোগী ঘরের ছেলে মিহির সেনগুপ্ত দেশ ভাগ ও সম্পত্তি চলে যাওয়ার প্রেক্ষাপটের যে বর্ণনা দিয়েছেন পূর্ববঙ্গের প্রায় সব জমিদার তালুকদার পরিবারের ইতিহাস প্রায় একই রকম।[১০৮] জমিদারী প্রথায় বংশানুক্রমিকভাবে খাওয়া পরার সংস্থান থাকায় জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারের সদস্যদের অনেকের মধ্যে অদ্ভুত এক উদ্দামহীনতা কাজ করছিল।[১০৯] অনেক পরিবার সম্পত্তি বিক্রয় করার চিন্তা করেননি বলে সে সকল পরিবারকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় অথবা যেটুকু পেরেছেন তা নিয়ে পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে হয়েছে।[১১০]
১৯৪৮ সালে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকে ১৯৫০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অনেক খণ্ড খণ্ড কৃষক সংগ্রাম ও বিদ্রোহ ঘটে। এসব বিদ্রোহ যেমন ছিল হিন্দু মুসলমান চাষীদের মিলিত বিদ্রোহ তেমনি এসব বিদ্রোহ দমনও করেছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার এবং হিন্দু মুসলমান জমিদার, জোতদার ও মহাজনরা মিলিতভাবেই।[১১১] এসময় হিন্দুরা প্রচুর সংখ্যায় দেশত্যাগ করছিল (এর ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু ভূম্যাধিকারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।) তবু এটাকে একেবারে বিনা বাঁধায় ছেড়ে দেওয়া হয়নি।[১১২] এদের এক বিরাট অংশ পূর্ববাংলায় রয়ে গিয়েছিল এবং সর্ববিধ উপায়ে এ আইন প্রণয়নে বিরোধিতা করেছিল।[১১৩] এ আইন প্রণয়ন করতে যে দুই বছর সময় লেগেছিল এবং পরে এ আইনের যে সামান্য বাস্তবায়ন হয়েছিল সেই সুযোগে এরা নিজেদের ভূসম্পত্তিকে তরল পুঁজিতে পরিণত করার ও ভারতে পাচার করার সর্ববিধ সুযোগ পেয়েছিল।[১১৪] ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মাড়ওয়ারী ও হিন্দু শেঠরা গড়ে প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকা করে (সাধারণতঃ স্বর্ণ, খাদ্যদ্রব্য, পাট ও বিদেশী দ্রব্যের আকারে) ভারতে পাঁচার করেছে। ----- তদুপরি ১৯৫০ সালের লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আগত মুসলমান ও ভারতে গমনেচ্ছু হিন্দুর মধ্যে সম্পত্তি বদলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।[১১৫]

মধ্যস্বত্ত্ব বিলোপ আইন পাশ হওয়াতে জমিদার ও মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দূরাবস্থা সৃষ্টি হলেও এ আইনের সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে এসকল পরিবারের একজন সদস্য অন্যদের বঞ্চিত করে। এরকম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এক মধ্যস্বত্ত্বভোগী পরিবারের সদস্য মিহির সেন তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন,

> "জ্যাঠামশাই খুবই কোন ভূমিকা না করেই বললেন ভাইডি We are lost. The zamindari system has been confiscated by the Government. We have now to decide, what to do next and how to survive. -----পরেও জেনেছি আমাদের প্রজাপত্তনির জমির, অর্থাৎ যার খাজনার অধিকারী আমরা, তা খুব একটা সামান্য ছিল না। কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেশী আয়ের ব্যবস্থা ছিল খাস জমি থেকে। খাসজমির তখন কোন সীমানা নির্ধারণের ব্যপার ছিল না। ফলে, তার আয় থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের আয়ের ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই চলার কথা ছিল। --- প্রজাপত্তনির খাজনা সে তুলনায় কিছুই না। কিন্তু সেসবের গতি যে কি হল, তা একমাত্র নায়েবমশাই-ই জানতেন। সে সব খাস জমির আর কোন হদিশই পাওয়া গেল না আর কোনওদিন। এর পর শুরু হল এক উঞ্ছবৃত্তির জীবন।"[১১৬]

সব দ্বন্দ্বের মূলাধার জমি। মানুষের মধ্যে যতসব দ্বন্দ্ব বিরাজমান, তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি, জমির মালিকানা। -----স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের কারণও যেন জমিই। সম্পত্তি বদল করে অনেক হিন্দু লোক পূর্ববাংলা ত্যাগ

[১০৮] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০
[১০৯] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১
[১১০] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১
[১১১] বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলন..., পৃষ্ঠা ১১২
[১১২] কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩০
[১১৩] কামাল সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০
[১১৪] কামাল সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০
[১১৫] কামাল সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০
[১১৬] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮- ৮৯

করে।[১১৭] এ সময় পূর্ববাংলার ভদ্রলোক হিন্দুদের প্রতি সাধারণ মানুষদের আচরণ সম্পর্কে মিহির সেন তার অভিজ্ঞতায় বলেন,

> "মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্রলোক হিন্দু গৃহস্থদের দুর্দশায় কেউই ঐ ক্রান্তিকালে অশ্রুমোচন করেননি, কারণ তারা পুরুষানুক্রমে যে জঘন্যতায় মানবতাকে অবমাননা করে এসেছেন তার জন্য সাধারণ মানুষ, কিবা হিন্দু, কিবা মুসলমান কারুরই তাদের প্রতি সহমর্মিতা থাকার কথা ছিল না।--- অনেক ক্ষেত্রে অপবর্গীয় মানুষেরা তাদের দুর্দিনে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের অনাচারই কেবল বিচার্য বিষয় ছিল না। এদের কিছু সদাচারও ছিল। সাধারণ মানুষ এই সদাচারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই বিভিন্ন প্লাবতার মুহূর্তে, পাশে এসে দাড়িয়েছে। তাদের অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। এজন্য ঠিক কোন সম্প্রদায়কে দায়ী বলব তা এতকাল পরেও বুঝে উঠতে পারি না।"[১১৮]

মধ্যস্বত্বলোপী আইন জারি হওয়ার পূর্বেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ আইন বিলুপ্ত হওয়ার খবর প্রকাশিত হতে থাকলে সাধারন মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে তখন বর্হিজগতের খবর বিশেষ পৌঁছাতো না। পোষ্টাফিসের মাধ্যমে গ্রামে একটি খবরের কাগজ গ্রামে এলে তা একজন পড়ে শোনাতো। এ রকম ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মিহির সেন বলেন,

> "তারা সংবাদের আভাষই দিত শুধু কোন বার্তা বলত না। বড়বাবু গায়ের লোকদের বার্তা দিতেন, 'বোজলানি অবস্থা খুব সঙ্গীন।' এমন সময় একদিন একটি বাসি কাগজের খবর, 'জমিদারী প্রথা বিলুপ্তিকরণ আইন চালু হইতেছে।' জনৈক মিয়া সাহেব এই খবরের নির্যাস নিয়ে বড়বাবুর দরবারে হাজির ---বড়বাবুর চটজলদি জবাব 'কয় তো খুব খারাপ।'[১১৯]

মিহির সেনগুপ্ত এ সময়ে হিন্দুদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন,

> "মধ্যস্বত্বলোপ আইন তখন জারী হয়। ইতিপূর্বের দাঙ্গার প্রোকোপ এ সময় স্তিমিত থাকলেও, সংখ্যালঘুরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় ক্রমশ পশ্চিমবাংলার দিকে চলমান। যারা চলে যাচ্ছেন, তাদের ভদ্রাসন, সাজানো বাগান, বাধাঁনো ঘাট পুরুষানুক্রমে তাবৎ ঐতিহ্য তথা সঞ্চিত সম্পদ পরিত্যাগ করে কিংবা নামমাত্র দামে বেঁচে দিয়ে দেশত্যাগ করছেন।"[১২০]

বিভিন্ন কৃষকদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আইন পাশ, ২য় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কারণে ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে জমিদারী প্রথা জমিদারদের নিকট আর তেমন লাভজনক ছিল না। ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে সামগ্রিকভাবে সকল ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার পরিবর্তনের হার সত্যিকার অর্থে শুন্যের কাছাকাছি ছিল।[১২১] এম.এম.ইসলাম কৃষি উৎপাদনের এই শুন্যতা সৃষ্টির জন্য জমিদারদের বিনিয়োগে অবহেলা ও তাদের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ উপার্জনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রতি লোলুপ দৃষ্টিকে দায়ী করেন।[১২২] নিম্ন উৎপাদনশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল যা দারিদ্রতার মাত্রাকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়ে দিয়েছিল।[১২৩] কৃষিপণ্য উৎপাদনে এই বন্ধ্যাত্ব অথবা ধীর উর্ধ্ব গতি আসলেই একটি নির্মম বাস্তবতা।[১২৪]

---

[১১৭] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮
[১১৮] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৫
[১১৯] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
[১২০] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
[১২১] বিমলকুমার সাহা, পৃষ্ঠা ৪৬
[১২২] M.M.Islam, Bengal Agricultur, 1920-1946, A Quantative Study, 1978, page 19, উদ্ধৃত বিমলকুমার সাহা, পৃষ্ঠা ৪৬
[১২৩] বিমলকুমার সাহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬
[১২৪] বিমলকুমার সাহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

এই বাস্তবতাই কৃষক জমিদার সুসম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে আর এই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হিসেবে প্রচার হয় কারণ ৮০ ভাগ কৃষক যেখানে মুসলমান আর ৮০ ভাগ জমিদার হিন্দু সম্প্রদায়ের।

অর্পিত সম্পত্তি আইন ও হিন্দু সম্পত্তি

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববাংলা অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন পাশ হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের প্রেক্ষিতে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা করার জন্য। ১৯৫০ সালে দিল্লী চুক্তিতে দেশত্যাগকারী হিন্দুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দিল্লী চুক্তিতে বলা হয় যে, অস্থাবর সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার থাকবে, কেউ কোন প্রকার বিরক্ত করবেনা। কারও উপর সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকলে তা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ফেরত দিবে।[১২৫]

সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি রক্ষা, প্রাদেশিক সরকার কতৃক অর্ডিন্যান্স জারিঃ ১৯৬৪

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির সম্পত্তি কেউ বিনা অধিকারে দখল করে থাকলে তা পূর্ব মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। গোলযোগের সুযোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন লোকের সম্পত্তি যেন কেউ বিনা অধিকারে দখল করে না নিতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া কেউ সম্পত্তি বিক্রয় করতে আগ্রহী হলে তার জমি বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বা কারণ উল্লেখ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে বলে আইনে বলা হয়।[১২৬]

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে আকস্মিক যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৬৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার শত্রু সম্পত্তি আদেশ ১৯৬৫ প্রণয়ন ও জারী করেন। এই আইনের ফলে অনেক হিন্দু বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান এর গভর্নর “The East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administation and Disposal Order” জারীর মাধ্যমে কাস্টুডিয়ানদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৫ সালে জারীকৃত পাকিস্তানে জরুরী আইন ১৯৬৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহৃত হলে ডিফেন্স অব পাক অর্ডিন্যান্স ২ রুল এর কার্য ক্ষমতা হারায়। কিন্তু জরুরী আইন প্রত্যাহার করা হলেও শত্রু সম্পত্তি আইন ‘এনিমি প্রপার্টি (কনটিনিউয়েন্স অব ইমারজেনস প্রভিশনস্) অর্ডিনেন্স ১৯৬৯ এর মাধ্যমে অব্যাহত রাখা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধে জড়িত দেশগুলো এক দেশ যাতে অন্য দেশে অবস্থিত তাদের সম্পত্তি যুদ্ধের পক্ষে ব্যবহার করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে শত্রু সম্পত্তি আইন জারী করেছিল। যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ আইনও স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাহৃত হয়ে যায়।

শত্রু সম্পত্তি প্রশাসন এবং বিলি বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ১৮২(১) বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (ভূমি রাজস্ব ও বাড়িঘর) প্রশাসন এবং বিলি বন্দোবস্ত আদেশ ১৯৬৬ জারী করেন। এই আইনে শত্রু, শত্রু সম্পত্তি, শত্রু নাগরিক, শত্রু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং এর হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনে জন্য কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারকে প্রজ্ঞাপন ও আদেশ জারির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই আইনে শত্রু বলতে বুঝাবেঃ

---

[১২৫] Agreement between the Government of India and Government of Pakistan dated the 8th April 1950. B Proceedings, Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol.1, Page-19, GOEB

[১২৬] দৈনিক আজাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

"ক) পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত যে কোন দেশ বা দেশের স্বার্বভৌম ক্ষমতা বা
খ) শত্রু দেশে বসবাসরত যে কোন ব্যক্তি বা
গ) যে কোন প্রতিষ্ঠান যা শত্রু দেশে গঠিত বা শত্রু দেশের আইনের দ্বারা নিগমবদ্ধ বা
ঘ) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শত্রু বলে ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। বা
ঙ) নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক শত্রু দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা
চ) যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যে শত্রু দেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে।[১২৭]
শত্রু নাগরিক বলতে বুঝাবে:
ক) সেই ব্যক্তিকে যে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত কোন দেশের নাগরিক অথবা অতীতে যে কোন সময় ঐ দেশের নাগরিক ছিল। কিন্তু অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন না করেই নাগরিকত্ব হারিয়েছে। বা
খ)শত্রু দেশের আইনে বা তদধীন গঠিত বা নিগমবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান।" [১২৮]

ভিসা প্রদান করে ভারত সরকার আপীলকারীদের সে দেশে (ভারতে) অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন, পাকিস্তানে নয়। সংশ্লিষ্ট সময়ে ভারত সরকার শত্রু সরকার ছিলেন। ভিসার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন ও উহা গ্রহণ করে আপিলকারীরা ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতা করেছিলেন এবং শত্রু রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।[১২৯]

"১৬১ বিধির সংজ্ঞানুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি শত্রু রাষ্ট্রে বসবাস করেন তা হলে তিনি শত্রু এবং তার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে। ১৬৯ বিধিতে শত্রু নাগরিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যিনি শত্রু রাষ্ট্রে চিরস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন।"[১৩০]

"শত্রু সম্পত্তি বলতে বুঝাবে ১৯৫৭ সালের ১২ নং আইন অনুযায়ী বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি ব্যাতীত ১৬১ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে কোন শত্রু নাগরিক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অধিকারে বা ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে যে সম্পত্তি রয়েছে সেই সকল সম্পত্তি বুঝাবে।

অবশ্য যদি কোনশত্রু নাগরিক পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যদি কোন সম্পত্তি তার মালিকানাধীন বা অধিকারে থাকে অথবা তার পক্ষে পরিচালিত হয়ে থাকে তবে তার মৃত্যু সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি সমূহের ১৮২ বিধি অনুসারে উহা শত্রু সম্পত্তি হিসাবে বহাল থাকবে।"[১৩১] যুদ্ধ বিরাজমান অবস্থার অবসানের পর এই বিধির অধীনে কোন সম্পত্তি অর্পণের আদেশ দেওয়া যাইবে না।"[১৩২]

১৮২(১) বিধিতে বলা হয়েছে যে, "ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বা উহার ক্ষমতার অর্পণ করতে পারবেন এবং উক্ত সম্পত্তি কোন শত্রু প্রজার মালিকী সম্পত্তি হলে তত্ত্বাবধায়ক উক্ত শত্রু বা পাকিস্তানে বসবাসরত তার পরিবারের ভরণপোষনের জন্য ঐ সম্পত্তির আয় হতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন।"[১৩৩] এই আদেশের তারিখ হতে "কোন ব্যক্তি কোন ভূমি বা বাড়ীঘর যাহা উপতত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত হইয়াছে বিক্রয়, বিনিময়, দান, উইল, বন্ধক, ইজারা, উপ ইজারা, বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেনা এবং আদেশ লংঘন করিয়া কোন ভূমি বা বাড়ীঘর হস্তান্তর করিলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"[১৩৪]

[১২৭] মোঃ আনসারউদ্দীন সিকদার, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন ভূমি সংস্কার ও ঋণ সালিশি আইন সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন এবং সরকারী দাবী আদায় আইন, ফিবকো প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৭
[১২৮] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ১৩-১৫
[১২৯] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৫
[১৩০] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫
[১৩১] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৫
[১৩২] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৫
[১৩৩] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৫
[১৩৪] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

অনুচ্ছেদ ৫ এ তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত সকল সম্পত্তি ডিক্রি জারির মাধ্যমে আটক ক্রোক ও বিক্রয় হতে রেহাই দেওয়া হয়েছে।[১৩৫]

শত্রু সম্পত্তির আইনের সংজ্ঞা সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতার কারণে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবে এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখা হয়েছে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। শত্রু সম্পত্তির আইনের প্রয়োগ ও ক্ষেত্র বিশেষে অপপ্রয়োগের ফলে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন কোন নাগরিক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। কোন হিন্দু সম্পত্তির কোন অংশীদার বাস্তুত্যাগ করার পর তাদের অবশিষ্ট অংশিদারগণ অথবা পাওয়ার অব এ্যাটর্নী বলে নিযুক্ত আত্মীয়গণের অনেকে সরকারী রাজস্ব, পৌরসভা ট্যাক্স, ও ইউনিয়ন কমিটির ট্যাক্স নিয়মিত আদায় করা সত্ত্বেও উক্ত আইনের বলে ঐ সকল যুক্ত ও বহু ক্ষেত্রে শত্রু সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হচ্ছে। ঐ সকল সম্পত্তির পাকিস্তানী মালিকগণের অগোচরেও অনেক সময় উহা সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। কোন কোন দেবোত্তর সম্পত্তি এবং ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে প্রদত্ত দানপত্রমূলক সম্পত্তিও এভাবে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। ধারণা করা হয় যে আইয়ুব শাসনামলে শত্রু সম্পত্তিরূপে ঘোষিত হওয়াতে রাজনৈতিক অনুগ্রহ বিতরণের মূলধন করে ক্ষমতাসীন দলের জন্য রাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা হতেই মূলত দুর্নীতির সূচনা।[১৩৬] শত্রু সম্পত্তির আইনের সংজ্ঞা সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা অবৈধভাবে পাকিস্তানি নাগরিকদের বৈধ জমি দখলের বা একে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করিয়ে নিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়ে নেয়ার সুযোগ লাভ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এসকল অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা খুব সহজ নয়, যে সকল নাগরিকেরা ভারতে চলে গিয়েছেন তারা ভারতে বসে পূর্ববাংলায় এজেন্টের মাধ্যমে সুযোগ গ্রহণ করছেন সে সকল সম্পত্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।[১৩৭] তবে এ সুযোগে স্বার্থান্বেসী ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রকৃত নাগরিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কেও সরকারের সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজন ছিল।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে দেশত্যগী হিন্দু সদস্যগণ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ লোকই জানান যে অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয়নি। অধিকাংশ লোকই সম্পত্তি বিক্রয় করে গেছেন। অনেকে জানান যে তাদের জ্ঞ্যাতি সদস্যগণই তাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে তাদের বঞ্চিত করে জমি বিক্রয় করে ভারতে চলে গিয়েছেন। হিন্দু জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অন্নদাশংকর রায় বলেন,

> "অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ গ্রামই মুসলিম প্রধান। হিন্দুরা যতই শহরে এসে ভীড় করে ততই গ্রামাঞ্চলে তাদের শুন্যতা পূরণ করে মুসলমান। জমির স্বত্ব হিন্দু হলে কি হবে ইতিমধ্যেই রব উঠেছে লাঙ্গল যার জমি তার। স্বাধীনতার আগে থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, হিন্দুরা সব কটা শহরে এসে ঘাটি গেড়ে বসেছে আর মুছলমানদের হাতে চাষবাসের ভার ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘাটি গাড়তে দিয়েছে। শহরের ঘাটি রক্ষা করতেন ইংরেজ সরকার। আর গ্রামের হিন্দু জমিদার। কিন্তু হিন্দু জমিদারের জমিদারী যাওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা নিজেরাই গ্রাম ছাড়া হন। ইংরেজদের কুইট ইন্ডিয়া, আর হিন্দু জমিদরদের কুইট ভিলেজ এর অনিবার্য পরিনতি পার্টিশনের পর কুইট টাউন।"[১৩৮]

গ্রাম এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে মুসলমানদের পূর্ববাংলার শহরে অভিগমন ঘটে। কিন্তু এইরূপ হিন্দুরা ভারতে গিয়ে বসবাসের চেষ্টা করে থাকে। পূর্ববাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দু জমিদার, ধনী কৃষক, মহাজন, পেশাজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে

---

[১৩৫] আনসারউদ্দীন সিকদার, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ২২
[১৩৬] দৈনিক ইত্তেফাক ১২ আগষ্ট ১৯৬৯
[১৩৭] দৈনিক ইত্তেফাক ১২ আগষ্ট ১৯৬৯
[১৩৮] অন্নদা শংকর রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯

অর্থনৈতিক, নেতৃত্ব হারানোর প্রশ্নে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে যা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা লাভ করে খুব সহজেই। যা হিন্দু নেতৃবৃন্দের বাংলা ভাগের দাবীকে ত্বরান্বিত করে। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকালীন সময়ে হিন্দু ধনী সম্প্রদায়ের ও পরবর্তীকালে হিন্দু কৃষক সমাজের দেশত্যাগ ছিল লক্ষ্যণীয়।

পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেমনি ঢাকা জেলারও অন্যান্য জেলার তুলনায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলা থেকে বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের এই দেশত্যাগের পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তেমনি ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ও দেশত্যাগের পেছনেও বিভিন্ন কারণ রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ঢাকা জেলার জনগণের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ।

চতুর্থ অধ্যায়
১৯৪৭ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান

বাংলাদেশে ঢাকা একটি ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা পূর্ববাংলার রাজধানী হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সরকারী অফিস আদালত, শিল্পকারখানা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সব কিছু গড়ে উঠার ফলে এই জেলায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ঢাকা জেলার পশ্চিমে যমুনা এবং পাবনা জেলা, উত্তরে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং কুমিল্লা জেলা এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী ও ফরিদপুর জেলা দ্বারা বেষ্টিত। এই জেলা ছয়টি বড় ভূ-তাত্ত্বিক ভাগে বিভক্ত। মধুপুর অঞ্চল, আড়িয়াল বিল, গাঙ্গেয় সমতলভূমি, যমুনা মেঘনার সমতলভূমি। ঢাকা মূলতঃ একটি কৃষিপ্রধান জেলা এবং অধিকাংশ জনগন কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে ঢাকায় বিভিন্ন ধরনের শিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে শিল্পকারখানায় সম্মৃদ্ধ হয়েছে ঢাকা। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গী শিল্পপ্রধান অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে।

ঢাকা জেলার জনসংখ্যা পরিস্থিতি

ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর গড়ে ওঠা ছাড়াও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী দেশের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ার ফলে এ অঞ্চল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে এ অঞ্চলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পূর্ববাংলার জেলাগুলোর মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে জনবহুল জেলা। ঢাকার কোন কোন থানা পৃথিবীর গ্রামীণ জনসংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে জনবহুল।[১] ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোক মৃত্যুবরণ করার ফলে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৪১-৫১ দশকে এ জেলার জনসংখ্যা ৩.৬% কমে যায়।[২]

ঢাকা জেলার বিশেষ করে নগর কেন্দ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার প্রধান কারণ পাকিস্তানের স্বাধীনতাকালীন সময়ে ভারত থেকে আগত মুসলমানদের আশ্রয় গ্রহণ। ১৯৫১-৬১ সময়কালে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৫.১%। শহর এলাকার মধ্যে তেজগাঁও থানায় ১১৭.৯৯%, ফতুল্লা থানায় ৫৮.৬৯%, নারায়ণগঞ্জ থানায় ৫৬.৯৫%। এর প্রধান কারণ ভারতীয় মুসলমানদের আগমন। এদের পুনর্বাসনের জন্য ঢাকা শহরের বিস্তার, নতুন নতুন কলোনি স্থাপন, শিল্পকারখানার প্রতিষ্ঠা। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ শহরে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ পাট ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার লাভ।[৩]

ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমায় ব্যপকভাবে শহর ও শিল্প এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬১ সালে এ অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪২.৩৯%। এ বৃদ্ধির হার ঢাকা জেলা এমনকি পূর্ববাংলার সকল এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভারত থেকে আগত মুসলমান মোহাজেরদের বেশিরভাগই আশ্রয়গ্রহণ করেছে এ অঞ্চলের শহর ও শিল্পাঞ্চলে। এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, কারিগরি, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে এ প্রদেশের এবং প্রদেশের বাইরে থেকে আশা ব্যাপকসংখ্যক জনগণকে আকৃষ্ট করে। ১৯৫১-৬১ সময়কালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার লালবাগ, কতোয়ালী, রমনা, সুত্রাপুর এ চারটি থানায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৮৮,৫৪৭ জন (৩২.৩৮%)। শুধুমাত্র তেজগাঁও থানাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

---

[১] Dacca District Gazetteer, Page 81
[২] ibid, Page 81
[৩] ibid, Page 83-84

পায় ১,৪৪,০৭১ জন (১১৭.৯৯%)। এ মহকুমার অন্যান্য থানার মধ্যে কেরানিগঞ্জে ২৩,৩৯৯ জন (২৯.০৬%), নওয়াবগঞ্জ থানায় ৫.৫৫%, এরং দোহার থানায় ১৮.৮৬%। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্বাধীনতার প্রথম চার বছরে ভারত থেকে আসা বেশিরভাগ লোকই আশ্রয়গ্রহণ করেছে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এবং ১৯৫১ সালের পরবর্তীতে ভারত থেকে আসা বেশিরভাগ লোকই আশ্রয় গ্রহণ করেছে তেজগাঁও ও কেরানীগঞ্জ থানায়। তবে নওয়াবগঞ্জ ও দোহার থানার জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্দিষ্ট কোন কারণ নেই।[৪]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে আছে ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা, এখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৬.০১%। এর মধ্যে শ্রীপুর থানায় ৩৩.৮০%, কালিয়াকৈর থানায় ২৮.৬১%, জয়দেবপুর থানায় ৩৫.১১%, সাভার থানায় ২৭.৪৬%। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে ধামরাই, কাপাশিয়া ও কালিগঞ্জে বৃদ্ধি পেয়েছে ২১.৩%, ২১.২৫% এবং ২১.২৩%। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমার মত শরণার্থীদের আশ্রয় গ্রহণ, এর প্রধান কারণ ভাওয়াল অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ধামরাই থানায়, প্রতি বর্গমাইলে ১৫২০ জন এবং সবচেয়ে কম শ্রীপুর থানায়, প্রতি বর্গমাইলে ৭০২ জন।[৫]

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসারের ফলে নারয়ণগঞ্জ (৩৬.৯৫%) ও ফতুল্লা থানায় (৫৮.৬৯%) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ থানার লোকসংখ্যা ১,২৫,৭৯২ জন। বৈদ্যের বাজার থানার লোকসংখ্যা ১৩৪,২৫২ ও নরসিংদী থানার লোকসংখ্যা ১৮৫,৭৭০ জন। বৈদ্যের বাজার ও নরসিংদী থানার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৩.১৯% এবং ২২.০৩%। রায়পুর থানার লোকসংখ্যা ২৭৯,৮২৮ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৭.৯৩%। আড়াইহাজার থানায় ১৩২,০৮৩ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯.৬১%। রূপগঞ্জ থানায় ১৭৭,৮৯৬ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯.০৬%। মনোহরদী থানায় ১৬৩,৭০৭ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৪.৪৭%।[৬]

১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মুন্সিগঞ্জ থানার ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম, ৯.৬২%। এ মহকুমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাকালীন সময়ে এ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও ধনী শ্রেণীর দেশত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ভারতে চলে যাওয়া। আর ভারত থেকে আগত মুসলমানদের এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করার কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি।[৭] ফলে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার পরিলক্ষিত হয়।

মানিকগঞ্জ মহকুমা ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য অসুখের ব্যাপক বিস্তারের কারণে প্রতি বছর অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে ফলে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম। তবে ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ৭০১,৩৯৩ জন। ১৯৫১-৬১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৮.২২%। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১,১১৫ আর ১৯৬১ সালে হয় ১,৩১৮ জন। এর প্রধান কারণ এ অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্তন এবং কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ও বিস্তার লাভ।[৮]

৪.১ নং সারণীতে ঢাকা জেলার জনসংখ্যা দেখানো হল। সারণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালের ঢাকা জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ২৬,১৬,৯৮৯ জন এবং ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭০,১১,৮০৭ জন। তবে

---

৪ ibid, Page 81-82
৫ ibid, Page 82
৬ ibid, Page 82-83
৭ ibid, Page 83
৮ ibid, Page 83

১৯৪১-১৯৫১ সময়কালে এই জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ১,৪৯,৩৬২ জন। এই জেলা থেকে ১৯৪৭ এর পর বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করায় এ জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বেশী। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলা থেকে ৫৭,৪০২ জন হিন্দু দেশত্যাগ করে।

সারণী-৪.১

ঢাকা জেলার মোট জনসংখ্যা ১৯০১-১৯৭৪

আদমশুমারী বছর	মোট জনসংখ্যা
১৯০১	২৬,১৬,৯৮৯
১৯১১	২৯,২৮,৯৮১
১৯২১	৩১,৬৯,৯০১
১৯৩১	৩৪,৪৭,৩৮৮
১৯৪১	৪২,২২,১৪৩
১৯৫১	৪০,৭২,৭৮১
১৯৬১	৫০,৯৫,৭৪৫
১৯৭৪	৭,৬১১,৫৯৮

সূত্রঃ- Census of India-1941,Vol. V, Bengal and Sikkim, Calcutta, Part-II, page 9
Bangladesh Population Census 1974, National Vol, Dacca1977, Table 7, Page 146

সারণী-৪.১ দেখা যায় যে মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ঢাকা জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সকল সময়ের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও একটি কারণ হচ্ছে ভারত থেকে আগত মোহাজেররা। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলায় মোহাজের আশ্রয় গ্রহণ করে ৯১,৪২৫ জন। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক বেশী।

সারণী-৪.২

ঢাকা জেলার মহকুমা অনুযায়ী জনসংখ্যা-১৯৬১-১৯৭৪

মহকুমা	থানা	ইউনিয়ন	গ্রাম	১৯৬১	১৯৭৪
ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা	৪	৭৭	১,৩২৪	৯,৭৯,৪১৩	১৪,১৩,৩৯১
ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা	৬	৪৪	৯০৫	১১,৩৮,২৭৪	২৩,২২,০৫৩
মুন্সিগঞ্জ মহকুমা	৬	৬৯	৫৮৬	৭,৩০,৩৮৭	৯,০৮,২৮৫
মানিকগঞ্জ মহকুমা	৭	৬৫	১,৭৪২	৭,০১৩৯৩	৯,০৫,০৯১
নারায়ণগঞ্জ মহকুমা	১১	১১৫	১৭২৫	১৫,৪৬,২৭৮	২০,৬২,৯৮৭
ঢাকা জেলা	৩৮	৩৭০	৬,৫৬৮	৫০,৯৫,৭৪৫	৩,৭৭,৯৮০

সূত্রঃ বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস ১৯৭৪, বুলেটিন ২, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩২-৩৫
গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান, ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস ১৯৭৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩-৪

১৯৫১-৬১ সময়কালে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয় দ্রুত রাজধানী শহর ও নারায়ণগঞ্জ শহর শিল্পাঞ্চল হিসেবে এর আর্থ সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে এ সময় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ঢাকা মূলতঃ একটি কৃষিপ্রধান জেলা এবং অধিকাংশ জনগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে ঢাকায় বিভিন্ন ধরনের শিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে শিল্প কারখানায় সম্মৃদ্ধ হয়েছে ঢাকা। নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গী শিল্পপ্রধান এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছে। ১৯৫১-৬১ সময়কালে ঢাকা রাজধানী শহর এবং

নারায়ণগঞ্জ শিল্প অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠায় এর আর্থ সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ফলে এ সময় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৯]

ঢাকা জেলার হিন্দু জনসংখ্যা

ঢাকা জেলায় ১৯০১ সালে মোট জনসংখ্যার হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার আলাদা হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৩১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩২.৭৭%। তবে এই সংখ্যা ক্রমেই হ্রাসের দিকে ছিল। একদিকে মুসলমান জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে।

ঢাকা রাজধানী শহর ছাড়াও ঢাকা নারায়ণগঞ্জ দেশের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা। এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র সুপ্রসন্ন হওয়ায় সমগ্র জনসংখ্যার আধিক্যের পাশাপশি হিন্দু জনসংখ্যারও আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।[১০] এর কারণ হিসাবে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যান্য কারণগুলোর (যা পূর্ব আলোচনা করা হয়েছে) সঙ্গে যোগ হয়েছে ১৯৪৭ সালে এদের বিপুল সংখ্যার দেশত্যাগ। ১৯৪৭ সালের পূর্বে এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ছিল হিন্দুদের আধিপত্য। বিশেষ করে শহর এলাকায় এদের সংখ্যাই বেশী ছিল। এদেশের সকল সরকারী চাকুরী, ব্যবসা- বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, বিভিন্ন পেশা যেমন: আইনজীবি, ডাক্তার সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাদের আধিপত্য। এখানকার জমিদার শ্রেণীরও বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের।

ঢাকা জেলার হিন্দুদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক হিন্দু জমিদার উচ্চশিক্ষিত ছিল, তারাই বর্ণ হিন্দু নামে পরিচিত। সাহাদের উচ্চবর্ণের মধ্যে গণনা করা হয়নি। যদিও তারা ধনী ছিল। সাহা সম্প্রদায় ঢাকার সাভার ও মানিকগঞ্জ এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে নমশুদ্র শাখা এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। সিঙ্গাইর, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নবাবগঞ্জ এলাকায় বেশি ছিল কৈবর্ত ও শিরিংগার। মুন্সিগঞ্জে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশি ছিল। ঢাকার ব্রাহ্মণরা বর্ণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার জাল ছিন্ন করেছেন। যা তাদেরকে পৌরহিত্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। পরবর্তীতে তারা অনেকেই দেওয়ান, লেখক, উকিল ও অন্যান্য লোকায়ত পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন।[১১]

ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল দৃঢ়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যার ৫৮.৫% ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ১৭ জন কমিশনারের ১০ জন ছিল হিন্দু।[১২] বিল্ডিং, দোকান, বাজারের ৮৫% ছিল হিন্দু মালিকানা। হিন্দু মালিকানায় ৭১৭৫ বাড়ি ছিল, ১৯৫০ সালে এ সংখ্যা হয় ৯২০ টি।[১৩] স্কুলে ৩২৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ২৮৮৯ জন এবং ২১১৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ২০৭০ জন হিন্দু। ১৯৫০ সালে ছাত্রসংখ্যা হয় ৮৭০ এবং ছাত্রীসংখ্যা হয় ৩৪৮ জন, কলেজে হয় ৮৪৬ জন। বার এসোসিয়েশনে ৩১০ জনে ২৮০ জন আইনজীবী ছিলেন হিন্দু। হিন্দু মালিকানায় দোকানের সংখ্যা ছিল ১৪৯৯টি, ১৯৫০ সালে তা হয় ১৭৫টি।[১৪]

---

[৯] Banladesh Population Census, 1981, National Vol. page- xxxiv, Dhaka, 1983

[১০] কুসুমলতা, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগলিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ, পৃষ্ঠা ৩১

[১১] ঢাকা জেলা পরিচিতি, পৃষ্ঠা ২০১

[১২] Samar Guha, Non Muslim behind the Curtain of East Pakistan, page 7

[১৩] Samar Guha, ibid, page 7

[১৪] Samar Guha, ibid, page 7-12

ব্রাহ্মণদের পরেই বৈদ্য শ্রেণীর অবস্থান যারা এই সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত তারা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং শুদ্রদের সাথে সকল রকম সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বর্জন করেন। এ জেলায় বৈদ্যগণ হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থাশালী। সমাজে তারাই প্রধানতঃ তালুকদার, দেওয়ান ও চিকিৎসাবিদ।[১৫]

কায়স্থ শ্রেণীকে এখানে শুদ্রদের বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়। যদিও তারা নিজেদের উচ্চ বংশ মর্যাদা বলে দাবী করেন। ব্রাহ্মণদের ন্যায় এরাও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের অধিকাংশই এটর্নী, উকিল, লেখক, হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে এবং শহরের বিভিন্ন আদালতে জমিদারদের কর্তৃক কর্মে নিযুক্ত। শুদ্রগণ নয়টি বিশুদ্ধ বর্ণ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে তাঁতী বা বয়ন শিল্পের সংখ্যা এ জেলায় প্রচুর।[১৬]

শাঁখারী, কামার, কুমার, গোয়ালা, মালাকার, নাপিত সম্প্রদায়, আচার্য ব্রাহ্মণ, অগ্রগামী ব্রাহ্মণ, সুবর্ণ বণিক, সাউলোক, কাপালিক, পাটিয়াল, পাটনী, কৈবর্ত, তাম্বলী সমপ্রদায়, গন্ধবণিক, ডোম, চন্ডাল, যোগী, গাড়ুরী, বেদে সম্প্রদায় রয়েছে।[১৭] জেলার উত্তর ভাগের অরণ্যাঞ্চলে কোঁচ ও রাজবংশী দুই শ্রেণীর উপজাতি বাস করে। এরা তাদের বৈশিষ্ট ও সাধারণ প্রকৃতিতে যে কোন সম্প্রদায় থেকে পৃথক। জেলার উত্তরভাগে এবং ময়মনসিংহের মধুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।[১৮]

স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম চার বছরে বিপুল সংখ্যক হিন্দু এই জেলা থেকে পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশ করে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে হিন্দুরাই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্প্রদায়। তারা শিক্ষা সম্পদে মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী ছিল। সরকারী চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই তারা ছিল ক্ষমতাবান এবং এ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান ছিল নগন্য। এর বেশীরভাগই ছিল হিন্দু উচ্চবর্ণের হাতে। মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অবস্থান ছিল অনেক নীচে। ১৯৪৭ সালে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হলে হিন্দুরা পূর্ববাংলা ত্যাগ করে চলে যায় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা সম্পদ ভারতে নিয়ে যায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভারত থেকে আগত মুসলমানদের সঙ্গে সম্পদ, বাড়িঘর বদল করে এবং বিক্রি করে চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে খালি হাতেও অনেকে চলে গিয়েছে। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় হিন্দু জনসংখ্যার হার দাঁড়ায় ১১.৪০%। এ সময় বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার ১৩.৫%। ঢাকা জেলার হিন্দুদের শতকরা হার জাতীয় শতকরা হারের চেয়েও অনেক কম। যেখানে ১৯০১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ছিল ৩৩.০% এবং ঢাকা জেলায় ছিল ৩৭.২৭%। মোট শতকরা হারের থেকে ঢাকা জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা বেশী ছিল। আর ১৯৭৪ সালে তা কমে যায়। ঢাকা জেলার হিন্দুদের শতকরা হার জাতীয় শতকরা হারের চেয়েও অনেক কম। ১৯৭৪ সালে তা আরও কমে যায়। এর থেকে এটি স্পষ্ট যে ঢাকা জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করেছে।
১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত রেলওয়ে ও স্টিমারের মাধ্যমে ঢাকা ১,৯৩,২২৮ জন পশ্চিমবাংলায় গমন করে এবং ১,৫২.৪২০ জন পশ্চিম বাংলা থেকে ঢাকায় আগমন করে।[১৯]

এখানে মুসলমান শতকরা হারের সঙ্গে অবশ্য যোগ হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের থেকে আগত মোহাজেররা। আর এই মোহাজেরদের বেশীর ভাগই শহর ও শিল্প এলাকায় স্থায়ী হয়। তাদের সংখ্যা দেশত্যাগী হিন্দুর সংখ্যা থেকে অনেক বেশী হয়। ফলে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার আরও বেশী কমে যায়।

---

[১৫] ঢাকা জেলা পরিচিতি, পৃষ্ঠা ১৭৬
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৫
[১৯] Home, Political (CR), B Proceedings, Vol. 4, File-January 1951/242-248, GOEB

দাঙ্গা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে ১.১ মিলিয়ন হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ করে।[২০] যদিও এসময় পূর্ববাংলায় বা ঢাকা জেলার কোথাও কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটে নাই। ১৯৬১-১৯৭৪ সময়কালে ১.১ মিলিয়ন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে। এসময়কালে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব পরে। ঢাকা জেলা ত্যাগকারী শরণার্থীরা বেশিরভাগ আশ্রয় গ্রহণ করে কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায়। তবে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পেশার সঠিক হিসাব জানা যায়নি কারণ তারাই আশ্রয় গ্রহণ করেছে যাদের পরিবারের কোন সদস্য আগের থেকেই পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করছে অথবা চাকুরী সূত্রে বসবাস করছে।[২১]

ঢাকা জেলায় ১৯৩১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩২.৭৭%। তবে এই সংখ্যা ক্রমেইহ্রাসের দিকে ছিল। একদিকে মুসলমান জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হিসাবে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যান্য কারণগুলোর (যা পূর্ব আলোচনা করা হয়েছে) সংগে যোগ হয়েছে ১৯৪৭ সালে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগ। ১৯৪৭ সালের পূর্বে এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ছিল হিন্দুদের আধিপত্য। বিশেষ করে শহর এলাকায় এদের সংখ্যাই বেশী ছিল। এদেশের সকল সরকারী চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কারণ বিভিন্ন পেশা যেমন আইনজীবি, ডাক্তার, সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাদের আধিপত্য। এখানকার জমিদার শ্রেণীরও বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের।

ঢাকায় মোহাজের

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর প্রথম চার বছরে ঢাকা জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। ভারতের পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হারের সঙ্গে অবশ্য যোগ হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের থেকে আগত মোহাজেররা। এই মোহাজেরদের বেশীর ভাগই শহর ও শিল্প এলাকায় স্থায়ী হয়। ফলে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার আরও বেশী কমে যায়। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলায় মোহাজের আশ্রয় গ্রহণ করে ৬,৯৯,০৭৯ জন, এবং ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে ৯১,৪২৫ জন। এই সংখ্যা ভারত থেকে আগত মোট মোহাজেরের ১৩.০৮%। ১৯৫১ সাল থেকে ঢাকা জেলার মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দু ও অন্যান্য জনসংখ্যার হার কমে গিয়েছে।[২২]

সারণী-৪.৩

শিক্ষিত মোহাজের

	পুরুষ	মহিলা
পূর্ববাংলা	১,৭৮,১৫৯	৪৬,০৪৬
ঢাকা	৪৪,৭২৫	১৪,৪২১

সূত্র-Census of Pakistan, Vol 3, East Bengal, Table 19-A, 1951, Karachi, 1953, Page 19-2,

[২০] Masihur Rahman Khan, Pattern of External Migration to and from Bangladesh. 1901-1961, page 605-609

[২১] Report on the Sample Servey for estimating the Socio Economic Characteristics of displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the West Bengal

[২২] Bangladesh Population Census 1981, National Series, Dhaka, 1883, page-xli,

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪.৪

কর্মজীবী মোহাজের

কর্মজীবী শ্রেণী	মোট	কৃষিজীবী	অকৃষিজীবী	বেসামরিক	নির্ভরশীল
পূর্ববাংলা	৬,৯৯,০৭৯	১,০৯৩৮৬	১,০০,৯১৮	৩,২৬৬	৪,৮৫,৫০৯
ঢাকা জেলা	৯১,৪২৫	৩,৩৫২	৩০,২৩৯	৬৭৬	৫৭,১২৮

সূত্র-Census of Pakistan, Vol 3, East Bengal 1951, Karachi, 1953, Page 19-2, Table 19-A

পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারীর মধ্যে ঢাকা জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে মোট আগতদের ১৩.০৮%। এরা ছিল পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যার ১.৬৭%। ঢাকার মোট জনসংখ্যার ২.২৫% হচ্ছে আশ্রয় গ্রহণকারী মোহাজের।[২৩] তবে এর পরেও বিভিন্ন সময়ে অনেক লোক এসেছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিস্থিতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নূতন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় ঢাকা জেলার জনগণের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থানেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে দ্রুত দেশত্যাগ করেন, বিশেষ করে যাদের কলকাতা বা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলে চাকুরী, ব্যবসা বা বসবাসের স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেকে পরবর্তীতে পশ্চিমবাংলায় তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দেশত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে ঢাকা জেলা ত্যাগকারী বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ সময়কার ঢাকা জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ বিষয়গুলো ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা ধারনা করা যায়।

ফটিকচন্দ্র বসাকের বাড়ি ছিল মানিকগঞ্জ মহকুমার সাপুল্যে গ্রামে, পেশায় তাঁতী। তিনি পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন '৪৮ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে। তিনি জানান যে, তিনি নিজে তার দুই দাদার সঙ্গে কলকাতায় থাকতেন। পরে বাবা মাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন। তিনি বলেন,

> "তা তখন চিন্তাভাবনা করলাম– হিন্দুস্থান পাকিস্তান যখন হইয়্যা গেছে–তখন একটা আইডিয়া নিলুম।----- যখন আমি আসি তখন ধরুন দেশ বিভাগ হয়ে গেছে - সে এক দেড় বছরের ব্যাপার। তখন কোন গন্ডগোল ছিল না। না থাক তখন আমি চিন্তা করলাম যে মুসলমান রাষ্ট্র হইয়্যা গেল–এ দেশে আর থাকা যাবে না। আমাদের ঐ গ্রামের থেইক্যা-ওখানে আশেপাশের তিনটে গ্রাম- সাপুল্যে, ইনাম, দরগ্রাম- এই তিনটে গ্রামের থেইক্যা আমিই ফার্স্টে বেরিয়ে আসি। ফার্স্টে যখন আমি বেরিয়ে এলাম– তারপরে শুনলাম আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে আসছে। শুধু খালি বসাক নয়– হিন্দু বলতে।"[২৪]
>
> আমার দেশে কোন সম্পত্তি ছিল না। আমি নিজে খেটেখুটে যা করার করেছি। তবে ঘরবাড়ি বিক্রি করে যা পয়সা পেয়েছি তা এনেছিলাম। আমাদের ওখানে হয়নি। আমরা শুনেছি ঢাকায় গন্ডগোল হয়েছে। গ্রামে কিছু হত না। আগে তো সম্পর্ক ভালই ছিল। আমাদের সংগে ওদের সম্পর্ক খারাপ হয়নি। ঐ মুসলমান রাষ্ট্র বইলাই আমরা ধারনা করলাম যে এখানে স্থান হবেনা। --ওটা নিজেদের মধ্যে একটা চিন্তাভাবনা এসে গেল। কেননা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান– এই থেকে একটা চিন্তা ভাবনা এসে গেল। মনে করলাম ভবিষ্যতে এখানে আর থাকা যাবে না। আমরা ওখানকার তিন চারটা গ্রামের আছি সবই ঢাকা জেলার। এখন তো আমি মনে করি ভালই আছি এখানে।----মুসলমানের রাষ্ট্র। এখনও যা শুনি, ভাল হলে কি হবে, ওখানে ভয় থাকবেই। ভয় আছেই।------চতুর্দিক দিয়া মুসলমান।---হিন্দু আছে কিনা সন্দেহ। সব মুসলমানে বাড়ি দখল কইর‍্যা নিছে। লোকের মুখে যা শুনা যাচ্ছে।

[২৩]. Census Report of Pakistan 1951, East Bengal, Karachi, 1953, page 39

[২৪]. ফটিক চন্দ্র বসাক, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদক- ত্রিদিব চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২৪-২৬

’৪৬ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে বলেন ‘আমাদের ওখানে দাঙ্গা হত না। আমরা শুনতাম যে ঢাকায় দাঙ্গা হচ্ছে। আমাদের ওখানে কোন গণ্ডোগোল হয়নি।[২৫]

পশ্চিমবাংলা সরকারের তত্ত্বাবধানে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দু সম্প্রাদায়ের লোকদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এক জরীপ পরিচালিত হয়। সে জরিপে পূর্ববাংলার কোন জেলার লোক পশ্চিমবাংলার কোন জেলায় বেশী আবাস গড়েছে তার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এর থেকে ঢাকা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দেশত্যাগের হার, আশ্রয় গ্রহণকারীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান জানা যায়। ঢাকা জেলা ত্যাগকারী শরণার্থীরা বেশীরভাগ আশ্রয় গ্রহণ করে কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায়। যেখানে ঢাকার লোকসংখ্যা সর্বোচ্চ ২৪৫১৬ জনের মধ্যে। তবে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পেশার সঠিক হিসাব জানা যায়নি কারণ তারাই আশ্রয় গ্রহণ করেছে যাদের পরিবারের কোন সদস্য আগের থেকেই পশ্চিমবাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করছে অথবা চাকুরী সুত্রে বসবাস করছে।[২৬]

ঢাকা জেলা ত্যাগকারী শরণার্থীরা বেশীরভাগ আশ্রয় গ্রহণ করে কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায়। যেখানে ঢাকার লোকসংখ্যা ২৪৫১৬ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ। আশ্রয় গ্রহণকারীদের পেশার সঠিক হিসাব জানা যায়নি কারণ তারাই আশ্রয় গ্রহন করেছে যাদের পরিবারের কোন সদস্য আগের থেকেই পশ্চিমবাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করছে অথবা চাকুরী সুত্রে বসবাস করছে।[২৭]

সারণী-৪.৫

ঢাকা জেলা ত্যাগকারী পশ্চিমবাংলার আশ্রয় গ্রহনকারীর শতকরা হার ও মোট আশ্রয় গ্রহণকারী

জেলা	শতকরা হার	মোট আশ্রয় গ্রহণকারী
বর্ধমান	১৮.৩	২৪,৬১৬
নদীয়া	১০.৭	৮৪,৯১৩
মেদিনীপুর	২৪.৩	৬০৫৮
বীরভূম	১৮.৩	২৬৫৫
বাঁকুড়া	১৮.৩	২২৯৮
হাওড়া	৩১.০	১৬,৮২৭
হুগলী	২৬.৩	১২,১১৫
২৪ পরগনা	১৯.১	১০০,৫৬৪
কলকাতা	৩০.৬	৭৬,০৭৮
জলপাইগুড়ি	১৫.৩	২০,৫১৯
দার্জিলীং	১৮.৯	৩,৪২৫
কুচঁবিহার	১০.৯	২২,৫২৬

সুত্রঃ Report on the Sample Survey for Estimating the Socio- Economic Characteristics of Displaced Persons Migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, Calcutta, 1951, page 2-3

[২৫] ফটিক চন্দ্র বসাক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪-৩৩

[২৬] Report on the Sample Servey for Estimating the Socio- Economic Characteristics of Displaced Persons Migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, page 1

[২৭] Report on the Sample Servey, op-cit, page 1

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে ঢাকা জেলার শরণার্থী ১৭.৯%।[২৮] মুর্শিদাবাদ, মালদা জেলায় ঢাকা জেলার লোক তেমন আশ্রয় গ্রহণ করেনি বললেই চলে। পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দুদের মধ্যে ১৭.৯% ঢাকা জেলার যা সকল জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ হার।[২৯]

সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মালদা, জলাপাইগুড়ি (পাকিস্তান) ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগকারীর হার খুবই কম। দেশত্যাগকারীদের মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক, বয়স ভিত্তিক হার নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি কারণ যারা পূর্ববাংলা ত্যাগ করেছে তারাই সপরিবারে দেশত্যাগ করেছে।[৩০] তাদের দেশত্যাগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয় এ সময় পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু পরিবারের মধ্যে ৭৬.৪% উচ্চবর্ণ, সিডিউল কাস্ট ২০.৮%, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ২.৫%, ০.৩% অন্যান্য। এসময় সিডিউল কাস্ট এর তুলনায় উচ্চবর্ণ হিন্দুরাই বেশী দেশত্যাগ করে। তাদের অধিকাংশ কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায় গমন করে। আর সিডিউল কাস্টদের বেশীরভাগই গমন করে ২৪ পরগনা ও নদীয়ায়।[৩১]

পূর্ববাংলা ত্যাগ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সকল সদস্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং অনেকের আত্মীয়-স্বজন যারা পূর্ববাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) স্থায়ীভাবে বাস করছেন তাদের সাক্ষাৎকার থেকে থেকে কিছু অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরা হল।

কেস স্টাডি ১

ঢাকা শহরের রায়ের বাজারের পুলপাড় এর বাসিন্দা গদাধর পাল। বয়স ৬৫/৬৬, পেশায় স্বর্ণকার। তার পিতা মৃত অমৃতলাল পাল ছিলেন কুমার। তারা বংশ পরম্পরায় মাটির কাজই করতেন। আত্মীয় স্বজনরাও মাটির কাজ করতেন। রায়ের বাজারের হিন্দুদের অধিকাংশই মাটির কাজ করতেন। এ অঞ্চলের কোন লোকই ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার পূর্বে দেশত্যাগ করেনি। তবে দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেশত্যাগ করার মত কোন ঘটনা ঘটে নি। তিনি মনে করেন যে, সেখানে তারা ভারতে ভাল সুযোগ সুবিধা পেয়েছে বলে চলে গিয়েছে। ভারত সরকার মাইগ্রেশন দেয়াতে তারা চলে গিয়েছেন। তার বাবাও চলে যাওয়ার জন্য পৈতৃক বাড়ি বিক্রয় করে টাকা যোগার করেছিলেন। যেদিন যাবেন বলে স্থির হয়েছিল সে রাত্রে সে টাকাসহ বাক্স চুরি হয়ে যায় বলে তিনি আর যেতে পারেননি। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তার চাচা, মামারা সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ভারতে চলে গিয়েছেন। তবে তারা দেশত্যাগ করার সময় কিছু বলে যাননি, গোপনে তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিয়ে চলে গিয়েছেন। তিনি মামাদের কাছ থেকে নানার রেখে যাওয়া সম্পত্তি কিনতে চাইলে তার কাছে বিক্রয় না করে গোপনে অন্য লোকের কাছে বিক্রয় করে চলে যান। তারা কেন গিয়েছেন সে সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। তাদের কোন মেয়েদের নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি।[৩২]

কেস স্টাডি ২

ডাঃ নিতাইচন্দ্র বিশ্বাস, ঢাকার মোহাম্মদপুরে বাঁশবাড়ি রোডে বসবাসকারী হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। বয়স প্রায় ৮০। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। তার পৈত্রিক নিবাস জয়দেবপুর থানার পলাসোনা গ্রামে। তার পিতা ছিলেন কৃষিজীবী ও স্বর্ণকার।

---

[২৮] Report on the Sample Servey, op-cit, page 2
[২৯] Report on the Sample Servey, op-cit, page 2
[৩০] Report on the Sample Servey, op-cit, page 2
[৩১] Report on the Sample Servey, op-cit, page 2
[৩২] গদাধর পাল, ইন্দ্রজীত জুয়েলার্স, পুলপাড়, রায়েরবাজার

তার মামারা, বোন, দুই পিসি ভারতে চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তার বোন ও পিসিদের শ্বশুড়বাড়ি ছিল টঙ্গী থানার ভাদাম গ্রামে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় এ গ্রামে অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার বোন ও পিশিদের বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। তার বোন ও এক পিসি জলপাইগুড়িতে ও আরেক পিসি দন্ডকারণ্যে চলে যায়। তার বোনের স্বামী প্লাম্বার মিস্ত্রী ছিল। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় তিনি অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন।

তার মামার বাড়ি ছিল ধামরাই থানার চুন্না গ্রামে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তারা ভারতের আসামে চলে যায়। তারা যাওয়ার সময় তাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে যান। তার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কেউ বাংলাদেশে নেই। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কেউ ভারতে যায়নি।

তার মতে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় সরকার ঠিকমত নিরাপত্তা দিতে পারেনি তবে তখন লোক কম মারা গিয়েছে কিন্তু সম্পত্তি দখল ও লুটপাট হয়েছে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় লোক বেশী মারা গিয়েছে। ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের পাশাপাশি পূর্ববাংলার কিছু লোকও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিল। দাঙ্গার সময় গরীব হিন্দু লোকেরাই বেশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কারণ ধনীদের কলকাতায় বিষয় সম্পত্তি ছিল বলে তারা আগেই চলে গিয়েছিল। এ অঞ্চলের বর্ণ হিন্দুরা মুসলমান ও তফসীলিদের ঘৃণা ও অত্যাচার করত। যার ফলে পরবর্তীতে মুসলমানদের অনেকে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন যে হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুর ওপর অত্যাচার করত। জমিদারদের বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি ছিল কলকাতায়, সেখানকার আরাম আয়েশ ছেড়ে এখানে থাকেনি। তারাই প্রথমে পরিবার পরিজন সহ দেশত্যাগ করে চলে যায়। তফসীলি সম্প্রদায় পরবর্তীতে নিজেদের নিরাপত্তাহীন ভেবে চলে যায়। অনেক হিন্দু লোক তাদের জমি দুই তিনজনের কাছেও বিক্রয় করেছে। হয়তো তারা বিক্রয়ের সময় ন্যায্য দাম পেত না বলেই এটা করেছে।

তিনি জানান যে, ১৯৫০ সালে তাদের পলাসোনা গ্রামে কোন দাঙ্গা হয়নি বলে তার বাবা দেশত্যাগ করেন নি। আর ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তিনি সরকারী চাকুরী করতেন এবং বাস করতেন মোহাম্মদপুরের বাঁশবাড়িতে। এ সময় বাঁশবাড়িতে তেমন কোন সমস্যা হয়নি বলে তিনি চলে যাননি। সে সময় তার বাবা বেচে ছিলেন না। তার এলাকায় তার কোন সমস্যা হয়নি। তার বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনরা তার সাথে কোনরকম অসৌজন্যমূলক আচরণ করেননি। তাই তিনি দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তাও করেননি।[৩৩]

কেস স্টাডি ৩

মনির চন্দ্র পাল একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। তার বড় ভাই, শ্বশুড়, মামা এবং আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে বড় ভাই, মামার ছেলেরা গিয়েছে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর এবং শ্বশুড়ের ছেলেরা পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে তারা তাদের বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি সরকারী চাকুরী করতেন বলে যেতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কোন আত্মীয় কলকাতায় ছিল না।

বড় ভাই তার সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই। বর্গাদাররা সেগুলো দখল করে নেয়। মামারা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা তাদের সম্পত্তি কম দামে বিক্রয় করে গিয়েছেন। কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই।

তার মতে দাঙ্গার কারণে নিরাপত্তার অভাব বোধ এবং সুবিচার পাওয়ার আশা ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় ভয়ে তারা ইনভেস্ট করেনি। বেকার সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা ছিল। অনেকে চাকুরী না পেয়ে চলে গিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ফিরে আসেন।[৩৪]

---

[৩৩] ডাঃ নিতাইচন্দ্র বিশ্বাস, বাঁশবাড়ি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

[৩৪] মনির চন্দ্র পাল, গ্রাম: বেলুড়, থানা- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

কেস স্টাডি ৪

চিনু রানী জানান যে তার কাকা শ্বশুড় ভারতে চলে গিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া করতে গিয়েছিলেন আর আসেননি। তিনি তার সম্পত্তি তার মায়ের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।
তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। তার মতে যার যখন ইচ্ছে হয় চলে যায়।[৩৫]

কেস স্টাডি ৫

সীমা পোদ্দার জানান যে তার পাঁচ কাকা, দুই মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে তার বড় বোনের বিয়ে হয়, সে আর ফিরে আসে নাই। তার কাকা ও মামারা ভারতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে চলে গিয়েছে। সঠিক সাল তার মনে নেই তবে তা পাকিস্তান আমলে।
তাদের তেমন কোন সম্পত্তি ছিল না, দোকান ছিল, দোকান বিক্রয় করে চলে গিয়েছে।[৩৬]

কেস স্টাডি ৬

পরিক্ষীত সাহা জানান যে, তার চার মামা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন তারা আর ফিরে আসেন নাই। তার কাকাত ভাইয়েরা কলকাতায় ব্যবসা করতেন, পরে তার কাকা ছেলেদের কাছে চলে যান। তারা কেউই কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তার কাকাত ভাইয়েরা যাওয়ার সময় কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে যান আর কিছু সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে। তার পরিবারের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। তিনি মনে করেন পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে যান।
১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য ভারতে যান। তিনি ময়মনসিংহ এলাকায় যুদ্ধ করেন।[৩৭]

কেস স্টাডি ৭

গণেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রথম জীবনে চাকুরী করতেন। তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি তার এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি তার এলাকায় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দাঙ্গার সময় শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তার ইউনিয়নে বা তার আশেপাশে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। তিনি জানান যে, তার দূর সর্ম্পকের কিছু আত্মীয় স্বজন দেশত্যাগ করেছেন তবে তার ঘনিষ্ঠ কেউ দেশ ছেড়ে যায়নি। যারা গিয়েছেন তারা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যেই দেশত্যাগ করেছেন। তাদের কেউ কেউ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কেউ ভয়ে দেশত্যাগ করেছেন আবার কেউ কলকাতায় চাকুরী করতেন।
হিন্দুদের দেশত্যাগ সম্পর্কে তার ধারণা যে, একটি দেশের সামগ্রিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যারা বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের বেশির ভাগই দেশ ছেড়ে চলে যায়। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন। তিনি নিজেও বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অনেকবার হয়রানির শিকার হয়েছেন। তার বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কিরণশংকর রায়, জ্যোতি বসু, গোপাল বসাক, অতুল গাঙ্গুলী, ধীরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ।

[৩৫] চিনু রানী, ১১২ ঠাকুর দাস লেন, বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা
[৩৬] সীমা পোদ্দার, ১১২ ঠাকুর দাস লেন, বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা
[৩৭] পরিক্ষীত সাহা, গ্রাম- আমতা, থানা- ধামরাই, মানিকগঞ্জ

তার কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। যারা চলে গিয়েছেন তাদের সম্পত্তি তারা বিক্রয় করে গিয়েছেন কিছু রয়েছে যা তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোগ করছেন।[৩৮]

কেস স্টাডি ৮

নিরোদ চন্দ্র নন্দী দোহার থানার শিমুলিয়া গ্রামের 'কবি নজরুল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' এর প্রধান শিক্ষক। তার এক কাকা ১৯৭১ সালের পরপরই ভারতে চলে যান। কিন্তু তিনি কেন গিয়েছেন তা তার জানা নেই। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তিনি কৃষি কাজ করতেন। ভারতে গিয়েও কৃষি কাজই করতেন। হিন্দুদের দেশত্যাগের সর্ম্পকে তার ধারণা যে, যারা যায় তারা মনে করে যে, ভারতে গিয়ে তারা নিরাপদে থাকবে।
কাকার সম্পত্তি তাদের কাছে বিক্রয় করে গিয়েছেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।[৩৯]

কেস স্টাডি ৯

মনতোষ ভৌমিক দোহার থানার শিমুলিয়া গ্রামের 'কবি নজরুল উচ্চ বলিকা বিদ্যালয়' এর সহকারী শিক্ষক। তিনি জানান যে, তার কাকা, মামা, মাসী, পিসি সবাই স্থায়ীভাবে ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় চাকুরী করতেন। পরে তারা আর ফিরে আসেন নাই। তার দুই ভাই চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার পর ভারতে চলে গিয়েছেন। তাদের গ্রামে কোন মুসলমান নেই তাই তাদের গ্রামে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়নি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সর্ম্পকে তিনি মনে করেন যে, এখানে যারা উচ্চ শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী তাদের মান সম্মান বজায় রাখতে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগ করে চলে যান। দেশ বিভাগের পর তাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার জন্যই চলে গিয়েছেন।
তারা তাদের সম্পত্তি ভাইদের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।[৪০]

কেস স্টাডি ১০

গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোদত, চাউলের ব্যবসা করেন। তার এক জ্যাঠা পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরপরই ভারতে চলে যান। তিনি বাজারে দোকানদারী করতেন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই চলে যান। সে সময় কোন গণ্ডোগোল ছিল না। তিনি কোনরকম নির্যাতনের শিকার হন নাই। পরিবেশ শান্ত ছিল।
তিনি যখন চলে যান তখন তার বাবা জীবিত ছিলেন বলে তার কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। তার পরিবারের কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হয় নাই।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা তাদের নিজেদের ইচ্ছে হয়েছে বলে চলে গিয়েছেন। বন্ধুরা গিয়েছে তাই তারাও গিয়েছেন।[৪১]

---

[৩৮] গণেশ চন্দ্র চৌধুরী, গ্রাম- চুরাইন, থানা- নবাবগঞ্জ,ঢাকা

[৩৯] নিরোদ চন্দ্র নন্দী, ১৩১/১ গঙ্গাধরপট্টি, ঝিটকা, মানিকগঞ্জ

[৪০] মনতোষ ভৌমিক, গ্রাম- মরিচট্যাক, থানা-সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

[৪১] গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোদত, গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোস্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ১১

ননী গোপাল সাহা, পেশা- শিক্ষকতা। তার এক কাকা ১৯৭৩ সালে ভারতে চলে গিয়েছেন। তিনি ফরিদপুরে ব্যবসা করতেন। ফরিদপুর থেকে ঢাকায় আসার পথে ডাকাতি হয়। পরে আবার বাড়িতে ডাকাতি হয়। এর পর পরই তিনি চলে যান। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তার কাকা যাওয়ার সময় তার সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ কলকাতায় যায়নি।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন এক এক জন এক এক কারণে চলে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশেই ছিলেন। কোন রকম নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি।[৪২]

কেস স্টাডি ১২

প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী জানান যে তার বাবার দুই কাকা ভারতে স্থায়ীভাবে চলে যান। একজন ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন, তিনি ডাক্তারী করতেন। আরেকজন পরে যান, তিনি ব্যবসা করতেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি এলাকার রাজনৈতিক চাপেই চলে গিয়েছেন। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিনা তা তার জানা নেই। তার নানা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন, তিনি শিক্ষক ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে, অনেকের অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, আবার অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে চলে গিয়েছেন।

তার বিষয় সম্পত্তি প্রশান্ত কুমারদের দখলেই আছে। অর্পিত আইনের কারণে তার দাদার সম্পত্তি তিনি সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়ে ভোগ করছেন, যেটা সে নিজেই আইনত অধিকারী। ১৯৭১ সালে তারা দেশেই ছিলেন।

কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি।[৪৩]

কেস স্টাডি ১৩

ডাঃ ননী গোপাল চক্রবর্তী জানান যে, তার দুই মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। একজন ডাক্তার ছিলেন, আরেকজন কলকাতায় পড়াশুনা শেষ করে নেভীর অফিসার ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ভারতে যান। তিনি পড়তে গিয়েছিলেন। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।

তিনি সম্পত্তি রেখেই চলে গিয়েছিলেন। সেগুলো এখন মুসলমানদের দখলে আছে। হিন্দু আইনে যেহেতু মেয়েরা পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় না তাই তার মা কোন সম্পত্তি পায়নি। অর্পিত আইনের ফলে তার পরিবারে কোন সমস্যা হয়নি।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে, অনেকের আত্মীয়-স্বজন চলে যাওয়াতে অন্যরাও চলে গিয়েছে। কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। এ এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক সবসময়ই ভাল।[৪৪]

কেস স্টাডি ১৪

কালীতারা চৌধুরী, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি মারা যান), তাঁর পিতা ছিলেন জমিদার।

---

[৪২] ননী গোপাল সাহা, গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোস্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার

[৪৩] প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী, গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোস্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার

[৪৪] ডাঃ ননী গোপাল চক্রবর্তী, গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোস্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পূর্বেই তার দুই ভাই ভয়ে সবকিছু ফেলে রেখে কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় তাদের ব্যবসা ছিল। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর তারা ক্ষতিপূরণ পায়।
তার স্বামী যায়নি বলে তিনি যেতে পারেননি। তিনি বলেন যে, তিনি না গিয়ে ভুল করেছেন। যারা গিয়েছে তারা সকলেই বাড়ি গাড়ি করেছেন আর তিনি এখানে পড়ে আছেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশেই ছিলেন। সম্পত্তি নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সেখানে যায়।[৪৫]

কেস স্টাডি ১৫

বিজয় গোবিন্দ সাহা জানান যে, তার মামী ভারতে চলে গিয়েছেন তার ছেলের কাছে। তার ছেলে ছোটবেলা থেকেই কলকাতায় থাকতো। কলকাতায় তার এক মামা থাকতেন, তার কাছেই অন্য মামার ছেলেরা থাকতো। তার মামা যতীন্দ্র মোহন সাহা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন। তিনি কলকাতায় টিনের ব্যবসা করতেন। আগে বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন পরে আর আসেননি।
তার মামী যাওয়ার সময় সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছেন। তার সম্পত্তি নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার পরিবারের কোন সমস্যা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেশেই ছিলেন।[৪৬]

কেস স্টাডি ১৬

রতন রানী সাহা জানান যে, তার তিন ভাই ও চার বোন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তার ভাইয়েরা চাকুরী করতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। বোনেরা তাদের স্বামীদের সাথে গিয়েছেন। তারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়ে যাননি।
তার বাবার বাড়ির বিষয় সম্পত্তি তার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি তা বিক্রয় করে দেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার পরিবারের কোন সমস্যা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেশেই ছিলেন।[৪৭]

কেস স্টাডি ১৭

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র সাহা ব্যাংকে চাকুরী করেন। তার পিতা আসামে কাঠের ব্যবসা করতেন। তিনি জানান যে, তার বড় ভাই ১৯৬৩/৬৪ সালের দিকে ভারতে চলে যান। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে এখানে কিছু করতে না পেরে ভারতে চলে যান। ১৯৪৭ সালের পরে তার ঠাকুরদাদা ভারতে চলে গিয়েছিলেন। নারায়ণগঞ্জে তাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল, ১৯৪৭ সালের পূর্বে দাঙ্গায় তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই ক্ষতি আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কেউ কলকাতায় থাকেনি।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা হিন্দুরা অর্থনৈতিক ছাড়াও মানসিকভাবে নির্যাতিত বলেই চলে গিয়েছেন। এছাড়া যাদের কোন আত্মীয় ভারতে প্রতিষ্ঠিত তারাই বেশী গিয়েছে।
গড়পাড়া গ্রামে তাদের প্রায় ৭০/৮০ শতাংশ জমি ছিল, সেটা অন্যরা ভোগ করছে। তার ঠাকুরদাদা চলে যাওয়ার সময় তার সম্পত্তি বিক্রয় করে যেতে পারেন নি, পরেও তা আর বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তার ভাইয়ের কোন সম্পত্তি ছিল না।

---

[৪৫] কালীতারা চৌধুরী, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[৪৬] বিজয় গোবিন্দ সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[৪৭] রতনরানী সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর, তার বাবার বাড়ি গ্রাম- পিপলিয়া, থানা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তার পরিবার ভারতে ছিল, পরে ফিরে এসেছে। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।[৪৮]

কেস স্টাডি ১৮

আরতি রানী সাহা যানান যে, তার এক বোন ও চার ভাই ভারতে চলে গিয়েছে। তার বোন বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে যায়, বোনের স্বামীর পরিবার আগে থেকেই ভারতে থাকতো। তার বড় ভাই ভারতে পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তিনি সেখানে সরকারী চাকুরী করতেন, পরে মারা যান। তারা সবাই আসামে থাকে।
সম্পত্তি বলতে এই বাড়িটা (বর্তমানে বসবাস করছেন) তাকে দিয়ে গিয়েছিল। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার কোন সমস্যা হয়নি। হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।[৪৯]

কেস স্টাডি ১৯

কালীপদ সাহা, বয়স ৯৫/৯৬। তিনি জানান যে, তার তিন ভাই ৪৫/৫০ বৎসর আগে ভারতে চলে গিয়েছে। তারা এমনিতেই চলে গিয়েছেন। তারা ভারতে ব্যবসা করতেন।
সম্পত্তি বলতে এই ভিটাবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই, যা তিনি ভোগ করছেন।[৫০]

কেস স্টাডি ২০

শান্তিলতা চৌধুরী জানান যে, তার এক ভাই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তার তিন ছেলে ভারতে থাকে। তার ভাই পূর্ববাংলায় কোন কাজকর্ম করতে পারেন নাই তাই তার মামা তাকে নিয়ে যায়। তিনি ১৯৬০ সালের পূর্বে ভারতে চলে যান। শান্তিলতা চৌধুরীর তিন ছেলে তাদের এক দাদুর সঙ্গে খুব ছোটবেলায় ভারতে চলে যায়। ব্রিটিশ আমলে তার ছোট কাকা ধুপড়িতে চাকুরী করতেন পরে তার পুরো পরিবারকে সেখানে নিয়ে যান। তার এক দেবর নবদ্বীপে থাকে। তার বাবা তাকে সেখানে বাড়িঘর করে দেবার পর সে সেখানে চলে যায়।
তার দাদার সম্পত্তি তার বড় বোনকে দিয়ে যান। তাদের বায়রা গ্রামে কিছু সম্পত্তি ছিল সেটা তারা নিজেরা ভোগ করেন না দেখাশুনা করার লোক নেই বলে। আবার অর্পিত আইনেও পড়ে নাই। তাদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল কিন্তু তার স্বামী ঠিকমত খোঁজখবর না রাখায় সেগুলো বর্গা চাষীরাই ভোগ করছে।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।[৫১]

কেস স্টাডি ২১

বিমলা সাহা জানান যে তার বড় ভাই ১৯৭০ সালে ভারতে চলে যায়। ভাইয়ের ছেলেরা ম্যাট্রিক পাশ করে ভারতে চলে যায়। তারা সেখানে ফলের ব্যবসা করতো পরে তারা তাদের বাবাকে নিয়ে যায়। তার মামারাও ভারতে চলে যায়। তারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়নি।

---

[৪৮] বাবু গোবিন্দ্র চন্দ্র সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর, এটা তার মামার বাড়ি। তার বাবার বাড়ি গ্রাম- গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ সদর

[৪৯] আরতি রানী সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর

[৫০] কালীপদ সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর

[৫১] শান্তিলতা চৌধুরী, স্বামী-মৃত সত্যেন্দ্র কুমার চৌধুরী (জমিদার ছিলেন), গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর।

তাদের অল্প কিছু সম্পত্তি ছিল সেগুলো তারা কম দামে বিক্রয় করে চলে যায়। তার শ্বশুড় বাড়ির সকলে তাদের নিজেদের সম্পত্তি নিজেরা ভোগ করছে।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।[৫২]

কেস স্টাডি ২২

দুলাল সাহা, পেশা-ব্যবসা, তিনি জানান যে তার তিন মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা খুব ছোটবেলায় কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে স্কুলে পড়াশুনা করেন হোস্টেলে থেকে।
তারা কোন প্রকার নির্যাতনের শিকার হন নাই। তার নানা নিজে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি তারা নিজেরা তাদের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করছেন।[৫৩]

কেস স্টাডি ২৪

পুস্প মল্লিক জানান তার স্বামী রস ও চরস এর ব্যবসা করতেন। তিনি জানান যে তার দেবর ভারতে চলে গিয়েছে। তিনি দেশে কাঁচামালের ব্যবসা করতেন। তিনি নদীয়ায় জমি কিনে চলে যান। অন্য প্রতিবশী ও বন্ধুবান্ধব চলে গিয়েছে তাই তিনিও চলে গিয়েছেন। তাদের গ্রামে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়নি তবে **১৯৬৪** সালে এই গ্রামের আশেপাশের এলাকায় দাঙ্গা হয় ফলে এ গ্রামের অনেক লোক ভয়ে ভারতে চলে গিয়েছে।
তিনি তার সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে যান। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।
তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যেতে চায়নি আর তাদের কোন সমস্যাও নেই। যারা চলে গিয়েছে তারা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পেরেছে বলে চলে গিয়েছে। **১৯৪৭** সালের পূর্বে তাদের কেউ পশ্চিমবাংলায় ছিল না।[৫৪]

কেস স্টাডি ২৫

স্মারক দেবী জানান যে, **১৯৬৪** সালের দাঙ্গার পরে ভয়ে তার তিন ভাই, মা, চাচী, চাচাত ভাই এবং দেবর দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছেন। খাইলকুর গ্রামে কোন দাঙ্গা না হলেও এ এলাকার অনেক লোক ভয়ে চলে গিয়েছে। এ গ্রামের সকল হিন্দুরাই নিম্নবর্ণের।
তাদের অনেক জমি ছিল। তারা যাওয়ার সময় সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছেন। তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়েনি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়। যারা চলে গিয়েছে তারা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পেরেছে বলে চলে গিয়েছে। আর **১৯৬৪** সালের দাঙ্গার পর বেশী চলে গিয়েছে। তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যায়নি তাই তিনিও যান নাই। **১৯৪৭** সালের পূর্বে তাদের কেউ পশ্চিমবাংলায় ছিল না।[৫৫]

---

[৫২] বিমলা সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[৫৩] দুলাল সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[৫৪] **পুস্প মল্লিক, গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী।**
[৫৫] স্মারক দেবী, গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী, তার বাবার বাড়ি গাজীপুরের হায়দরাবাদ গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ২৬

মধুমালা জানান যে, তার বাবা, মা, ভাই, বোন, দুই চাচা ও ননদরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছেন। তার ননদের বাড়ি ছিল ধরপাড়া ইউনিয়নের সাতাইশ গ্রামে। তারা কৃষিকাজ করত। ভারতে গিয়েও তারা জমি কিনে কৃষিকাজ করছে।
তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছেন।
১৯৬৪ সালে টঙ্গীর মিল কারখানার শ্রমিকরা দাঙ্গা করে। দাঙ্গার সময় তার বাবার বাড়ি লুট হয়নি বা কোন নির্যাতনের শিকার হয়নি। তবে তার শ্বশুড় বাড়িতে মাঝে মাঝে চুরি হত। গরু চুরি হত, চুরি করে দূরে নিয়ে ছেড়ে দিত। এখানে উগ্র টাইপের কিছু লোক এগুলো করতো।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়, এছাড়া ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভয়ে চলে গিয়েছে। খাইলকুর গ্রামের হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর বাইরের লোকেরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে ভয় ডর দেখানোর পর আস্তে আস্তে লোকজন কমে যায়। মাসে দুই তিনবার করে চুরি হত। তবে বর্তমানে একটি সমস্যা হচ্ছে বিয়ের সমস্যা। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ কলকাতায় ছিল না।
তারা তাদের সম্পত্তি তারা বিক্রয় করে গিয়েছে। তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যায়নি তাই তিনিও যান নাই। তবে তারা যেতে চেয়েছিলেন,তার শ্বশুড় আট বিঘা জমি বিক্রয় করেছিলেন। ১৯৭১ সালে শ্বশুড় মারা যান। এলাকার সুলতান মিয়া এবং আফসারউদ্দীন নামে দুই লোক তাদের বসত ভিটা ও সাত/ আট বিঘা জমি বেনামে দলিল করে নেয়। চৌদ্দ বৎসর কেস চালানোর পর তার তারা মামলায় জয়লাভ করে, পরবর্তীতে পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাওয়ায় আর ভারতে চলে যাওয়া হয়নি। নারী নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটেনি।[৫৬]

কেস স্টাডি ২৭

বসন্তকুমার সরকার, তার পিতা ছিলেন কৃষক। তিনি পেশায় প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক বর্তমানে আইনজীবী। তিনি জানান তার ৪ চাচা, জ্যাঠাত ভাই সহ এলাকার আশেপাশের ৫টি বাড়ির লোক সকলেই ভারতে চলে গিয়েছে। এখানে অবস্থানকালে তারা সকলেই কৃষিকাজ করতেন। ভারতে তারা কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ ব্যবসা ও কেউ চাকুরী করেন। তারা ১৯৬৯/ ১৯৭০ সালে ভারতে চলে যান। তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছে। তিনি নিজে ১৯৭১ সালের পূর্বে একবার ভারতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার চল্লিশ হাজার টাকার হুন্ডি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফেরত আসেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় চলে গিয়েছিলেন আবার ফেরত আসেন। তার বাবা বাদে অন্য শরিকরা চলে গিয়েছে। তার বাবা ভয় পেলেও বাধ্য হয়ে থেকেছে যে সকল জমিজমা ছিল সেগুলো নষ্ট হওয়ার ভয়ে আর যায়নি। তার নিজের ভারতে বাড়ি ও সম্পত্তি আছে তবে তিনি এখনও স্থায়ীভাবে চলে যান নাই।
তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই তবে তার একজন শরিকের জমি অর্পিত আইনে পড়েছে।
তার আত্মীয়রা কুঁচবিহার ও নদীয়ায় থাকেন।[৫৭]

কেস স্টাডি ২৮

সুরীন্দ্র চন্দ্র দাস একজন মুদি দোকানদার। তিনি জানান যে তার চার মামা অনেক আগেই ভারতে চলে গিয়েছেন। আর তার দুই ছেলে ভারতে চলে গিয়েছে। তার ছেলে শ্বশুড়ের সম্পত্তির লোভে গিয়েছে।

[৫৬] মধুমালা, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী, তার বাবার বাড়ি গাজীপুরের বাসন ইউনিয়নের আতর গ্রামে
[৫৭] বসন্তকুমার সরকার, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী,

তিনি জানান উধুর গ্রামে কোন হাঙ্গামা হয়নি। তিনি শ্বশুড় বাড়িতে থাকেন। তার পৈতৃক বাড়ি পাকুড়িয়ায় বাড়িঘর লুট হয়েছে, জমিতে আগুন দিয়েছে তবে কোন শারীরিক নির্যাতন হয় নাই।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা লুটপাটের ভয়েই তারা চলে গিয়েছে।
১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ কলকাতায় ছিল না। তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই।
তার ইচ্ছা নাই বলে তিনি যান নাই। তিনি গীর্জার ফাদারের সঙ্গে ঋণদানের কাজ করতেন। ১৯৭১ সালে ফাদারের কাছে ভারতে যাওয়ার জন্য সাহায্য চান যুদ্ধে মারা পড়ার ভয়ে। তখন ফাদার তাদেরকে বলেন যে ভারতে যাওয়ার জন্য দশ হাজার করে টাকা দেবেন তবে শর্ত দেন যে ভারতে গিয়ে মরতে পারবেন না। এ কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে মরতে হলে নিজের দেশেই মরবেন। অনেকে তার বাবাকে সাহায্যের আশ্বাস দিলে তারা আর দেশ ছেড়ে যান নাই।[৫৮]

কেস স্টাডি ২৯

সদানন্দ দাস জানান তার পিতা ছিলেন একজন কৃষক। তিনি নিজেও একজন কৃষক। তিনি জানান যে তার কাকা ও জ্যাঠাশ্বশুড় ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা দেশে কৃষিকাজ করত। ভারতে চা এর দোকান চালায়। তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভারতে চলে যায়। তিনি বলেন যে, এখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যা ছিল না। তাদের ভারতে যেতে ভাল লেগেছে তাই চলে গিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। তখন তারা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। তারা কোন রকম নির্যাতনের শিকার হন নাই।
তার কাকার প্রায় ছয়/ সাত বিঘা জমি ছিল। মাত্র সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করে চলে গিয়েছে। তারা জানতেও পারেন নাই। তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। তবে তাদের প্রতিবেশী সুরীন্দ্র দাস তাদের সব সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। কয়েক বৎসর পর সুরীন্দ্র দাস তাদের বাড়িতে এলে তার বাবা সুরীন্দ্র দাসকে মারতে উদ্যত হলে তের পাখি জমি ফেরত দেয়। তার কাকা ভারতে মুর্শিদাবাদে থাকে।
তার বাবা দেশ ছেড়ে যেতে চান নাই। তিনি বলেন মরলে নিজের বাড়িতেই মরব।

কেস স্টাডি ৩০

অগ্নিমোহন দাস, তার পিতা কৃষিকাজ করতেন। তিনি নিজেও একজন কৃষক। তার ছেলেরা বিদেশে চাকুরী করে। তার মেয়ের শ্বশুড় ও তার পরিবার ভারতে চলে গিয়েছে। দেশে তিনি কৃষিকাজ ও ব্যবসা করতেন। তবে তার মেয়ের জামাই ঢাকায় থাকে। এ এলাকার অনেকে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভারতে চলে যায়। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।
অগ্নিমোহন দাস এর মতে ভারতকে নিজের দেশ মনে করে তাই তারা ভারতে চলে যায়।
যারা চলে গিয়েছেন তারা সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে গিয়েছে। তার নিজের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই বা নষ্ট হয় নাই।
তিনি জানান তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নাই। দাঙ্গার সময় ভয়ে অন্য এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মেম্বার তাকে চলে যেতে বললেও তিনি যান নাই। তিনি বলেন ভারতে গেলে তাদের সারাদিন সারা বৎসর কাজ করতে হবে আর এখানে ছয় মাস কাজ করে বাকী ছয় মাস আরামে থাকে।[৫৯]

---

[৫৮] সুরীন্দ্র চন্দ্র দাস, বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম- উধুর, ডাক- উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর, স্থায়ী ঠিকানা- পাকুড়িয়া, গাজীপুর।
[৫৯] অগ্নিমোহন দাস, গ্রাম- উধুর, ডাক- উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর,

কেস স্টাডি ৩১

যুগলরানী দাস, তার পিতার ছিল মাছের আড়ৎ। তিনি জানান যে, তার কাকা ১৯৬৪ সালের রায়টের পর ভারতে চলে গিয়েছিল। ভারত সরকার তখন রেশন কার্ড দিয়েছিল তাই সে চলে গিয়েছিল তবে সুবিধা করতে পারেনি বলে তিন মাস পরে ফিরে এসেছে। তার কাকার মাছের ব্যবসা ছিল।
১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তাদের বাড়ি লুট হয়েছিল। দাঙ্গা শুরু হলে তারা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। তাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন সমস্যা হয় নাই।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।[৬০]

কেস স্টাডি ৩২

শ্রীমতি জানান যে তার মামা, দাদা, দিদি চলে গেছে। আমার জ্যাঠাত ভাইয়েরা গিয়েছিল, আবার এসে পড়েছে। জায়গা জমি ছিল না। মানুষের কাজকর্ম করতো, তিনি রায়টের আগেই চলে গিয়েছেন। মানুষের জায়গায় থাকতো, কাজের খোজে চলে গিয়েছে। তাদের কোন সম্পত্তি ছিল না
ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে সুবিধা হয় চলে যায়। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন না
তার স্বামীর কিছু জমি ছিল তা থেকে কিছু বিক্রয় করেছে আর কিছু আছে।
তার স্বামী ভয় পেলেও যায় নাই। যারা গেছে তারা বলেছে যে ঐ দেশে থাকা খাওয়ার কষ্ট, তো কষ্ট করলে নিজের দেশেই করবো।[৬১]

কেস স্টাডি ৩৩

জ্যোতি জানান যে তার মামারা চলে গিয়েছে, তার চাচা, ভাসুর, মামা শ্বশুড়রা ভারতে চলে গেছে। মামা কৃষিকাজ করতো, চাচা মাছের ব্যবসা করতো, মামা শ্বশুড় গৃহস্থ ছিল। তিনি রায়টের পর চলে গিয়েছে।
কাজের খোঁজে চলে গিয়েছে। দিল্লীতে থাকে, ঠিকানা জানা নেই।
চাচা সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছে। তবে মাপের সমস্যা আছে। মামাশ্বশুড় জমি বিক্রয় করে গিয়েছে। তার ভাসুরকে তার শ্বশুড় কালীগঞ্জে জায়গা দিয়েছিল সে জায়গা বিক্রয় করে চলে গিয়েছে। আমার শ্বশুর রায়টের আগে মারা গেছেন।
ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার বা কোন প্রকার দাঙ্গার শিকার হন নাই।
এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই, প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে সুবিধা হয় চলে যায়। অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে সুখী হয়ে যায় এবং যখন সুযোগ হয় তখনই ভারতে চলে যায়।
১৯৪৭ সালের পূর্বে কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন না।
অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। আমার স্বামীর কিছু জমি ছিল তা থেকে কিছু বিক্রয় করেছে আর কিছু আছে।
তার পরিবারের মেয়েদের কোন সমস্যা হয় নাই। তার বাবা যায় নাই কারণ বাবার কাজ করার মত লোক ছিল না। সেখানে আমার বাবা যে কাজ করবে সে কাজ বাবার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। আমরা রায়টের পর এই জায়গা বদলী করে গিয়েছিলাম তবে ভারতে জায়গা না পেয়ে ফিরে আসি। ঘর বাড়ি করে থাকতেছি।[৬২]

[৬০] যুগলরানী দাস, গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর। বাবার বাড়ি ঢাকার রাজারবাগ, দক্ষিণ গাঁও
[৬১] শ্রীমতি, গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর, বাবার বাড়ি পাকুড়িয়া, গাজীপুর, মামার বাড়ি গাজীপুরেই
[৬২] জ্যোতি, গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ৩৪

রূপচাঁন দাস জানান তার মা এর জ্যাঠাত ভাইয়েরা গিয়েছে।
তারা সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছেন।
১৯৪৭ সালের পূর্বে তার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন না।
অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।
এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। মামাদের গ্রামে দাঙ্গার পর ভয়ে তারা চলে যায়। আমার বাবা, চাচা কেউই যান নাই, কারণ প্রয়োজন হয় নাই।[৬৩]

কেস স্টাডি ৩৫

অনিতা রানী দাস জানান যে, তার কাকা, কাকী, চাচাতো ভাই বোনেরা গিয়েছে। তাদের প্রচুর জমি ছিল তাই কৃষিকাজ এর উপরই নির্ভরশীল ছিল।
তারা সম্পত্তি কিছু বিক্রয় ও কিছু বিনিময় করে গিয়েছেন।
এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে নিরাপত্তা ও সুবিধা আছে বলে মনে হয় সে সেখানে চলে যায়।[৬৪]

কেস স্টাডি ৩৬

অঞ্জলী চক্রবর্তী মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার নালী গ্রামে বাস করতেন। তার পিতা- নরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঢাকা কলেজ ও পরে হরগঙ্গা কলেজ এ চাকুরী করতেন। ১৯৪৭ সালে তার চাকুরিজীবী বাবা অপশনে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে কাজে যোগ দেন। তখন তার বয়স ১৩/১৪ বছর। পিতার সঙ্গে সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। তারা গ্রাম ত্যাগ করার পর তাদের বাড়িতে লুটপাট হয়।[৬৫]

কেস স্টাডি ৩৭

গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী বা তার পরিবার কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তারা গ্রাম ছাড়ার পর তাদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছিল, তখন অনেক ক্ষতি হয়। তাদের বাড়িতে শুধু ডাকাতি হয়েছিল তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি যে বিল্ডিং এ থাকতেন সেখানে কোন আক্রমন হয়নি। তিনি আরও জানান, তাদের সামাজিক অবস্থান ভাল ছিল। তার ছোট কাকা বিক্রমপুরের বেলতলী হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বড় কাকা বেউথা রাজবাড়ির ম্যানেজার ছিলেন আর পদ্মা নদীর পাড়ে ইলিশের আড়ৎদারী করতেন। আর এক কাকা কবিরাজ ছিলেন। ময়মনসিংহ এলাকায় বড় বড় মহারাজাদের চিকিৎসা করতেন।[৬৬]

---

[৬৩] রূপচাঁদ দাস, গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর
[৬৪] অনিতা রানী দাস, গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর
[৬৫] অঞ্জলী, চক্রবর্তী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
[৬৬] গনেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা, পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা গ্রামঃ রয়্যাল, সাভার, জায়া জয়মন্ডপ, থানা- সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

কেস স্টাডি ৩৮

গৌরীপদ ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৮ সালে এম.এ পাশ করেন। তাদের কনভোকেশনের সময়ই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। ১৯৪৯ সালের দিকে তিনি কলকাতায় চলে যান। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাশ করেন সে সময় এ বিভাগে দুটো পদ খালি ছিল। বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. আব্দুল হালিম, তিনি বলেন যে মাইনোরিটি বলে তাকে শিক্ষক হিসাবে নেয়া হবে না। তখন তিনি মেদিনীপুরে মহিষাদল কলেজে চাকুরী নিয়ে চলে যান। তিনি ঢাকার ছেলে বলে তাকে আশুতোষ কলেজে তখন নেয়া হয়নি।[৬৭]

কেস স্টাডি ৩৯

সন্ধ্যা চক্রবর্তী জানান ১৯৪৬ সালের রায়টের সময় তারা তাদের শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রাম ত্যাগ করেন। এ এলাকায় তারা কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। পিসিমা আগরতলা রাজবাড়ির বৌ ছিলেন, তার কাছে তাদের পরিবারের সবাই আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬৮]

কেস স্টাডি ৪০

সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী, মামার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানায়। তিনি জানান যে ১৯৪৬ এর ভয়াবহ রায়টের প্রেক্ষাপটে তার বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসেন। তারা গ্রামের বাড়িতে কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।

কেস স্টাডি ৪১

বাদল সেন ঢাকায় ব্যবসা করতেন, তিনি অল পাকিস্তান হোসিয়ারী শিল্পের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, নারায়ণগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যশোরের রবিউল আলম, আ.স.ম আব্দুর রব, সিরাজুল আলম খান, নূরে আলম সিদ্দিকী, ফকির সাহাবুদ্দীন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান (২০০৯ সাল) তার বন্ধু। ১৯৭১ সালের আগে থেকেই কলকাতায় আসা যাওয়া ছিল। ১৯৭১ সালের পরে স্থায়ীভাবে ভারতে চলে যান। তার দেশত্যাগের পেছনে সঠিক কোন কারণ নেই।[৬৯]

কেস স্টাডি ৪২

বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা এ্যাডভোকেট নিতাই লাল গাঙ্গুলী ঢাকায় অবস্থানকালে ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে চাকুরী করতেন। ১৯৫৭ সালের থেকে কলকাতায় বাস করেন। তিনি কলকাতায় এসে আইন পাশ করেন। তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন রাজনৈতিক কারণে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। তার বাবা, মা আগে ঢাকা ত্যাগ করেন পরে তিনি। তাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি। রাজনৈতিক কারণে তাকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে। রাজনৈতিক কারনে তাকে চাকুরি থেকে ছাটাই করা হয়েছিল পরে আবার চাকুরীতে যোগ দেন। তার বাবা মাখন লাল গাঙ্গুলী বিজয়গড় কলোনিতে একটি প্লটের ব্যবস্থা করেই কলকাতায় স্থায়ী হন।

[৬৭] গৌরীপদ ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, এ/১৩১ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা

[৬৮] সন্ধ্যা চক্রবর্তী, অরবিন্দ নগর, কলকাতা

[৬৯] বাদল সেন, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা

কেস স্টাডি ৪৩

সত্রাজিত নাগ চৌধুরী ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। তিনি ভারতীয় ডিফেন্সে চাকুরী করতেন। তার নারায়ণগঞ্জের বৈদ্যেরবাজার গ্রামের বাড়িটি কখনো কোনভাবে আক্রান্ত হয়নি। তাদের সেখানে জমিদারী ছিল। ১৯৪৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর জমিদারীর আয় কমে গিয়েছিল ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তার বাবা চাকুরি করতে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, পরে পরিবারের সকলেই চলে আসেন। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসে পড়াশুনা করেন। তারা চার ভাই এখানে এই কলোনিতেই পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন।[৭০]

কেস স্টাডি ৪৪

প্রলয়শংকর চক্রবর্তী জানান ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তার বয়স ছিল ৯/১০। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ভয় পেয়ে তার পরিবার ঢাকার শাসাইল গ্রাম ত্যাগ করেন।[৭১]

কেস স্টাডি ৪৩

দীপকরঞ্জন গুহ জানান যে, তাদের বাড়ি ছিল সুত্রাপুর ঋষিকেশ দাস রোডে। তারা ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকা ত্যাগ করেন। তারা কোন নির্যাতন বা দাঙ্গার শিকার হন নাই।[৭২]

কেস স্টাডি ৪৫

জয়শ্রী গাঙ্গুলী, বর্তমানে বিজয়গড় কলোনিতে থাকেন। তিনি বলেন "আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আমাদের বাড়ি ডেপুটি বাড়ি নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরপরই আমরা চলে আসি। আমার বাবা, কাকারা কলকাতায় চাকুরী করতেন। আমি খুব ছোট ছিলাম। আমরা কোন নির্যাতনের শিকার দাঙ্গার হইনি। আমরা প্রথমে আমার পিসির বাড়িতে উঠি।[৭৩]

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গাজীপুরের সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগনের বেশীরভাগ সদস্য সে অঞ্চলে দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে বলে জানান। তবে তাদের অনেকে দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে নয়, অন্য গ্রামের দাঙ্গার খবর পেয়ে ভয়ে দেশত্যাগ করেন। অনেকে জানান যে, তাদের সাথে স্থানীয় সাধারণ জনগনের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল, তাদের আত্মীয়-স্বজনরা যারা দেশত্যাগ করেছেন তারা দাঙ্গার কারণ ব্যতিত কোন সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন নাই। মানিকগঞ্জ, দোহার, নওয়াবগঞ্জের সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা জানান যে, তাদের এলাকায় কোন দাঙ্গা হয় নাই। তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করেছেন।

১৯৫০ সালে প্রথম পূর্ববাংলায় দাঙ্গা হয়। এর পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা দেশত্যাগ করেছেন তাদের অধিকাংশই উচ্চবর্ণের। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরই প্রথম নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দেশত্যাগ করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পটভূমি, দাঙ্গার সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক এবং দাঙ্গার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল। দাঙ্গার সময় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

---

[৭০] সত্রাজিত নাগ, বিদ্যাসাগর কলোনি, কলকাতা

[৭১] প্রলয়শংকর চক্রবর্তী, কলকাতা

[৭২] দীপকরঞ্জন গুহ, কলকাতা

[৭৩] জয়শ্রী গাঙ্গুলী, বিজয়গড় কলোনী, কলকাতা, পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম– কুমারভোগ, থানা- লোহজং, মুন্সিগঞ্জ

পঞ্চম অধ্যায়
১৯৫০ সালের দাঙ্গা পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশত্যাগ

পূর্ববাংলায় হিন্দু মুসলমান বিরোধের সূত্রপাত হয় ১৯০৫ সালের প্রথম বঙ্গভঙ্গ আইনকে কেন্দ্র করে। এই আইনকে রদ করার জন্য হিন্দু এলিট গোষ্ঠীর আন্দোলন ও এই আইনকে রক্ষা করার জন্য মুসলমান এলিট শ্রেণীর আন্দোলন দুই সম্প্রদায়ের বিরোধকে বাড়িয়ে তোলে। এ সময়ের বঙ্গভঙ্গ আইন পূর্ববাংলার মুসলমানদের সচেতন হতে এবং পূর্ববাংলার অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করে। ১৯১১ সালে এই আইন রদ করা হলে পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজ তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করে। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের মিছিলের সময় নারিন্দা মসজিদে আক্রমণকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বাঁধে। এ সময় দাঙ্গা রোধ করার জন্য শান্তি কমিটি গঠন করা হলেও দাঙ্গা বন্ধ হয়নি। ১৯৩০ সালের ১৭ মার্চ ঢাকার রমাকান্ত লেন এ কয়েকজন হিন্দু মাস্তান কর্তৃক একজন মুসলমান বালক নিহত হয় হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে। প্রায় একমাস ধরে চলতে থাকা দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের ২৭ জন করে ৫৪ জন লোক নিহত হয় ঢাকা শহরে। এই দাঙ্গা ঢাকার গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। সর্বাধিক আক্রান্ত হয় হিন্দু প্রধান ৮১ টি গ্রাম। নরসিংদী, রায়পুর, শিবপুর এর প্রায় ১৫০০০ লোক আক্রান্ত হয়। এসকল এলাকার প্রায় ১০,০০০ লোক অঞ্চল ত্যাগ করে আগরতলায় চলে যায়।[১] ২২ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত রাস্তার লাট্টু খেলায় কয়েকজন বালকের বিরোধকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা চলে।[২] ১৯৪০ সালে পুনরায় দাঙ্গার সূত্রপাত হয় ১৪ মার্চ হোলির দিন রং খেলাকে কেন্দ্র করে। প্রশাসনের সর্বস্তরের হস্তক্ষেপ ও দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা সত্ত্বেও "থেকে থেকে ভূমিকম্পের মত দাঙ্গা সব ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে থাকে।[৩] দ্যা ইন্ডিয়ান ম্যানুয়াল রেজিস্টারের সম্পাদক এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকার দাঙ্গার বর্ণনায় শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "বঙ্গের দ্বিতীয় শহরে প্রায় ছয় মাস যাবৎ হত্যাকারীর ছুরি ও হস্তধৃত মশাল ------একজন হিন্দুর মৃত্যুর পর একজন মুসলমানের মৃত্যু ঘটেছে এবং মুসলমানের পর হিন্দুর।---- আর ছয় বৎসর পরই যা ঘটবে এ বোধহয় তারই পূর্বাভাস।[৪]

আব্দুল মোহাইমেন তার স্মৃতিচারণে ঢাকার দাঙ্গার প্রসঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন,

> "১৯২০ সন থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ঢাকায় যতগুলি দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা হয়েছে এত সংখ্যক দাঙ্গা অখণ্ড বাংলার আর কোন স্থানেই হয়নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এসব দাঙ্গা আরম্ভ হত সাধারণতঃ লাটিম খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর মত সাধারণ ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে। তখনকার হিন্দু সমাজে ছুরি মারামারির ব্যাপারটা বাল্যকাল থেকেই ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হত--- ।[৫]
>
> "শুনেছি দুই পক্ষেই নাকি গোয়েন্দা বাহিনী থাকতো খবর আনা নেওয়ার জন্য। মুসলিম এলাকায় যেই খবর আসতো যে হিন্দুরা একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানরা তৎপর হয়ে উঠতো এবং সূর্য্য ডোবার পূর্বেই সংখ্যা সমান করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতো এবং প্রায় ক্ষেত্রেই নিরীহ কোন হিন্দুর প্রাণ সংহার করে সংখ্যার সাম্য প্রতিষ্ঠা করতো।
>
> যতদূর শুনেছি ঢাকার দাঙ্গা মুসলমান হিন্দু দুই এলাকা থেকেই আরম্ভ হত। শহরের মুসলমানরা যেহেতু গরীব এবং অধিকাংশই শ্রমজীবী তাই দাঙ্গার সময় তাদের প্রায় না খেয়ে উপোষ করে মরার মত অবস্থা হত। তাছাড়া প্রশাসনে, পুলিশে হিন্দুদেরই আধিপত্য ছিল বলে দাঙ্গা বাধলে মুসলমানরাই বেশি মার খেত, ক্ষতিগ্রস্তও হত বেশী এবং পুলিশ রিপোর্টের ফলে জেল জরিমানারও বেশী সম্মুখীন হত। ঢাকায় তখন

---

[১] Dacca Riot Enquiry Committee Report. 1941, Page 209, Government of Bengal
[২] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪৩
[৩] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩
[৪] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬
[৫] মোঃ আব্দুল মোহাইমেন, দুই দশকের স্মৃতি, প্রকাশক- মোঃ আব্দুল মোহাইমেন, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির খুব জোর। এসব পার্টির শিক্ষাধীন যুবকেরা তখন খুব সাহসী ও যোদ্ধৃসুলভ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।"[৬]

১৯৪৬ সালের কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার পর পূর্ববাংলার নোয়াখালী এরপর বিহার, বোম্বে, পাঞ্জাবে প্রায় পুরো ভারত জুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে প্রশাসন আলগা হয়ে পড়ছে। এতে লোকের মধ্যে অশান্তি আর অনিশ্চয়তা বেড়ে যায় এবং তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে।[৭] নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও সন্দীপ অঞ্চলে দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এতে হিন্দুরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬ অক্টোবর দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯৪৬ সালে কলকাতার প্রলয়ংকারী হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের মধ্যে অবিশ্বাস এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই ভাবতে থাকেন, এরপর আর একত্রে বসবাস করা সম্ভব কিনা।[৮]
কলকাতা আর নোয়াখালী দাঙ্গার অভিজ্ঞতা বাংলার হিন্দুদের একটা বড় অংশকে দেশভাগের পক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের ঘোষণাকে স্বাগত জানায় বাঙ্গালি হিন্দু সম্প্রদায়। ২০ জুন বাংলার আইন পরিষদে দেশভাগ স্থির হয়ে যাবার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ঘোষণা করেন, আজ হিন্দুদের পক্ষে মুক্তির দিন।[৯]
স্বাধীনতাকালীন সময়ে পূর্ববাংলা দাঙ্গামুক্ত থাকলেও পাঞ্জাবের দুই অংশেই শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। স্বাধীনতাকালীন সময়ে পূর্ববাংলার হিন্দু মুসলমান জনগণের মনোভাব ব্যাখ্যা করে অন্নদাশংকর রায় বলেন,

"স্বাধীনতার সময় থেকে দেখছি, তখন আমি ময়মনসিংহের জেলা জজ, যে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। বাংলা দ্বিখন্ডিত করার ব্যাপারে কংগ্রেস সেদিন সম্পুর্ণ ইচ্ছুক ছিল। স্বাধীনতার সময় যে উদ্বাস্তু এল পূর্ববাংলা থেকে সেটাওতো হিন্দু উসকানি। ওখানকার হিন্দুরা মোটেই অনিরাপদ ছিলেন না এবং বহু পরিবারই এখানে আসার পরও, ওদিককার ক্ষীরটুকু যাতে মার না- যায় তার জন্য সেখানে ওয়ারিশ রেখে আসে।"[১০]

ভারতে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ১২ জানুয়ারী থেকে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করলে দাঙ্গার প্রকোপ কমে আসে কিন্তু ৩০ জানুয়ারি তিনি সুস্থ্য হয়ে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে গেলে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন, কারণ গান্ধীজীর অনশনে তারা চটে লাল হয়েছিল।[১১]

পশ্চিমবাংলায় স্বাধীনতার আগে থেকেই দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কাটিহার, নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর একটি মহররম এর মিছিলে আক্রমণ করা হলে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়ে তা কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। সরকার প্রেসনোট প্রকাশ করে এবং কারফিউ জারী করে। ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় দাঙ্গা হয়।[১২]
ঢাকায় দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়লেও ভীত হয়ে অনেক হিন্দু উচ্চশ্রেণীর লোক দেশত্যাগ করেন। অনেকে আক্রান্ত হয়ে দেশত্যাগ করে। কলকাতার মুসলমানরা এই সময় সন্ত্রস্ত ছিলেন; কারণ স্বাধীনতার আগের কয়েক দিনের দাঙ্গায় প্রায় একতরফা ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল মুসলমান এলাকাগুলি। ৩১ আগস্ট রাত থেকে আবার নতুন করে দাঙ্গা শুরু হলে কলকাতার মুসলমানরা আরও বিপন্ন বোধ করতে থাকে।[১৩]

---

[৬] মোঃ আব্দুল মোহাইমেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
[৭] জয়া চ্যাটার্জী, বাংলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ, ১৯৩২-৪৭, পৃষ্ঠা ১৭৯
[৮] আবুল হোসেন, ভারত বিভাগ ও অন্যান্য লেখা, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১২
[৯] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫২
[১০] অন্নদাশংকর রায়, আরও এক তমস, পৃষ্ঠা ১৩৩
[১১] মৌলানা আজাদ, ভারত স্বাধীন হল, পৃষ্ঠা ২২০
[১২] দাঙ্গার কিছু বিবরণ জানা যায় Home, Political(C.R), B Proceeding, vol. 1, File no. 313-7/49, B Nov. 50/1273-1329, GOEB
[১৩] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ দেশত্যাগ, পৃষ্ঠা ৫০

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার এই দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিল শহরের মুসলমানদের তাড়ানো অথবা সন্ত্রস্ত করে দেওয়া প্রধানতঃ পূর্ব ও মধ্য কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে পেশাদার গুণ্ডারাই মুসলমান বস্তির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। তাদের পিছনে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতাও ছিলেন প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের নামে নেতারাই এক সময় তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল।[১৪]

বিজয়গড় কলোনির সুভাষচন্দ্র বসু (ভানু) তাদের এলাকায় কিভাবে মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে জানান,

> "মন্ত্রী নিকুঞ্জবহারী মাইতির কাছ থেকে লোক বসাবার অনুমতি নেওয়া হয়। তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না –তারঁও এই লোক বসানোয় সায় ছিল।----- ১৯৪৯ সালেও মুসলিমদের দেখেছি। ঢাকার নারিন্দার---- বলে একজন থাকতেন। তিনি ভয় দেখিয়ে মুসলিমদের তাড়িয়ে দেন যাতে ঐ বাড়িতে কিছু উদ্বাস্তু আশ্রয় নিতে পারে। ----মানে জাদরেল লোক অনেকেই মান্য করত, ভয় পেত। উনার ভয়ে মুসলিমরা পালিয়ে যায়, পরে আরেকদল লোক উদ্বাস্তুদের নিয়ে ঐ খালি ঘরগুলোতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে।"[১৫]

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলায় ব্যাপকভাবে দাঙ্গার ঘটনা না ঘটলেও বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটে। কলকাতা নিবাসী সন্ধ্যা চক্রবর্তী জানান তিনি যখন খুব ছোট, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় তার পরিবার ভয় পেয়ে তাদের গ্রাম মুন্সিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা) এর ষোলঘর ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলে।[১৬]

প্রলয় শংকর চৌধুরী ৯/১০ বৎসর বয়সে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ঘটনায় ঢাকার শাসাইল গ্রাম ত্যাগ করেন।[১৭]

১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট গেন্ডাড়িয়া হাইস্কুলের শিক্ষক অনিল মোহন রায় এর বাড়িতে আক্রমণ হয়। আর স্ত্রী জ্যোৎস্না রায় তাদের বাড়ির মুসলমান দুধওয়ালার কাছ থেকে আগেই খবর পেয়েছিলেন যে তাদের বাড়িতে আগুন লাগানো হবে। আগুন দিতে এলে তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালিয়ে গিয়ে একটি মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নেন। সে বাড়িতে আরও কয়েকটি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মিঃ রায় স্কুল থেকে ফেরার পথে গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচেন। পরে সপরিবারে দেশত্যাগ করেন।[১৮]

১৯৪৭ সালে ১৬ আগস্ট এর দাঙ্গা পরিস্থিতিতে দীপক রঞ্জন গুহর পরিবার ঢাকার সুত্রাপুর থানার হৃষিকেশ দাস রোডের বাড়ি ত্যাগ করেন।[১৯]

ভারতের পশ্চিমবাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সর্বপ্রথম পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে। এই দাঙ্গা সবচেয়ে বিস্তার লাভ করে ঢাকা শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এর ফলে বহু লোক হতাহত হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সময় পর্যন্ত প্রায় ২৪ লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় গমন করে, ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর এ সংখ্যা ৩৫ লক্ষ হয়, জানুয়ারী-১৯৫১ পর্যন্ত ১১ লক্ষ মুসলমান পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ববাংলায় আসে।[২০]

---

[১৪] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০
[১৫] সুভাস চন্দ্র বসু, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদক- ত্রিদিব চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২০০
[১৬] সন্ধ্যা চক্রবর্তী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, বিধাননগর কলোনি, কলকাতা
[১৭] প্রলয় শংকর চৌধুরী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, কলকাতা
[১৮] মানস রায়, শিক্ষক, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, সেন্টার ফর স্যোসাল সাইন্স স্টাডিজ, কলকাতা
[১৯] দীপক রঞ্জন গুহ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, স্বামীজী স্বরণী, কলকাতা
[২০] বিস্তারিত B.C.Roy, West Bengal Legislative Assembly proceedings , 17th April 1950

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় বাগেরহাটের কালশিরায় সংঘটিত ঘটনা দাঙ্গা সম্পর্কে উল্লেখ করে প্রাদেশিক সভায় বলেন, Communal disturbances started on a large scale in East Bengal in December 1949, with the Bagerhat incidents.[২১]

কালশিরায় সংঘটিত ঘটনার প্রায় একমাস পর থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সংবাদ মাধ্যমের উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচারের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে। পূর্ববাংলা সরকার, নেতৃস্থানীয় হিন্দু জনগণ তাদের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে বাগেরহাটের ঘটনাটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয় এবং একে কেন্দ্র করে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে দেশের স্থিতিশীল পরিবেশ নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন বারবার। কিন্তু সরকারের প্রেসনোট উপেক্ষা করে, পূর্ববঙ্গ হিন্দু নেতাদের সাক্ষ্য উপেক্ষা করে ভারতের কিছু সংবাদপত্র মিথ্যা গুজব ও উত্তেজনা বিস্তার করিতে থাকে। কিন্তু কলকাতাস্থ স্টেটসম্যান পত্রিকা মোটেই গুরুত্ব দেয় নাই। পূর্ববাংলা সরকার ও জনগণের সকল আবেদন ব্যর্থ হয়, দুই দেশেই সংঘটিত হয় ভয়াবহ দাঙ্গা এবং বহু নিরীহ জনগণ আহত ও নিহত হয়, বাড়িঘর হারায় এবং দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় সংঘটিত এই দাঙ্গা পূর্ববাংলার জনগনের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বহি:প্রকাশ বলেই প্রচারিত হয়েছে বারবার এবং কিছুসংখ্যক গুণ্ডাপ্রকৃতির স্বার্থান্বেষী লোক দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকে। কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রচারমাধ্যম ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা পরিস্থিতিকে শান্ত করতে এবং স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। তাছাড়া একটি দেশের স্থিতিশীলতা পার্শ্ববর্তী দেশের স্থিতিশীলতার উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পূর্ববাংলার খুলনা জেলার বাগেরহাটে সংঘটিত পুলিশ কর্তৃক আসামী গ্রেফতারের একটি ঘটনাকে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় এবং সভা সমাবেশে বিভিন্ন বক্তৃতায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক বলে প্রচারণা চালায় (এমনকি পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণাপত্র, গল্প, উপন্যাসে এই প্রচারণার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়)। ফলে দুইদিন পর হতেই কলকাতা ও কলকাতার শহরতলী শিল্প অঞ্চলে দাঙ্গা বাঁধে পরে তা পূর্ববাংলার ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

পশ্চিমবাংলার ১৯ জানুয়ারী বনগাঁয় মসজিদ অপবিত্র করার মাধ্যমে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কয়েকটি এলাকায় বিশেষ করে কলকাতার চতুর্দিকে দাঙ্গা ভয়ংকর আকার ধারণ করে। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় বলে ১৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। পূর্ববঙ্গের কালশিরায় সংঘটিত যে ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, সে ঘটনাই পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গার জন্য দায়ী বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেসনোটে জোর দেয়া হয়।

নেতৃবৃন্দ ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা এবং দাঙ্গার সূত্রপাত

খুলনা জেলার কালশিরায় সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে প্রচারণা চালানো হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংঘটিত হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত রিপোর্টের বর্ণনা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য থেকে কালশিরার ঘটনা সর্ম্পকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সরকারের আদেশক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদান করে। ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে বলা হয়,

> "বিভাগপূর্বকালে বাগেরহাট থানার অর্ন্তগত ঝালডাঙ্গা কম্যুনিস্ট কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। এছাড়া এই স্থানটি কুখ্যাত দুস্কৃতিকারী অঞ্চল। খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত হতে জানা যায় যে কয়েকটি মকদ্দমার সঙ্গে জড়িত কয়েক ব্যক্তিকে এই স্থানের লোকেরা বিপুল সম্বর্ধনা জানায় এবং এদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় পাকিস্তান বিরোধী ধ্বণি করা হয় এবং অত্যন্ত উত্তেজনামূলক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এর ফলে একটি মকদ্দমা দায়ের এবং ২০ ব্যক্তির

[২১] বিস্তারিত Dr.Bidhan Chandra Roy, West Bengal Legislative Assembly proceedings , 17^{th} April 1950

বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। কতিপয় আসামী ভারতে পালিয়ে যায় এবং অন্যান্যরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আত্মগোপন করে।
২০ ডিসেম্বর একজন সহকারী পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর এবং তিনজন পুলিশ কন্সটেবল নিয়ে গঠিত এক পুলিশ দল জয়দেব ব্রহ্ম নামক একজন কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে বাগেরহাটের অর্ন্তগত কালশিরা গ্রামে রজনী মাঝির বাড়ি গেলে তারা অকস্মাৎ কম্যুনিস্ট প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র নমঃশুদ্র জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

একজন কনস্টেবল ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং পুলিশদলের অবশিষ্ট লোকগুলি গুরুতরভাবে জখম হয়। অবশিষ্ট পুলিশটি কোনমতে পালিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের আনসারদিগকে এই ঘটনার সংবাদ দিলে আনসারদের সাহায্যে দুইজন পুলিশকে উদ্ধার করা হয়। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আনসার দল এবং গ্রামবাসীরা সময়মত তাদের উদ্ধার করতে আসায় তাদের জীবন বাঁচে। অবস্থা আশংকাজনক হলে আহত পুলিশদ্বয়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহত কনস্টেবলের লাশ আক্রমণকারী গ্রামবাসীরা নিয়ে যায়, এই লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুলিশের অত্যাচার ও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে কালশিরা ও ঝালমত্তলা গ্রামের অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ছেড়ে পালায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা গৃহত্যাগীদের কোন কোন জিনিস চুরি করে। স্থানীয় মুসলমান ও অমুসলমান অধিবাসীদের সাহায্যে পুলিশ উক্ত জিনিস উদ্ধার করিয়া তা মালিকদিগকে ফিরিয়ে দেয়।
এই ঘটনার পর সমগ্র অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। পুলিশী জুলুমের ভয়ে বহু গ্রামবাসী তাহাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে চলে যায়। দুর্বৃত্তরা খালি বাড়ী হতে যা পায় তাই নিয়ে যায়। পুলিশ এসে তাদের নিরাপদে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। যারা গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে।”[২২]

খানাতল্লাশির সময় অন্যান্য নির্যাতনের সাথে তারা মহিলাদের ধর্ষণ করার চেষ্টা করে বলে প্রচার করা হয়।[২৩] এ প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট বলেন,

“তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃক প্রচারিত নারীহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ অথবা প্রতিমা অপবিত্র করণের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেবলমাত্র দুইটি ক্ষেত্রে নারী নিগ্রহের খবর পাওয়া গিয়াছে এবং এসম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে। এই সকল ব্যক্তিরা এবং পুলিশের উপর আক্রমণ সংগঠনকারী কম্যুনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে যাইয়া খুলনায় হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের কাহিনী ছড়াইতেছে এবং প্রতিশোধ দাবী করিতেছে। -------

উত্তেজনাপূর্ণ অপপ্রচারণা ইতিমধ্যেই ফলবতী হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ২৪শে জানুয়ারি হইতে পশ্চিমবঙ্গে একটানা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সংবাদ পাইতেছে। ফলে ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ হইতে এই বহুসংখ্যক বাস্তহারা এই প্রদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) আসিতেছে।”[২৪]

খুলনার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে ৭ ফেব্রুয়ারি। খুলনার স্থানীয় হিন্দু নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক বিবৃতি থেকে খুলনার বহুল প্রচারিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়।[২৫] এই বিশিষ্ট বক্তিবর্গ হচ্ছেন, খুলনা মিউনিসিপ্যলিটির কমিশনার শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদ চন্দ্র মুখার্জী, বাগেরহাটের জমিদার শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার নাগ, খুলনার জেলা তফসীলি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট রায়সাহেব কালীচরণ মণ্ডল এবং মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও গার্লস কলেজের অধ্যাপক হরিপদ ঘোষ, তারা ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকার সমালোচনা করে এবং কালশিরার প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করে বলেন,

“বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরিতকরণ, নারী ধর্ষণ ও লুন্ঠনের সংবাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।’

---

[২২] Home, Political (C. R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5 R- 1, GOEB
[২৩] বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ২২৮
[২৪] দৈনিক আজাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[২৫] ঐ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

আমরা কালশিরার অনুষ্ঠিত প্রকৃত ঘটনা কারও অপেক্ষা কিছুই কম জানিনা বলিয়া চ্যালেঞ্জ করিতে পারি। আমরা জনসাধারণকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের প্ররোচণায় না পড়িতে অনুরোধ করি।
এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন ত্রাস সৃষ্টিকারী গুজব এবং সংবাদ দেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর সুতরাং আমরা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদের নিকট সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া এই গুজব বন্ধ করিবার ও ভবিষ্যতে সংবাদপত্রে এই শ্রেণীর রিপোর্ট প্রকাশ না করিবার আবেদন জানাই।"
"মহাসভা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সমিতি প্রভৃতির ন্যায় অনর্থ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব উত্তেজিত করিবার জন্য সম্প্রতি খুলনায় অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা লইয়া পড়িয়াছে, এবং উহাকে বিকৃত করিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। ঘটনাটি ভারতীয় পার্লামেন্টেও উত্থাপিত হইয়াছে। "[২৬]

বাগেরহাটের এই অঞ্চলে সেসময় প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু না ঘটার ফলে দাঙ্গার কোন সংবাদ পূর্ববাংলা বা ভারতের কোন পত্রিকায় একমাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। দুই দেশের মধ্যে কোন দেশের সাম্প্রদায়িক নেতারাও বক্তৃতা বিবৃতিতে এর কোন উল্লেখ করেন নি। কারণ এই সংঘর্ষ পূর্ববাংলার বিভিন্ন এলাকার কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান ও নির্যাতনেরই একটি ঘটনামাত্র।[২৭] কালশিরা গ্রামের অত্যাচারিত হিন্দুরা কলকাতায় গিয়ে ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে স্থানীয় লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য প্রকৃত ঘটনা থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করতে থাকে এবং স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অনেক কল্পিত কাহিনী ছাপা হতে থাকে।

ভারতীয় হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দ তাদের ২৮ তম সম্মেলনে ২৪- ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন এবং ২৬ ডিসেম্বর এক রেজ্যুলেশনে ভারত পাকিস্তান একত্রিকরণ এর দাবী জানায়।[২৮] তারা অভিযোগ করেন যে পাকিস্তানী হিন্দুদের মান সম্মান সম্পত্তি এবং জীবন নিরাপদ নয়। ২৯ ডিসেম্বর ড. খারে নাগপুরে এক সাক্ষাৎকারে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে 'Economic War' চলছে বলে বলেন, `The war will be won, resulting in annexation at the worst or reunion at the least.'[২৯]
১৯৪৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর ড. খারে কলকাতায় বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তান আদর্শগতভাবে ভারতের জন্য বিপদ এবং দুই রাষ্ট্র এক হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, "Pakistan with its ideology would always be a danger to Bharat. The two countries, therefore must be united."[৩০] পরবর্তীতে ২০ মার্চ মহাসভা সভাপতি এন বি খারে কলকাতায় সভা করতে এলে তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।[৩১]

মহাসভা এক লক্ষ সেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়োগ করে। যারা সামাজিক অসামঞ্জস্য দূর করবে।[৩২]
কালশিরার ঘটনার কিছুদিন পর থেকে হঠাৎ করে কিছু সংগঠন বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা, আর এস এস, এবং সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা সমিতি তাদের পক্ষ থেকে সরকারকে না জানিয়ে সংখ্যালঘুদের রক্ষার নামে তাদের কর্মীদের অস্থায়ী আর্মী ট্রেনিং দেয়।[৩৩] পূর্ববাংলা সরকার অভিযোগ করে। সরকারের এই অভিযোগের স্বীকৃতি পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে। উদ্বাস্তু নেতা মণীন্দ্র পাল বলেন,

---

২৬ ঐ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
২৭ বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮
২৮ DAWN. 28 Dec. 1949
২৯ Home, Political (CR) B Proceedings, File 5R 1, VOL.10, 1350, page-2, GOEB
৩০ Home, Polical (C.R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5.R 1, page 2, GOEB
৩১ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
৩২ Home, Polical (C.R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5.R 1, page 2, GOEB
৩৩ ডাঃ রায় এর দেয়া চিঠির উত্তর, Home, Political (C. R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5 R-1, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

> "মনে হয় ১৯৫০ সাল নাগাদ আমরা পূর্ববাংলা আক্রমণ করতে পারি, শম্ভুবাবু ও আমরা মিটিং করি ব্রুকবন্ড- এসপ্লানেডে, সেখানে একটা অফিস ছিল। – ওখানে রাত্রি আড়াইটা তিনটা নাগাদ বসা আছি শ্যামাপ্রসাদের জন্য তিনি বললেন এসব করতে যেও না। আমরা আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম পূর্ববাংলা, কারণ আমাদের অস্ত্র এসে গেছে নদীয়া বর্ডারে। ---কারণ আমাদের সমস্ত লোকজনদের মেরে, ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিচ্ছে, ভীষণ অবস্থা। এই ঘটনা ১৯৫০ সাল নাগাদ। বহু মানুষকে ট্রেনে পাঠায়, বহু মারা যায়। তার জন্য এরকম একটা আক্রমণের ব্যবস্থা করি। কর্পুরী ঠাকুর বিহার থেকে বহু লোক চার পাঁচ লরি নিয়া এসে গেছে নদীয়া বর্ডারে। খালি আমাদের অর্ডার। আর্মি নয় সিভিলিয়ানদের সঙ্গে।---আমরা ছিলাম। কলোনি কমিটির লোকজনও ছিলেন। বহু লোক যোগ দিয়েছিল।[৩৪]

হিন্দু মহাসভা এই সময় অত্যন্ত প্ররোচনামূলক বিবৃতি দিয়ে হিন্দুদের তাতিয়ে তুলছিল। জনসংখ্যা বিনিময়ের দাবী তুলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[৩৫]

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ২৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে হাঙ্গামা সম্পর্কে দেয়া বিবৃতির প্রতিবাদ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন,

> "ভারতের একশ্রেণীর নাগরিক দেশ বিভাগের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। তাহারা সংরক্ষণ কাউন্সিলের নামে "সাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ সরকার" পর্যন্ত গঠন করে এবং এই সাময়িক সরকার ৩০ হাজার লোক লইয়া গঠিত একটি বাহিনীকে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিতেছে। ---
> হিন্দু মহাসভা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার্থে গঠিত তথাকথিত পরিষদের নেতৃবৃন্দকে খুলনায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনেক পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাকে এক সম্পূর্ণ মিথ্যা সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন।"[৩৬]

১৯৫০ সালের ১০ মার্চ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে দাঙ্গা বিস্তারের কারণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন তার বক্তৃতায় বলেন,

> "লৌকিক রাষ্ট্র ভারতে বার বার ঘোষণা করা হইয়াছে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে আমরা বরদাসত্ করিব না। ---------
> অতঃপর ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলিকাতায় আগমন করেন। ১৫ জানুয়ারী তিনি এক বক্তৃতায় বলেন----পূর্ব্ব ও পশ্চিমবাংলার সীমানা কৃত্রিম এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভাইদের সাহায্যের জন্য যাওয়ার কোন বাধা নাই। সংবাদপত্র এবং সাম্পদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ মহাউৎসাহে এই বক্তৃতা লুফিয়া নেয়। সরদার প্যাটেলের বক্তৃতা জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয়, প্রবন্ধে, পুস্তিকা ও প্রচারপত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুদের কাল্পনিক দুঃখ দুর্দশা মহাসমারোহে প্রচার করা হয়।[৩৭]

বাগেরহাটের সংঘটিত ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন,

---

[৩৪] মণীন্দ্র পাল, ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদক- ত্রিদিব চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১২১, ঢাকায় একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন, তিনি মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তার বাড়ি আক্রান্ত হলে তিনি পালিয়ে কলকাতায় গমন করেন।

[৩৫] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭

[৩৬] দৈনিক আজাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০

[৩৭] পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ১০ মার্চ ১৯৫০,দৈনিক আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৫০

"ইহা কিছুতেই সাম্প্রদায়িক দুর্ঘটনা নহে; -------ঘটনাটি প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং মহাসভার অধিবেশন, সরদার প্যাটেলের বক্তৃতা অথবা সংবাদপত্রগুলিতে যাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই তাহার পুনরুত্থান করিয়া এবং অতিরঞ্জিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হইবার পরও দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন সব বিবৃতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা এই সকল বিবৃতিকে দাঙ্গাঁর কৈফিয়ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ লাভ করে।[৩৮]

৭ ও ৮ মার্চ দৈনিক আজাদ এর সম্পাদকীয় তে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের উস্কানিমূলক ভূমিকার নিন্দা জানিয়ে লেখে,

"----পণ্ডিত নেহেরু ভারতীয় পার্লামেন্টে যে উত্তেজনাপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার কুফল ফলিতে বাধ্য। পন্ডিত নেহেরু একা নন। পণ্ডিতজীর পরে এবার দেশপাণ্ডেজী রণহুঙ্কার দিয়াছেন, তিনি সোজা পূর্ব্ব পাকিস্তান আক্রমণের প্রস্তাব করিয়াছেন। দায়িত্বহীন ভারতীয় নেতাদের সাথে যোগ দিয়াছে কলিকাতার অধিকাংশ ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্র। --------পূর্ব্ব পাকিস্তানের তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাগুলিকে প্রচারের সাহায্যে সেখানে বিপুল ও ভয়াবহ করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে ফলে দাঙ্গাঁর আগুন যেমন সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঠিক তেমনই সেখানকার সংখ্যাগুরুদের মধ্যে এক অসুস্থ উত্তেজনা ও ক্রোধ বহিয়া চলিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে দাঙ্গাঁ হাঙ্গাঁমা যদিও বহু পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছে তবু এখান হইতে লোকাপসরণের চেষ্টা পুরোদমে চলিতেছে।"[৩৯]

এই সমস্ত আন্দোলন, অভিযান এবং বক্তৃতায় পশ্চিমবাংলায় মুসলমান বিরোধী মনোভাব উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরদার বল্লভভাই প্যাটেল ৬ জানুয়ারি বোম্বের এক জনসভায় একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন যা লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করে এবং সেখানে সচেতন মহলে আলোচিত হয়। সর্দার প্যটেলের এই ভাষণের সমালোচনা করে লন্ডনের Daily Herald, Daily Mail, New Cronicle পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাদের এই রেজ্যুলেশনের সমালোচনা করেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু নাগপুরের জনসভায় এবং উপপ্রধানমন্ত্রী বোম্বে জনসভার বক্তব্যে।

কালশিরার ঘটনার পর প্রায় একমাস কোন পত্রিকায় এ সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ১ জানুয়ারি সর্দার প্যাটেল বোম্বাইয়ের এক জনসভায় তীব্র সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দেন এবং ভারতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেন। তিনি তার বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতি অস্ত্রের হুমকি দেন।[৪০] ৬ ও ৭ জানুয়ারি দৈনিক আজাদ তার এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তার এই বক্তব্যের সমালোচনা করে।[৪১] ১১ জানুয়ারি জে.পি মিত্র বনগাঁয়ে হিন্দু মহাসভার এক সম্মেলন করে।

এর সাথে আরও ভূমিকা রেখেছিল প্রচারমাধ্যম। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্য প্রচারের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন সেদেশের পত্র পত্রিকাকে। ভারতীয় প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত পূর্ববাংলায় হিন্দু নির্যাতনের কাহিনী[৪২] পূর্ববাংলায় বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায় এবং ভারতে বসবাসকারী তাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করে মিথ্যা প্রচারণার অভিযোগে পূর্ববাংলার শান্তি বিঘ্নিত হবার আংশকায় পূর্ববাংলায় বিভিন্ন ভারতীয় পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয় ।

---

[৩৮] প্রাগুক্ত, ১১ মার্চ ১৯৫০

[৩৯] দৈনিক আজাদ ৭ ও ৮ মার্চ ১৯৫০

[৪০] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৯

[৪১] দৈনিক আজাদ, ৬ ও ৭ জানুয়ারি ১৯৫০

[৪২] যার বেশীর ভাগই ছিল মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত যা পূর্ববাংলা সরকারের তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে যে গ্রামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে গ্রামই অস্তিত্বহীন। এসব তথ্য রয়েছে Home, Police, (C.R), B Proceeding, এর ফাইলে।

কিন্তু ভারতীয় পত্রিকার সাংবাদিকগণ তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। পূর্ববাংলা সরকার পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট ১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত উত্তেজনামূলক ১৫০টি সংবাদ, সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় ও এ পত্রিকাগুলো পূর্ববাংলায় নিষিদ্ধ করে।[৪৩] ১৯৫০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকা উত্তেজনামূলক সংবাদ, মন্তব্য এবং শিরোনাম প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহযোগিতা করছে এই অভিযোগে পূর্ববাংলায় এই পত্রিকা নিষিদ্ধ করে সরকার প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।[৪৪]

আনন্দবাজার পত্রিকার অব্যাহত মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে সাংবাদিকের পদ থেকে ইস্তফা দেন ঐ পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক বাবু প্রমথ নাথ বিশী। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পুনঃপুনঃ ভিত্তিহীন দূরভিসন্ধিমূলক সংবাদ পরিবেশনের জন্য তাকে চাপ দেয়।[৪৫]

ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহ প্রকাশ্যভাবে নিন্দাপূর্বক পাকিস্তান বিরোধী অপপ্রচার ও হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তথাকথিত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করছিল এবং কলকাতার বহুসংখ্যক প্রচারপত্র ছড়ানো হয়েছে এবং কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিশোধ দাবী করে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৪৬] একমাস পূর্বে সংঘটিত কালশিরার ঘটনার ওপর ১৮ জানুয়ারি যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে মুসলমান বিরোধী তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এ ধরনের অতিরঞ্জিত ও অসত্য ঘটনার বর্ণনা এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্বলিত অনেক লিফলেট, পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় যা পশ্চিমবাংলা থেকে প্রকাশিত হত যা একটি দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ।[৪৭] একটি লিফলেটে লেখা হয়,

> "বাগেরহাট থানার কালশিরা গ্রামের রজনী মাঝির বাড়ী পুলিশ আনসার বাহিনী ও সাধারণ মুসলমান গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক অনুমান ১৩,০০০ এবং ৬০০০ মণ ধান্য ও তাহার যাবতীয় দ্রব্য ঘরবাড়ী সমূহ লুট করিয়া লইয়াছে।----উহারা ৩৫০ ঘর হিন্দুর যাবতীয় সম্পত্তি, ঘরবাড়ী নগদ টাকা, নৌকা, গহনা প্রভৃতি সমস্তই লুট করিয়া লইয়াছে। সম্পত্তির অনুমান মূল্য নগদ মোট ২ লক্ষাধিক ধান্য অনুমান দেড় লক্ষ মণ, এক হাজারের অধিক গরু, গহনার অনুমান মূল্য ৭০/ ৮০ হাজার এবং ঘরবাড়ী অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৬ লক্ষ টাকার উপর।---অমানুষিক অত্যাচারের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা অসম্ভব।"[৪৮]

ভারতীয় কিছু সংগঠন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত উত্তেজনামূলক ভাষায় পুস্তিকা, লিফলেট প্রকাশ করে একদিকে পূর্ববাংলার হিন্দু জনগণের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় হিন্দুদের মুসলমান বিরোধী করে তুলেছে।

১৪ জানুয়ারি কুমিল্লা বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার ও টাউন হলের সদস্যরা এক বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত ভবন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেতারের মত সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে অপপ্রচার চালিয়ে বলা হয় যে চারশত মুসলমান হল আক্রমন করে এবং মুসলমানরা দুইশত হিন্দু পরিবারের বাড়ি লুন্ঠন ও বিধ্বস্ত করে। কুমিল্লা টাউন হলের উপর আক্রমনের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করে কুমিল্লার বিখ্যাত উকিল, কংগ্রেস নেতা, ও পাকিস্তান

[৪৩] Home, Political(C.R), B Proceeding, VOl, 1, File No. March-50/ 72, GOEB

[৪৪] দৈনিক আজাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[৪৫] ঐ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০এ তথ্য দেন রাজশাহীর এক জনসভায় প্রমথ নাথ বিশীর ভাই পি.এন.বিশী।

[৪৬] ঐ, ৪ ফেব্রুয়ারি,-১৯৫০

[৪৭] এর অধিকাংশরই প্রকাশকের ঠিকানা দেয়া আছে কিন্তু পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের নিকট এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলেও মিথ্যা প্রচারণা বন্ধের কোন উদ্যোগ ভারতীয় সরকার গ্রহণ করেনি।

[৪৮] 'বাগেরহাটে নোয়াখালির পৈশাচিক অভিযান আরম্ভ !!!' শিরোনামে একটি লিফলেট, Home, Political (C.R), B Proceeding, Vol. 9, File no. Jan'53/ 392, এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্বলিত বহু লিফলেট, পুস্তিকা অনেক রয়েছে। GOEB

গণপরিষদের সদস্য কামিনীকুমার দত্ত এবং পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের কংগ্রেস দলীয় উপনেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব আবিদুর রেজা চৌধুরী এম.এল.এ, কুমিল্লা টাউন হলের সহ সভাপতি শ্রীযুত জীতেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রিপুরা জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য আসুতোষ সিংহ, কুমিল্লা মিউনিসিপ্যলিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত মোহন রায়, কুমিল্লার মোক্তার শ্রীযুত মনিলাল চৌধুরী ও জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আজিজুর রহমান যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।[৪৯] ত্রিপুরা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি রজতনাথ নন্দী একটি পৃথক বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলেন 'পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থাও সংকটাপন্ন হইবার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫০]

১৮ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর এবং ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড প্রথম কালশিরার ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এরপর থেকেই পূর্ববঙ্গে অত্যাচারের মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। অতিরঞ্জিত ও অসত্য ঘটনার বর্ণনা এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন লিফলেট এবং পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় যার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে।

তখনও পর্যন্ত দাঙ্গা ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কলকাতায় তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়- পরে হাওড়া এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলার মুসলমান বসতির উপর হামলা ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটতে থাকে।[৫১]

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের পর হতে কলিকাতা ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশে হিন্দু মহাসভার কার্যাবলী এবং মহাসভার নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা এবং বিবৃতিকে দৃঢ় ভাষায় নিন্দা করে পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীযূত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,

> "মহাসভা নেতৃবৃন্দের দায়িত্বহীন বক্তৃতা এবং বিবৃতি সমূহের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের চরম সাম্প্রদায়িক নীতি রাজনৈতিক কুতর্ক পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অধিবাসীদের পক্ষে আকস্মিক বজ্রপাততুল্য।
>
> ভারত পাকিস্তান একত্রীকরণ সম্পর্কিত যে কোন সামান্যতম উক্তিও দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত। মহাসভা নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতি সমূহ এবং পাকিস্তানের প্রতি তীব্র বিদ্বেষমূলক উক্তিতে প্রতিটি নিরপেক্ষ, প্রতিটি চিন্তাশীল নরনারী দু:খ প্রকাশ করিয়াছেন। উপরন্তু তাহাদের এই ধরনের কার্যকলাপে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা ভাবিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ---মহাসভার কার্যাবলী দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ ও দ্রুত উন্নতি ভীষণভাবে ব্যহত হইতেছে। যদি হিন্দুস্থান সরকার এইপ্রকার চিন্তাধারার মূলোৎপাটন না করে তাহা হইলে উভয় রাষ্টের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিনষ্ট হইবে এবং তাহার ফলস্বরূপ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পুণরুত্থান ঘটিবে। --- উভয় রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে যদি এই মনোভাব দূরীভূত না হয় তাহা হইলে পাকিস্তানীদের মধ্যেও অবিশ্বাস এবং তিক্ততা সঞ্চায়িত হইতে বাধ্য।"[৫২]

হিন্দু মহাসভা এবং 'Protection of Right of Minority' এর সম্মেলনের পর ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রপাগাণ্ডা শুরু করে।

১৭ জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জের চাপোলিয়া প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সংখ্যালঘুদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এক সভায় ভারতভুক্তি সংক্রান্ত হিন্দু মহাসভার এক প্রস্তাবের নিন্দা করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সহকারী শ্রীযূত চিত্তরঞ্জন সেন গুপ্ত সভাপতি হিসেবে উক্ত সভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, ভারত সরকার অবিলম্বে এই সকল কার্যকলাপ বন্ধ না করলে উভয় ডোমিনিয়নের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের উদ্ভব হবে।"[৫৩]

---

[৪৯] দৈনিক আজাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[৫০] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০- ২৩১
[৫১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
[৫২] দৈনিক আজাদ, ১২ জানুয়ারি ১৯৫০
[৫৩] ঐ, ২২ জানুয়ারি ১৯৫০

১৯ জানুয়ারি থেকে বনগাঁয়ে মসজিদ অপবিত্র করা হয়। ২৪ জানুয়ারি বীরহামপুরে মহাসভার সম্মেলনের পরই মুর্শিদাবাদ জেলার গোরাবাজার ও অন্যান্য এলাকায় হিন্দুরা মুসলমান প্রধান এলাকাগুলোতে আক্রমণ করে।[৫৪] ২৪ জানুয়ারি দমদম ক্যান্টনমেন্টে মুসলমান কোয়ার্টার ও মসজিদ আক্রান্ত হয়। ২৬ জানুয়ারি উল্টাডাঙ্গা, মানিকতলা, বালিয়াঘাটা এলাকায় বিভিন্ন দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।[৫৫] ২৬ জানুয়ারি উল্টাডাঙ্গা, মানিকতলা, বালিয়াঘাটা এলাকায় বিভিন্ন দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।[৫৬]

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

২৯ জানুয়ারি কাউন্সিল বাটানগরে একটি জনসভা করে, এরপর সেখানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়।[৫৭]

৩ ফেব্রুয়ারি বাটানগরে সংখ্যালঘু রক্ষা কমিটি এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে জে.পি মিত্র বলেন পূর্ববাংলার জন্য আলাদা theocratic Govt.[৫৮] গঠনের কোন বিকল্প নেই এবং পূর্ববাংলাকে ভাগ করে সংখ্যালঘু এবং ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়। এই সম্মেলনে বাগেরহাটে শিশু ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়। বিনোদ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি খুলনা ও বরিশালের বিভিন্ন গ্রামে নারী নির্যাতন ও জোর করে ধর্মান্তরিত করণের অভিযোগ করে বক্তব্য রাখে। এর ফলশ্রুতিতে বাটানগরে দাঙ্গা হয়।[৫৯]

পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বাঁধার অন্যতম কারণ।[৬০]

পূর্ববাংলা সরকার ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে চিঠি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও ভারতীয় সরকার বা পত্রিকাগুলো তাদের ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে এবং পূর্ববাংলার সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ অব্যাহত রাখে যা ভারতীয় পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করতে থাকে।[৬১] পরবর্তীতে ভারত ও পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।

বাগেরহাটের কালশিরার ঘটনা কিভাবে পশ্চিমবাংলায় প্রচার হচ্ছে এবং তা পশ্চিমবাংলার আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাচ্ছে তার বর্ণনা দিয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববাংলা সরকারের কাছে ১৯৫০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এক চিঠির মাধ্যমে জানান যে, বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামের কয়েক সপ্তাহের ঘটনার সংবাদ পশ্চিমবাংলা সরকার চাক্ষুষ সাক্ষী, দুর্গত, আতঙ্কিত পুরুষ ও মহিলাদের বর্ণনা থেকে জানতে পারে। তাদের রিপোর্ট থেকে পশ্চিমবাংলা সরকার জানতে পারে যে পুলিশ ও আনসাররা ১৯৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর দিবাগত রাত্রে কালশিরা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ঢুকে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের খুজতে থাকে এবং বাড়ির মহিলা সহ সকলকে নির্যাতন করে। প্রতিবেশিরা তাদের উদ্ধার করে। পুলিশ হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরের দিন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এলাকা পরিদর্শন করে। ২২ ডিসেম্বর মুসলমান জনতা পুলিশের সহায়তায় লুটতরাজ করে। মারপিট ও হত্যা করে। মহিলাদের উপর নির্যাতন করে এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করে। এ খবর বাইরে প্রকাশিত হয়নি কারণ মুসলমানরা গ্রাম থেকে কাউকে বাইরে আসতে বা কাউকে বাইরে থেকে এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়নি। কোন মাঝি হিন্দুদেরকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে রাজি হয়নি। কিছু পুরুষ ও মহিলা

[৫৪] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5.R 1, GOEB
[৫৫] ibid,
[৫৬] ibid
[৫৭] ibid
[৫৮] Home, Polical (C.R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5.R 1, GOEB
[৫৯] Home, Polical (C.R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5.R 1, GOEB
[৬০] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০
[৬১] সে সময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট

Dhaka University Institutional Repository

বহু কষ্টে টিকিট সংগ্রহ করে পশ্চিমবাংলায় পৌঁছে। যে ১২,০০০ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় পৌঁছে তাদের বেশীরভাগই কৃষক এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু। প্রতিদিন প্রায় ৫০০ জন পূর্ববাংলা ত্যাগ করে।”[৬২]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, ডাঃ রায়ের এই বক্তব্যে অনেক অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু মহাসভা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে গঠিত তথাকথিত পরিষদের নেতৃবৃন্দকে খুলনায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনেক পরে ভেবে চিন্তে একে এক সম্পূর্ণ মিথ্যা সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে চালাবার চেষ্টা করেন তার এক অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী কলকাতায় বক্তৃতা দেয়ার পর মহাসভা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় সংবাদপত্র সর্বপ্রথম এই ঘটনার প্রকাশ করে। ১৮ জানুয়ারি কলকাতার সংবাদপত্রসমূহে এই ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করে।[৬৩]

বস্তুতপক্ষে পশ্চিমবাংলায় ও সমগ্র ভারতে অধিকতর ব্যাপক আকারে দাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতীয় সরকার ও তাদের সমর্থক সাম্প্রদায়িক পত্রিকাসমূহ এই সময় মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দেশ্যে কাল্পনিক দাঙ্গার কাহিনী প্রচারের দ্বারা তারা প্রকৃত দাঙ্গা সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।[৬৪]

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বাগেরহাটের কালশিরায় সংঘটিত ঘটনা দাঙ্গার কারণ বলে উল্লেখ করে প্রাদেশিক পরিষদের সভায় বলেন, ‘Communal disturbances started on a large scale in East Bengal in December 1949, with the Bagerhat incidents.’[৬৫]

কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় কালশিরায় সংঘটিত ঘটনার প্রায় একমাস পর থেকে পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সংবাদমাধ্যমের উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচারের পর থেকে।

পূর্ববাংলা সরকার, নেতৃস্থানীয় হিন্দু জনগণ তাদের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে বাগেরহাটের ঘটনাটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এবং একে কেন্দ্র করে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে দেশের স্থিতিশীল পরিবেশ নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন বারবার। কিন্তু সরকারের প্রেসনোট উপেক্ষা করে[৬৬], পূর্ববঙ্গের হিন্দু নেতাদের সাক্ষ্য উপেক্ষা করে ভারতের কিছু সংবাদপত্র মিথ্যা গুজব ও উত্তেজনা বিস্তার করতে থাকে। পূর্ববাংলা সরকার ও জনগণের সকল আবেদন ব্যর্থ হয়, দুদেশেই সংঘটিত হয় ভয়াবহ দাঙ্গা এবং বহু লোক আহত ও নিহত হয়, বাড়িঘর হারায়, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ভারতীয়দের নিকট পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। অতিরঞ্জিত ও অসত্য ঘটনার বর্ণনা এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন লিফলেট এবং পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় যার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন,

> “ভারতীয় উপপ্রধানমন্ত্রীর উস্কানিমূলক বক্তৃতার প্রতিধ্বনি কলিকাতার রাজপথে মিলাইয়া যাইতে না যাইতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর কাল্পনিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের দাবীতে লিখিত সহস্র সহস্র পুস্তিকা ও প্রচারপত্রে শহর ছাইয়া ফেলা হয়। সাথে সাথে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা যায়। এরপর কলিকাতা ও এর আশেপাশের এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়।”[৬৭]

৪ মার্চ খুলনায় মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক জনসভায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারতীয় পার্লমেন্টে দেয়া বক্তব্যের ও সংবাদপত্রের অপপ্রচারণার প্রতিবাদ করে ৪ মার্চ খুলনার মিউনিসিপ্যাল মাঠে জনসভায় বক্তব্য প্রদান করেন সভার

[৬২] Home, Polical (C.R), B Proceedings, Vol. 10, File no. 5.R 1, GOEB
[৬৩] লিয়াকত আলী খান, দৈনিক আজাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[৬৪] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩১
[৬৫] বিস্তারিত Dr. Bidhan Chandra Roy, West Bengal Lagislative Assembly proceedings , 17th April 1950
[৬৬] লিয়াকত আলী খান, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ সালের বিবৃতি, দৈনিক আজাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[৬৭] লিয়াকত আলী খান, ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি শ্রীযূত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, খুলনা জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভৌমিক। এম.এল.এ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার বলেন,

> "পণ্ডিত জওহেরলাল নেহেরুর মত একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি ভারতীয় পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা করিয়াছন তাহা সত্যি বেদনাদায়ক। পণ্ডিত জওহেরলাল নেহেরু তাহার বিবৃতিতে বাগেরহাট সম্পর্কে যে ব্যাপক নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ম্মান্তকরণ ও বলাৎকারের অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসুত। উক্ত সংবাদের মূলে কোন ভিত্তি নাই।"[৬৮]

সভার সভাপতি শ্রীযূত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ তার বক্তৃতায় প্রচারণার প্রভাব সম্পর্কে বলেন,

> "আমি যখন খুলনায় থাকি তখন মনে কোন ভীতির সঞ্চার হয়না। কিন্তু কলিকাতা গেলেই অবিরত বিভিন্ন রকম গুজব শুনবার ফলে সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যায়।--------গুজবের ফলে বরিশাল জেলার কয়েকটি অঞ্চলে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। খুলনার তিনটি গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মিভূত হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং ২০০ টাকার গরু ৩০ টাকায় ও ১০ টাকায় বিক্রয় করিয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া যায়। তাহারা অবশ্য সিরিঙ্গা যশোর হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আমি রাখাল ব্যানার্জ্জির সহিত আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে তাহার বিশ্বাস তাহার প্রতিবেশী জনৈক হিন্দুই তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র মুসলমান জনসাধারারণ সকলে একত্রিত হইয়া রাখাল বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িটি পুনঃনির্ম্মান করিয়া দেন।"[৬৯]

ঢাকায় দাঙ্গার সূত্রপাত

কলকাতা এবং শহরতলীতে এইসব আক্রমণ এর ঘটনার সংবাদ পূর্ববঙ্গে পৌঁছলে সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন শুরু হয় এবং এবং তারা দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। মুসলমান বিরোধী এসব দাঙ্গায় হিন্দু মহাসভার পরিষ্কার মদত ছিল বলে জানা যায়।[৭০]

এই সকল ব্যক্তিরা এবং পুলিশের উপর আক্রমণ সংগঠনকারী কম্যুনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে খুলনায় হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা করে প্রতিশোধ দাবী করে। এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারণার ফলে ২৪ জানুয়ারি হতে পশ্চিমবঙ্গে একটানা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয়। ফলে ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ হতে বহুসংখ্যক মুসলমান পূর্ববঙ্গে আসে।"[৭১] পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গার সংবাদ ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকে পূর্ববাংলার দৈনিক পত্রিকা আজাদ ও মর্নিং নিউজ পত্রিকায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমানদের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকলে পূর্ববাংলায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর প্রভাবে পূর্ববাংলার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা একদিকে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলমানরা চলে আসছে, তারা এখানে যেভাবে পারছিল বসবাসের জায়গা করে নিচ্ছিল। এতে হিন্দুদের খালি বাড়িগুলোই বেশী দখল হয়েছে, অন্যদিকে তারা তাদের দূরবস্থার চিত্র তুলে ধরে উত্তেজনা বাড়াতে থাকে। পূর্ববাংলায় দাঙ্গার সময়ও এরা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন; সেই সমিতির একটি প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ব্যাপকহারে' মুসলমানদের ওপর আক্রমণ এবং গণহত্যা হয়েছে; বহু মুসলমান বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।[৭২]

---

[৬৮] দৈনিক আজাদ, ৬ মার্চ ১৯৫০
[৬৯] দৈনিক আজাদ, ৬ মার্চ ১৯৫০
[৭০] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
[৭১] দৈনিক আজাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০
[৭২] আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল, ১৯৫০

১৯৫০ সালে জানুয়ারি মাসে ঢাকায় দাঙ্গার সূত্রপাতে পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন,

> "উদ্দেশ্যমূলক না হলেও পূর্ববাংলা এসেমব্লির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এম.এল.এ দের একটি অবিবেচক পদক্ষেপ এই ঘটনাকে গুরুতর করে তোলে। সংসদের কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের 'রক্ষা' করার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন, এই প্রদেশের মুসলমানদের অসন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। এম.এল.এ দের এই পদক্ষেপগুলো যতই সরলবিশ্বাস ও বিশুদ্ধ নাগরিক অধিকার বোধ থেকেই উৎসরিত হোক না কেন এর বিরুদ্ধে অতি উদারপন্থীদের ঠিক সন্দেহ না হলেও অসন্তোষ ছিলই।[৭৩]

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় কিছুসংখ্যক গুণ্ডাপ্রকৃতির স্বার্থান্বেষী লোক জড়িত থাকে, কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রচারমাধ্যম ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা পরিস্থিতিকে শান্ত করতে এবং স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।

ঢাকায় দাঙ্গার বিস্তার

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকে ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বেলা প্রায় ১১ টার সময় একটি মিছিল সেক্রেটারিয়েট ভবনের সম্মুখে সমবেত হয় পরে এই জনতা কলকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতিবাদে ভিক্টোরিয়া পার্কে এক সমাবেশ করে। পুলিশ এই সভা ছত্রভঙ্গ করে এবং কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এর থেকেই শহরে হাঙ্গামা ও লুটতরাজের সূচনা হয়। তাজউদ্দিন আহমদ সেদিন কেরানিদের সমাবেশের সমালোচনা করে বলেন,

> "সচিবালয়ের কেরানিদের আরও একটি অপরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলে বিস্ফোরণ উন্মুখ এক বারুদের স্তুপে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়া হল। যখন কেরানিরা ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মিছিল করে এসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব সি.এস সেন এর কাছে তাদের অনুভূতি বর্ণনা করে ভারত প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়। শরণার্থীরা বিশেষতঃ বিহারীরা যারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তারা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। বেচারা কেরানিদের সাংবিধানিকভাবে পদক্ষেপ নেয়ার আন্তরিক ইচ্ছা মারমুখী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এই জনতা কেরানিদের চারপাশে জড়ো হয়েছিল এবং যাদের অধিকাংশই ছিল শরণার্থী। দাঙ্গাকারীদের এই আক্রমণের ফলে প্রথম আক্রান্ত হয় সংখ্যালঘুদের বিষয় সম্পত্তি তারপর ব্যক্তি। ক্রমবর্ধমানভাবে পূর্ণদ্যোমে হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকলো। হিন্দুদের জীবনটাই দুষ্কৃতিকারীদের মনোযোগের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।[৭৪]

সরকার সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী আনয়ন করা হয় এবং দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করা হয়। দুর্গতদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কতিপয় শিবির স্থাপন করা হয়। দাঙ্গার সময়ে ঘটনার বর্ণনা ও সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার রিপোর্টে কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে জমাদার মোহাম্মদ রমজান রায়ট ডিউটিতে ছিল। তার সঙ্গে ছিল ইমতিয়াজ এবং সিপাহী সানোয়ার আলী। তারা যখন শঙ্খনীধি হাউজের কাছে আসে তখন দেখতে পায় একদল লুণ্ঠণকারী মারাত্মক অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে শঙ্খনীধি হাউজ আক্রমণ করছে, কিছু লুণ্ঠণকারী ইতেমধ্যে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। তাদের হুসিয়ারী ব্যর্থ হলে তারা পাঁচ রাউন্ড

[৭৩] তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৯-১৯৫০, প্রতিভাস, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৭৪
[৭৪] তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, পৃষ্ঠা ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

গুলি বর্ষণ করে। এর ফলে তারা লুটেরাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এবং স্থানীয় হিন্দুরা রক্ষা পায়। এছাড়া এসময় এই এলাকায় কিছু বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল।[৭৫]

১০ তারিখ বিকাল সাড়ে চারটায় জমাদার রমজান নয় সদস্যের দল নিয়ে টহল দেয়ার সময় দেখতে পায় যে, প্রায় দুইশ জন উচ্ছৃঙ্খল জনতা মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিন্দু বাড়িতে আগুন দিচ্ছে, হিন্দুদের হত্যা করছে। তারা দুটি মৃতদেহ দেখতে পায়। পুরানা মোগলটুলীতে হিন্দু বাড়ি ও দোকান পুড়ছিল। তারা চার রাউন্ড গুলি করে। এতে দুইজন লোক আহত হয়।[৭৬]

রাত আটটায় মৌলভী বাহুদ্দীন আহমেদ তার রাউন্ডের সময় ১৩ নং বেচারাম দেউড়ীর সামনে আসেন, সেসময় একদল লুটেরা একটি হিন্দু বাড়ির ভিতর মালামাল লুট করছিল তাদেরকে নিষেধ করেন কিন্তু তারা চলে না গিয়ে তার দিকে ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারে, গুলি করে তারা নিজেদের রক্ষা করেন এবং সেখানকার হিন্দুদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করেন।"[৭৭]

১০ ফেব্রুয়ারি যখন দাঙ্গা তুঙ্গে পৌঁছেছে সে সময় নওয়াবপুর রোডে নিউ সাইকেল মার্ট এবং রায় কোম্পানী লিমিটেড নামক দোকান আক্রান্ত হয়, এসময় উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক দোকান লুট হচ্ছিল এবং আগুন দেয়া হচ্ছিল এসময় মোট চার রাউন্ড গুলি করা হয়। সেসময় লুটের মাল সহ বেশকিছু দাঙ্গাকারী গ্রেফতার হয়। এ সময় সরকারের অর্ডার ছিল গুলি করার।[৭৮]

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১০ ফেব্রুয়ারি শহরের সর্বত্র সান্ধ্য আইন জারী করেন।

নওয়াবপুর রোড, ঠাঁটারী বাজার, নারিন্দা এলাকাতে সেদিন উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাকারীরা আক্রমণ করলে অনেক হিন্দু লোক আহত ও নিহত হয়। বাড়ি ঘরে আগুন লাগানো হয়। পুলিশ দাঙ্গা প্রতিহত করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় এবং পুলিশের গুলিতে কয়েকজন দাঙ্গাকারী আহত ও নিহত হয় বলে পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

১০ ফেব্রুয়ারি সরকারী প্রেসনোটে ঢাকার দাঙ্গার সূত্রপাতের যে বর্ণনা দেয়া হয় তাতে বলা হয়,

> "কলিকাতার ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ ও গুজবের ফলে এবং পশ্চিমবঙ্গ হতে কতিপয় আশ্রয় প্রার্থীর ঢাকা আগমনের পর অদ্য শহরে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। দুর্বৃত্তগণ এই সুযোগে এবং লোক জমায়েতের ফলে নওয়াবপুর ও ইসলামপুর অঞ্চলে গাড়ি ঘোড়ার ভীড় জমিয়া যাওয়ার সুযোগে দোকান লুট পাট করতে আরম্ভ করে এবং কয়েকটিতে অগ্নিসংযোগ করে, কয়েকটিতে আক্রমণও হয়। ঘটনার অব্যবহিত পরপরই উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ প্রহরার জন্য ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আহ্বান করা হয়। তাদেরকে লুণ্ঠনকারী দেখিবামাত্র গুলি করিবার ক্ষমতা দেয়া হয়। মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। এ পর্যন্ত তিনশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।[৭৯]

১৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা শহরের দাঙ্গার রিপোর্ট পাওয়া যায়। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে ঢাকার D.I.G.C.I.D দাঙ্গার পরিস্থিতি, পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। আক্রান্ত এলাকায় টহল দেয়ার জন্য অফিসারদের দায়িত্ব দেয়া হয়। সাথে ছিল পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ। তাদের টহলদানের সময় কারফিউ ভঙ্গ করার দায়ে, লুটের মালসহ, সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য, এবং হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য আটান্ন জনকে গ্রেফতার করা হয়। ছুড়িকাঘাত, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের জন্য একশ আটত্রিশটি মামলা হয় সুত্রাপুর থানায়।[৮০]

---

[৭৫] Home, Police. B Proceedings, vol.92, file no. B Nov.50/ 1012-1013, page 4, GOEB

[৭৬] ibid, page 4

[৭৭] ibid, page 4

[৭৮] ibid, page 4

[৭৯] দৈনিক আজাদ ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০

[৮০] Home, Police, B Proceeding, Vol. 5. File No. May-5o, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

দাঙ্গার বর্ণনা প্রসঙ্গে কামরুদ্দিন আহমদ লেখেন,

> "১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হল ভারতে দাঙ্গার ফলে।---মহল্লার রসিক দাসের সবাই ছিল বন্ধু তাই সে ভয় পেল না। গুণ্ডারা তার বাড়ী আক্রমণ করলে সে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ফেলে---তখন সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে দৌড়াতে থাকে-কিন্তু কিছুদূর গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে যায় আমি চিৎকার শুনে দোতলার জানলা খুলে দেখি যে একটা গুণ্ডারা তার পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। আমি তখনও জানিনা তার জামাই ও মেয়ে আমাদের নীচের তলায় একটা ঘরে লুকিয়ে আছে। গুন্ডারা অনুমান করেছিল ঠিকই। আমাকে গেটের দরজা খুলে দিতে বলল-আমি কোন উত্তর দিলাম না। ওরা ছুড়ি উচিঁয়ে কি যেন বলল।--দুপুরের পর কয়েকজন লোকের সাহায্যে পেছনের দেয়াল ভেঙ্গে কিছুদূর হিন্দু পাড়ায় তাদের পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হলাম।"[৮১]

তাজউদ্দিন আহমদ ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া দাঙ্গার বর্ণনা দিয়ে লেখেন,

> "বেলা ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, দিগবাজার, ইংলিশ রোড চক প্রভৃতি এলাকা ঘুরে বেড়ালাম। হিন্দুদের উপর কিছু মুসলমানদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে করতে।-----
> স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত ঢাকা আজ দুপুর ১২ টা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করল। গত তিন/চার দিন ধরে কলকাতায় যে দাঙ্গা চলছিল এটা তারই ধারাবাহিকতার ফল। শরণার্থীরা বিশেষ করে বিহারীরা এই গোলযোগের জন্য দায়ী। স্থানীয় জনগণ যদিও এর বিপক্ষে নয়, তবে তারা উদাসীন। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবিরাম লুট, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ চলল।"[৮২]

১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। শহরের অধিকাংশ দোকানপাট খোলা থাকে এবং স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল করে। তবে শহরতলীতে কিছু ঘটনা ঘটে।[৮৩] এইসব ঘটনার মধ্যে কুর্মিটোলার বিমান ঘাঁটিতে অপেক্ষমান যাত্রীর উপর অতর্কিত আক্রমণ সর্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। আকস্মিক আক্রমণে ৩৮ জন যাত্রী আক্রান্ত হয়। তার মধ্যে দশ জনের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। এরপর তেজগাঁও বিমানঘাটি বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ এই ঘাঁটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ ছিল। এই ঘাটি সুরক্ষিত করা হয়।[৮৪] এই ঘটনার পর কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটির চারিপার্শের জঙ্গলে অনুসন্ধান করে পুলিশ ৪ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেছে। ১৩ ফেব্রুয়ারি শহর ও শহরতলীতে আক্রমণের তিনটি ঘটনা ঘটে।[৮৫]
ঢাকা শহর ছাড়াও জেলার অন্যান্য অঞ্চল এবং অন্যান্য জেলায় দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন ১২ মার্চ ব্যবস্থাপক পরিষদে বক্তৃতা প্রদান করে ঘটনার বর্ণনা করেন।

> "পরবর্তী দুইদিনে হাঙ্গাঁমা শহরতলী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে ঢাকায় আগত এবং ঢাকা হইতে যে সকল ট্রেন ছাড়ে সেগুলির যাত্রীদের উপর কয়েকটি ইতস্তত আক্রমণ চলে সেই পরিস্থিতিও ত্বরায় আয়ত্বে আনয়ন করা হয়। সমস্ত ট্রেনের জন্য অতিরিক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়। একদিন মাত্র নারায়ণগঞ্জে ইতস্তত কয়েকটি ঘটনা ঘটে। নারায়ণগঞ্জ সহ ঢাকায় নিহতের সংখ্যা ১৯৮ জন এবং আহত ১২৩ জন।[৮৬]

[৮১] কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০
[৮২] তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, পৃষ্ঠা ৭২
[৮৩] সরকারী প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি
[৮৪] সরকারী প্রেসনোট, ঐ, ১৩ ফেব্রুয়ারি
[৮৫] সরকারী প্রেসনোট, ঐ, ১৪ ফেব্রুয়ারি
[৮৬] নূরুল আমিন, পূর্ববাংলা ব্যবস্থা পরিষদ অধিবেশন, ১২ই মার্চ ১৯৫০, ঐ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

রায়বাহাদুর অতুল প্রসাদ রায় চৌধুরী ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার হাঙ্গামার কারণ ও ঘটনার বর্ণণা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন,

> “কলিকাতার হিন্দুদের কোন অপকর্মের জন্য এই শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের এই সব শিবিরের আশ্রিতেরা ভয় করিতেছেন। সুতরাং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানীদের তরফ হইতে আমি কলিকাতার হিন্দু ভাইদের সকল প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।”[৮৭]

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হাঙ্গামা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ তারিখে এক বিবৃতি প্রদান করেন, তিনি খুলনার ঘটনার উল্লেখ করে বলেন,

> “ইহা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ঘটনা অথচ ভারতীয় সংবাদপত্রে এই ঘটনাকে নানা ভাবে ফেনাইয়া ফেনাইয়া প্রচার করা হইতেছে।------কলিকাতার সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলি তিলকে তাল করিয়া প্রচার করিতেছে এবং মহাসভাপন্থী আর,এস,এস ও সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা পরিষদ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে তাহারা একটি বেসরকারী সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছে, এবং কলিকাতায় একটি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী এই সকল পরিকল্পনার কথা যদি না ভাবিয়া থাকেন তবে তাহারা খুব কম খবর রাখেন বলিতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার ইহার বিরুদ্ধে কয়েকবার প্রতিবাদ জানাইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে কিছু করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।”[৮৮]

কলিকাতার ‘সত্যযুগ’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে ঢাকায় সংঘটিত দাঙ্গা এবং পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতি প্রসংগে তিনি বলেন,

> “ঢাকার অশান্তি আরম্ভ হইবার দুইদিন পূর্ব্বে টাঙ্গাইল ও মীর্জাপুর হইতে ঢাকায় আসিয়া বহু পরিচিত হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত কলিকাতার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। তাহারা আশ্বাস দেন যে ঢাকায় কোনরূপ অশান্তি , উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি আমি সচ্ছন্দভাবে নানা অঞ্চল ভ্রমন করিয়াছি, কিছু গুজব শুনিয়াছি কিন্তু উত্তেজনার কোন লক্ষণ দেখি নাই, সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান বাসিন্দারা স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্ম করিতেছিলেন। কিন্তু শুক্রবার অকস্মাৎ শহরে গোলমাল শুরু হইয়া যায়। কি সাধারণ কি গভর্নমেন্ট ইহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেননা। পুলিশ কর্তৃপক্ষ তৎপরতার সহিত উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে পুলিশ মোতায়েন করেন। এই সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়িবার পর নানা পল্লি হইতে হিন্দুরা ঘরবাড়ী ফেলিয়া জগন্নাথ কলেক [কলেজ], বলদা হাউজ, বলিয়াদি হাউজ, ও বনগ্রামে সমবেত হয়। পরদিন প্রভাতে সর্ব্বত্র কড়া মিলিটারী পাহারা বসে তবে গলিঘুচির মধ্যে কিছু আক্রমণের সংবাদ নাই [পাই]?”[৮৯]

দাঙ্গার সময় গাজীপুরের টঙ্গী থানার ভাদাম গ্রামে অনেক বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়, ফলে সেখান থেকে অনেক লোক দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়, মোহাম্মদপুর নিবাসী নিতাই চাঁদ বিশ্বাস জানান ১৯৫০ এর দাঙ্গার পরে এক পিসি এবং অন্য পিসি এবং মামারা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান তবে যে সকল অঞ্চলে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করেনি সেখান থেকে সে সময় দেশত্যাগের ঘটনা কম ঘটেছে। তবে পঞ্চাশ সালের দাঙ্গায় লোক কম মারা গেছে।[৯০]

---

[৮৭] সরকারী প্রেসনোট, ঐ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[৮৮] দৈনিক আজাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[৮৯] দৈনিক আজাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি

[৯০] নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালের ৪ জুলাই একজন মহিলা সাক্ষী জানান ১০ ফেব্রুয়ারি তার পুত্র দুপুরের খাবারের পর লক্ষীনারায়ণ কটনমিলে তার অফিস হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নিহত হয়। এ ঘটনা তিনি অন্য একজন মহিলার মারফতে জানতে পারেন।

কাউদিয়া গ্রামের এক ব্যক্তি তার সাক্ষ্যে জানান যে, ঘটনার দিন গোলমাল শুনে তিনি জঙ্গলে পালিয়ে যান সেদিনই বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন যে তার গৃহের দরজা ভাঙ্গা, টিন ও ধান চাউল লুট হয়ে গেছে। জনৈক মুসলমান বন্দুকের আওয়াজ করায় দুষ্কৃতিকারীগণ অনেক জিনিস ফেলে পালিয়ে যায় দরজা ও টিন ফেরত পাওয়া যায় কিন্তু তৈজস পত্র পাওয়া যায়নি। তার প্রায় ৬০০০/ ৭০০০ টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে। তার অবর্তমানে স্থানীয় দফাদার কর্তৃক দরখাস্ত লিখিত হয় এবং তিনি পরে দরখাস্তের কথা জানতে পারেন।

কাউদিয়া গ্রামের অপর একজন সাক্ষী বলেন যে ঘটনার দিন তিনি ঢাকায় ছিলেন বিকালে লুটতরাজের খবর পান। কারা লুট করেছে তা তিনি জানেন না। জনৈক মুসলমান জিনিসপত্র উদ্ধারে সাহায্য করেন। তার প্রায় ৩০০ টাকামত জিনিস নষ্ট হয়। তার দরখাস্ত দফাদার কর্তৃক লিখিত হয় এবং সে সই করেছে।

কাউদিয়া গ্রামের অপর একজন সাক্ষী বলেন যে, তিনি লেখাপড়া জানেন। তার দরখাস্ত দফাদার কর্তৃক লিখিত হয় এবং তিনি সই করেছেন। সাক্ষী বলেন যে গ্রামের অধিকাংশ দরখাস্ত সে এবং দফাদার মিলে লিখেছেন। সেখানে ১লা ফাল্গুন প্রথম গোলযোগ আরম্ভ হয়। প্রায় ৩৫/৩৬ খানা গৃহ লুণ্ঠিত হয়। তার গৃহ চড়াও হওয়ার ভয়ে সে গ্রামের একজন মুসলমানের গৃহে আশ্রয় নেয়। বিকালে সে নিজ গৃহে ফিরে আসে। তার লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটি ভাঙ্গা বাক্স ও পিতলের গামলা আনসারদের সাহায্যে ফিরে পায়। তিনি এজাহার করার সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকাও জমা দেন। তার প্রায় ৬০০ টাকার মত দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়।[৯১]

১৯৫০ সালের ৬ জুলাই দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট দেয়া কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ জানা যায়। জনৈক স্থানীয় ডাক্তার তার সাক্ষ্যে বলেন, তিনি যে এলাকায় বাস করেন, তথায় একটা ঘটনা ঘটায় তিনি নিজ বাসভবন ছেড়ে বলদা হাউজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসলে তার বাস ভবনের অনেক জিনিস খোয়া গেছে দেখতে পান। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২৫০ টাকার মত তার বাস ভবনের আসবাবপত্রের কোন সন্ধান পাননি।

আর একজন সাক্ষী বলেন, ঘটনার দিন তিনি ভিক্টোরিয়া পার্কস্থ নিজ অফিসে ছিলেন। একটা শোভাযাত্রা ভারতের বিরুদ্ধে ধ্বনি সহকারে পার্কে এসে জমায়েত হয় এবং সেখানে কয়েকজন বক্তৃতা করে, তিনি সেই বক্তৃতা শোনেননি। তিনি অফিস বন্ধ করে নিজ বাস ভবনে চলে যান। ঐ রাতে ঐ এলাকায় একটি বালক নিহত হয় বলে তিনি জানতে পারেন। অত:পর তিনি পুলিশের সাহায্যে বলদা হাউজে যান। উক্ত সাক্ষী আরও বলেন যে, তার বাসভবনে আর একজন ভাড়াটিয়া ছিল। কিন্তু জনৈক মুসলমান তার ঘর অধিকার করে। অনেক চেষ্টা করেও তিনি তাকে সরাতে পারেননি। সরকার পক্ষের কৌসুলী জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার হিন্দু ভাড়াটে একটি চিঠি দ্বারা উক্ত মুসলমানকে তার ঘর দখল করতে অনুমতি দিয়েছিল। সাক্ষী ঐ সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে তদন্ত কমিশনের প্রশ্নের উত্তরে জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ২৪ মার্চ রেজিস্টার্ড পত্রযোগে এস.পি. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস.ডি.ও কে তিনি ঘটনার কথা জানান। তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগের স্থানীয় মুসলমান যুবক তার গৃহ ও আসবাবাদি বিক্রয় করবেন কিনা সে জিজ্ঞাসা করত। অগ্নিসংযোগের ফলে তার তিন হাজার টাকার মত সম্পত্তি বিনষ্ট হয় বলে সাক্ষী জানান। ঢাকার এস.ডি ও (সাউথ) এর অফিস হতে মাত্র ২৩ মিনিটের পথ হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাত্র একদিন দরখাস্ত সমেত দেখা করতে আসেন ২০ মার্চ বাড়ি ত্যাগের পর উক্ত যুবকগণের বিষয়ে কাউকে কিছু জানান নাই।

কাউদিয়ার জনৈক দফাদার তার সাক্ষ্যে বলে যে, সেখানে ১২০/১৫০ ঘর বসতি তার মধ্যে দুই আনি মুসলমান। সেখানে ১লা ফাল্গুনের আগে কোন গোলমাল হয় নাই। রবিবার কোন গোলমাল হয় নাই। লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধারে আনসারগণ সাহায্য করে। তার নিজস্ব হাজার টাকা ও তার স্ত্রীর প্রায় ১০০০/১৫০০ টাকার মত গহনা ও

[৯১] পূর্ব পাকিস্তান তদন্ত কমিশনের বৈঠকের_শুনানী, দৈনিক আজাদ, ৫ জুলাই ১৯৫০,

Dhaka University Institutional Repository

আসবাবাদী লুট হয়। তার স্ত্রী যখন মুসলমান পাড়ার দিকে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল পথে তার নিকট হতে গহনাপত্রের বোচ্কা কেড়ে নেওয়া হয়। তার স্ত্রীর সঙ্গে অনেক মহিলা ছিলেন বলে জানান।

অন্য একজন সাক্ষী বলেন যে, ১ ফাল্গুন গ্রামের দক্ষিণ দিক হতে হল্লা শুনে তিনি পালিয়ে একটি গাছের উপর আশ্রয় নেয় সেখান হতে সে উপর হতে কিছু দেখতে পায়নি শুধু দরজা ভাঙ্গার শব্দ ও অন্যান্য শব্দ শুনতে পায়। প্রায় দেড় ঘন্টা পর গোলমাল বন্ধ হয়। লুণ্ঠনকারীগণ লুট করে কিন্তু আনসারগণ বাঁধা দিলে সব রেখে পালিয়ে যায়। প্রায় ৫/৬ শত টাকার জিনিস নষ্ট হয়।

শাহবাগের (কাউদিয়া) এক সাক্ষী বলেন যে, রবিবারে এবং সোমবারে গোলমাল হয়। মুসলমানরা তার বাড়ি লুট করে। দফাদার তার লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করে। সংবাদ পেয়ে দারোগা ঐ গ্রামে আসে। সাক্ষী গোলমালের সময় এক মুসলমান গৃহে আশ্রয় নেয় এবং তার কিছু জিনিসপত্র উদ্ধারের কাজে মুসলমানরা সাহায্য করে।

হাতিরদিয়া বাজারের জনৈক মনোহারী দোকানদার তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বাজারে তার দোকান ছিল। ২৯ মাঘ রবিবার হাটের দিন সন্ধ্যার পর সে হিন্দু মুসলমান দোকানদারদের পলাইতে দেখে। আনসারদের ডেপুটি লিডার এসে অদূরে গোলমাল হওয়ার সংবাদ দিয়ে দোকান বন্ধ করে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি দোকান বন্ধ করে দোকানের মধ্যে অবস্থান করেন। কিছুক্ষণ পর দরজা ভাঙ্গার শব্দ পেয়ে সে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় এবং একজন মুসলমান গৃহে আশ্রয় নেয়। দুষ্কৃতিকারীরা চলে গেলে স্থানীয় মুসলমান জমিদার নিজে গাড়ি পাঠিয়ে থানা থেকে পুলিশ ডেকে আনান। তার প্রায় ১৭২৫ টাকা এবং ২৮০০ টাকার মত ক্ষতি হয়। এজাহারের সময় সে অসুস্থ থাকার কারণে টাকার কথা উল্লেখ করেননি বলে কমিশনের চেয়ারম্যানের প্রশ্নের উত্তরে জানায়। সেদিন যে সকল মুসলমান ব্যবসায়ী হাটে এসেছিল তাদের দোকানও লুট হয়। তবে কোন মুসলমানের স্থায়ী দোকান লুট হয়েছে কিনা তা তার জানা নেই। তবে সাময়িকভাবে যে সব মুসলমান হাটে বিক্রয়ার্থে বাইরে বসত তাদের দোকান লুট হয়।

১ ফাল্গুন সোমবার দুলালপুর গ্রামে গোলমাল হলে আনসারগণ এসে বাহিরাখোলা গ্রামে পাহারা দেয়, রাত্রে আনসারগণ চলে গেলে বহু লোক এসে বিভিন্ন বাড়িতে আক্রমণ করে। ২ ফাল্গুন রাত্রে ১২/১টার সময় আক্রমণ করে একজন কৃষকের ঘরে লুট করে এবং খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সে লোক গোলমাল শুনে একজন মুসলমানের গৃহে আশ্রয় নেয়, সকালে বাড়িতে ফিরে দেখে তার বাড়ি লুট হয়েছে। সে তার লিখিত জবানবন্দীতে জানায় যে তার ৪৩০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত কশিনের কাছে আরো বেশী ক্ষয়ক্ষতির কথা জানায়। তদন্ত কমিশনের কাছে সে আরো জানায় সে দুদিন পরে জানতে পারে যে তার স্ত্রীর দুই ভরী সোনা লুট হয়েছে। কিন্তু এজাহারে তিনি তা উল্লেখ করেন নি। সে সময় ঐ গ্রামের এক মহিলার বাড়ি আক্রমণ করে এবং তার ঘরের বেড়ায় আগুন লাগিয়ে দেয়। মুসলমানরা এসে আগুন নেভায়। লুটের সময় সেই মহিলা মুসলমান পাড়ায় আশ্রয় নেয়। পরের দিন ভোরে ফিরে আসে। অন্য এক বাড়িতে আক্রমণ হলে সেই বাড়ির মহিলা তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও শিশুসহ বাগানে পালিয়ে যায়। কিছু পরে তার স্বামী ও শ্বশুড় ঘরের দিকে ফিরলে আক্রমণকারীরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে হত্যা করে।[৯২]

১০ জুলাই একজন দোকানদার তার সাক্ষাৎকারে জানান যে, ঢাকার ঠাঠাঁরী বাজারে একটি মুদী দোকান ও পান সিগারেটের দোকান লুট হয়। দোকান মালিকের বাড়ি কেরানীগঞ্জে। দোকান লুট হওয়ার তিন চারদিন পর সে দোকান লুট হওয়ার ঘটনা জানতে পারে। তার বাসগৃহ আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করে, এসময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাপ্টেন আব্বাস মীর্জা তার পরিবারবর্গকে ওয়ারীতে এক নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায়। দোকান মালিকের দোকানে খুব বেশী মাল ছিলনা সে মাল তার বাড়িতে রাখত। তার প্রায় আঠার হাজার টাকা ক্ষতি হয়।

[৯২] পূর্ব পাকিস্তান তদন্ত কমিশনের বৈঠকের_শুনানী দৈনিক আজাদ, ৭ জুলাই ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

কালীগঞ্জের একজন মহিলা সাক্ষী জানান ১১ ফেব্রুয়ারি তার স্বামী আড়িখোলা স্টেশন হতে ভৈরব যাওয়ার জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। সরকারী কৌশলীর জেরার ফলে জানা যায় যে, তার স্বামী ২/৩ বৎসর পূর্বে আগরতলায় গিয়ে জ্বরে মারা যান। স্থানীয় প্রফুল্ল ডাক্তার এ সম্পর্কে জানতেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি পাশের গ্রামের কয়েকজন মুসলমান ও নমঃশুদ্র মিলিতভাবে বরুণা গ্রামের একটি বাড়িতে আক্রমন চালায়। আক্রান্ত ব্যক্তি স্ত্রী পুত্রবর্গকে পার্শ্ববর্তী কুদরত আলীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সে একজন নমঃশুদ্রকে চিনতে পারে। কুদরত আলীর বাড়িতে ৬০/৭০ জন মহিলা আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি একদল লোক পুনরায় অস্ত্র সস্ত্র সহ ঐ গ্রামে আক্রমন চালায় এবং সে ব্যক্তিকে খোজ করে ঐ ব্যক্তি তখন দেওয়ান আলীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আক্রমণকারীরা তার খোঁজে প্রথমে কুদরতের বাড়িতে ও পরে দেওয়ান আলীর বাড়িতে গিয়ে তাকে বের করে দিতে বলে ও দেওয়ানকে মারধর করে। ঐ গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ইউসুফ আলী তাকে রক্ষা করে। তার প্রায় ৭/৮ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সাক্ষী লিখিত এজাহার পাঠায়। লিখিত এজাহারে সে জানায় যে, ডাঃ ইউসুফ আলীর সঙ্গে পুলিশ ও হোমগার্ড ছিল।

শুক্রবার দুপুরে মালিটোলা এলাকায় দাঙ্গাকারীদের হাতে নিহত হয় এক ভদ্রলোক ও তার ভাগ্নে। জনৈক বিহারী মুসলমান তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে নিজ গৃহে নিয়ে যায় ও গরম জামা দেয়। পরদিন পুলিশ এসে মালিটোলার হিন্দুদেরকে বনগ্রাম এলাকায় নিয়ে যায়। সে একমাস সলিমুল্লাহ কলেজ আশ্রয় কেন্দ্রে ও পরে রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহিলার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তার স্বামীর নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও তার নিজে ৪০ ভরি সোনার গহনা ও ৪০০ টাকা লুট হয়। মালিটোলার দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলেন যে তিনি এক বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মৃতদেহ দেখতে পান তবে তিনি কোন বাড়ি লুট হতে দেখেন নাই তিনি পুলিশ দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় রাস্তায় এক বিধবাকে দেখে তার অনুরোধে তার জিনিসপত্র আনতে তার সঙ্গে তার বাড়িতে যান পরে তার শিশুপুত্র ও জিনিসপত্র সহ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং বাড়ির অপর অংশে অবস্থিত হিন্দু ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকতে দেন। পরে বিধবাটি ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস ও পরে সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৯৩]

১২ ফেব্রুয়ারি ৪/৫ জন মুসলমান দেয়াল টপকে এক এ্যাসিসট্যান্ট সার্জনের বাড়িতে প্রবেশ করে। তাদের কয়েকজন রান্না ঘরের দিকে আর কয়েকজন শোয়ার ঘরের দিকে যায় এবং কুঠার দ্বারা দরজা ভাঙ্গে। একজন তাকে ছুড়িকাঘাত করতে যায়। এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন নিজে ছুড়ি কেড়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেন। তিনি আহত হন। তার স্ত্রীর শরীর থেকে আক্রমণকারীরা বাইশ ভরি সোনার অলংকার নিয়ে যায়।
তেজগাঁও নিবাসী জনৈক দোকানদার তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্যে জানান যে, শুক্রবারে (১০ ফেব্রুয়ারি) তার দোকান লুট হয় এবং শনিবার সকালে বহু লোককে তাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে সে তার মা, স্ত্রী ও ভগ্নীকে নিয়ে মীর হাজেরবাগের দিকে অগ্রসর হয়, এ সময় আরও ৫০/৬০ জন লোককে মীর হাজেরবাগের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। তারা রাস্তায় আক্রান্ত হয় সাক্ষী এবং অন্যান্য সব দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল শ্যামপুর এবং অন্যদল সাধনা ঔষধালয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে গমন করে। সেখানে একটি ছেলের ঘাড়ে তরবারীর আঘাত এবং একজনের গায়ে বর্শার আঘাত দেখতে পায়। সাক্ষী একমাস পর নিজ বাড়িতে ফেরে। তিনি সাধনা ঔষধালয়ে গিয়ে শুনতে পান যে তাদের গ্রামের ছয়জন নিহত হয়েছে। সে ডাকযোগে রেজিস্ট্রি করে এজাহার পাঠায়।
মাঝিনা গ্রামের কয়েকটি বাড়ি লুট হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি নাওরা এলাকায় অধিকাংশ বাড়িতে লুট হয়।[৯৪]

[৯৩] পূর্ব পাকিস্তান তদন্ত কমিশনের বৈঠকের শুনানী, দৈনিক আজাদ ১১ জুলাই ১৯৫০
[৯৪] দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের বৈঠকের শুনানী, দৈনিক আজাদ ১২ জুলাই ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

১২ জুলাই চটবাড়ি গ্রামের একজন সাক্ষী বলেন যে, ১২ তারিখ তার বাড়িতে একদল লোক আক্রমণ করে তার গৃহ জ্বালিয়ে দেয় এবং জিনিসপত্র লুট করে। ১৫০০ টাকা ও ১৭ তোলা স্বর্ণের অলংকার লুট হয়।
১২ তারিখ রাত্রে কাপাসিয়ায় এক ব্যক্তির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আনসাররা তার জীবন রক্ষার জন্য তার নিকট টাকা দাবী করে। তবে তিনি টাকার বিষয়ে দরোগার নিকট করা এজাহারে উল্লেখ করেননি।
মোমেনশাহী নিবাসী চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কর্মচারী ১১ তারিখে ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়ার পথে গেণ্ডারিয়ার নিকট আততায়ী কর্তৃক আহত হয়।
বরুণা গ্রামের কুদরত আলীর বাড়িতে গ্রামের অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করে। সে গ্রামের একজন উকিল যিনি নারায়ণগঞ্জে বসবাস করে, ১৩ ফেব্রুয়ারি আক্রমনের আশংকায় তার বাড়িতে বসবাসকারী একজন বিধবা তার দুই মেয়েকে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে পরের দিন সকালে তারা কুদরত আলীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। কুদরত আলী নিজের জীবন বিপন্ন করে তার বাড়িতে হিন্দুদের আশ্রয় দেন।[৯৫]

ঢাকার রায়সাহেব বাজার রোডের গোয়ালনগর এর বাসিন্দা ডাক্তার লালমোহন ভট্টাচার্যর বাড়ি আক্রান্ত হয়। সে সময় তিনি তার স্ত্রী ও ছেলেসহ বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তার বাড়ির সাথে ডিসপেন্সারি ছিল। সব ফেলে তিনি পালিয়ে যান। সরকারী লোক তাদের উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং পরে প্লেনে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।[৯৬]

ঢাকা শহরের সুত্রাপুর থানার ৬৮ নং বেচারাম দেউরীর বাসিন্দা মতিলাল পোদ্দার জানান ১০ ফেব্রুয়ারি দাঙ্গা শুরু হলে তার পরিবার বালিয়াটি লজ এ আশ্রয় গ্রহণ করেন ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি দুইজন পুলিশ এর প্রহরায় তার বাড়িটি দেখতে আসেন। তার বাড়ি তখনও আক্রান্ত হয়নি। সে সময় তার প্রতিবেশী নূরুল ইসলাম বাড়ি দেখাশুনার দায়িত্ব নেন। পরের দিন ১৫০ টাকায় বাড়ি ভাড়া নেয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি অভিযোগ করেন যে তাকে কোন টাকা না দিয়েই ১৫০ টাকার রসিদে সই করতে বললে তিনি দৌঁড়ে বালিয়াটি লজ এ চলে যান। ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি আবার পুলিশ প্রহরায় বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান তার বাড়ির অনেক মূল্যবান সম্পদ লুট হয়েছে। ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি সপরিবারে একজন শিপ সার্ভেয়ার এর সহায়তায় নারায়ণগঞ্জে চলে যান। এক মাস পর বাড়িতে ফিরে দেখতে পান সুলতান নামে এক ব্যক্তি বাড়ি দখল করে নিয়েছে। সুলতান তার বাড়ি ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান।[৯৭] এস.পি কতোয়ালী থানার ও.সি কে এ দলের বাবু মিয়ার বাড়ি তল্লাশী করার নির্দেশ দেন। পুলিশের সহায়তায় ও তিনি বাড়ি ফেরত পেতে ব্যার্থ হন বলে তিনি ২৮ জুন পিটিশন দাখিল করেন।[৯৮]
জোড়াপুল এলাকায় এক চিত্রকরের বাড়িতে লুট হলে তার প্রায় ৩২/৩৩ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। পরে সে ৫০০/৬০০ টাকার মত ফিরে পায়।[৯৯]

২৪ জুলাই সাক্ষাৎকারে একজন দোকানদার জানান যে, পুবাইল বাজারে একটি মুদী ও মনোহারী দোকান লুট হয়। দোকানের মালিক গোলযোগের আশংকায় দোকান বন্ধ করে নিকটস্থ এক মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরদিন এসে সে দেখে তার দোকান লুট হয়েছে, তার প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার টাকার মত ক্ষতি হয় বলে সে জানায়। সে ১০/১৫ দিন পর থানায় এজাহার দেয়।
সাভার এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে লুট হয়। সে বাড়িতে দুই বস্তা বিড়ির তামাক ও প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুট হয়। ঐ বাড়ি ছাড়া সে গ্রামে আর কোন মুসলমান বা নমঃশুদ্রর বাড়ি লুট হয় নাই। এ সময় সে পূবাইলে ছিল। কাহেলা গ্রামে একটিমাত্র বাড়িতে লুট হয়।

[৯৫] পূর্ব পাকিস্তান তদন্ত কমিশনের বৈঠকের_শুনানী, দৈনিক আজাদ ১৩ জুলাই ১৯৫০
[৯৬] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ড. গৌড়ীপদ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ী হন।
[৯৭] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol 10, File No. January `53/ 951, Page 229
[৯৮] ibid, page 224, পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের তদন্তে ও সি রিপোর্ট দেন যে পিটিশনার কলকাতা নিবাসী সুলতানের কাছে বাড়ি বদল করে টাকা নিয়েছে সুলতান ঢাকায় সে বাড়িতে বসবাস শুরু করে এবং বাড়ির ট্যাক্স প্রদান করে। দুই মাসের ভাড়া মানি অর্ডার করে পাঠালে পিটিশনার তা গ্রহণ করেনি। সে টাকা রেন্ট কন্ট্রোল অফিসে জমা দেয়া হয়।
[৯৯] পূর্ব পাকিস্তান তদন্ত কমিশনের বৈঠকের_শুনানী , দৈনিক আজাদ, ১৪ জুলাই ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণপুরে ফাল্গুন মাসে ৪০/৫০ জন লোক একটি বাড়িতে ৯ মণ ধান ও ৩ মণ চাল লুট করে ও আগুন লাগায়। আর কোন বাড়িতে আক্রমণ হয়নি। একটি ঔষধের দোকান লুট হয়। গোলমালের সময় আক্রান্তরা সহ বহু হিন্দু পরিবার স্থানীয় আশরাফ খানের গৃহে আশ্রয় নেয়।
কেরানিগঞ্জ থানা এলাকার জনৈক পেন্সনভোগী আদালতের কেরানি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২২ মার্চ তারিখে তার গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং উক্ত ঘটনার দুইদিন পূর্বে তিনি তার জামাতার গৃহে আসেন। তার এক প্রজা ঢাকায় এসে তাকে ঘটনার কথা জানায়।[১০০]
ধানকোড়া গ্রুপ অব ওয়ার্ডস এর একাউন্ট্যান্ট রশিক চন্দ্র ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেন যে ১৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর গ্রামের বাড়ি আক্রান্ত হয়। অক্রান্ত হলে তার পরিবার এবং সে গ্রামের আরও কয়েক পরিবার স্থানীয় মুসলমান পোস্ট মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন পর রসিক চন্দ্র তার পরিবারকে ঢাকা শহরে নিয়ে আসে। কয়েক মাস পর জানতে পারেন যে তার বাড়ির দরজা জানালা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তিনি সরকারের কাছ থেকে ২০ টাকা ক্ষতিপূরণ পান।[১০১]

বর্ধমান জেলার কালনা নিবাসী (শ্রীনগর থানার প্রাক্তন অধিবাসী) মনেরঞ্জন কুন্ডু জানান ১৯৫০ সালের মুলাদী রায়টের কথা শুনে তারা ভয় পেয়ে দেশত্যাগ করেন। তাদের গ্রামে কোন আক্রমণ হয়নি। কোন দাঙ্গা হয়নি।

মায়া সাহা ও তার পরিবার ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে, দাঙ্গার সময় তাদের গ্রাম আক্রান্ত হলে সে সময় তাদের বাড়িতে রান্না হচ্ছিল, সব কিছু ফেলে ভয়ে তারা পালিয়ে আসেন। পশ্চিমবাংলায় গিয়ে তারা সাতগাছিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন।[১০২]

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ঝর্ণা সাহা জানান যে, দাঙ্গার সময় সাভারের কুণ্ডা গ্রাম আক্রান্ত হলে সে গ্রামের অধিবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। সে সময় অনেক বাড়িতে রান্না হচ্ছিল। ঝর্ণা সাহা ও তার পরিবার ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে, দাঙ্গার সময় তাদের গ্রাম আক্রান্ত হলে তারা সব কিছু ফেলে ভয়ে তারা পালিয়ে আসেন। তাদের সব কিছুই ফেলে পালিয়ে যান। পশ্চিমবাংলায় গিয়ে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তারা সাতগাছিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন।[১০৩]

১৯৫০ সালে চারিদিকে অশান্তি দেখে নিতাই সাহাকে তার বাবা কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। তাদের বাড়ি ছিল ফাঁকা জায়গায়। পরে তার বাবাকে প্রতিবেশীরা দর্শনা পর্যন্ত দিয়ে যায়।[১০৪]
কলকাতার রাসবিহারী এ্যাভিনিউ এর বাসিন্দা বাদল সেন জানান ১৯৫০ সালে একটি দাঙ্গা হল ঢাকায়। ঢাকা দাঙ্গার একটি কেন্দ্র ছিল। তখন কিছু মাইগ্রেশন হল। অশিক্ষিতরাই বেশী রয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সমস্যার সৃষ্টি করে।[১০৫]
কলকাতা নিবাসী সুনন্দা ঘোষ ১৯৫০ সালে ও দাঙ্গার সময় ময়মনসিংহ ও ঢাকার দাঙ্গা পরিস্থিতিতে তাদের কলকাতায় চলে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

> "আমার বাবা সুধাংশু রঞ্জন রায় ছিলেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। ঢাকার বাড়িটি বর্তমান ওয়ারী পোস্ট অফিস, ঢাকা। পূর্ববাংলায় আমরা থাকতাম বাবার সঙ্গে কলেজ কোয়ার্টারে। ১৯৫০ সালের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ও সে সময়কার পরিস্থিতির কারণে বিশেষ করে

[১০০] পূর্ব পাকিস্তান তদন্ত কমিশনের বৈঠকের_শুনানী, দৈনিক আজাদ, ২৫ জুলাই ১৯৫০
[১০১] Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol. 9, File No. June 50/433 GOEB
[১০২] মায়া সাহা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
[১০৩] ঝর্ণা সাহা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
[১০৪] নিতাই সাহা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা
[১০৫] বাদল সেন, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

আমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বাবা আমাদের ভাইবোনদের পাঠিয়ে দেয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও আমার বাবা বা আমরা কখনো আসবো ভাবিনি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার আগে কোন সমস্যা ছিল না। রায়টের সময় খুব ট্রাজিকভাবে আমাদের আসতে হয়েছে। ওখানে রায়টে অংশগ্রহণ করে বিহারী মুসলমানরা। যারা তখন ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে পূর্ববাংলায় শরণার্থী হিসেবে গিয়েছিল। তাদের সাথে কিছু স্থানীয় লোকেরা যোগ দেয়। তবে কলেজের মুসলমান ছাত্ররা ও শিক্ষকরা আমাদেরকে রক্ষা করেছিল। বাবার মুসলমান সহকর্মীরা সবসময় সাথে থাকতেন। তখন বাবা মা আমাদের পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার এক বন্ধু আমাদের ঢাকায় আমাদের ওয়ারীর বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাড়িতে কেউ ছিল না। আমরা খালি বাড়িতে উঠলাম। পরে সেখানে আরও কয়েকটি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আমরা আসার সময় বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। এমনভাবে আসি যেন কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা চলে আসছি। আমার এক কাকার একটি এয়ারওয়েজ ছিল তার একটি প্লেন আমাদের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের সাথে আরও কয়েকজন আত্মীয় স্বজন ছিলেন। আমরা অনেক কষ্টে কুর্মিটোলা এয়ারপোর্টে পৌঁছাই। আমাদের যে প্লেনে আসার কথা ছিল তার আগের প্লেনের সকল যাত্রীদের মেরে ফেলা হয় বলে শুনেছি। আমাদের সব কিছু কেড়ে নেয়া হয়েছিল। আমরা কলকাতা পৌঁছাই একেবারে খালি হাতে। আমার কাকা ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, তার কাছেই উঠেছিলাম।”[১০৬]

সরকারের পদক্ষেপ ও পুলিশের ভূমিকা

কালশিরার ঘটনা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বহুবার প্রতিবাদ করে চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু এতে কোন লাভ হয়নি।[১০৭] পূর্ববঙ্গ সরকার খুলনার কালশিরার সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার এর ঘটনা নিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ও ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যে প্রচারণা চলছিল তার প্রতিবাদ করে ৩ ফেব্রুয়ারি এক প্রেসনোট প্রকাশ করে। প্রেসনোটে বলা হয়,

> “খুলনার হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং উহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগ সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের আলোচনার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা কলকাতার সংবাদপত্র কর্তৃক পাকিস্তান বিরোধি দায়িত্বহীন অপপ্রচারণা। মহাসভা নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে বাঁচিয়া থাকার অধিকার সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতায় বক্তৃতায় মুসলিম লীগের “প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা” ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীর হাঙ্গামা এবং বঙ্গ বিভাগ হইতেই তাহারা এই অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশ্যভাবে নিন্দাপূর্বক পাকিস্তান বিরোধী অপপ্রচার ও হিন্দুদের প্রতি তথাকথিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরকে উত্তেজিত করিতেছে না অধিকন্ত ইদানিং কলকাতার বহুসংখ্যক প্রচারপত্র ছড়ানো হইতেছে এবং কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিশোধ দাবী করিয়া জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।
> মহাসভা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সমিতি প্রভৃতির ন্যায় অনর্থ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব উত্তেজিত করিবার জন্য সম্প্রতি খুলনায় অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা লইয়া পড়িয়াছে, এবং উহাকে বিকৃত করিয়াছে।
> এই সকল প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকার কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। ------- এই উত্তেজনাপূর্ণ অপপ্রচারণা ইতিমধ্যেই ফলবতী হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ২৪ শে জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গে একটানা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সংবাদ পাইতেছে। ফলে ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ হইতে বহু সংখ্যক বাস্তুহারা এই প্রদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) আসিতেছে।”[১০৮]

[১০৬] সুনন্দা ঘোষ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, কলকাতা
[১০৭] প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[১০৮] দৈনিক আজাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় হাঙ্গামা শুরু হলে সে দিন ১০ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত প্রেসনোটে সরকার বাগেরহাটের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ঢাকায় হাঙ্গামার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে এবং হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দেয়।

> "ঘটনার অব্যবহিত পরপরই উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ প্রহরার জন্য ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আহ্বান করা হয়। তাহাদিগকে লুণ্ঠণকারী কাহাকেও দেখিবামাত্র গুলি করিবার ক্ষমতা দেয়া হয়।
> সঙ্গে সঙ্গে শহরে সভা সমিতি ও চারি বা ততোধিক লোকের একত্র সমাবেশ ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।--------এ পর্যন্ত ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।"[১০৯]

সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়।[১১০] তবে তাজউদ্দিন আহমদ সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন যে, পুলিশ এসব বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করল না। অবাঙ্গালী পুলিশেরা বরং উৎসাহ যোগাচ্ছিল। পুরো প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল। সরকারের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত কারফিউর ঘোষণা দেয়া হলেও তা কার্যকর করা হল না।[১১১]
১১ ফেব্রুয়ারি রাত্রে এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আর কোন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[১১২]

দাঙ্গার সময় পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের ডি, আই, জি জনাব হাবিবুর রহমান তদন্ত কমিশনের নিকট যে সাক্ষ্য দেন তাতে সে সময় পুলিশের ভূমিকা সর্ম্পকে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন "১০ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বেকার পরিস্থিতিকে "উত্তেজনা- বিক্ষুব্ধ" বলা যায়না। ঐসময় দাঙ্গা বাঁধবার উপক্রম হয় তাও বলা যায়না। তবে পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে এবং দ্রুত উহার সংবাদ পৌছুতে থাকায় এখানকার মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়।
দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট দেয়া এক সাক্ষ্যে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন ডি.আই.জি হাবিবুর রহমান সে সময় দাঙ্গা পরিস্থিতিতে পুলিশ বিভাগের ভূমিকার ব্যাখ্যা করে বলেন যে, শহরের তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল ১১ ফেব্রুয়ারি সকল ডি,আই, জি কে ডেকে পাঠান এবং তাদের প্রত্যেককে অবিলম্বে বিভিন্ন থানার ভার দেন। তিনি কতোয়ালী থানার দায়িত্ব পান। তিনি তার এলাকায় কোথাও কোন গোলযোগের সংবাদ পেলেই সেখানে খানা তল্লাশী ও গ্রেফতারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দুই তিন দিন কতোয়ালী থানার ক্যাম্পেই অবস্থান করেন। তিনি যে কোন প্রয়োজনের কথা কন্ট্রোলরুমে জানালে আই,জি তাকে ই,পি,আর এর লোক দিয়ে সাহায্য করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হয়। শহরের রাস্তা সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তারা পুলিশকে সহযোগিতা করে। কতোয়ালী থানা এলাকায় জগন্নাথ কলেজ, বলিয়াদি হাউজ, রয় হাউজে বাস্তুত্যাগীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়। নিরাপত্তার জন্য এই সমস্ত ক্যাম্পে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সে সময় যে সমস্ত লোককে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তারা অনেকেই তাদের নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইলে আনসার ও কনস্টেবলরা তাদের বাক্স ও ভারী বিছানা পত্র লরীতে করে পৌঁছে দেয়। পরিত্যক্ত বাড়ি ঘর পাহারা দেয়ার জন্য কোন কোন এলাকায় প্রবেশ পথে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।[১১৩]
১৫ ফেব্রুয়ারি এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়,

---

[১০৯] প্রেসনোট, ঐ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[১১০] প্রেসনোট, ঐ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[১১১] তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, পৃষ্ঠা ৭৩
[১১২] প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ১২ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[১১৩] হাবিবুর রহমান, পূর্ববঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর সাক্ষ্য দেন। দৈনিক আজাদ, ৬ ডিসেম্বর ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

> "ঢাকা শহর ও শহর তলীর অবস্থা শান্তই আছে গতরাত্রে এবং আজ কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা পুনরুদ্ধার ও চিকিৎসা এবং রিলিফ কার্যে সাহায্যের জন্য পাকিস্তান মহিলা ন্যাশনাল গার্ড, নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি ঢাকা, ঢাকা মহিলা ক্লাব, রেডক্রস ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কাজ করছে। তেজগাঁও থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।"[১১৪]

খুলনা পুলিশের অবিবেচক পদক্ষেপ ও তৎকালীন সরকারের অদূরদর্শীতার ফলে ১৯৫০ সালে ভারতের কলকাতা, বিহার, জামসেদপুরে এবং পূর্ববাংলায় ভয়াবহ দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এ সময়ের প্রকৃত ঘটনা, পুলিশ ও সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে আব্দুল মোহাইমেন বলেন,

> "দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সনে খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমার কালশিরা গ্রামে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় '৫০ সনে যে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাতে কত হাজার নিরীহ মুসলমান যে প্রাণ হারিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। ------খুলনা থেকে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী ঐ এলাকায় গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের না পেয়ে ঐ এলাকার লোকজনের উপর অত্যাচার চালায়--- কয়েকজন পুলিশ হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রেরিত পুলিশেরা যে কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কালশিরা গ্রামের অত্যাচারিত হিন্দুরা কলকাতায় গিয়ে ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে স্থানীয় লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য অনেকটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করতে থাকে এবং স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচারের অনেক কল্পিত কাহিনী প্রচার করতে থাকে।"----
>
> "তখন পূর্ববঙ্গে শাসন ক্ষমতায় ছিল নূরুল আমিনের মুসলিম লীগ সরকার। আশ্চর্যের বিষয় তখন দিনের পর দিন কলকাতা রেডিও, সেখানকার পত্রিকাগুলি এখানকার ঘটনার উপর মিথ্যা খবর ছড়াতে লাগলো এবং জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে লাগলো তখন নূরুল আমিন সরকার একদম চুপ মেরে রইলো। তখন যদি প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে বিবৃতি দেওয়া হত এবং ভাল করে প্রচার করা হত যে কালশিরা গ্রামের ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই ----জনসাধারণকে উত্তেজিত করে পঞ্চাশের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সৃষ্টি করতে পারতো না।"[১১৫]

অন্যান্য জেলায় দাঙ্গা

ঢাকার বাইরে ফেনী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং সিলেটে গোলযোগ ঘটে। ১৩ ফেব্রুয়ারি বরিশালে গুজব ছড়ায় যে কলকাতায় ফজলুল হককে হত্যা করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। নোয়াখালীর ফেনীতে ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে, চট্টগ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ময়মনসিংহ ও সিলেটে ১৬ ফেব্রুয়ারি এভাবে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। তবে ঢাকায় দাঙ্গা বাঁধানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিহারী মুসলমানরা।[১১৬]

১৩ ফেব্রুয়ারি ভৈরব এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি শান্তাহারে ট্রেন আক্রান্ত হয়। ঢাকার বাইরে মোট হতাহতের সংখ্যা ১২৫ জন। এর মধ্যে মুসলিম হতাহতের সংখ্যাও অর্ন্তভুক্ত।"[১১৭] ১৯৫০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে ১৩ ফেব্রুয়ারি বরিশালে এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি সিলেটে হাঙ্গামা হয়। কতিপয় স্থানে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ হলেও কেউ গুরুতরভাবে আহত হয় নাই।[১১৮]
চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন জারী করা হয় এবং পরিস্থিতি আয়ত্বে আনয়নের জন্য সামরিক বাহিনী আহুত হয়।[১১৯]

---

[১১৪] .দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[১১৫] মোঃ আব্দুল মোহাইমেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

[১১৬] মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৫২(প্রথম খন্ড), আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১১৭

[১১৭] প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ অধিবেশন. ১২ মার্চ ১৯৫০, দৈনিক আজাদ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[১১৮] দৈনিক আজাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[১১৯] ঐ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

১৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে ৭ জন লোক ছুরিকাহত হয় এবং ৪ টি স্থানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তৎক্ষণাত সান্ধ্য আইন জারী করা হয় এবং সৈন্যবাহিনী তলব করার ফলে অবিলম্বে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনয়ন করা সম্ভব হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত থাকে। পার্শবর্তী কয়েকটি পল্লী অঞ্চলেও গোলযোগ ঘটে। তবে স্থানীয় কতৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনতিবিলম্বে গোলযোগ বন্ধ হয়ে যায়।[১২০]

১৫ ফেব্রুয়ারি খুলনা ও বরিশাল সফর করেন চব্বিশ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ক্রিশ্চিয়ান স্কুলের রেঃ ডব্লিউ.ই.ফ্রেঙ্ক। তিনি তার সফর শেষে কলকাতায় ফিরে সে সময়ে খুলনা ও বরিশালের দাঙ্গা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,

> "খুলনা ও বরিশালে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কে কলিকাতায় যে গুজব রটিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত। খুলনা ও বরিশালে তিন দিন অবস্থান কালে সাম্প্রদায়িক অশান্তির কোন লক্ষণই তিনি দেখেন নাই। খুলনা হইতে বরিশালের পথে স্টীমারে তিনি খুলনার হাঙ্গামা সম্পর্কে নানারূপ গুজব শুনিতে পান কিন্তু খুলনায় পৌছে তিনি অশান্তির কোন লক্ষণই দেখিতে পান নাই। কলিকাতার হাঙ্গামার সংবাদ খুলনায় পৌঁছলে সেখানে স্টীমারে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহারই অতিরঞ্জিত সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে উদ্বেগের সৃষ্টি করে।"[১২১]

বরিশালে গুজব ছড়ানো হয় যে জনাব ফজলুল হক কলকাতায় নিহত হয়েছে। বরিশালে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে গোলযোগ আরম্ভ হলে অগ্নি সংযোগ করা হয়। প্রথমে সরকারী গুদামে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১৪ জনকে ছুরিকাঘাত করা হয়। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অবস্থা আয়ত্তে আসে। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে পল্লী অঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সদর মহকুমার অর্ন্তভুক্ত ঝালকাঠি ও নলছিটি থানায় ইতস্তত লুণ্ঠণ, গৃহদাহ ও ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে।[১২২] বরিশালের দাঙ্গা সম্পর্কে এম.আর.আখতার মুকুল বলেন,

> "বরিশালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কারা দায়ী সে বিতর্কমূলক প্রশ্নের অভ্যন্তরে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যই এর মূল কারণ।-- কলকাতা আর জলপাইগুড়িতে দাঙ্গা প্রশমিত হবার দুই দিনের মধ্যে বরিশালের অবস্থা শান্ত আকার ধারণ করে।[১২৩]

২৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোট জারি করে। প্রেসনোটে পূর্ববাংলায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার ডাঃ সীতারাম এর পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও উপকণ্ঠবর্তী এলাকা সমূহ, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল ও সিলেট জেলা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। হাই কমিশনার লক্ষ্য করেন যে, গোলযোগের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উদ্বিগ্ন।[১২৪]

ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে ফেনীতে হাঙ্গামার ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। তবে এ সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তা অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বলে অভিযোগ করেন বাবু হারান ঘোষ চৌধুরী এম.এল.এ ও নোয়াখালি সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য বাবু আশুতোষ নারায়ণ চৌধুরী। সত্যের অপলাপ হলে তাদের নিজেদের অবস্থা উদ্বেগজনক হবে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[১২৫]

---

[১২০] প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ঐ, ১০ মার্চ ১৯৫০
[১২১] দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[১২২] প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ঐ, ১৪ মার্চ ১৯৫০
[১২৩] এম আর আখতার মুকুল, ভাসানী মুজিবের রাজনীতি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩১
[১২৪] দৈনিক আজাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[১২৫] ঐ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

ফেনীতে সংঘটিত হাঙ্গামার বর্ণনা দিয়ে এবং এক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ এর ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন ব্যবস্থাপক পরিষদে বলেন,

> "উক্ত দিবসে (অর্থাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারী) ফেনীতে গোলযোগ আরম্ভ হইলে ঐ দিনই তা আয়ত্বে আনা হয়। কিন্তু পুনরায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয়। এখানে ইতস্তত লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড এবং ছুরিকাঘাত চলিতে থাকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে হতাহতের সংখ্যা এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ অধিক হইতে পারে নাই। যে সমস্ত অঞ্চলে আক্রমণ হইবার আশঙ্কা ছিল সে সকল অঞ্চল হইতে প্রায় চারি হাজার লোককে আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়।"[১২৬]

জামালপুরে ১৬ ফেব্রুয়ারি গোলযোগ আরম্ভ হয়, তা পরে কেন্দুয়া ও শেরপুরে ছড়িয়ে পরে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সহ দাঙ্গা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি দাঙ্গা বন্ধ হয়।[১২৭]

জনগণের ভূমিকা

দাঙ্গা চলাকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন হিন্দুদের উদ্ধার, আশ্রয়দান, চিকিৎসা, সেবা প্রদান, এলাকায় শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টে জানা যায় শান্তিমিছিল, প্রচারকার্য, সভা-সমিতির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে বলে। ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে উত্তেজনা দেখা দিলে অপরাহ্নে রাজধানীর অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র শহরে শান্তি মিছিল পরিচালনার জন্য বের হয়। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ঢাকা শান্তি ও রিলিফ কমিটি, পাকিস্তান ছাত্র র‍্যালী, পাকিস্তান ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ সাহায্য কমিটি, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম, মাসরেকী পাকিস্তান প্রভৃতি সংগঠন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার কমজারভ্যান্সি সুপারভাইজার গণ শিবির গুলিতে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন।[১২৮]

"ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে চারি হাজার হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী ছিল, পুরুষ ও মহিলা ভলান্টিয়ারগণ তাদের তত্ত্বাবধানে দিনরাত কাজ করেন। সরকার চাল, ডাল, চিড়া, গুড় সরবরাহ করে। শান্তি ও রিলিফ কমিটির কর্মীগণ উপদ্রুত এলাকা সমূহে গমন করে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচার কার্য চালান।[১২৯]

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পূর্ববাংলা সরকার ও জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন,

> "গভর্নমেন্ট ১৮টি আশ্রয় শিবির খুলিয়া কড়া মিলিটারি পাহারায় হিন্দুদের রক্ষা করিতেছেন। সরকারের পক্ষ হইতে খাদ্য ও দুধ দেওয়া হইতেছে। বিখ্যাত দানবীর শ্রীমান রণদা প্রসাদ সাহা বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে কয়েকদিনে এক হাজার মণ চাউল, ডাল, ও শিশুদের জন্য নিয়মিতভাবে বিলাতি দুধ বন্টন করিতেছেন। বহু যুবক, মুসলমান এম. এল. এ এবং মুসলিম নারী সংঘকে নানা প্রকারে হিন্দুদিগকে অভয় এবং আশ্বাস দিয়া এবং নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি।------ শহরের আতঙ্ক গুজব সবই আমি শুনিয়াছি এবং যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, হতাহতের সংখ্যা কলিকাতায় অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত হইয়াছে। পুলিশ ও সামরিক কর্তৃপক্ষ দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত উপদ্রব কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন।---- মঙ্গলবার ঢাকা শহর

---

[১২৬] ঐ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[১২৭] নূরুল আমিন, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ১০ মার্চ ১৯৫০ দৈনিক আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৫০

[১২৮] দৈনিক আজাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[১২৯] ঐ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। ঢাকার অদূরবর্তী অঞ্চল হইতে কিছু কিছু উদ্বেগজনক সংবাদ আসিয়াছে এবং শুনিলাম সেইসব স্থানে পুলিশ ও কিছু কিছু সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।[১৩০]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর প্রাদেশিক পরিষদের হিন্দু সদস্যদের ভূমিকা ছিল নীরব। দাঙ্গা সংক্রান্ত বিষয়ে তারা পরিষদের অধিবেশনে তেমন কোন বক্তব্য প্রদান করেননি। ৯ মার্চের অধিবেশনে তাদের নীরব ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে সদস্য জনাব মজিবুর রহমান বলেন,

"আজ এই দেশের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ নাগরিকগণকে এই সংকটজনক মুহূর্তে নীরব থাকতে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি।---এখান থেকে যারা পশ্চিমবাংলায় চলে গিয়েছে তারা এখানকার বাড়ীতে একজন করে প্রতিনিধি রেখে কলিকাতায় গিয়ে প্রবাসী হিসাবে বসবাস করছে। সেখানে গিয়ে তারা propaganda করছে 'পূর্ব্ববাংলা অধিকার কর, পূর্ব্ববাংলার উপর হামলা কর, পূর্ব্ববাংলা দখল কর'। যখন পূর্ব্ববাংলার জন্য এইসব slogan দেওয়া হয় তখন যদি পূর্ব্ববাংলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা চুপ করে বসে থাকেন তা'হলে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ থাকতে পারে কিনা নিজেরা বিচার করুন।---তাদের কর্তব্য পাকিস্তানের উন্নতি ও শান্তি কামনা করা এবং বিপদে আপদে পাকিস্তানের কর্ম্মকর্ত্তাদের সহায় হওয়া কিন্তু তা না করে তারা প্রতিদিন নেহেরু সাহেবকে টেলিগ্রাম, পশ্চিমবাংলায় টেলিগ্রাম করেন।"[১৩১]

পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা

১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুসলমান বস্তিতে বোমা ছোঁড়া এবং আগুন লাগানো হয়।
১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রায় আটশত লোকের একদল জনতা একটি বাড়িতে চতুর্দিক হতে আক্রমণ চালায়। বাড়ির মালিক একজন কারখানার শ্রমিক। তারা এসময় সেখানকার বস্তিবাসিদিগকে বলে যে পাকিস্তান চলে যাও।
৯ ফেব্রুয়ারি বাগমারিয়া এলাকায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ডাক্তারের মতে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর জুলুমের খবর ছাপানোর ফলেই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা হয়।
নদীয়া, চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে অসংখ্য মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে যান। ধুবুলিয়ার হিন্দু উদ্বাস্তুরা মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়। অন্যদিকে হাওড়া এবং কলকাতায় বহু মুসলমান বস্তি পুড়িয়ে দেয়া হয়।[১৩২]
পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি মিঃ দেবেন সেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন,

"৮ ফেব্রুয়ারি হইতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দাঙ্গা প্রথমে উত্তর কোলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ও লুটতরাজই বেশী হইয়াছে। ২১ মার্চ্চ হইতে ৩০ শে মার্চ্চ পর্যন্ত প্রধানত হাওড়ার শ্রমিক অঞ্চলে দাঙ্গা চলতে থাকে। লুটতরাজ,অগ্নিকান্ড এবং নরহত্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। উহার পর ১লা মার্চ্চ হইতে ১৩ই মার্চ্চ পর্যন্ত চন্দননগরে গুরুতরভাবে দাঙ্গা চলিতে থাকে। পণ্ডিত নেহেরুর আগমনের সহিত উহা থামিয়া যায়। শ্রমিকরা দাঙ্গাঁয় অংশগ্রহণ করিতে থাকে। চন্দননগর হইতে উদ্বাস্তুদের বরাকপুরের কয়েকটি অঞ্চলে পুর্নবসতির ব্যবস্থা করা হয়।
দাঙ্গার অন্যতম কারণ হইতেছে গৃহাদির অভাব, তাহার উপরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের চাপ উহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। অবিলম্বে সকল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেয়া উচিৎ।"[১৩৩]

[১৩০] ঐ, ১৭ ফেব্রুয়ারি
[১৩১] মজিবুর রহমান, প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন, ৯ মার্চ ১৯৫০, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০
[১৩২] পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট দেয়া সাক্ষ্য, দৈনিক আজাদ ১ জুলাই ১৯৫০
[১৩৩] ঐ, ১ জুলাই ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

১০ ফেব্রুয়ারি আরও বড় ধরনের হাঙ্গামায় ৫৬ জন আহত হন। কলকাতার মুসলমান বস্তিগুলোর ওপর একতরফাভাবেই আক্রমণ চালানো হতে থাকে।-- গ্রামাঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ হচ্ছিল। ১ এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে কিছু মুসলমান সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় সাওতাঁল অধিবাসীরা তাদের বাঁধা দেন।[১৩৪]

হাওড়ার সৈয়দুন্নেসা নামের এক মহিলা জানান ২৭ মার্চ তাদের গ্রাম আক্রান্ত হলে তার পরিবারের সদস্যরা সিংরাতি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে জনতার আক্রমণে তার স্বামী নিহত হন।
গদীশপুর গ্রামের নুরুজ্জামান হাজরা জানান তার বাড়ি ঘরে লুটতরাজ হয় এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তাদের গ্রামে যথেষ্ঠ লুটতরাজ হয়। তবে তাদের গ্রামের স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট যতীন্দ্রনাথ দাস মুসলমানদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। মুসলমানরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি লুট হয়।[১৩৫]
দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের চিত্র তুলে ধরে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ হতে পূর্ববঙ্গ হতে উদ্বাস্তদের আগমন বন্যার আকার ধারণ করে। পূর্ব বাঙলার হিন্দু যে পথে সুবিধা সেই পথে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার নিকটতম ভারতভূমির অংশ হল ত্রিপুরা রাজ্য। সুতরাং সেই দিকে এই অঞ্চলের বাস্তুত্যাগী হিন্দুর স্বাভাবিক গতি। শ্রীহট্টের হিন্দুর স্বাভাবিক আশ্রয় হল কাছার জেলা। অনুরূপভাবে ময়মনসিংহ জেলার হিন্দুর আকর্ষণ উত্তর আসামের প্রতি। উত্তরে রংপুর জেলার মানুষের নিকটতম আশ্রয়স্থল কুঁচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্ব দিনাজপুরের উদ্বাস্তুর গতি পশ্চিম দিনাজপুরের দিকে। রাজশাহী জেলার মানুষের আকর্ষণ মালদহের দিকে। পূর্ব পাকিস্তানের বাকি যে অংশ তার থেকে দুটি মূল স্রোতে পশ্চিমবাঙলার দক্ষিণ অংশে উদ্বাস্তু হিন্দুর স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথম স্রোতটি ট্রেনযোগে দর্শনায় এসে সীমানা অতিক্রম করে ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছে।[১৩৬]

দাঙ্গা পরবর্তী পদক্ষেপ

১৯৫০ সালের ২০ মার্চ পাকিস্তান গণ পরিষদের বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট বিভিন্ন দাঙ্গার বর্ণনা দিয়ে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের বিচারের দাবী জানিয়ে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে স্মারক লিপি পেশ করেন।
পূর্ববাংলা, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ও ত্রিপুরায় দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ভারত সফর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আলোচনা করে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং পুনরায় যেন দাঙ্গার ঘটনা না ঘটে সেই লক্ষ্যে ৮ এপ্রিল এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ১০ এপ্রিল নিজ নিজ দেশের পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। সরকার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। দিল্লী চুক্তির পর শরণার্থী মুসলমানরা পশ্চিমবাংলায় এবং হিন্দু পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করে। ৩৫ লক্ষ হিন্দু শরণার্থীর মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করে।[১৩৭] প্রায় ৭ লক্ষ মুসলমান ভারতে প্রত্যাবর্তন করে।[১৩৮]

---

[১৩৪] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
[১৩৫] পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের নিকট দেয়া সাক্ষ্য, দৈনিক আজাদ ১৬ জুলাই ১৯৫০
[১৩৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ৬৮
[১৩৭] Speaker, West Bengal Assembly Proceedings, 8th Feb. 1951, 3rd Session (Budget), Vol. iii, No.1, Page-2, Pranati Chaudhury, Refugee in West Bengal, page 18,
[১৩৮] West Bengal Assembly Proceedings, 17th April 1950

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর সে সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালের ২০ এপ্রিল দিল্লী চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিজ আমির উদ্দীনকে কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করে তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের অপর দুই সদস্য ছিলেন রংপুরের তৎকালীন জেলা জজ মিঃ এস.এন চক্রবর্তী এবং কৃষি আয়কর ট্রাইবুনালের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ। ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে তার উপায় সম্পর্কেও রিপোর্ট পেশ করার দায়িত্ব তাদের দেয়া হয়।
৪ জুলাই সোমবার পূর্ববঙ্গ পরিষদ ভবনে পূর্ববঙ্গ তদন্ত কমিশনের শুনানি আরম্ভ হয়। তদন্ত কমিশনের সভাপতি বিচারপতি আমিরুদ্দীনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ আগষ্ট তারিখ পর্যন্ত বিবৃতি দাখিল করার শেষ দিন ধার্য্য করা হয়।

কমিশনের সভাপতি ২ জুন এক এশতেহারে জানান ২০ জুন থেকে তদন্ত কাজ শুরু করবেন।[১৩৯] কমিশন তদন্ত কাজের তথ্য সংগ্রহের জন্য জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, দাতব্য, সামাজিক, ও জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারি, সাহায্য পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদের নিকট থেকে তাদের জানা ঘটনার বিবরণ আহ্বান করে। তদন্ত কমিশন ঢাকা জেলা সহ পূর্ববাংলার দাঙ্গা পিড়ীত জেলা সমূহের দাঙ্গা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন ১৯৫১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি।[১৪০]

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর সে সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে তার উপায় সম্পর্কেও রিপোর্ট পেশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫০ সালের ২০ এপ্রিল দিল্লী চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশন' গঠন করা হয়। তদন্ত কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের যারা পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্য অংশে বাস করছিল, বা পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গার ফলে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে গমন করছিল পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জানা ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ ১৯৫০ সালের ৩০ জুনের পূর্বে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস এ অবস্থিত 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তদন্ত কমিশন' এর সেক্রেটারির নিকট পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন দাঙ্গা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রিপোর্ট পেশ করে।

দাঙ্গার পর পূর্ববাংলায় অবস্থানরত হিন্দু আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ নেবার জন্য পশ্চিমবাংলার বাঙ্গালিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পরে। পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আগ্রহী আত্মীয়দের নিকট থেকে তথ্য সম্বলিত কিছু স্লিপ পূরণ করে পূর্ববাংলা সরকারের নিকট তদন্তের জন্য পাঠানো হলে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত করে রিলিফ অফিসার জানায় যে, এ সকল ব্যক্তিদের আর কোন সমস্যা নেই, তারা নিরাপদে আছে তবে সকলেই পশ্চিমবাংলায় তাদের পরিজনদের কাছে চলে যেতে আগ্রহী কিন্তু তাদের কাছে পশ্চিমবাংলায় যাওয়ার মত আর্থিক সংগতি নেই।[১৪১]
১৯৫০ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চুক্তির সাত নং ধারায় বলা হয়, "সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন সংবাদ বা অভিমত যাতে কোন সংবাদপত্র, রেডিও অথবা প্রতিষ্ঠান বিশেষের মারফত প্রচারিত না হয় সরকার তার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এইরূপ কোন কার্যের দায়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।"[১৪২]
চুক্তির ফলে ১২ লক্ষ হিন্দু দেশে ফিরে এলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ধারা বিভিন্ন কারণে কম বেশী অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবাংলায় দিল্লী চুক্তির বিরোধিতা করে আন্দোলন গড়ে ওঠে। দিল্লী চুক্তির পর চুক্তির বিরোধিতা করে ভারতে সভা সমাবেশে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান অব্যাহত থাকে। বেঙ্গল প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, বেঙ্গল পুর্নবাসন সংস্থা চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রচারণা অব্যাহত রাখে। পূর্ববাংলায় হিন্দু নির্যাতনের কাহিনী সম্বলিত প্রচারপত্র প্রকাশ করতে থাকে। অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মেঘনাদ

১৩৯ দৈনিক আজাদ, ৩ জুন ১৯৫০
১৪০ ঐ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
১৪১ Home. political (C.R), B Proceedings, Vol. 7, File No. Dec. 1952/ 463-531, Page 81. GOEB
১৪২ দৈনিক আজাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

সাহার মত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এ চুক্তির সমালোচনা করেন। তারা মনে করেন যে, এ চুক্তি হিন্দুদের মনে কোন আস্থা সৃষ্টি করতে পারবে না এবং লোক বিনিময়ের বিষয়কে বাধাগ্রস্থ করবে।[১৪৩]

পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় শিবিরে যারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের হারের একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হয় সরকারী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারীদের তালিকা থেকে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস হতে কয়েকমাস কি হারে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয় তার একটা হিসাব দেয়া হল।

সারণী-৫.১

১৯৫০ সালে দাঙ্গার পর পশ্চিমবাংলার আশ্রয় শিবিরে ভর্তী সংখ্যা

মাস	আশ্রয় শিবিরে ভর্তী সংখ্যা
জানুয়ারি	১,১৫০
ফেব্রুয়ারি	১,০০২
মার্চ	৭৫,৫৯৬
এপ্রিল	১৪,৯৬০
মে	২৭,৪৪০

সূত্রঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

দাঙ্গা বন্ধ হলেও বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ সীমিত আকারে অব্যাহত থাকে। ৯ অক্টোবর মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে পূর্ববাংলা ত্যাগ করলে হিন্দু সম্প্রদায় আরও ভীত হয়ে পড়ে। ফলে দিল্লী চুক্তির পর হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলায় ফিরে আসা বাধাগ্রস্থ হয়।
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার হিন্দু শরণার্থীদের আশ্রয় গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন যে,

> ১৯৫০ সালের এপ্রিল হতে উভয় বঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখমের হার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। বিদ্বেষের আগুন তো অনির্দিষ্টকালের সমান তেজে জ্বলে থাকতে পারেনা। ১৯৫০ সালের গোড়ায় উদ্বাস্তুদের আগমন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তারপর ফেব্রুয়ারির শেষে সর্বাত্মক দাঙ্গা হাঙ্গামার বিস্তৃতির ফলে তা ব্যাপক আকার নিয়ে আবার শুরু হয়েছিল। যে সকল উদ্বাস্তুরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল তাদের সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না।[১৪৪]

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেক অংশ দেশত্যাগ করেনি, আবার অনেকে ভারতে গিয়ে সুযোগ সুবিধা না পেয়ে ফিরে এসেছে। হিন্দু জনগণের যারা দেশত্যাগ করেনি তাদের দেশত্যাগ না করার কারণ ও তাদের সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে সমর গুহ বলেন,

> "They are not the socially and politically conscious upper and middle class Hindus but people belonging to unconscious backward communities,- the peasantries, the agricultural laborers, the fishermen, the poor weavers, the petty businessmen and the helpless lower middle class.----- These forlorn backward non- Muslim masses have neither means, nor courage, nor alertness, for facilities to cross over the border and seek for another shelter of peace and security.--'babus' who are still found amidst these forsaken

[১৪৩] Gyanesh Kudaisya, DIVIDED LANDSCAPES, FRAGMENTED IDENTITIES: EAST BENGAL REFUGEES AND THEIR REHABILITATION IN INDIA 1947-79' page 110-111
[১৪৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯২

common non Muslim masses, are only marking time, till they are able to make some suitable arrangement for shifting to Indian Union."[১৪৫]

রিফিউজিদের যারা অবস্থার পরিবর্তন হলে তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় তাদের জন্য জরুরী ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫০ সালের ৫ জুন সাংবাদিক সভায় রিলিফ কমিশনার প্রত্যাগত হিন্দুদের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগের বর্ণনা দেন। তিনি জানান যে, ১৯৫০ সালের ৫ জুন পর্যন্ত সময়ে পূর্ববঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক সরকার প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।[১৪৬]

১৯৫৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ, সে সময় পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার প্রতি দশজনের মধ্যে একজন ছিল শরণার্থী।[১৪৭]

কাশ্মিরে হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র চুল চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতে দাঙ্গা শুরু হলে ১৯৬৪ সালে পূর্ববাংলায় পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। এ দাঙ্গা প্রথমে খুলনায় শুরু হলেও পড়ে তা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গা সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এর ফলে বিভিন্ন জেলা সহ ঢাকা জেলার থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে।

---

[১৪৫] Samar Guha, Non Muslim behind the Curtain of East Pakistan, page 23-24

[১৪৬] দৈনিক আজাদ, ৬ জুন ১৯৫০

[১৪৭] R.R. Committee's Report, 1981, Page 1, তবে এ শরণার্থী শুধুমাত্র দাঙ্গার ফলেই পূর্ববাংলা ত্যাগ করেনি, ১৯৫২সালের ভারত ও পাকিস্তানের পাসপোর্ট পদ্ধতির প্রচলনের ফলেও পূর্ববাংলা ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
১৯৬৪ সালের দাঙ্গা পরিস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ

১৯৫০ এর দাঙ্গার পর ১৯৬৪ সালে পুনরায় বড় ধরনের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। পশ্চিমবাংলা সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় ২৫ লক্ষ শরণার্থী স্থায়ীভাবে বাস করছিল।[১] পূর্ববাংলা ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬.৯৩% হিন্দু ধর্মের লোক ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার পর পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে।[২] ঢাকা শহরের রায়ের বাজার ও বাঁশবাড়ি এবং গাজীপুর এলাকা থেকে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পূর্বে কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করেনি।[৩] ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগে প্রভাবিত করে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ জনগণ ও সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর প্রচেষ্টায় দাঙ্গা পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের ফলে দাঙ্গা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি এবং এর বিস্তার খুব বেশী হয়নি। তারপরও এই দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের জানমালের ক্ষতি হয় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হিন্দু জনগণ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়।[৪]

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারির দাঙ্গার পর পূর্ববাংলায় বড় ধরনের কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সংরক্ষিত চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে হিন্দুদের ভারতে গমন চলছিল তবে তা বেশী মাত্রায় নয়। ভারতীয় সরকারের নিয়োজিত 'R.R Committee's Report' এ বলা হয় ১৯৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৩১.৩২ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় ছিল।[৫] ১৯৫৮ সাল থেকে ভারতীয় কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ভারত পাকিস্তান একত্র করে একটি কেন্দ্রের অধীনে এনে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। এর বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব করা হয়। আরও প্রস্তাব করা হয় যে, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে পাকিস্তানীদের অপসারণ করতে হবে।[৬] এধরনের যে কোন প্রস্তাব বা পদক্ষেপ যে কোন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

১৯৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে পাকিস্তানের মালিক ফিরোজ খান নুন ও ভারতের পণ্ডিত জওহররাল নেহেরুর মধ্যে এক সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় সীমান্ত এলাকায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।[৭]

হিন্দু মহাসভার নেতা এন.সি চ্যাটার্জী এ চুক্তির বিরোধিতা করেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের চুক্তি করার কোন অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এধরনের চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৮] কলকাতা হতে প্রকাশিত কিছু পত্রিকা এ বিষয়ে চরমপন্থী নেতাদেরকেই সমর্থন করতে থাকে।[৯]

পূর্ববাংলায় বড় ধরনের দাঙ্গার ঘটনা না ঘটলেও পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গা ঘটে চলছিল। ১৯৬২ সালের ২৪ এপ্রিল তৎকালীন ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতীয় লোকসভার বক্তৃতায় বলেন যে হোলী

---

[১] R.R Committee's Report, Prefected by Samar Mukharjee, Chairman, R.R Committee, West Bengal Government, Calcutta, 1981, page 1

[২] Joya Chatterji, op-cit, page 112

[৩]. নিতাইচন্দ্র বিশ্বাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

[৪] সৈয়দ মাহবুবুর রশীদ, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্মৃতিময় ১৯৬৫, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৪৪

[৫] R.R Committee's Report, op-cit, page1

[৬] দৈনিক আজাদ, ৯ অক্টোবর ১৯৫০

[৭] ঐ, ৯ অক্টোবর ১৯৫০

[৮] ঐ, ৯ অক্টোবর ১৯৫০

[৯] ঐ, ৯ অক্টোবর ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসবের সময় মালদহে প্রথম দাঙ্গার সূত্রপাত হয় তখন দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা হলেও ১৬ এপ্রিল পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান। গোলযোগের কারণে সেখানকার সাওঁতালরা ভীত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানায়।[১০] ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার জনাব আগা হিলালী ১৯৬২ সালের ২৪ এপ্রিল ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরে মালদহের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদ করে সরকারের নিকট আবেদন জানায়।[১১]

১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল ঢাকা জেলার পুটিয়া ইউনিয়নের হিন্দু অধিবাসীগণ ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক চিঠিতে অনুরোধ করেন,

> "হিন্দুদের দোল পুজার সময়ে মালদহের হিন্দুগণ অন্যায়ভাবে তথাকার মুসলমানদের জামা কাপড়ে রং ছিটায়। মুসলমানগণ এর প্রতিবাদ করিলে তাহাদের উপর হামলা করা হয়। ---উভয় স্থানেই হিন্দুদের হাতে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রাণ হারায়।-----ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তার অভাব হইলে তাহার ফলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু জনসাধারণের মনে আপনা আপনিই তাহাদের জান-মালের বিষয়ে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়ে থাকে।---আমাদের ভয় যে ভারতে অনুরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অব্যাহত থাকিলে এখানকার সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাকিস্তান সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখানেও ভারতের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।"[১২]

৩০ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জেলায় দাঙ্গা হয়েছে বলে ভারতের সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পত্রিকায় এসকল ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার না করার জন্য পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।[১৩] পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলার সরকারের নিকট এক প্রতিবাদপত্রে জানানো হয় যে, ৩০ এপ্রিল পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ববাংলার দাঙ্গার সংবাদ সঠিক নয়, চাদঁপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, ও ঢাকা অথবা পূর্ববাংলা কোথাও কোন দাঙ্গা হয়নি। তবে দাঙ্গার ফলে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বাস্তুত্যাগী রাজশাহীতে প্রবেশ করার ফলে সেখানে উত্তেজনা দেখা দিলে সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। প্রতিবাদ পত্রে বলা হয়,

> "পশ্চিমবঙ্গে পত্রিকাসমূহে ঐভাবে অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশিত হইতে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক উম্মত্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে এখানেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পত্রিকায় এসকল ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ হইতে বিরত করাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।"[১৪]

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে রাজশাহী থেকে ব্যাপক আকারে বাস্তুত্যাগ শুরু হয়েছে বলে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় ১ মে ১৯৬২ তারিখে পশ্চিমবাংলা সরকারের এক মুখপাত্র এর সত্যতা অস্বীকার করেন এবং জানান যে মাত্র নয়জন ব্যক্তি সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করেছে।[১৫]

পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় বলে জানান পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্র সচীব।[১৬] পশ্চিমবাংলার কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু এম.এল.এ মালদহ জেলার কয়েকটি

---

[১০] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল, ১৯৬২
[১১] ঐ, ২৫ এপ্রিল, ১৯৬২
[১২] দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মে ১৯৬২
[১৩] ঐ, ২ মে ১৯৬২
[১৪] ঐ, ৩ মে ১৯৬২
[১৫] ঐ, ২ মে ১৯৬২
[১৬] ঐ, ৬ মে ১৯৬২

এলাকা পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানান যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণ নিতান্ত হতাশ এবং আতংকগ্রস্থ হয়ে আছে। অন্যদিকে সারা এলাকা ঘুরে পুলিশের তৎপরতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।[১৭]

১৯৬২ সালের ১০ মে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার এক সভা হয় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে, সে সভায় ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার সে সময়ের সাম্প্রদায়িক বিষয় এবং কংগ্রেস সরকারের দায়িত্ব ও পাকিস্তানের সঙ্গে সরকারের দুর্বল নীতি ও ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং ভারতীয় হিন্দুরা পাকিস্তানের হিন্দুদের সম্পর্কে কোন ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ করা হয়।

> "They called upon the Hindus to prepare themselves for protecting there lives and properties and upholding the prestige of Hindu ladies in the event of any Muslim hooliganism."[১৮]

১৯৬২ সালে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে পুনরায় দুই দেশের মধ্যে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব করে বলে, "Resolution demanding exchange of population to solve the present communal tension was adopted."[১৯] ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে সৈয়দ বদরুদ্দোজা তার বক্তৃতায় বলেন,

> "আমাদের মুসলমানদের সাড়ে সাতশো মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার হিন্দুরা করিয়াছে কিন্তু হিন্দু কংগ্রেস সরকার প্রতিকার করে নাই। পাকিস্তান হইতে যে হিন্দুরা আসিয়াছে কংগ্রেস সরকার সাড়ে তিনশো কোটি টাকা খরচ করিয়াছে এবং তাহাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়াছে কিন্তু যে সব মুসলমানরা পকিস্তান হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহাদের বসতির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এমনকি তাহাদের বাড়ি ঘর পর্যন্ত ফেরত পায় নাই। তাহারা গাছতলায় বসবাস করিতেছে এবং মুসলমানদের যোগ্যতা থাকা সত্যেও কোন চাকুরী কিন্তু কংগ্রেস সরকার দেয় না। মুসলমানদের মোহাম্মদ, সৈয়দ প্রভৃতি টাইটেল উঠিয়ে দিয়ে শ্রী ও শ্রীমতি লিখিতে মুসলমানদের বাধ্য করিয়াছে। আমাদের নবীর বিরুদ্ধে যে ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়া হিন্দুগণ আমাদের ধর্ম্মকে কলুষিত করার চেষ্টা করিয়াছে আমি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার কোন প্রতিকার এ যাবৎ কিছু করেন নাই।"[২০]

১৯৬২ সালের ১০ মে কলকাতায় এ.ডি.সি সদস্যদের মধ্যে এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় কমিটি অফিসের প্রায় ৮০/৮৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবাংলা বিশেষ করে মালদার তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অবস্থা তুলে ধরে সি.পি.আই নেতা জ্যোতি বসু জানান যে, মালদায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এর ফলে সেখানে মহিলা ও শিশু সহ ৯ জনের আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়।[২১]

তিনি আরও জানান যে, তার দল কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সমর্থন করেনা। তারা দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। দাঙ্গায় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে জ্যোতি বসু বলেন যে সরকারের দাঙ্গা থামানোর কোন ইচ্ছে নেই।[২২]

---

[১৭] ঐ, ৬ মে ১৯৬২

[১৮] Report of I.B, Special Branch, Calcutta, 11 May 1962, Home, Political (C.R) B Proceedings, West Bengal State Government, India.

[১৯] Report of a secret source of I.B, Special Branch, Calcutta, 11 May 1962, Home, Political (C.R), B Proceedings, West Bengal State Government, India.

[২০] সৈয়দ বদরুদ্দোজা, Statement of Shri Biswa Nath Saha, page- 2, Home, Political (C.R) B Proceedings, West Bengal State Government, India.

[২১] Jyoti Basu, of I.B, Special Branch, Calcutta, 10 May 1962, Proceedings of Home, Political (C.R) B Proceedings, West Bengal State Government, India.

[২২] ibid,

১৯৬২ সালের ১৭ মে ২ টি হিন্দু পরিবার শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছায়। কয়েকটি পরিবারের থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ জানতে পারে যে ঢাকা, রাজশাহী, পাবনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ১৮ মে শিয়ালদা স্টেশনে আগমন করা হিন্দু পরিবার জানায় যে ঢাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।[২৩]

১৯৬২ সালের ১৮ মে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ২১ টি হিন্দু পরিবার, ২২ মে ২টি হিন্দু পরিবার ও ৫০ টি মুসলমান পরিবার এবং অন্য কয়েকদিনে ৩৩টি হিন্দু পরিবার ও ৩৩ টি মুসলমান পরিবার শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে। নারায়ণগঞ্জের একজন জানান যে, তারা মুসলমান কর্তৃক উত্যক্ত হওয়ার ভয়ে তাদের মেয়েদের স্কুল ও কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।[২৪]

পশ্চিমবাংলা সরকারের হিসাব মতে ১৯৬২ সাল ৫৫,০০০ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৫]

১৯৬৩ সালের ৮ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে ‘উদ্বাস্তু স্রোত’ শিরোনামে এক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতিদিন উদ্বাস্তু দল সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করছে। এমনকি এ সময় পশ্চিমবঙ্গ হতেও মুসলমান নাগরিকদের উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশিত হয়।[২৬] ভারত হতে আগত মোহাজেরদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানায় যে, সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়,

> “স্থানীয় সরকারী মহল হতে আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত ভূমিকে মুসলমানহীন করার সুপরিকল্পিত কাজের পরিধি ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বর্তমান বিহার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।
> আগতদের লইয়া এ পর্যন্ত আসাম ও ত্রিপুরা হইতে আগত ৮৪ হাজার ৩০৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে আগত ৯ হাজার ৮৬৮ জন মোহাজের বিভিন্ন জেলায় নাম রেজিস্টারি করিয়াছে। জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট নাম রেজিস্টারি করা নাই এমন মোহাজেরের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।”[২৭]

ভারতীয় সরকারের উচ্ছেদ নোটিশ ইস্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামে মুসলমানদের বাড়িঘর ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদকারীকে প্রতি শব্দের জন্য ৫ টাকা হারে জরিমানা ও একমাস কারাদন্ড দেওয়া হয় বলে উদ্বাস্তুরা জানায়।[২৮]

ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য হতে বিতাড়িত মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জনের অধিক পুরুষানুক্রমে ভারতীয় নাগরিক বলে তথ্য দেন আব্দুল জব্বার খানের নেতৃত্বে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিশন।[২৯] ২২ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। কমিশন ১৯৫০ সালে ঘোষিত ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ভারত হতে আগত এ সকল মোহাজেরদের মধ্যে অনেকে জীবনে এই প্রথমবার পাকিস্তানে এসেছেন। এরা ভারতের সাধারণ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছেন।[৩০]

১৯৬৪ সালে দাঙ্গার ঘটনার সূত্রপাত হয় কাশ্মিরের হযরতবাল মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র কেশ চুরির ঘটনা থেকে। কাশ্মিরের ‘হযরতবাল’ মসজিদে রক্ষিত মুসলমানদের নিকট পবিত্র বিবেচিত পয়গম্বর মোহাম্মদের চুল রহস্যজনক ভাবে অপহৃত হয় বলে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাশ্মিরের হযরতবাল মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র কেশ চুরির

---

[২৩] Report of a secret source of I.B, Special Branch, Calcutta, May 1962, Home, Political (C.R), B Proceedings West Bengal State Government, India.

[২৪] Report of I.B, Special Branch, Calcutta, May 1962, Home, Political (C.R) B Proceedings, GOWB

[২৫] R.R Committee’s Report, op-cit, page 1 GOWB

[২৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ২

[২৭] ঐ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৩

[২৮] দৈনিক আজাদ, ২৩ জুন ১৯৬৩

[২৯] ঐ, ২৩ মার্চ ১৯৬৩

[৩০] ঐ, ২৩ মার্চ ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার বিবরণ ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ফলে কাশ্মীর সহ ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের এক শ্রেণীর মুসলমানরাও সভা শোভাযাত্রা ও সংঘর্ষ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।[৩১]
১৯৬৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর মৌলবী ফারুক মীরওয়াইজ ও পাকিস্তান সমর্থক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি মহিউদ্দীন কারা শ্রীনগরে এক বিশাল জন সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এরপর এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা অগ্নিসংযোগ করে বহু মটরগাড়ি, দোকানপাট ও দুটি সিনেমা হল বিধ্বস্ত করে। জনতা অনেক আবাসিক এলাকা অনেক অংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ মারমুখী জনতাকে আয়ত্তে আনার জন্য গুলিবর্ষণ করে। গুলি চালানোর ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়।[৩২]
কেশ হারানোর পর পাচঁদিন শ্রীনগরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। ৩১ ডিসেম্বর থেকে দোকানপাট ও সাধারণ খাদ্য ভাণ্ডারে বেচাকেনা চালু হয়।[৩৩]

পূর্ববাংলায় দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে প্রথমে হিন্দু মুসলমান এর মধ্যে, পরবর্তীতে বাঙালী বিহারী দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়।[৩৪] কাশ্মিরের ঘটনার সূত্র ধরে ৩ জানুয়ারি খুলনার দৌলতপুর এলাকার মিল শ্রমিকদের দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক আক্রান্ত হয়। দৌলতপুর এলাকার প্রায় ২০ হাজার মিল শ্রমিকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়ে তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটতরাজে লিপ্ত হয় এবং তারা সেখানকার যানবাহন ও ট্রেন আক্রমণ করে। পরে তারা খুলনা শহরে প্রবেশ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারা কিছু বাড়ি ও দোকান আক্রমণ করে। খুলনায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য ই.পি.আর বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামার দায়ে ৭৩ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। অন্য একটি মিলের শ্রমিকরা দৌলতপুরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে আক্রমন করে সেখানকার কিছু বাড়িতে লুট করে এবং আগুন লাগায়। পুলিশ এসে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।[৩৫] ৩ জানুয়ারি সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়,

> "খুলনা জেলার দৌলতপুর এলাকার মিল শ্রমিকগণ আজ প্রায় ২০ হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা বাহির করে। তাহারা রেলগাড়ি সহ সকল যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং অতঃপর ভারত অধিকৃত কাশ্মিরের হযরতবালের ঘটনাবলীর নিন্দাযুক্ত শ্লোগান দিতে দিতে তাহারা শহরে প্রবেশ করে। শহরে প্রবেশ করার পর সূর্যাস্তের সময় শোভাযাত্রার একাংশ উচ্ছৃংখল হইয়া পড়ে এবং বহু সংখ্যক ঘরবাড়ি নষ্ট করে। এবং কতিপয় দোকান লুটপাট করে। অতঃপর পুলিশ ও ই.পি.আর বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তথায় ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।"[৩৬]

১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ঢাকা, আদমজী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পেশাদার গুণ্ডা বাহিনীর নেতৃত্বে এক বিভৎস হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালি বিহারী দাঙ্গায় শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩৭] আতাউর রহমান খান এই দাঙ্গার সূচনা সম্পর্কে লিখেছেন,

> "১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে পাক ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি হয়। কাশ্মিরে হযরত বাল (রাসুলুল্লাহর পবিত্র কেশ) সযত্নে রক্ষিত ছিল কয়েকশ বছর আগে থেকে। হঠাৎ সেটা চুরি যায় কিম্বা চক্রান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চুরি করায়। এই ব্যাপারে ভীষণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ঘোর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, বহু লোক হতাহত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর ঢেউ এসে লাগে এবং

[৩১] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮১
[৩২] দৈনিক আনন্দবাজার, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৪
[৩৩] ঐ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৪
[৩৪] সৈয়দ মাহবুবুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪
[৩৫] সরকারি প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৩৬] দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৩৭] সৈয়দ মাহবুবুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে স্বভাবতই ঘোর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সূত্রপাত হয় খুলনা থেকে প্রাথমিক স্তরে তথাকার অতি বিখ্যাত এক দেশ প্রেমিকের প্ররোচনায় দুই দলে সম্পত্তি নিয়ে খুনোখুনি হয়। সেই ঘটনার উপর সাম্প্রদায়িক রং চড়াতে চারিদিকে বিস্তার করা হয়। দৈবক্রমে এক জনসভা উপলক্ষে আমরা তখন ছিলাম বরিশালে। আবহাওয়া সেখানেও গরম হয়ে উঠল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় দাঙ্গা বেধে উঠতে পারে নাই। জেলা কর্তৃপক্ষ সময়োপযোগী কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফলে আসন্ন দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় ফিরে এসে দেখলাম, ঝড়ের পূর্বাভাস নিস্তব্ধ থমথমে ভাব, চর্তুদিকে গুঞ্জন ধ্বনি। সবারই মনে আতঙ্ক। তখন কোথায় কি হয় বলা যায় না। সংখ্যালঘু শ্রেণীর মনে ভীষন ত্রাসের সঞ্চার হয়। পরদিনই নারায়ণগঞ্জের পাশ্ববর্তী মিল এলাকায় নিদারুন হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল।”[৩৮]

“ঢাকা শহরের নিকটবর্তী এক এলাকায় পুরুষরা রাত্রিকালে বড় নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে। এই ফাঁকে দুর্বৃত্ত নরপশুর দল গ্রামে ঢুকে নারী শিশু নির্বিশেষে অবাধে হত্যা করেছে। অতি বৃদ্ধও বাদ যায় নাই, কোলের শিশুও না।[৩৯]

ঢাকা জেলার গড় অঞ্চল নীরব নিথর। প্রকৃতির লীলাভূমি । ঢাকা থেকে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে হলেও আধুনিক সভ্যতার কোলাহল ও কর্মব্যস্ত অস্থির আবহাওয়া এই এলাকায় ঢুকতে পারে নাই। - - দুর্বৃত্তের দল এখানেও এসে হানা দেয়। বাড়ি-ঘর মজুত ধান, পাকা ফসলে আগুন লাগায়ে দেয়। প্রাণের ভয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে বন থেকে বনান্তরে পালায়ে এরা জীবন রক্ষা করেছে। কয়দিন কেটেছে নিরঞ্ঝু উপবাস করে। পাতার উপর সঞ্চিত শিশির চুষে পিপাসা নিবারণ করেছে।”[৪০]

টঙ্গী এলাকার দাঙ্গার বর্ণনা দিয়ে আতাউর রহমান খান বলেন,

“টঙ্গী মিল এলাকা থেকে হাজার কুলি শ্রমিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জেহাদ করতে বার হয়ে গেল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে। মিল থেকেই নাকি অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পঙ্গপালের মত এরা চলল ধ্বংসলীলা সাধন করে। এই এলাকায় একজন ভদ্রলোক ছিলেন জমিদার গোছের সাধু ও মহানুভব বলে সুবাদ ছিল। বাড়ীর ফটকের উপর লেখা ছিল “মানুষের ভাল করিবে।” দুর্বৃত্তরা ভালই করল একেবারে নির্বংশ করল তার বিরাট পরিবার। গর্ভবতী মহিলাও রেহাই পায় নাই। মাত্র দুটি প্রাণী পার্শ্ববর্তী খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন রক্ষা পায়। এই সময় কয়েকজন লোক গিয়ে থানায় ঢুকে পড়ে এবং তাদের রক্ষা করার অনুরোধ করে। থানার এক ছোট দারোগা তাদের কাছ থেকে এগারশ টাকা আদায় করে রক্ষা করার মাশুল। বলে, আপনারা যান, আমি সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসছি কিন্তু যায় নাই। ফলে গ্রাম আক্রান্ত হয়ে যা হবার তাই হয়েছে।”[৪১]

তিনি ঢাকা শহর ও তার আশে পাশের পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলেন,

একদিন ইত্তেফাক অফিসে গিয়ে সংবাদ পেলাম রেলওয়ে কোয়ার্টারে কয়েকটি পরিবার বিপন্ন। আগের রাতে একটি রেল কর্মচারী নিহত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এই কয়টি প্রাণীর উপর হামলা হতে পারে। তৎক্ষনাৎ নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়ির একজন দারোগা সশস্ত্র কনস্টেটবল নিয়ে সেখানে গিয়ে সবগুলি পরিবার উদ্ধার করে নিয়ে আসি এবং রামকৃষ্ণ মিশন রোডের একটি রিলিফ ক্যাম্পে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি। কিন্তু সে রিলিফ ক্যাম্পও অরক্ষিত অবস্থায় চার পাঁচটি নির্জীব লাঠিধারী পুলিশ আর আনসার চার পাঁচশ লোকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে বসে রয়েছে। তারা বলল, অতি সত্ত্বর রাইফেলধারী পুলিশ না পাঠালে এদের রক্ষা করা যাবে না।[৪২]

ফিরে আসব, এমন সময় খবর এল, প্রায় মাইলখানেক দূরে শহরের শেষপ্রান্তে, একটি গ্রামে সাত আটশ নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস। চারদিক খোলা। তিনদিক থেকে আক্রমণের ভয় নাই স্থানীয়

[৩৮] আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৩২
[৩৯] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
[৪০] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
[৪১] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
[৪২] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামবাসীই সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু একটি দিক শহরের দিকে, সে দিকটাই মারাত্মক। দিনে বেশী ভয়ের কারণ নাই কিন্তু রাত্রিকালে তাদের রক্ষা করার কোন উপায় থাকবে না।"[৪৩]

১৩ জানুয়ারি এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারীরা কলকাতার দাঙ্গার সূত্র ধরে বিভিন্ন স্থানে গুজব ছড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এ সময় ঢাকার ডেপুটি কমিশনার জনাব আবুল খায়ের ও ডি.সি এম.পি জনাব ইয়াহিয়া চৌধুরী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন ও ই.পি.আর টহলের ব্যবস্থা করেন। কোন দুস্কৃতিকারী শান্তি ক্ষুন্ন করার সুযোগ না পায় সেজন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন।[৪৪]

১৩ জানুয়ারি সরকারি এক ইস্তেহারে বলা হয় যে, কাউকে কোনরূপ গুজব ছড়াতে বা গোলযোগের চেষ্টা করতে দেখা গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[৪৫] ১৩ জানুয়ারি যারা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেছে তাদেরকে সাবধান করে এবং সকল শান্তিপ্রিয় নাগরিককে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় এক ইসতেহার প্রকাশ করা হয়। ইশতেহারে বলা হয়,

> "কিছু কিছু দুষ্কৃতিকারী শহরে কলকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্পর্কে নানারূপ গুজব ছড়াইয়া বেড়াইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। যদি কাহাকেও গুজব রটাইতে বা কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে দেখা যায় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।
> নারায়নগঞ্জে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ হ্রাস করা হয়।
> নারায়নগঞ্জে কতিপয় মিলে কাজ শুরু করা হয়।
> এই ব্যাপারে কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়।
> অন্যান্য জেলায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে এবং সর্বত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত পরিমানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।"[৪৬]

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অবস্থা বরাবর শান্ত থাকার পর ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪ সোমবার শেষ রাত্রের দিকে অকস্মাৎ নারায়ণগঞ্জের মিল এলাকায় হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে এবং ১৫ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) অপরাহ্ন ৪টার দিকে অবস্থা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহের আশংকা দেখা দেওয়ায় উপদ্রুত এলাকায় বহু সংখ্যক ই.পি.আর ও সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করা হয়। ঐ সময় হতে ২০ ঘন্টার সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারায়ণগঞ্জের মিল এলাকার দুষ্কতিকারীদের উপদ্রব হলেও নারায়ণগঞ্জ শহরে ছোট দুটি ঘটনা ছাড়া শহরের অবস্থা শান্তই থাকে।[৪৭]

সাম্প্রদায়িকতার নামে দুষ্কৃতিকারীদের গুণ্ডামী সীমা ছাড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জানমালও বিপন্ন করে তুলে এমনকি গুণ্ডারা ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪ ছাত্রী নিবাসে হামলা করে ছাত্রীদের জীবন বিপন্ন করে তোলার ষড়যন্ত্রে মাতে। আইয়ুব গেটের (বর্তমান আসাদ গেট) নিকটে মোহাম্মদপুর এলাকার সাত মসজিদ রোডের পার্শ্বে অবস্থিত কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের ছাত্রী নিবাসে সন্ধ্যার পরে ২০/৩০ জনের একটি দুষ্কৃতিকারী দল হামলা চালায়। মেয়েরা সকলে ভয়ে চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করে। কলেজের অধ্যক্ষ যখন মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন ঠিক সেই সময় সার্জেন্ট নবী চৌধুরী ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন উক্ত পথ অতিক্রম কালে ছাত্রীদের চিৎকার শুনে তিনি তথায় উপস্থিত হন এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে গুন্ডাদের ছত্রভঙ্গ করেন। অতঃপর উক্ত ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে স্থানান্তর করেন।[৪৮]

---

[৪৩] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
[৪৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৪৫] ঐ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৪৬] ঐ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৪৭] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৪৮] দৈনিক আজাদ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

১৫ জানুয়ারি ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক, পাকিস্তান অবজারভার, আজাদ ও সংবাদের উপর তাদের আক্রোশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সকল পত্রিকার অফিসে টেলিফোন মারফত ভীতি প্রদর্শনের পর দুপুরে ঠাঁঠারী বাজারের দিক হইতে ২০/২৫ জন দুষ্কৃতিকারী উন্মুক্ত ছোরা হাতে ইত্তেফাক অফিসের দিকে ধেয়ে আসে। পরে তারা অন্য পথে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর হামলা চালাবার চেষ্টা করে কিন্তু আশে পাশের জনসাধারণ ও পুলিশের বিরোধিতার মুখে তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৪৯]

১৫ জানুয়ারি ঢাকার এক বিশিষ্ট সর্দার তার এলাকা ও আশেপাশের কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘুকে আশ্রয় দিয়েছেন এই সংবাদ পেয়ে মোটর সাইকেলে চড়ে জনৈক দুস্কৃতিকারী সর্দারের বাড়িতে উপনীত হয় এবং সর্দার সাহেবের খোঁজ করতে তার বাড়িতে যায় এবং তিনি মিটিং করতে গিয়েছেন শুনে দুষ্কৃতিকারীরা পকেট হতে রিভলবার বের করে হুশিয়ারি জানায় যে হিন্দুদের বিনিময়ে তার প্রাণ নেওয়া হবে। সর্দার সাহেব বিচলিত না হয়ে তিনি দুষ্কৃতিকারীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আরও বেশী সংখ্যক সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"[৫০]

গুন্ডাবাহিনী শহরের কয়েকটি এলাকায় শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে আর নাগরিকদের জীবন বিপন্ন এবং বেপরোয়াভাবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে নাগরিকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হয়। ঠাঁঠারী বাজার এলাকায় গুণ্ডাদের কবল হতে কতিপয় বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে ছুরিকাহত হয়ে শহীদ হন ৫৫ বৎসর বয়সী আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের সদস্য জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী। ১৫ জানুয়ারি গুণ্ডাদের হামলা হইতে ঠাঁঠারী বাজারের কতিপয় লোককে উদ্ধার করতে গেলে গুণ্ডারা তাকে ধাওয়া করে। তিনি গুন্ডাদের আক্রমণে বাধ্য হয়ে জিন্নাহ এভিনিউর দিকে দৌঁড়াতে থাকলে গুন্ডারাও পিছু পিছু ধাবিত হয়। জনাব চৌধুরী কাতর মিনতি করে নিজেকে একজন মুসলমান পরিচয় দিয়ে তাকে খুন না করার অনুরোধ করেন এবং গুন্ডামী বন্ধ করে আল্লাহর ওয়াস্তে পাকিস্তানের স্বার্থে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে ভারতের কোটি মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা করার অনুরোধ জানান। কিন্তু গুণ্ডারা (স্থানীয় লোক নয়) জনাব চৌধুরীকে রেল ক্রসিং এর উপর ছুরিকাঘাতে আহত করে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহৎপ্রাণ জনাব চৌধুরী শাহাদৎ বরণ করেন।[৫১]

১৫ জানুয়ারি নওয়াবপুর এলাকার স্থানীয় লোক নয় এইরূপ একদল গুণ্ডা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অগ্নিসংযোগ ও হট্টগোল সৃষ্টি করে নাগরিকদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে সচেষ্ট হয় এবং নওয়াবপুরের কতিপয় দোকান হতে মালামাল লুণ্ঠন করতে শুরু করে। লুণ্ঠিত দোকানগুলির মধ্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের কিছু দোকানও লুট হয়। সদরঘাটের হকার্স মার্কেটের বহু দোকান দুস্কৃতিকারীরা নির্বিচারে লুট করে।[৫২] ঠাঁঠারী বাজারে সংখ্যালঘুদের ছাড়াও স্থানীয় মুসলমানদের কতিপয় মুদির দোকানও লুণ্ঠিত হয়।[৫৩]

এই দুর্ভাগ্যজনক হানাহানি ও লুটতরাজ বন্ধ করে দেশের স্বার্থে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা কার্যে তৎপর হওয়ার আবেদন জানিয়ে ১৫ জানুয়ারি সকাল ১১ টায় প্রেসক্লাব হতে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠিত এক শান্তি বাহিনী শহর প্রদক্ষিণে বের হয়। মিছিলে সবাই 'শান্তি চাই' ধ্বনি দিতে দিতে শান্তি মিছিলটি গভর্নমেন্ট হাউসের গেট পর্যন্ত পোঁছে নওয়াবপুর রোডে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সময় নওয়াবপুর রোডের গুণ্ডারা বেপরোয়াভাবে টহল দিতে থাকে। মিছিলটি গভর্নমেন্ট হাউসের সম্মুখে উপবেশন করে দাঙ্গা ফ্যাসাদ বন্ধ কর দাবী তুলতে থাকে। ইত্যবসরে কতিপয় অপরিচিত ব্যক্তি মিছিলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এক ব্যক্তি বিরাট এক ছোরা বের করে শান্তি কর্মীদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সতর্ক শান্তি বাহিনীর জনৈক কর্মী তাহাকে ছোরাসহ ধরে ফেলে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পরে নিরস্ত্র শান্তি মিছিলটি গভর্নমেন্ট হাউসের

[৪৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫০] দৈনিক আজাদ ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫১] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫২] দৈনিক আজাদ ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫৩] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪

পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে হাটখোলা অভিমুখে অগ্রসর হলে ঠাঠাঁরী বাজারের কসাইদের দোকানের পিছন দিয়ে একদল গুণ্ডা রেললাইন বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু সাহসী শান্তি কর্মীরা নির্ভিক ভাবে অগ্রসর হতে থাকলে গুণ্ডারা পিছিয়ে যায়। মিছিলটি অত:পর হাটখোলা ও মদনমোহন বসাক রোড হইয়া র‍্যাংকিন স্ট্রীটে গমন করে তথায় কতিপয় গুণ্ডাকে একটি বাড়ি আক্রমণ করতে দেখতে পায়। কিন্তু শান্তি মিছিলের হস্তক্ষেপের ফলে দুর্ঘটনার হাত হতে কতিপয় নিরীহ প্রাণ রক্ষা পায়। মিছিলে কবি জসিমউদ্দীন, হাজী দানেশসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।"[৫৪]

কতিপয় মহৎপ্রাণ নাগরিক সংখ্যালঘুদের আশ্রয়দান করলে দুষ্কৃতকারীরা ১৫ জানুয়ারি আশ্রয় দাতাদের গৃহ আক্রমণ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আশ্রয় দাতারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও গুণ্ডাদের হামলা প্রতিরোধ করেন।[৫৫]

শেখ মুজিবর রহমান প্রায় ৫ শত কর্মী নিয়ে ঠাঠাঁরী বাজার ও বনগ্রাম এলাকায় গমন করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেশবাসী সকলের প্রতি আবেদন জানালে গুণ্ডারা তাকেও আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। ~~কিন্তু স্থানীয় লোকেরা গুণ্ডাদের বাধাদান করে। শেখ মুজিবর রহমান উক্ত এলাকার অনেক লোককে গুণ্ডা হামলা~~ হতে উদ্ধার করেন।[৫৬]

সেইদিন অপরাহ্নে মোহাম্মদপুর রিফিউজী কলোনীর অদূরবর্তী রায়ের বাজারের বিখ্যাত কুম্ভকারদের এলাকায় গুন্ডারা আগুন লাগায়। এছাড়া ইত্তেফাক অফিসেও দুইবার দুষ্কৃতিকারীরা (স্থানীয় লোক নয়) আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে।[৫৭]

নারায়ণগঞ্জে জনৈক মুসলমান ড্রাইভার উদ্ধার কার্য করা অবস্থায় গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। নারায়ণগঞ্জ এলাকার নিউ মেট্রো টকিজের মুসলমান মালিকের ছেলে আর্ত মানুষকে রক্ষা করিতে গিয়ে গুন্ডাদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।[৫৮]

১৭ জানুয়ারি লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ফলে অমুসলমানদের পাশাপাশি স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃহস্পতিবার সারাদিন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় কিছু সংখ্যক মুসলমান পরিবারকে পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে ও অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয়।[৫৯] দৈনিক ইত্তেফাকে লিখে,

> "বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করিতে গিয়ে সমাজকর্মী আমীর হোসেন চৌধুরী এবং আরও কিছু সংখ্যক নিরীহ নাগরিককে যে প্রাণ দিতে হয়েছে তাই নয় ঢাকার প্রবল প্রতাপশালী মহল্লা সরদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সহ সকল মানুষের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। ঢাকার দক্ষিণ কমলাপুরের সর্দার এবং রাজারবাগ ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আহমদুল্লাহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, অন্যতম কাউন্সিলার ও প্রাক্তন কমিশনার হাজী মতলাবক্স সওদাগর, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় বিশিষ্ট সদস্য দেওয়ান আব্দুল আব্বাস প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। দুর্বৃত্তদল এইসব ব্যক্তির প্রাণ নাশের হুমকী দিয়েছে এবং তাদের উপর আক্রমণের চেষ্টা চালিয়েছে।"[৬০]

১৬ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) গ্রীন এ্যারো যোগে কুমিল্লা হতে ঢাকা আসার পথে মরহুম শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের একমাত্র পুত্র জনাব ফয়জুল হক দুবৃত্তদের কবলে পড়েন। টঙ্গী স্টেশনে গাড়ি প্রবেশ করলে একদল দুর্বৃত্ত গাড়িতে আরোহন করে জনাব ফয়জুল হককে পাকড়াও করে এবং তিনি হিন্দু না মুসলমান তা

[৫৪] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫৫] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫৬] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫৭] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫৮] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৫৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৬০] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

জানতে চায়, তিনি মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও গুন্ডারা সন্তষ্ট না হয়ে তাকে কলেমা পড়তে বলে শেষ পর্যন্ত তিনি কলেমা পড়ে দুবৃর্ত্তদের হাত হতে রেহাই পান।"[৬১]

১৭ জানুয়ারি গুণ্ডাদল পরদিন সকালবেলা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তার কতিপয় ছাত্রকর্মী সহ হলে ফিরবার সময় তাদের অনুসরণ করতে থাকে এবং গুলিস্তানের নিকট পৌছলে শাহ মোয়াজ্জেমকে ছোরা দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলে তিনি কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন।"[৬২]
তেজগাঁও শিল্প এলাকার সি.এন্ড.বি মেকানিক্যাল অফিসের সন্নিকটে দুই ব্যক্তি দুর্বৃত্ত কর্তৃক ছুরিকাঘাতে আহত হন। আহত দুইজনই স্থানীয় মুসলমান ছিলেন।[৬৩]
১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের নদীর অপর পার হতে বিপুল সংখ্যক লোক নৌকা যোগে শহরে এসে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে টানবাজার এলাকার আশে পাশে ঘোরাফেরা করছিল। পুলিশের বাধা পেলে তারা ইতস্তত লুকিয়ে পড়ে।[৬৪]
নারায়ণগঞ্জের কায়েদে আজম রোড এবং টানবাজারের সংযোগস্থলে একটি মোটরে করে কয়েকজন সংখ্যালঘুকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার সময় দুর্বৃত্তদের একটি দল ঐ মোটরটি আক্রমণ করে এবং মোটরের সকল আরোহীকেই (মোট ১১ জন) ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এদের মধ্যে চারজন স্থানীয় মুসলমান ছিল।[৬৫]

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে কিছু সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় তাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা জানিয়েছেন, দাঙ্গা আক্রান্ত টঙ্গী, পূবাইল, রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুরের বাঁশবাড়ি এবং সোনারগাঁও এর কয়েকজন সাক্ষাৎদানকারী জানিয়েছেন যে, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তাদের আত্নীয় স্বজনরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে। তাদের দেশত্যাগকারী আত্নীয়দের কেউই ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পূর্বে ভারতে যায়নি।

বাসিন্দা মনির পাল জানান যে, তার বড় ভাই গেছে ৬৪' এর দাঙ্গার সময়। মামার ছেলেরা ৬৪' সালের দাঙ্গার পরে চলে গেছে। ওদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দিয়েছে। তারা যাওয়ার আগে মুসলমান বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল পরে চলে গিয়েছিল। এদের গ্রামের বাড়ি, সোনারগাঁও থানাধীন বেলুড় গ্রামে।[৬৬]

গাজীপুর জেলার উধুর গ্রামের অনিতা রানী দাস জানান, "১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ভয়ে তারা ভারতে চলে গেছেন। তখন তাদের প্রচুর টাকা পয়সা ও ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রতিবেশী মুসলমানরা দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ অংশ নেয়, যার ফলে তারা ভয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার অর্থ সম্পদ বাসন কোসন অনেক কিছু লুট হয়েছে। প্রতিবেশী অনেক লোককে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার কাকা, কাকী, চাচাত ভাই বোন ভারতে চলে গেছে। ১৯৭২ সাল থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে।"[৬৭]

---

[৬১] ষ্টাফ রিপোর্টার, ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৬২] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৬৩] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৬৪] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৬৫] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৬৬] মনির পাল, ঠাকুর দাস লেন, বানিয়া নগর, নারিন্দা
[৬৭] অনিতা রানী দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, উধুর, গাজীপুর

উধুর গ্রামের রুহিনী কান্ত দাস জানান যে, তিনি বাদে সম্পূর্ণ পরিবার ভারতে চলে গেছে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় টঙ্গীর শ্রমিকদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমাদের অনেক প্রতিবেশীদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সেই ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।[৬৮]

উধুর গ্রামের সুমন্ত চন্দ্র দাস জানান, "আমার মা ও তার পরিবারবর্গ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর থেকে। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাদের জান ও মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় ফলে তারা ভারতে চলে যায়।"[৬৯]

গাজীপুর জেলার উজিরপুর গ্রামের বলাইচন্দ্র দাস বলেন, "আমার বোন, ভগ্নিপতি ও তার পরিবারের সকলেই ভারত চলে গেছেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় আর্থিক প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা ভারতে চলে যায়। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর মারধর করে এবং মেরে ফেলার চেষ্টা করে, পরে তারা বাড়ি ঘর ছেড়ে ভারতে চলে যায়।"[৭০]

টঙ্গীর খাইলকইর গ্রামের আইনজীবী (প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক) বসন্ত কুমার সরকার জানান, "আমার ৪ জন চাচা, আমার জ্যাঠাত ভাই সহ এলাকার পাঁচ বাড়ির লোকজন ভারতে চলে গেছেন। এরা ১৯৬৯/৭০ সালের দিকে চলে গেছেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ফলেই তারা চলে গেছেন। গ্রামের দুষ্ট প্রকৃতির লোক দাঙ্গাবাজদের সাহায্য করেছে। এই গ্রামে লুট হয়েছে তবে মানুষ মারা যায়নি। এই গ্রামের কিছু মাতবর শ্রেণীর লোক পেছনে থেকে দাঙ্গায় সাহায্য করেছে। তাদের লাভ ছিল লুটের মাল হস্তগত করা। এখানে মিল কারখানার শ্রমিক ছিল নোয়াখালীর লোক ও বিহারীরা।"[৭১]

টঙ্গীর খাইলকইর গ্রামের স্বাধিনী মধুবালা (তার পিতার বাড়ি গাজীপুর জেলার বাসন ইউনিয়ন আতরপাড়া গ্রামে) জানান, "আমার বাবা, মা, ভাই বোন, দুই চাচা চলে গেছে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরে আস্তে আস্তে চলে গেছে। টঙ্গী এলাকার মিল শ্রমিকরা দাঙ্গায় অংশ নেয়। আমার বাবার বাড়িতে কোন লুট হয়টি বা আক্রান্ত হয়নি।"[৭২]

খাইলকইর গ্রামের একজন বৃদ্ধা সারদা দেবী, পিতার বাড়ি হায়দরাবাদ গ্রামে। তিনি বলেন, "আমার তিন ভাই, মা, চাচী, চাচাত ভাই, দেবর ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর সবাই ভারতে চলে গেছে। এখানে কোন দাঙ্গা না হলেও তারা ভয়ে চলে গেছে। সে সময় প্রচুর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। টঙ্গীর বিভিন্ন মিল কারখানার শ্রমিকরা দাঙ্গা করেছে। এলাকার লোকের সাথে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। আমার বাবার বাড়ি লুট করে সব নিয়ে গেছে। ঘর ভেঙ্গে টিনও নিয়ে গেছে। তবে জ্বালিয়ে দেয়নি। স্থানীয় মুসলমানরা আমাদের আশ্রয় দেয়। টঙ্গী এলাকার মিল শ্রমিকরা দাঙ্গায় অংশ নেয়।"[৭৩]

রায়ের বাজারের পুলপাড় এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা স্বর্ণকার গদাধর পাল। তাদের পৈত্রিক পেশা হচ্ছে মাটির কাজ তিনি জানান, "১৯৬৪ সালের রায়টের পর আমার চাচা, মামা এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ভারতে চলে যায়। দেশ বিভাগের পূর্বে এমনকি ১৯৬৪ সালের পূর্বে আমার আত্মীয় স্বজন এমনকি রায়ের বাজার এলাকার

[৬৮] রুহিনী কান্ত দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, উধুর, গাজীপুর
[৬৯] সুমন্ত চন্দ্র দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, উধুর, গাজীপুর
[৭০] বলাই চন্দ্র দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার , উজিরপুর, গাজীপুর
[৭১] বসন্ত কুমার দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, খাইলকইর, টঙ্গী, গাজীপুর
[৭২] স্বাধিনী মধুবালা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, খাইলকইর, টঙ্গী, গাজীপুর
[৭৩] সারদা দেবী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, খাইলকইর, টঙ্গী, গাজীপুর

Dhaka University Institutional Repository

কেউই দেশত্যাগ করে যায়নি। এখানে দাঙ্গার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল ইটখোলার শ্রমিকরা এবং তাদের সহযোগীতা করেন বিহারীরা। প্রথম আক্রমণ হয় মোহাম্মদপুরের বাঁশবাড়ি এলাকায় পরে এখানে ছড়িয়ে পড়ে।[৭৪]

ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরের বাঁশবাড়ি নিবাসী ডাঃ নিতাই চাঁদ বিশ্বাস ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে বলেন, "আমার বোন ভারতে চলে গিয়েছেন ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর। বোনের শ্বশুরবাড়ি ছিল টঙ্গী থানার ভাদাম গ্রামে। মামার বাড়ি ধামরাই থানার চুন্না গ্রাম। ১৯৬৪ এর দাঙ্গা আদমজী জুটমিল থেকে প্রথম দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। পরে এটা ঢাকা শহর সহ আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিল্প এলাকাগুলোতে দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারন করে। শিল্প এলাকাগুলোতে ভারত থেকে আগত অবাঙ্গালী রিফিউজী বেশী ছিল। ফলে বাঙালী বিহারী সম্পর্কের অবনতি ঘটে। লুটপাট অগ্নিসংযোগে বাঙালীরাও অংশগ্রহণ করে। রায়েরবাজার থেকে কাসিমপুর পর্যন্ত ১৫০টি হিন্দু গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র বাঁশবাড়ি বাদে। বাঁশবাড়িতে লুট হয়েছে কিন্তু জ্বালিয়ে দেয়া হয় নাই। এখানে দুইজনকে চাকু মারা হলে একজন মারা যায়। রায়ের বাজারে মারা যায় ১১ জন অন্যান্য এলাকায় দুই সম্প্রদায়েরই লোক নিহত ও আহত হয়।"[৭৫]

আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী

দাঙ্গার সময়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ও এর আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গার আক্রান্তদের জন্য আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়। ঢাকা শহরের ২১টি আশ্রয় শিবিরে অর্ধ লক্ষাধিক নারী, পুরুষ ও শিশু কয়েকদিন যাবৎ বেসরকারী মহল দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সাহায্যে কোনক্রমে অন্ন সংস্থান করছিলেন, ১৮ জানুয়ারি থেকে সরকার আশ্রয় শিবির এর বাসিন্দাদের জন্য চাল,ডাল, কাঠ ও মশলাপত্র সরবরাহ করতে এগিয়ে আসে।[৭৬]

আশ্রিত শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, পানীয়র ব্যবস্থা করা হয় এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে আশ্রয় গ্রহণকারীদের একটি সংখ্যা দেয়া হল। কেন্দ্রীয় দাঙ্গা কমিটির পক্ষ হতে জানানো হয়েছে যে, ঢাকা শহর ও শহরতলীতে গোপীবাগ ও কাজীপাড়া আশ্রয় শিবিরে এক হাজার, রায়ের বাজার শিবিরে ছয় হাজার, জগন্নাথ কলেজে সাত হাজার, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলে বত্রিশ শত, সেন্ট জোসেফ স্কুলে আড়াই হাজার, জগন্নাথ হলে ৭ শত, পোগোজ স্কুলে তিন হাজার, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, মুসলিম হাইস্কুল ও ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ৫ হাজার, র‍্যাংকিন স্ট্রীটে ২ শত, গোরান আশ্রয় কেন্দ্রে ৫ শত, সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে ৪ শত, কাকরাইল গীর্জায় ৫৩ জন মেরাদিয়া আশ্রয় কেন্দ্রে ৫ শত, তেজগাঁ পলিটেকনিক স্কুলে ৫ শত। বিউটি বোর্ডিংয়ে ১ শত, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ৬০ জন, বুলবুল একাডেমিতে ৩ শত, শশী মোহন বসাক লেনে ৫ শত লোক আশ্রয় গ্রহণ করে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী ও লক্ষীনারায়ণ বস্ত্র মিলে ৩০ হাজার আশ্রয় প্রার্থী অবস্থান গ্রহণ করে।"[৭৭] ঢাকা জেলার বেরাইদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের চেষ্টা, মহত্বে ও প্রহরায় ডেমরার কায়েত পাড়া, রূপগঞ্জ প্রভৃতি ইউনিয়নের প্রায় ছয় সাত হাজার গৃহহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে।[৭৮] 'কেন্দ্রীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'র প্রায় ৫ শত স্বেচ্ছাসেবক ঢাকা শহর ও শহরতলীর ২০টি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারী ত্রিশ সহস্রাধিক পুরুষ মহিলা ও শিশুর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকেন।[৭৯] ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় সরকার পরিচালিত ৫০ টি সাহায্য শিবিরে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে যারা

---

[৭৪] গদাধর পাল, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, পুলপার, রায়েরবাজার

[৭৫] নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, বাঁশবাড়ি রোড, মোহাম্মদপুর

[৭৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৪

[৭৭] দৈনিক আজাদ, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৪

[৭৮] ঐ, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৪

[৭৯] ঐ, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৪

অবস্থান করছিলেন সরকার তাদের যথাযথ খবর নেন ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্যের বন্দোবস্ত করা হয়।[৮০]

মানব দরদী অসংখ্য নাম জানা না জানা ব্যক্তি উপদ্রুত এলাকা হতে সংখ্যালঘুদের উদ্ধার করে আশ্রয় শিবিরগুলিতে প্রেরণ করেন। আশ্রয় শিবিরগুলিতে সরকার চাল ও ডাল সরবরাহ করেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং সরবরাহ নিয়মিত নয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তদুপরি খাওয়ার পানির অভাব তীব্রভাবে দেখা দেয় ২২ জানুয়ারি রায়েরবাজার আশ্রয় শিবিরে ৩টি ও জগন্নাথ হলে ১টি শিশু অসুস্থ হয়ে মারা যায়। কেন্দ্রীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে শিশুদের মধ্যে কয়েকশত টাকার দুধ ও অন্যান্য খাবার সরবরাহ করে ।

রেডক্রস হতে গুড়াদুধ ও ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা না হওয়ায় কমিটি তাদের নিকট আবেদন জানায়। এছাড়া বেসরকারী ডাক্তারদের সহায়তার কমিটি ঔষধপত্র ও টীকা ইনজেকশনের ব্যবস্থা করে।”[৮১]

১৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকজন কর্মী সহ সকাল থেকে উয়ারী এলাকায় সংখ্যালঘু অধিবাসীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের কাজে ব্যপৃত হন। উদ্ধার কর্ম চালানোর সময় দুষ্কৃতিকারীরা তাদেরকে ধাওয়া করে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি পুনরায় উদ্ধার কাজ অব্যাহত রাখেন।[৮২]

দাঙ্গা পরিস্থিতিতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছিল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন সমাজকর্মী এবং রাজনীতিবিদরা। দাঙ্গা প্রতিরোধে পত্রিকাগুলোর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। দাঙ্গার বিবরণ, দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত সংবাদ এবং দাঙ্গা প্রতিরোধে জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয়।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় দেশের সাধারণ জনগণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে সভা, সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে ও পত্রিকায় বক্তব্য দিয়ে। বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন নির্যাতিতদের রক্ষা করতে। অনেকে সন্ত্রাসীদের চাপের মুখেও নিজ নিজ বাড়িতে আশ্রয় কেন্দ্র ও লঙ্গরখানা খোলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার রিপোর্টে তাদের কার্যক্রমকে তুলে ধরে এবং পত্রিকায় তাদের বক্তব্য ও বিবৃতি প্রকাশ করে দাঙ্গা প্রতিরোধে পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট খওয়াজা নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন ও ধন সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানান, তিনি বলেন,

> “পশ্চিমবঙ্গের দুঃখজনক ঘটনার জন্য পাকিস্তানের জনসাধারণ খুবই মর্মাহত। কিন্তু এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের পবিত্র আমানত বলিয়া দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে ঘোষণা প্রচার করিয়া আসিতেছি, তাহা আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। আমি আমার পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মোছলেম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাহারা যেন সংকটময় পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করেন এবং দুর্বৃত্তদের বাধা দান করিয়া আমাদের পবিত্র আমানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয়ভাবে তৎপর হন।”[৮৩]

চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের সভাপতিত্বে ১৪ জানুয়ারি রবিবার ঢাকায় বৌদ্ধদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খুলনা ও কলিকাতায় সংঘটিত হিংসাত্মক ও বর্বর কর্মকাণ্ডের ফলে যে সকল হত্যাকাণ্ড হয় তার জন্য গভীর উদ্বেগ

---

[৮০] সরকারী প্রেসনোট,   ঐ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৪

[৮১] ঐ,   ২০ জানুয়ারি ১৯৬৪

[৮২] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪

[৮৩] ঐ,   ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪

প্রকাশ করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সুবিবেচক জনগণ ও সদাসয় সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়।[৮৪]
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রেসিডেন্ট মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করে। উত্তেজনা সত্ত্বেও নীরব থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান।[৮৫]
প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাবেক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিবৃতি প্রদান করেন।[৮৬]

প্রাদেশিক আঞ্জুমানে মোহাজেরিনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এস.কে.ভূইয়াঁ এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানবাসী এবং মোহাজেরদের সর্বপ্রকার উস্কানি ও প্রলোভন উপেক্ষা করে প্রদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। জনাব ভুঁইয়া বলেন যে, ভারত ত্যাগের পূর্বে ভারতীয় মুসলমানেরা আমাদের শুধু এই কথাই বলেছিলেন যে আমরা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চাই, তাই আজ সর্বাত্মকভাবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জানমান রক্ষা করা সকলেরেই কর্তব্য।[৮৭]

১৫ জানুয়ারি সকালে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ও পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল কাসেম দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য পবিত্র আমানত।[৮৮]
পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফ মারুফী ১৫ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা আমাদের নাই। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানেও সাম্প্রদায়িক শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে তা কখনও সমর্থন করা যেতে পারে না।[৮৯]

১৯ জানুয়ারি পূর্ববাংলার শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সর্বপ্রকার উস্কানীর মুখেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানান।[৯০]
দাঙ্গাকালীন সময়ে ছাত্র ও রাজনৈতিক দলগুলো দাঙ্গা-বিরোধী বক্তব্য ও কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংস্থা ও ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানে ১৮ জন ছাত্রনেতা ১৪ জানুয়ারি এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন,

> "আমরা গভীর উদ্বেগের সহিত বর্তমানে দেশের অশান্তিমূলক পরিস্থিতি লক্ষ্য করিতেছি। দেশে বর্তমানে শান্তিশৃংখলা নষ্ট হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। কিন্তু শান্তিপ্রিয় সুসভ্য জাতি হিসাবে পাকিস্তানের মর্যাদাকে আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না। অতীতেও বহুবার এই জাতীয় উস্কানির মুখে আমাদের দেশের শান্তিশৃংখলা অব্যাহত রাখিয়াছি।"[৯১]

পল্লী কবি জসিমউদ্দীন দাঙ্গা হাঙ্গামায় না জড়ানোর জন্য পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে বলেন,

[৮৪] দৈনিক আজাদ , ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৮৫] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৮৬] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৮৭] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৮৮] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৮৯] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৯০] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৯১] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

> "পাকিস্তানে মুছলমানদের প্রতি হিন্দুরা অত্যাচার করলে এদেশের হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার প্রতিশোধ হইবে না। ওখানে যাহারা অত্যাচার করে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা সম্ভব নয় বলিয়া এদেশের কতগুলি নিরীহ লোকের প্রতি অত্যাচার করা কোন হৃদয় ধর্মই অনুমোদন করে না। হিংসার দ্বারা হিংসাই বাড়ে। নিরীহ লোক যারা কোন অপরাধ করে নাই তাহারাই মারা পড়ে।"[৯২]

১৬ জানুয়ারি প্রদেশের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ও ছাত্র সমাজের তরফ হতে যে দাঙ্গা বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয় তাহাতে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় জনসাধারণের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ পায়। ১৬ জানুয়ারি সকাল এগারটায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবর্গ কর্তৃক এক শান্তি অভিযান বের করা হয়। এতে জনাব আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজীজুল হক, শাহ আজীজুর রহমান, জনাব আব্দুল সামাদ, জনাব নুরুর রহমান, জনাব ওলী আহাদ প্রমুখ নেতা অংশগ্রহণ করেন। ট্রাকযোগে এই শান্তি মিছিল নওয়াবপুর রোড ধরে যাত্রা আরম্ভ করে। তাদের এই অভিযান ইসলামপুর, আরমানীটোলা, উয়ারী এলাকার লারমিনি স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট, ফোলডার স্ট্রীট প্রভৃতি এলাকা অতিক্রমকালে দুর্বৃত্তরা অন্তত তিন স্থানে তাদের উপর ইট বর্ষণ করে।"[৯৩]

জাতীয় পরিষদের সদস্য কবি বেনজির আহমদ জানান যে, এই সকল গ্রামের ছিন্নমূল লোকদের প্রথমে গোরান মৌজার জনাব সুলতান ভূঁইয়ার বাড়িতে আশ্রয় দান করা হয়। কিন্তু সেখানে প্রায় ১১ শত লোকের স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরে উক্ত গ্রামের জনাব এমরানের বাড়িতে তাদের স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় লোকদের সাহায্যে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৯৪]

বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখেন। ১৬ জানুয়ারি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা সৈয়দ আজীজুল হক (নান্নামিয়া), ডি.আই.জি জনাব এম.এ. হক এবং স্থানীয় লোকজন যাত্রাবাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ৭ হাজার সংখ্যালঘু মেয়ে, পুরুষ, শিশুকে উদ্ধার করেন। তম্মধ্যে ৪ হাজার সংখ্যালঘুকে কামরুন্নেসা স্কুলে, ১২ শত কে হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীতে এবং অন্যান্য লোকজনকে হাটখোলা রোডের একটি বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও অধিবাসীগণ সংখ্যালঘুদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেন।[৯৫] জনাব আতাউর রহমান খান স্মৃতিচারণে লিখেছেন,

> "দাঙ্গার সময় সরকার শহরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আশ্রয় শিবির বা রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। আমরা ঘুরে ঘুরে সে সব ক্যাম্পের খোজ খবর নিতাম।---
>
> দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে কিছু রুটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালিটি পানির ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখে ফায়ার ব্রিগেড ডাইরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করে তাকে পানি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করায় তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন।
>
> একজন ব্যবসায়ী বন্ধু পরম উৎসাহে এক হাজার চাটাই এবং কয়েক মন চিড়া গুড় যোগার করে দিলেন। সামাদ ও ওলী আহাদ সেগুলি ট্রাক ভরে রায়ের বাজার ক্যাম্পে পৌছাল। রাত বেশী হওয়ায় আমি যেতে পারি নাই।
>
> ওরা যখন মালপত্র নিয়ে ওখানে বিলি ব্যবস্থার কাজে ব্যস্ত তখন জনৈক সি.এস.পি, ও আর দুইজন অফিসার ওখানে গিয়ে হাজির, হুকুম জারী করলেন, বাইরের কোন লোক এই এলাকায় থাকতে পারবেনা থাকলে অ্যারেস্ট করা হবে।"[৯৬]

---

[৯২] দৈনিক আজাদ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৯৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৯৪] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৯৫] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৯৬] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

সংখ্যাগুরু জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে ইত্তেফাকে "রাজনৈতিক মঞ্চ" লেখক মুসাফির লেখেন,

> "জানিনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি মনোভাব গ্রহণ করিবে, তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে অপর পক্ষে তাহাদের ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে সাধারণ ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াঁইয়াছেন। নিজেদের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়াও হিন্দুদের আশ্রয় দিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুছলমানদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে ইহাই আশার আলো ও পথের দিশারী।
>
> সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেও আজ দাঙ্গার বিরুদ্ধে স্বত:স্ফুর্ত ঘৃনা ও প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমরা একটু সান্তনা অনুভব করিতেছি দাঙ্গার পরিস্থিতিতে এই প্রদেশবাসীরই যে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও আজ এই উপলব্ধি জাগিয়াছে।"[৯৭]

জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় লেখা হয়,

> "দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনসাধারণ দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। সচেতন জনসাধারণ একথা প্রমাণ করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার দিন অতীত হইয়া গিয়াছে এবং শান্তি কামী নাগরিকরা আর গুণ্ডামি বরদাশ্‌ত করিবে না। তাই দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন এলাকার শান্তিকামী মানুষ গুণ্ডামির বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া মহল্লা কমিটি গঠন করিতেছে এবং শত শত তরুণ আর্ত মানুষের সেবাকার্যে আগাইয়া আসিয়া অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।"[৯৮]

জানুয়ারি মাসের দাঙ্গায় ঢাকা জেলার শ্রীপুর থানার জনগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে, শ্রীপুর থানার অধিবাসী হিন্দু জনগণের পক্ষ হইতে বাবু মহেশচন্দ্র সরকার, জ্ঞানচন্দ্র দাস ও সুধীরকুমার কাঞ্জিলাল এক বিবৃতি প্রদান করে বলেন,

> "আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ বিভাগের পূর্ব হইতেই সুখ স্বাচ্ছন্দে বসবাস করিয়া আসিতেছি আমাদের উপর কোনদিনই কোন প্রকার অত্যাচার বা জুলুম হয় নাই গত মাসে ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে যে গোলযোগ হইয়াছে সে সময় আমাদের শ্রীপুর থানার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলারগণ, গ্রাম্য মাতব্বর ও গ্রাম্য সাধারণ এবং শ্রীপুরের ওসি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে আমাদের রক্ষার চেষ্টার কোন ক্রুটি করেন নাই। মোটের উপর আমাদের উপর কোন প্রকার আচড় লাগে নাই। সুতরাং আমরা শ্রীপুর থানার রাজবাড়ি ও প্রহলাদপুর ইউনিয়নবাসী এই বলিয়া প্রমান করিতে চাই যে, আমাদের মুছলমান ভাইয়েরা যেভাবে আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে এখনও তেমনিই করিয়া যাইবেন।"[৯৯]

শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গার সময় পূর্ববঙ্গের জনগণ ও পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে বলেন,

> "ঢাকা নারায়ণগঞ্জের সংখ্যালঘু নিধন ও উৎসাধন পর্বে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানদের বৃহদংশের অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চরিত্র উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠে। কেবল মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান খাঁ, জলুর হোসেন প্রমুখ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারাই ঐ দাঙ্গার প্রকাশ্য নিন্দা করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সাহায্য দেবার জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস করেননি, সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও রমণীর সংখ্যালঘুদের সাহায্য করার বহু নিদর্শন ছিল। হিন্দু ও অন্য

---

[৯৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারি

[৯৮] দৈনিক আজাদ, ২০ জানুয়ারি

[৯৯] ঐ, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪ পৃঃ ২

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যালঘুদের জীবন সম্পত্তি মর্যাদা রক্ষার জন্য আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করে শহীদ হন আমীর হোসেন চৌধুরী, কাজী রউফ, এমদাদ মকবুল ঢালী প্রমুখ মোট ২২ জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি।
নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে শত শত আক্রান্ত ও বিপন্ন হিন্দুকে বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় ও আহার যোগান মহম্মদ সিরাজ, সার্জেন্ট নবী চৌধুরী, অধ্যক্ষ সায়েদুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী, স্পীকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী প্রমুখ শত শত খ্যাতনামা ও সাধারণ নর নারী।[১০০]

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও কার্যক্রম

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে সংঘটিত দাঙ্গার সময়ে এদেশের সচেতন দেশবাসী সোচ্চার হয়ে উঠে দাঙ্গার বিরুদ্ধে বিপন্ন মানুষের সাহায্যে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় সাহায্যের হাত নিয়ে। জাতির এমনি কঠিন সময়ে ছাত্র ও রাজনৈতিক দলগুলো ছিল দ্বিধাগ্রস্থ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।[১০১] তবু দাঙ্গা বিরোধী বক্তব্য ও কর্মসূচী গৃহীত হয় রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং বুদ্ধিজীবীগণ শান্তি মিছিল, সংগঠনে এবং দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনে অকৃপণ সাহায্য করে। পত্রিকায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহবান জানিয়ে বিভিন্ন বিবৃতি, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ছাপা হতে থাকে। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনে পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
শত উত্তেজনার মুহুর্তেও পাকিস্তানের জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে। মানবতার স্বার্থে উহাকে রুখে দাড়াতে চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী এবং রাজনৈতিক মহল শুধু সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজেই নয়, এদেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতাকে চিরতরে নির্মূল করবার কাজে পূর্নোদ্যমে আত্মনিয়োগ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।"[১০২]
১৫ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,

> ''বলাবাহুল্য এই দুস্কৃতিকারীদের প্রতি জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই এবং থাকিতে পারে না। তথাপি স্থানীয় লোকজনদের সংঘবদ্ধ দাঙ্গা বিরোধী প্রতিরোধ গড়িয়া না উঠিলে একমাত্র সরকারী তৎপরতার দ্বারা দুস্কৃতিকারীদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা মনে করি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ছাড়াও প্রদেশের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই মুহূর্তেই শান্তি কমিটি গঠন করিয়া সকল দেশবাসীর সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।"[১০৩]

১৬ জানুয়ারি দৈনিক আজাদে 'দাঙ্গাকারীদের হটাও' শিরোনামে সকল ভাল মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে লেখা হয়,

> ''দাঙ্গাকারী নরপিশাচের উম্মত্ত অন্তরে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবেশ যেন বিষাক্ত না হয়। ভারতে যাই ঘটুক না কেন আমাদের দেশের নিরীহ সংখ্যালঘুদের উপর তার প্রতিশোধ নেওয়া একান্ত পৈশাচিক কাজ হবে। এই পৈশাচিকতার পথে যারা পা বাড়াবে তারা যে শুধু আমাদের দেশের মুখেই কলঙ্ক লেপন করবে তাই নয়, এমনকি তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (সঃ) নির্দেশও অমান্য করবে তাই আজ শুধু গুণ্ডাদের অশুভ তৎপরতাকে শুধু নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।"[১০৪]

১৬ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়তে 'মানবতার দুশমনদের রুখিয়া দাঁড়ান' শিরোনামে দাঙ্গা পরিস্থিতি তুলে ধরেন ও শান্তি রক্ষায় জনগণের ভূমিকার প্রশংসা করে লেখা হয়,

---

[১০০] শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১২০
[১০১] মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৫২, সাগর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২০৭
[১০২] দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ২ মুসাফির রাজনৈতিক মঞ্চ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১০৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি পৃঃ ২, ১৯৬৪
[১০৪] সম্পাদকীয় দৈনিক আজাদ ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪

"পরিস্থিতি পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনিতে হইলে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে ও শান্তি প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ইতিমধ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভূমিকা অব্যাহত রাখিয়া মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠন করা আবশ্যক।"[১০৫]

১৭ জানুয়ারি দৈনিক আজাদ পত্রিকায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহবান জানিয়ে লেখা হয়,

"মহল্লায় মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে গুণ্ডাদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বালচাল কর। আইন শৃংখলা ফিরাইয়া আনো। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শহরে, বন্দরে, গ্রামে সর্ব্বত্র শান্তি সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছাপূর্ণ পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর।"[১০৬]

১৯৬৪ সালে ১৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ ও দৈনিক সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পুর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে প্রথম ইশতেহার প্রকাশিত হলে তা এক ঐতিহাসিক আবেদন হিসেবে পরিগনিত হয়। এই প্রচারপত্র লিফলেট আকারে ছাপিয়ে বিলি করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির প্রকাশিত এই প্রচার পত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১০] প্রচারপত্রে বলা হয়,

''সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘর-বাড়ী পোড়ান হইতেছে। সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে। এমনকি জনাব আমীর হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুবৃর্ত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রী নিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুণ্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।"[১০৭]

১৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে ঢাকায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের এক সভায় ব্যাপক ভিত্তিক একটি বেসরকারী দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে কমিটির আহবায়ক মনোনীত করা হয়। ৯১ সদস্য সমন্বিত দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিতে মহল্লার সরদার, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক ইউনিয়ন, মেডিক্যাল সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংস্থার প্রতিনিধিগণ যুক্ত হন। প্রয়োজনবোধে কমিটিতে আরও সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ঢাকায় ৩৩ তোপখানা রোডে কমিটি অফিস ও সাহায্য দান ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়।

সভার প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গভীর দুঃখ প্রকাশ এবং গুণ্ডাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয়। দাঙ্গাকারী ও গুন্ডাদল মুসলমানদের ওপরও বিশেষ করে দাঙ্গা উপদ্রুত লোকদের উদ্ধার কার্য ও সাহায্য দানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হামলা চালালে সভায় গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং এর বিরূদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সভায় বলা হয় "কতিপয় ক্ষেত্রে গুণ্ডাদল সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিতে শুধু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধেই নয়, শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ও জবরদস্তি প্রদর্শন করেছে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য অবিলম্বে দৃঢ় হস্তে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে উহা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।[১০৮]

[১০৫] সম্পাদকীয় দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১০৬] দৈনিক আজাদ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১০৭] দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৪
[১০৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের এস.ডি.ও জনাব এস হাসান আহমেদকে চেয়ারম্যান এবং জনাব শামসুদ্দোহাকে সম্পাদক করে নারায়ণগঞ্জে একটি শক্তিশালী শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। নারায়ণগঞ্জের সকল ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং সকল বর্তমান সাবেক রাজনৈতিক দলের সভাপতি ও সম্পাদক এই কমিটির সদস্য হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১০৯]

৭ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে ভারতে অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বিতাড়নের ফলে পাকিস্তানে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কিছু লোক এর সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের শান্তি বিনষ্ট করায় উদ্যোগী হয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি দেশবাসীর প্রতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। খুলনার ঘটনাকে তিনি কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোকের উদ্দেশ্য হাসিলের কাজ বলে উল্লেখ করে বলেন,

> “আমি পাকিস্তনের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্রসকল শ্রেণীর নিকট সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি। আমি সরকারের নিকটও খুলনার ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং খুলনার ঘটনার জন্য প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইতেছি।”[১১০]

ঢাকার ৮ জন পত্রিকা সম্পাদক ও পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের ২ জন কর্মকর্তা পশ্চিমবাংলায় ঘটে যাওয়া কিছু পৈশাচিক ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার না করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের শুভেচ্ছাকামী মানুষ বিশেষ করে পত্রিকা সম্পাদক ও সাংবাদিকদের প্রতি এক বিবৃতিতে আহ্বান জানান। পশ্চিমবাংলার ঘটনাপ্রবাহে উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তারা পূর্ববাংলার সাধারণ জনগনের প্রতি আবেদন জানান। বিবৃতিতে তারা খুলনার ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।[১১১]
১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় পূর্ববাংলার দাঙ্গায় পূর্ববাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করে শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> “পূর্ব পাকিস্তানের বহু সংবাদপত্র ঐ সময়ে অসাম্প্রদায়িক এবং জোরালো দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা নিয়ে ওদেশের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের আদর্শবাদী চরিত্রের পরিচয় দেয়। এর মধ্যে প্রধান মাণিক মিঞা অর্থাৎ তোফাজ্জল হোসেনের দৈনিক ইত্তেফাক। এছাড়া সংবাদ, জনতা, Pakistan Observer প্রমূখ পত্রিকাও দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে বলিষ্ঠভাবে লেখনী চালনা করে অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে।”[১১২]

পূর্ববাংলায় দাঙ্গার বিস্তারে ভারতীয় সংসদের ৩১ জন সদস্য ভারতীয় বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রচার করে। বিবৃতিতে তারা পূর্ববাংলায় দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন হচ্ছে তার প্রতিকারের আবেদন জানান। দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এ ধরনের ভূমিকার নিন্দা জানিয়ে দৈনিক আজাদ এর ১১ মার্চ সম্পাদকীয়তে লেখে,

> “ভারতীয় মুছলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহনের স্পৃহা জাগাইয়া তোলার জন্য সেখানে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাল্পনিক কাহিনী ছড়ানো রেওয়াজ হইয়া আছে। ----- অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ভারতীয় বেতারকে নিয়োগ করিয়াছেন। পুরাতন কাহিনীকে নূতন করিয়া টানিয়া আনিয়া এক কথাকে একশভাবে বলিয়া ভারতীয় বেতার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইয়া যাইতেছে।”[১১৩]

[১০৯] ঐ, ১৭ জানুয়ারি
[১১০] ঐ, ৮ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১১১] দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১১২] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০
[১১৩] দৈনিক আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৬৪ , সম্পাদকীয়

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক গোলযোগের যে সকল বিবরণ ভারতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাকে আজগুবী ও ডাহা মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত বলে প্রতিবাদ করেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুর বলেন যে, স্থানীয় প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টির ফলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়।[১১৪] তিনি কতিপয় ন্যাপ ও আওয়ামীলীগ সদস্যদের বিরুদ্ধে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের অভিযোগ করেন।[১১৫]

কলকাতার দাঙ্গার সূত্র ধরে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী বিভিন্ন স্থানে গুজব ছড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করলে ঢাকার ডেপুটি কমিশনার জনাব আবুল খায়ের ও জনাব ইয়াহিয়া চৌধুরী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও ই.পি.আর টহলের ব্যবস্থা করেন। তারা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তাৎক্ষনিকভাবে সন্দেহভাজন ৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।[১১৬] ফতুল্লা থানার অন্তর্গত এনায়েতনগর ইউনিয়নের হরিহরপাড়া গ্রামে ইউনাইটেড এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।[১১৭]
২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় ২৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ বন্ধের আহবান জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন "আপনারা যেখানে যেভাবে সম্ভব সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ এবং সংখ্যালঘুদের ব্যাপক দেশত্যাগ বন্ধের ব্যবস্থা করুন।[১১৮] স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জন হিন্দু ২১ জন মুসলমান।[১১৯]

পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ঢাকা ও ঢাকার মফস্বল অঞ্চলে ২০ জানুয়ারি আরও কয়েকটি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। জনাব এজাজুর রহমান ও জনাব আব্বাস আলী উক্ত কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।[১২০]

কেন্দ্রীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ঢাকা শহর ও শহরতলীতে শান্তি শৃংখলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকেশ্বরী-পলাশী কমিটি, ঠাঁঠারী বাজার কমিটি, বংশাল কমিটি, গোপীবাগ কমিটি, তাঁতীবাজার কমিটি, রমনা ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য কতিপয় কর্মী কালিয়াকৈরের গাছা ইউনিয়ন সফর করে তথাকার উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন।[১২১]

১৯ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি ঢাকাসহ প্রদেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের নিকট আট দফা সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশে গুণ্ডা দুর্বৃত্তদের যে সকল এলাকা, ঘর বাড়ি, দোকান পরিত্যক্ত, ক্ষতিগ্রস্থ ও বেদখল হয়েছে তা পুনরুদ্ধার ও প্রকৃত মালিকদের হাতে প্রত্যার্পণের জন্য একটি জরুরী আইন প্রণয়ন করার দাবী করা হয়। সুপারিশে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের আশ্রয় শিবিরে যে সরকারী সাহায্য বিতরন করা হচ্ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে অবিলম্বে সকল আশ্রয় শিবিরকে সরকারী সাহায্য কেন্দ্র ঘোষণা এবং তথায় পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, ঔষধ এবং সাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করার দাবী জানানো হয়।[১২২]

---

[১১৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১১৫] ঐ, ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১১৬] ঐ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১১৭] ঐ, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১১৮] দৈনিক আজাদ, ৩০ এপ্রিল ১৯৬৪
[১১৯] ঐ, ৩০ এপ্রিল ১৯৬৪
[১২০] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জানুয়ারি
[১২১] ঐ, ১৭ জানুয়ারি
[১২২] ঐ, ২০ জানুয়ারি

মজদুর ফেডারেশন

১৫ জানুয়ারি পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনের পূর্বাঞ্চল শাখার কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার উদাত্ত আহবান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির উস্কানীদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। তারা বলেন, "ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণের মধ্যে হানাহানি দেশ ও জাতির পক্ষে কখনই কল্যাণপ্রসূ হতে পারেনা বরং উহা ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমূহ ধ্বংস ডেকে আনে। উপরন্তু দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র আমানত স্বরূপ।[১২৩]

দাঙ্গা পরিস্থিতিতে সরকারী বক্তব্য ও কার্যক্রম

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এই দাঙ্গার পিছনে সরকারী উস্কানি ছিল[১২৪] বলে মন্তব্য করেন অনেকে। মোহাম্মদ হান্নান বলেন, দেশব্যপী আইয়ুব বিরোধী মনোভাব যখন তুঙ্গে তখন সরকার পরিচালিত এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমগ্র জনমানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[১২৫]
সম্ভাব্য দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৩ জানুয়ারি থেকে সরকার খুলনায় অতিরিক্ত ১০ প্লাটুন অফিসার ও ১২২ জন আনসার সদস্যকে নিয়োগ প্রদান করেন।[১২৬] ১৮ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন জেলায় অতিরিক্ত ২৬০২ জন আনসার সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়।[১২৭] ঢাকায় ৪২০ জন আনসার সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়।[১২৮]
১৩ জানুয়ারি থেকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মিল এলাকায় দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ১৪ জানুয়ারি ৪ টা থেকে দাঙ্গা মারাত্মক রূপ ধারণ করার আশংকায় সরকার বহু সংখ্যক ই. পি আর ও সসস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করা হয় এবং ঐ সময় থেকে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।[১২৯] ১৬ জানুয়ারি থেকে সান্ধ্য আইন এর মেয়াদ ২৪ ঘন্টার জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং শহরের প্রায় সমস্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্র বহন করা ও ৪ জনের বেশী লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।[১৩০]
গুণ্ডাদের অরাজক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকার কতোয়ালী ও সুত্রাপুর থানা এবং কতিপয় এলাকায় দুপুর দুইটা হতে ১৭ জানুয়ারি দুপুর দুইটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করে এবং নওয়াবপুর এলাকায় সামরিক বাহিনী নিয়োগ দেয়া হয়। পুলিশ ও ই.পি.আর টহল দেয়।[১৩১] শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও রক্তলোলুপদের বর্বরতা বন্ধ হয়নি। কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করতে পারেনি, সরকারের এই দুর্বলতা জনগণের চোখে ধরা পড়ে বলে মন্তব্য করা হয় দৈনিক ইত্তেফাকে।[১৩২]

১৬ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর মোনায়েম খান গভর্নমেন্ট হাউজে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণ শান্তি শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানবাসী

[১২৩] ঐ, ১৭ জানুয়ারি
[১২৪] মাহবুবুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০
[১২৫] মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৭
[১২৬] Letter From Deputy Commissioner of Police, Khulna, Police,Vol. 58,1964, GOEB
[১২৭] Letter From Deputy Commissioner of Police, Khulna, Police,Vol. 58,1964, GOEB
[১২৮] Police,Vol. 58, 1964, GOEB
[১২৯] দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩০] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩১] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩২] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪

এবং বিশেষভাবে সংবাদপপত্র সমূহের প্রতি আবেদন জানান।[১৩৩] তিনি পত্রিকা সম্পাদকদের সঙ্গে এই বৈঠকে এক ঘণ্টার মধ্যে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ওয়াদা করেন।

গভর্নর বলেন যে, মিল অথবা কারখানা ছোট রাষ্ট্র বিশেষ। অতএব তথায় আইন ও শৃংখলা বজায় এবং কর্মচারীদের কল্যাণ সাধনের গুরু দায়িত্ব এর মালিকের উপর। তবে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কতিপয় সমাজ বিরোধী লোক তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্ম সংস্থান করে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদের ভ্রান্তপথে চালনা করে। কঠোর হস্তে এই সব সমাজ বিরোধীদের দমনের ব্যাপারে সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে।[১৩৪]

১৭ জানুয়ারি পশ্চিমবাংলার দাঙ্গা পরিস্থিতি আয়ত্ত্বে আনার জন্য ভারতীয় প্রেসিডেন্টের নিকট আহ্বান জানান।

১৮ জানুয়ারি গভর্নর মোনায়েম খান নারায়ণগঞ্জের আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য স্থাপিত রিলিফ ক্যাম্পে গমন করেন এবং তাদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য স্থাপিত লঙ্গরখানা পরিদর্শন করেন।[১৩৫]

খুলনায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে সেখানকার মুসলমানরা দাঙ্গা ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে বলে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে এবং তার বর্ণনা অলীক কাহিনী বলে বক্তব্য দেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর মোনায়েম খান।[১৩৬]

১৮ জানুয়ারি এক সরকারী প্রেসনোটে দাঙ্গা ও দাঙ্গাকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়,

> “সরকারের দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং নাগরিক জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার স্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। ঢাকা নগরীর পুরাতন এলাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ সকাল ৮ টা হতে বেলা ১২ টা পর্যন্ত সিথিল করা হয়।-----নারায়ণগঞ্জ ও শিল্প এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত থাকে তবে একটি স্থানে লুটতরাজের চেষ্টা করা হলে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিবর্ষণের ফলে ১ ব্যক্তি নিহত ও অপর একজন আহত হয়।”[১৩৭]

সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক সংবাদ প্রকাশের দায়ে পূর্ববাংলা সরকার ২০ জানুয়ারি সোমবার তেজগাঁও বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত পাকিস্তান টাইমস ও জঙ্গ পত্রিকা আটক করে আপত্তিজনক অংশ কেটে তা বিতরণের জন্য ছাড়া হয়।[১৩৮] ২২ জানুয়ারি পূর্ববাংলা সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়,

> “ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থা ক্রমশ শান্তভাব ধারণ করিতেছে। কোনখান হইতে কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায় নাই। সান্ধ্য আইন জারীকৃত এলাকা সমূহে সান্ধ্য আইনের স্থায়িত্ব আরও হ্রাস করা হয়। আদমজী চটকল ও ডেমরা শিল্প এলাকায় অন্যান্য কতিপয় মিলের শ্রমিকরা কাজে যোগদান করিয়াছে। ---পুলিশ শিবিরসমূহ হইতে বিভিন্ন জায়গায় বিপুল পরিমান মূল্যবান দ্রব্যাদি সহ লুণ্ঠিত জিনিসপত্র উদ্ধারের খবর পাওয়া গিয়াছে। আরও কিছু গ্রেফতারের খবর পাওয়া গিয়াছে এবং ভ্রাম্যমান সশস্ত্রদল ২৪ ঘন্টা কড়াকড়িভাবে টহল দিতেছে। কতিপয় এলাকার আশ্রয়চ্যুতরা তাহাদের গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন।”[১৩৯]

২৫ জানুয়ারি সরকারি প্রেসনোটে প্রদেশের অবস্থা স্বাভাবিক এবং কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং উদ্বাস্তুরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে বলে জানানো হয়। ২৫ জানুয়ারি অপরাহে গভর্নর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গমন করে

---

[১৩৩] ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩৪] দৈনিক আজাদ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩৫] ঐ, ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩৬] ঐ, ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩৭] সরকারী প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩৮] ঐ, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৩৯] সরকারি প্রেসনোট, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৪

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক সদস্যের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং তাদেরকে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেন।[১৪০]

২৭ জানুয়ারি গভর্নর আব্দুল মোনয়েম খান গভর্নর হাউজে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শিল্পপতিদের সংগে এক আলোচনায় মিলকারখানায় আইন শৃংখলা রক্ষা করা এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করার জন্য আহ্বান জানান এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।[১৪১]

২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান দাঙ্গা পরিস্থিতিতে সরকারের ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করে এবং জনগণকে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে বলেন, "আমি পাকিস্তানের সংখালঘু সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিতে চাই যে তারা যাতে পূর্ণ নিরাপত্তা আর স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন তার ব্যাবস্থা করার জন্য আমরা রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ কাজে লাগাব।"[১৪২]

সরকার বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ ও নির্যাতিতদের জন্য কাজ করার সময় বিভিন্ন অজুহাতে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও' শিরোনামে ইশতেহার ছাপানো ও বিলি করার অপরাধে ১৯৬৪ সালের ৩০ এপ্রিল মোনায়েম খান সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ঢাকা (দক্ষিণ) মহকুমা প্রশাসকের এজলাসে এক মামলা দায়ের করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইশতেহার বিলি করার সময় কিছু ইশতেহার গভর্নর মোনায়েম খানের গাড়িতে গিয়ে পড়ে। ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে তাদের গ্রেফতার করা হয় গভর্নরের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগে এবং এই ইশতেহারকে জননিরাপত্তা বিরোধী বলে অভিযোগ করে মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই মামলা নিয়ে হয়রানি চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ৫ এপ্রিল এই মামলা প্রত্যাহার করা হয়।[১৪৩]
দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য বলে যাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে আলাদা একটি মামলা দায়ের করা হয় ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে।[১৪৪]

১৭ জানুয়ারির ইত্তেফাকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংক্রান্ত সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে নিউ নেশান প্রেসের কীপার জনাব তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে ২৫০০০ টাকার জামানত তলব করে মামলা করা হয়।[১৪৫]

ভারত ও পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গা

১৯৫০ সালের লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির পর পূর্ববাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হলেও ভারতের পশ্চিমবাংলা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটতে থাকে। এ চুক্তির প্রতিবাদ করে ভারতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫০ সালের পর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতের দাঙ্গার সঠিক সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায়নি তবে ১৯৫৪ সালে ভারতে ৮৩টি, ১৯৬০ সালে ২৬টি দাঙ্গা হয়। এই আট বৎসরে ভারতে ৩১৬ জন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়।[১৪৬] ১৯৬১ সালে ৯২টি, ১৯৬২ সালে ৬০, ১৯৬৩ সালে ৬১টি

---

[১৪০] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৪১] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৪২] দৈনিক আজাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
[১৪৩] মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৭
[১৪৪] আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৯
[১৪৫] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ মার্চ ১৯৬৪
[১৪৬] S.K Ghosh, RIOTS Prevention and Control, page 51

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।[১৪৭] এ সময়ে ভারতের দাঙ্গার বিশ্লেষন করে উড়িষ্যার অবসরপ্রাপ্ত আই. জি.পি এস.কে ঘোষ বলেন,

> "From 26 in 1960, the number of communal riots shot up to 92 in 1961, and though the number went slightly in the two subsequent years- being 60 in 1962 and 61 in 1963 which were higher then the average for 1954-60, the incident of communal violence showed a continuous upward trend,----- as between 1954 and 1960, the Muslims among the Killed were 86 percent, --------these communal disturbances were neither preceded nor followed by violence on Hindus in Pakistan."[১৪৮]

১৯৬১ সালে জব্বলপুরের দাঙ্গা থেকে শুরু করে দেশের কোণে কোণে একাধিক দাঙ্গা, যাতে মুসলমানদেরই দুর্গতি ঘটে বেশী।[১৪৯] এসব দাঙ্গার বেশীরভাগই ঘটেছে উত্তেজিত জনগণ অথবা পেশাদার গুণ্ডাদের দ্বারা। খুব কমই পূর্ব পরিকল্পিত। বেশীরভাগই ঘটেছে স্থানীয় উস্কানিতে।[১৫০]

১৯৬৪ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতার গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, এন্টালি, ক্রিস্টোফার রোড, আনন্দ পালিত রোড ও মহেশতলা এলাকায় বোমা হামলা, ছুরিকাঘাত এর ঘটনা ঘটে। চব্বিশ পরগণা ও বারাসাতে বিভিন্ন জায়গায় ৭টি আক্রমণের ঘটনায় পুলিশ গুলি চালিয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে।[১৫১]
১১ জানুয়ারি বনগাঁও, বারাসাত, হাবড়া, যাদবপুর, মহেশতলা, সোনাপুর, বজবজ থানা এলাকায় কারফিউ জারী করা হয়। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আর্মি নামানো হয়। কলকাতা শহরের এন্টালি, বেনিয়াপুকুর, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বেলেঘাটা, তালতলা থানা এলাকায় বিভিন্ন আক্রমণের ঘটনা ঘটে। কলকাতার কেশব সেন স্ট্রিট, নিউ ট্যাংরা রোড, মতিঝিল, কলেজ স্ট্রিট, বেলেঘাটা, এন্টালী, বেনিয়াপুকুর, আমহার্স্ট স্ট্রিট, তালতলা এলাকায় দাঙ্গা প্রতিরোধে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছেড়ে এবং গুলি চালিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গার ঘটনায় ২ জন মারা যায় এবং ১৪০ জন আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়। দাঙ্গা পরিস্থিতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।[১৫২]

হুগলী, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণের ঘটনা ঘটে। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তৈরী প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মিছিল বাতিল করা হয়। আক্রমণকারীরা রাজাবাজার, মানিকতলা ও শিয়ালদা এলাকায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটায়। দুইদিনে প্রায় ১৫০ টি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। গাইঘাটা এলাকায় দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে একজন এন.সি.ও এবং দুইজন পুলিশ নিহত হয়। দাঙ্গাকারীরা পুলিশ এর নিকট থেকে অস্ত্র লুট করে। বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ এলাকায় দাঙ্গাকারীরা বিভিন্ন বাড়িতে আগুন লাগায়।[১৫৩]
১২ জানুয়ারি কলকাতার নতুন আক্রান্ত এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও আর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। বউবাজার, জোড়াসাঁকো, পার্কসার্কাস, মানিকতলা এলাকায় কারফিউ জারী করা হয়। বেলেঘাটা, এন্টালী, বেনিয়াপুকুর এলাকায় কারফিউর মেয়াদ ২২ ঘন্টার জন্য বাড়ানো হয়। কেশব সেন স্ট্রিট, রাজাবাজার,

---

[১৪৭] S.K Ghosh, ibid, page 51
[১৪৮] S.K Ghosh, ibid, page 51
[১৪৯] শৈলেষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৭
[১৫০] S.K Ghosh, op-cit, page 51
[১৫১] দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫২] ঐ, ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫৩] ঐ, ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪

নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড এর দাঙ্গা পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। সেনাবাহিনী এ সকল এলাকায় গুলি চালায়। পাতারবাগান এলাকা, হ্যারিসন রোড, ক্রিস্টোফার রোড, তালতলা, ফুলবাগান, বৈঠকখানা, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, কলাবাগান ও অন্যান্য এলাকায় দুই সম্প্রদায়ের লোকেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দাঙ্গাকারীরা উল্টাডাঙ্গা স্টেশনে শিয়ালদার ট্রেন থামিয়ে তিনজন লোককে হত্যা করে।[১৫৪]
১২ জানুয়ারি পশ্চিমবাংলার সরকারী প্রেসনোটে জানানো হয়,

> নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী জেলা এবং বনগাঁ এর কিছু এলাকা, চব্বিশ পরগনা জেলার সদর সাবডিভিশন এ দাঙ্গা ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। খড়দহ এলাকায় একজন, যাদবপুরে দুই জন লোক নিহত হয়। বেহালা ও গুপ্তিপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। ১২ জানুয়ারি রাত ১০টা পর্যন্ত ১০০টি ঘটনার খবর পাওয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ের ১০ জন লোক নিহত হয় এবং ৭৫ জন আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়। কয়েকদিনের দাঙ্গায় প্রায় ৫০,০০০ লোক তাদের গৃহত্যাগ করে। পুলিশ প্রটেকশনের জন্য লালবাজার থানায় প্রতি সেকেণ্ডে একটি ফোন আসে।[১৫৫]

১৩ জানুয়ারি আক্রান্ত এলাকার দাঙ্গা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও নতুন এলাকায় দাঙ্গার বিস্তার ঘটে, প্রধানতঃ জোড়াসাঁকো, ওয়াটগঞ্জ, ইকবালপুর এলাকা আক্রান্ত হয়। হত্যা, খুন, লুট এর ঘটনা ঘটে পাতারবাগান, গার্ডেন রিচ, মুচীপাড়া, বড়বাজার, দমদম এলাকায়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার লালবাজার থানায় আর্মস কন্ট্রোল রুম খোলা হয়।[১৫৬] ১৩ জানুয়ারি বেহালা ও যাদবপুর এলাকায়ও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।[১৫৭]

নদীয়া জেলায় দাঙ্গা আক্রান্ত এলাকায় দাঙ্গা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও তেহাট্টা, ছাপড়া, হরিণঘাটা, রানাঘাট, চকদহ, শান্তিপুর, ধুবুলিয়া, কুপার'স ক্যাম্প, বীরনগর, কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য এলাকা থেকে দাঙ্গার খবর পাওয়া যায়।[১৫৮] নদীয়া জেলায় ছয়টি এলাকায় পিটুনিকর বসানো হয় এবং সামরিক বাহিনী সহ ৭২ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।
১৪ জানুয়ারি মনসাতলা রোড, হেমচন্দ্র স্ট্রীট, পদ্মাপুকুর ইস্ট লেন জংশন, সার্কুলার গার্ডেন রিচ, নিউ ট্যংরা রোড, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বড়বাজার স্ট্রিট জংশন, কাশীপুর শীল গার্ডেন লেন এলাকায় দাঙ্গা সংঘটিত হয়। উত্তর কলকাতার দাঙ্গা পরিস্থিতির উন্নতি হয়,তবে ওয়াটগঞ্জ, ইকবালপুর, এবং গার্ডেনরীচ এলাকা সেনাবহিনীর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়।[১৫৯] ১৪ জানুয়ারি চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ, হাবড়া, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম এলাকায় এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বেহালা, মেটিয়াবুরুজ, যাদবপুর, সোনাপুর, মহেশতলা এবং বজবজ এলাকায় দাঙ্গা পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়।[১৬০]

১৪ জানুয়ারি কলকাতার দাঙ্গা পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও সান্ধ্য আইন বর্হিভূত কিছু এলাকায় নূতন করে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ফলে সেনাবাহিনী নূতন তিনটি এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মোট আটটি এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত হয় সেনাবাহিনী। কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে সান্ধ্য আইন দুই ঘণ্টা শিথিল করা হয়। ব্যারাকপুর মহকুমার নূতন ছয়টি এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

[১৫৪] ঐ, ১৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫৫] ঐ, ১৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫৬] ঐ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫৭] ঐ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫৮] ঐ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৫৯] দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৬০] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

১৫ জানুয়ারি আনন্দ পালিত রোড, ওয়াটগঞ্জ, পদ্মাপুকুর ইস্ট লেন, বাগমারি রোড এলাকায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় ১২ টি আক্রমণের ঘটনা ঘটে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়। বেশীরভাগ আক্রমণের ঘটনা ঘটে খিদিরপুর ও ওয়াটগঞ্জ এলাকায়। [১৬১]

সরকারী হিসাব মতে কলকাতার ৭৩ হাজার লোককে সরকারী সাহায্য দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৫০ হাজার লোক নিরাশ্রয় হয়েছে না হয় রাস্তায়, পার্কে কসাইখানায় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আশ্রয়হীন লোকের জন্য পশ্চিমবাংলার গভর্নর শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু রাজভবনের ৮টি কক্ষ কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেন। জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক ৩টি বাড়ি দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য ছেড়ে দেন।[১৬২]

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার দাঙ্গায় ৪০ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।[১৬৩]

১৪ জানুয়ারি কলকাতার দাঙ্গা পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও সান্ধ্য আইন বর্হিভূত কিছু এলাকায় নূতন করে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ফলে সেনাবাহিনী নূতন তিনটি এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মোট আটটি এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত হয় সেনাবাহিনী। কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে সান্ধ্য আইন দুই ঘণ্টা শিথিল করা হয়। ব্যারাকপুর মহকুমার নূতন ছয়টি এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

ধীরে ধীরে পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার প্রকোপ কমে আসে বলে পশ্চিমবাংলার সরকারী প্রেসনোট ও পত্রপত্রিকার রিপোর্টে জানানো হয়। ১৮ মার্চ জনৈক গোয়ালাকে ছুরিকাঘাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওড়িষ্যার রাউরকেল্লায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয় পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গা শান্ত হয়ে আসার পর। রাউরকেল্লায় দাঙ্গা শুরু হলে অবিলম্বে তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে দূর দূর এলাকাতেও। দাঙ্গায় মৃত ২০০০ জনের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।[১৬৪]

ভারতীয় সরকার পূর্ববাংলার নূতন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের জন্য সরাসরি দণ্ডকারণ্যের[১৬৫] মানা ক্যাম্পে বিশেষ ট্রেনে করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ৬ মার্চ থেকে রাউরকেল্লা স্টেশন হয়ে বিশেষ ট্রেনগুলি দণ্ডকারণ্যে যাওয়া শুরু করে। রাউলকেলা স্টেশন থেকে উদ্বাস্তুদের দিনের খাদ্য সংগ্রহের জন্য গাড়িগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য সেখানে দাঁড়ায়। সে সময় স্থানীয় জনগন নিঃস্ব অসহায় উদ্বাস্তুদের দেখার ও তাদের কাহিনী শোনার সুযোগ পায়। উদ্বাস্তুদের খাদ্য সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত কয়েকজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ ও জনসঙ্ঘের (ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী) এই অবসরে (১১ মার্চ) স্টেশনে মাইকের সহায়তায় তাদের পাকিস্তান ও মুসলমান বিরোধী বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদও প্রচার করেন। উত্তেজনার প্রত্যক্ষ কারণের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় গুজবের অমোঘ শক্তি। এসব গুজব রটে মুখে মুখে এবং অংশত ওড়িয়া সংবাদপত্রের দ্বারা।[১৬৬] আর এর সাথে যোগ হয়েছিল রাউলকেল্লার হিন্দু মুসলমান জনগণের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দন্ধ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে উন্নয়নের যে মডেল ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে -----বহু স্থলেই যে বিস্ফোরক পরিস্থিতি বিদ্যমান তার প্রমাণ রাউলকেলার দাঙ্গা।[১৬৭] বহুসংখ্যক সংখ্যালঘুকে একদল বিশেষ প্রদেশের হিন্দু হিতৈষী মানুষ ট্রাকে করে কোন গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে বধ করেছিল। এমনকি আদিবাসীরাও তীর ধনুক নিয়ে যোগ দিয়েছিল।[১৬৮] এর জের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বিহারের সিংভূম জেলার জামশেদপুর ও অন্যত্র একাধিক মুসলিম নিগ্রহকারী দাঙ্গায় ফুটে ওঠে।[১৬৯]

---

[১৬১] ঐ, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪

[১৬২] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪

[১৬৩] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪

[১৬৪] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০-৮১

[১৬৫] দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪

[১৬৬] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮১-৮২

[১৬৭] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩

[১৬৮] মৈত্রেয়ী দেবী, এত রক্ত কেন? নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৮

[১৬৯] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০-৮১

১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ভারতে বছরে গড়ে ৬২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে এবং তাতে প্রতি বৎসরে মারা যেত ৪০ এর কাছাকাছি।[১৭০]

ভারতীয় প্রশাসন ও পুলিশ এর ভূমিকা

পশ্চিমবাংলার দাঙ্গা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে ১৪ জানুয়ারি দিল্লী থেকে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এস.এম.খেরা সহ কলকাতায় আসেন সেনাবাহিনী প্রধান জয়নাথ চৌধুরী। তিনি দাঙ্গা আক্রান্ত এলাকা এবং লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেন।[১৭১] পশ্চিমবাংলার জি.ও.সি মেজর জেনারেল এম.জি.দেওয়ান সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সকল এলাকা পরিদর্শন করেন। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ এবং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৪ জানুয়ারি বিভিন্ন আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।[১৭২] ভারতে সংঘটিত অধিকাংশ দাঙ্গা ঘটে প্রশাসনিক শৈথিল্যের কারণে বলে মতপ্রকাশ করেন পুলিশ কমিশনের ভূতপূর্ব সদস্য এন.এস.সাকসেনা।[১৭৩] ভারতীয় প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "দাঙ্গার পর যে স্বল্পসংখ্যক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়া আরম্ভ করে তাদের মধ্যে এ যাবৎ নামমাত্র ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এমনকি বহু সংখ্যক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।--- ভারতের প্রায় সব রাজ্যেও প্রশাসন ব্যবস্থা তার নিদর্শন। মন্ত্রী বা বিধানসভা সদস্যদের হস্তক্ষেপে দোষী ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া অথবা মামলা এমনভাবে দায়ের করা হয় যাতে অভিযুক্তরা খালাশ হয়ে যায়। এর উদাহরণ সব রাজ্যেই এবং সব দলের শাসনকালেই পাওয়া যাবে। --অপর একটি পরিনাম হল প্রশাসকদের সেচ্ছাচার। ---উপরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা।[১৭৪]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী বলেন,

> "বিদ্বেষ বিভেদের উৎসরূপে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে তর্জনী নির্দেশ করি বটে, সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেও তা কম উৎসারিত হয় না। সাহিত্যের শক্তি অনেক বেশী সেইজন্যই প্রধাণতই শিক্ষক সাহিত্যিকদের নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। ----- সবচেয়ে বেশী শিক্ষা হল লব্ধপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকদের প্রতিক্রিয়া দেখে। যখন দারুণ দাঙ্গা চলেছে যার ফলে যে শুধু ঘর বাড়ি মানুষের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে তা নয়, মানুষের মনের ভিতরটাও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে- স্নেহ মায়া মমতা কিছুরই যেন ভিত্তি নেই। ------দীর্ঘ একটা সময় ধরে রাজনৈতিক নেতারাও নিরব ছিলেন।"[১৭৫]

এস.কে.ঘোষ এর মতে ভারতের পুলিশ প্রশাসনের নিম্নপদস্থ পুলিশ সদস্যরা অনেক সময় দাঙ্গাকারীদের সাথে দাঙ্গা ও লুট এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তৎপর হলে এসকল দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা যেত।[১৭৬] --some cases misused public authority by indulging in assults for which the charge of "police brutatality" is frequently made.[১৭৭] কোন কোন জায়গায় দাঙ্গায় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে এস কে ঘোষ বলেন,

---

[১৭০] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬
[১৭১] দৈনিক আনন্দবাজার, পত্রিকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৭২] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৭৩] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫
[১৭৪] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫
[১৭৫] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭
[১৭৬] S.K Ghose, op-cit, page 53
[১৭৭] S.K Ghose, op-cit, page 53

> "At some places the civil and police administration has been accused of inefficiency, callousness and even partiality in allowing communal elements among the Hindus to escape while the Muslims as a community suffered at there hands.[১৭৮]

কলকাতা শহরের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে প্রায় ৮০০০ পুলিশ সদস্য। ১৬ জানুয়ারি পত্রিকায় দেয়া বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান, কলকাতা শহরে ৩৪৭৩ জন এবং অন্যান্য জেলায় ৪৫০০ জনকে দাঙ্গার সংঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।[১৭৯]

প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

সরকার ও জনগণের বক্তব্য প্রকাশিত হয় পত্রিকায়। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোক পত্রিকাকে ব্যবহার করে তাদের বক্তব্যকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেবার মাধ্যম হিসেবে। বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলিই ইচ্ছে করলে একটা দেশের চিন্তার মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে।[১৮০] ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অসত্য প্রচারণা দু দেশেরই স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। পূর্ববাংলা ও ভারতীয় পত্রিকার ভূমিকার পার্থক্য রয়েছে। দাঙ্গার সময় উভয় দেশের কাগজ পড়লে একেবারে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়।[১৮১] ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় পূর্ববাংলা ও ভারতীয় পত্রিকার ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা করে মৈত্রেয়ী দেবী বলেন,

> "যখন কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয় তখন পূর্ববঙ্গের খবরের কাগজ দুই একখানা যারা ওদেশ থেকে এনেছিলেন তাদের হাতে পেলাম। সংবাদ ও ইত্তেফাকের ভূমিকা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম।--------- সংবাদ ও ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রতিদিনই মানবতার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল।-------পূর্ব পাকিস্তানের 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক', 'আজাদ', 'পাকিস্তান অবর্জাভার', প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা যে শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছিলেন, আমাদের উচিৎ ছিল সে কল্যাণকর্মে সহায়তা করা।----বর্বরতা যেখানেই ঘটুক তাকে নির্ভয়ে নিন্দা করা। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার সেই প্রধান উপায়টি কলকাতার অনেক দৈনিকই ভুলে গিয়েছিলেন।[১৮২]

দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও দাঙ্গা আক্রান্তদের সহায়তার জন্য সরকার ও সাধারণ জনগণের প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকের পক্ষ থেকে এক আবেদন জানানো হয়। আবেদনে বলা হয়,

> "সমাজ বিরোধী দুস্কৃতিকারীদের সাম্প্রতিক হামলায় ঢাকা নগরী ও আশপাশ এলাকায় হাজার হাজার নিরীহ নারী পরুষ ও শিশু আজ সর্বস্ব হারাইয়া বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে ক্ষতিগ্রস্ত এইসব নরনারী শিশুর অন্ন বস্ত্র ঔষধপত্র ও মাথা গুজিবার ঠাঁইর ব্যবস্থা করার সামর্থ আজ তাহাদের নাই। কোন একক প্রচেষ্টায় ইহার প্রতিবিধান সম্ভব নয়। স্বভাবতই সমাজ জীবনের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আজ সকলকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। তাই সংশ্লিষ্ট সকল এলাকার সমাজহিতৈষী, মানবদরদী মাত্রের কাছেই আমাদের আবেদন, আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থমত এইসব হতভাগ্য মানব সন্তানের সাহাযার্থে আগাইয়া আসুন। শক্তি দিয়া, অর্থ দিয়া এমনকি সম্ভব হইলে

---

[১৭৮] S.K Ghose, op-cit, page 53
[১৭৯] দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৮০] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩
[১৮১] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২
[১৮২] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২

> কায়িক পরিশ্রম দিয়াও নিজ নিজ এলাকার বিপন্ন মানুষকে স্ব স্ব জীবনে ও সম্পত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করুন।"[১৮৩]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে ও মুসলমানদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে সচেতন করে দৈনিক আজাদ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন' শিরোনামে লেখে,

> "রামের অপরাধে শ্যামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন বিধান এসলামে নেই। এসলাম ন্যায়বিচার, মানবতা ও শান্তির ধর্ম। এসলামের নীতি ও আদর্শে প্রত্যেক মুসলমানকেই আজ পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে -------- কোন নিরপরাধ লোকের উপর পীড়ন বা নির্যাতন করা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সঃ) শিক্ষার ঘোর বিরোধী। সুতরাং আজ ভারতে যাহাই ঘটুক না কেন তহার প্রতিশোধ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর গ্রহণ করিলে তাহা দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের নির্দ্দেশ অমান্য করা হইবে। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্ররোচনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইয়া সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব।"[১৮৪]

পূর্ববাংলার মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা ভারতীয় পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হতে থাকে '৬৩ সালের নভেম্বর থেকেই। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে ভারতের কাশ্মীরে হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত কেশ চুরি হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। সে সময়ে এ খবরটি অত্যন্ত ফলাও করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করা হয় এবং এ ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে খবর প্রচারিত হতে থাকে। তবে এ ঘটনার পূর্ব থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিভিন্ন খবর পত্রিকায় প্রচারিত হতে থাকে। ১৯৬৩ সালের ৫ নভেম্বর দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'পাকিস্তান ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হিন্দুদের সম্পত্তি বিনিময়ে বাধা, 'পাকিস্তানে হিন্দু গৃহ জবরদখলের হিড়িক', পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ', প্রভৃতি শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।[১৮৫]
এস.কে. ঘোষ বলেন,

> "These tales of atrocities had provoked Hindu sentiments and brought to the surface latent Hindu Muslim antagonisms. At this point communalists appeared to have taken the lead in telling the people that the Muslims were a source of danger to the security of the country, that they were agents of Pakistan."[১৮৬]

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক সরকার এর দেয়া প্রেসনোটে খুলনার দৌলতপুরের ঘটনায় কোন লোক নিহত হওয়ার কোন খবর না থাকলেও ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা'য় খুলনায় ১ জন নিহত এবং ৮ জন আহত হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। অন্য আরেকটি ঘটনা সম্পর্কে এই পত্রিকার অন্য একটি সংখ্যায় রিপোর্ট করে খুলনার দাঙ্গায় ৫ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছে।[১৮৭]
৮ জানুয়ারি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে খুলনার দাঙ্গায় ২০ জন নিহত এবং ২৫০ জন আহত হয়। দাঙ্গাকারীরা বিভিন্ন দোকান ও বাড়ি লুট করে।[১৮৮]

---

[১৮৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৮৪] দৈনিক আজাদ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৮৫] S.K Ghose, op-cit, page 53
[১৮৬] S.K Ghose, op-cit, page 53-54
[১৮৭] Sukumar Biswas, RILIGION AND POLITICS IN BANGLADESH AND WEST BENGAL, page 55
[১৮৮] দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ জানুয়ারি ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

২৪ জানুয়ারি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে একটি রিপোর্টে বলা হয় "গত কয়েকদিন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের লোকজন ৩ টি চ্যান্সারী ভবনে গাদাগাদি অবস্থায় কালাতিপাত করছে।[১৮৯] ২৬ জানুয়ারি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রেসনোটে এ সংবাদের প্রতিবাদ করে বলে "প্রকৃত ঘটনা এই যে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শের পর প্রাদেশিক সরকার চ্যান্সারি ভবন এবং ভারতীয় ভিসা অফিস সহ ১০টি গৃহে ২৪ ঘন্টার ডিউটিতে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ব্যবস্থা করে। ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সহ বেশীর ভাগ নিজ নিজ বাসভবনে অতিবাহিত করছেন, এবং সেখানে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার নিজ বাসভবন ত্যাগ করে চ্যান্সারি ভবনে চলে গিয়েছেন বলে যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে তাহা ডাহা মিথ্যা।"[১৯০]

পূর্ববাংলার দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে রয়টারের বরাত দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রচার করে "রায়েরবাজারে ৫ শত ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। মার্কিন শান্তিবাহিনীর জনৈক নার্স ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬ শত লাশ দেখেছে। ঢাকার সন্নিকটে তেজগাঁওয়ে একটি ট্রেন থামাইয়া ৪ শত লোককে ছুরিকাঘাত করা হয়।"[১৯১] সরকারি প্রেসনোটে এ সংবাদের প্রতিবাদ করে বলা হয়, "রয়টারের রিপোর্টে উক্ত তিনটি ঘটনাকেই ফলাও করা হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা।[১৯২] ঢাকা মেডিকেল কলেজের সুপারের রিপোর্টে বলা হয়,

> "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৫৩৮ ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল ঐ সকল লোক ছাড়াও কিছু সংখ্যক মুছলমানকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল। তম্মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং গুণ্ডাদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। সুতরাং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬ শত লাশ দেখিতে পাওয়ার খবরের কোন ভিত্তি নাই।"[১৯৩]

যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল মিঃ চার্লস্‌ পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারির নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন তাতে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত এ সংবাদের প্রতিবাদ করে জানান, "ব্যাপক তদন্তের পর এই সংবাদ মিথ্যা বলে জানা গিয়েছে, সুষ্ঠুভাবে বলা যেতে পারে যে ঢাকায় অবস্থানরত শান্তিবাহিনীর কোন নার্স কোন সাংবাদিককে কোন ধরনের কোন খবর সরবরাহ করে নাই।"[১৯৪] রয়টারের যে রিপোর্টারের বরাত দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও এ সংবাদ প্রচার করে তার সম্পর্কে প্রেসনোটে বলা হয় যে এই রিপোর্টার গত বৎসর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে ঢাকায় এসেছিলেন এ বৎসর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসেন নাই। ঢাকায় রয়টারের কোন সংবাদদাতা ছিলেন না।[১৯৫]
আকাশবাণী থেকে প্রচারিত কয়েকটি অনুষ্ঠানে বলা হয় যে ঢাকায় যে তিনটি সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের নিন্দা করা হয়, গুণ্ডারা তার অফিস সমূহে অগ্নিসংযোগ করে।[১৯৬] ২৬ জানুয়ারি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রেসনোটে এ সংবাদের প্রতিবাদ করে বলে এ কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোন সময়ই এখানকার কোন পত্রিকা অফিস আক্রান্ত হয় নাই।[১৯৭]
ভারতীয় পত্রিকাগুলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা সংঘটিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গার খবর ফলাও করে প্রচার করে এবং ভারতীয়দের নিকট আবেদন জানায় এর প্রতিকার দাবী করে। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি রিপোর্টের শিরোনাম দেয়া হল।

---

[১৮৯]. সরকারি প্রেসনোট, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯০] সরকারি প্রেসনোট, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯১] সরকারি প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯২] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯৩] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯৪] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯৫] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯৬] সরকারি প্রেসনোট, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
[১৯৭] সরকারি প্রেসনোট, ঐ, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৪

২৮ জানুয়ারি একটি প্রসিদ্ধ দৈনিক এর শিরোনামা এই রকম– 'কলিকাতাকে শায়েস্তা করার জন্যই কেন্দ্রীয় নেতাদের মহানগরে পদার্পণ।' অর্থাৎ গুলজারীলাল দাঙ্গা থামাবার যে চেষ্টা করলেন তা' এদের অনুমোদন লাভ করল না। দাঙ্গার সময় পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবী বলেন,

> "আরেকটি কাগজে লেখা হল, 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। যেদিন পাকিস্তানে হিন্দু হত্যার হিংস্রমত্ততার বিবরণ শুনিয়া ও ভারতের হিন্দু মনপ্রাণ আর বিচলিত হইবেনা। হিন্দুত্বের মর্যাদা, হিন্দু নারীর মান সম্ভ্রম পাকিস্তানের ধর্মবিদ্বেষী হিংস্রতায় ও ঘাতকতায় শোণিতাক্ত হইবে কিন্তু ভারতের হিন্দুর কাছে সেই আর্তনাদ একটি কাহিনীর হতভাগ্যের আর্তনাদ বলিয়া মনে হইবে।----তবে বুঝিতে হইবে হিন্দুর ইতিহাস শেষ অঙ্কে পৌঁছিয়াছে।' বুঝতেই পারা যায় এই ধরনের হিন্দুত্বের গর্ব যদি খবরের কাগজে খুঁচিয়ে তোলা হয়, বিশেষত দাঙ্গার সময়, মানুষ তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দুই দিকের দুই রকম ব্যাপার। ----পূর্ব পাকিস্তানে ---- শিক্ষিত গণশক্তি নির্দ্বিধায় মানবতার বাণী উচ্চরণ করেছে, সরকারের দুর্নীতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই মানবতাবোধ এত সত্য যে এর জন্য তের চৌদ্দজন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। দুঃখের বিষয় কলকাতার ঘটনার দুর্নীতি এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে এবং সরকারের সৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি।"[১৯৮]

পশ্চিমবাংলার লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী তার সমমনা নিখিল চক্রবর্তীর মা, জয়নারায়ণ প্রকাশ ও আরও কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে চেষ্টা করছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে জনগণকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন করতে। আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার চালানো। কিন্তু তারা তাদের বক্তব্য প্রচার করতে পারছিলেন না কারণ পত্রপত্রিকা এমন কোন কিছু লিখতে চায়না যাতে এ দেশের সাম্প্রদায়িকতার প্রতি নিন্দা থাকে।[১৯৯] তারা তাদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বক্তব্য প্রচারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ঘুরেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি। তখন তারা নতুন পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। তাদেরকে উৎসাহিত করতে অন্নদাশঙ্কর রায় তাদের 'নবজাতক' পত্রিকায় লিখতেন।[২০০] ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত খুব কম লেখাই হয়েছে যাতে জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা হয়।[২০১]

রাউলকেল্লার দাঙ্গার খবর কেউ জানতো না। খবরের কাগজেও কিছু প্রকাশিত হয়নি। জয়নারায়ণ প্রকাশ প্রথম এ বিষয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। তার এই বিবৃতি স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'টাইম টু স্পিক'। কিন্তু কোন বাংলা পত্রিকায় এটি প্রকাশ করেনি। সত্য ভাষণের জন্য তিনি বহু নিন্দিত ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ তাকে শেখ আব্দুল্লাহর বন্ধু বলে অভিযোগ তুলছিল। স্টেটসম্যানে এই খবরটি প্রকাশিত হলে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল।[২০২] এ লেখাটি উপহাস করে একজন প্রবীণ লেখক 'মহামানব' নামে দেশ পত্রিকায় একটি উস্কানিমূলক গল্প লিখেন।[২০৩] 'মহামানব' গল্পটির প্রতিবাদ করে মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা একটি গল্প কোন নামী পত্রিকা ছাপেনি, পরে তা হীরেন বসু সম্পাদিত 'দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে 'মহামানব' গল্পের লেখক তাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা লিখে। মৈত্রেয়ী দেবী বলেন,

---

[১৯৮] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬-১৭
[১৯৯] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭
[২০০] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭
[২০১] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭
[২০২] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯
[২০৩] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯

> "তখন তিনি একাদেশদর্শী হয়ে পড়েছিলেন বলেই ঐরকম একটি কবিতা কোন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। ---আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা পত্র পত্রিকার ভূমিকা একই। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ানো।"[২০৪]

ভারতীয় সংবাদপত্রের নেতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "অনেক সংবাদপত্র কেবল মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করে দাঙ্গায় প্ররোচনা যোগায়নি, হিন্দু সাংবাদিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিবেদনে সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রভাবও ছিল। সত্য ঘটনা ব্যক্তকারী পাঠকদের পত্র এবং মুসলমানদের বক্তব্য জেনেশুনে প্রকাশ করা হত না।[২০৫] --- এদেশে দাঙ্গার সূত্রপাতে সহায়ক এবং অন্য কারণে দাঙ্গা আরম্ভ হলে তার বিস্তারের প্ররোচনাকারী হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রমাণিত।[২০৬]

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর পূর্ববাংলায় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হলেও ভারতে দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। ভারতে শুধুমাত্র ১৯৬৭ সালে দাঙ্গায় ৩০১ জন লোক নিহত হয় এবং ১৯৬৮ সালের প্রথম ছয় মাসেই এ সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়।[২০৭]
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে হিন্দু মুসলমান সহ বিভিন্ন সম্প্রদয়ের প্রায় ৭৫ লক্ষ লোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সকল সম্প্রদায়ের মত হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ লোকই দেশে ফিরে আসে। ১৯৭৩ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫৮ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় ছিল।[২০৮]

পূর্ববাংলার জনগণ ও সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। সে সকল অভিযোগগুলোকে তারা তাদের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী বলে বুঝাতে চেয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সকল অভিযোগগুলো তুলে ধরা হবে।

[২০৪] মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২
[২০৫] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪
[২০৬] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৯
[২০৭] শৈলেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৯
[২০৮] R.R Committee's Report, op-cit, page 1 GOWB

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
সরকারী পদক্ষেপ ও পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী ঢাকা জেলার হিন্দুদের অভিযোগ সমূহ

দাঙ্গা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর সেভাবে কোন দাঙ্গা না হলেও যেহেতু পাকিস্তান মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে সাধারণ ভীতি কাজ করেছে। পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী ফটিকচন্দ্র বসাক তার বক্তব্যে এই ভীতির প্রসঙ্গে বলেন, 'মুসলমান রাষ্ট্র' হয়েছে বলে। ঐ মুসলমান রাষ্ট্র বইলাই আমরা ধারনা করলাম যে হিন্দুদের এখানে স্থান হবে না। ওটা নিজেদের মধ্যে এমনি এসে গেল। কেননা হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান–এই থেকে একটা চিন্তা ভাবনা এসে গেল।"[১] এ ধারণা হয়তো হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের অধিকাংশের মনেই দনো বেঁধেছে, যা তাদেরকে অনেক সাধারণ ঘটনাকেও ভীতিকর অথবা সংখ্যালঘু হিসেবে অপমানজনক বলে মনে করতে সহায়তা করেছে। সরকারী বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের সিদ্ধান্তও তারা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে মনে করেছে।

ঢাকা জেলা ত্যাগকারী শরণার্থীরা বেশিরভাগ আশ্রয় গ্রহণ করে কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায়। তবে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পেশার সঠিক হিসাব জানা যায়নি কারণ তারাই আশ্রয় গ্রহণ করেছে যাদের পরিবারের কোন সদস্য আগের থেকেই পশ্চিমবাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করছে অথবা চাকুরী সূত্রে বসবাস করছে।[২] বিভিন্ন সময়কালে দেশত্যাগের সংখ্যা এবং দেশত্যাগের সম্প্রদায়গত পার্থক্য এবং সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা যায় যে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ও সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপত্তাহীনতার কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেনি এর পেছনে একদিকে ভারতে সংঘটিত অনেক ঘটনা যেমন হায়দেরাবাদে ভারতীয় সরকারের পুলিশি এ্যাকশন, কাশ্মীরে অভিযান ইত্যাদি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারণা, শরণার্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্য ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং প্রচার মাধ্যমের পূর্ববাংলার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা দেশত্যাগকে প্রভাবিত করেছে।

অন্যদিকে সদ্য স্বাধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং অন্যদিকে পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ যা হিন্দু মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়কে মোকাবেলা করতে হয়েছে, আর এ সমস্যাগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতাকালীন দেশভাগের প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা করে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কেবল একটি জেলার তত্ত্বাবধানে যদি থাকতাম তাহলে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না। আমার জেলা যদি পাকিস্তানে পড়ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে এমন স্থানে বদলী করবার ব্যবস্থা করতেন যেখানে স্বাধীনতা দিবসে আমি ভারতের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাতে পারতাম। আর যদি সে জেলা পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় পড়ত, আমার সেখানে থেকেই সে আনন্দ ভোগ করবার সৌভাগ্য হত। এই অবস্থার এই অনেক প্রত্যাশিত শুভদিনটিতে নিজস্ব জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাতে পারব না-এই আশাঙ্কাই আমার মনে বেদনা সঞ্চার করছিল। এমন শুভদিন জাতির জীবনে দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তা হতে বঞ্চিত হওয়াও তেমন পরম দুর্ভাগ্য।"[৩]

[১] ফটিক চন্দ্র বসাক, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদনা ত্রিদীব চক্রবর্তী

[২] Report on the Sample Servey for the estimating the Socio Economic Characteristics of displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the West Bengal, page 2, GOWB

[৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ২

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপ

পূর্ববাংলা সরকার জনগণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ও আইন পাশ করেছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এসকল আইন অনেক সময় হয়তো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেকের জন্য বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সকল সমস্যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে হয়েছে যে সে হিন্দু বলেই নির্যাতিত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বা পূর্ববাংলা সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্যা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হলে সমস্যা সমাধানের জন্য অভিযোগ জানাত পশ্চিমবাংলা ও ভারতীয় সরকারের কর্তৃপক্ষের নিকট। তাদের বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলো এবং সমস্যা সমাধানে পূর্ববাংলা সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ আলোচনা করা হল।

অপশন

স্বাধীনতাকালীন সময়ে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হলে ব্রিটিশ সরকার সরকারী চাকুরীজীবীদের জন্য অপশন ঘোষণা করে। যে সরকারী কর্মচারীরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন দেশে থাকতে আগ্রহী তা উল্লেখ করে দরখাস্ত আহ্বান করলে অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে ও মুসলমানরা পাকিস্তানে স্থায়ী হওয়ার আবেদন জানায়। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই উচ্চবর্ণের ও চাকুরীজীবী শ্রেণী তাদের পরিবার পরিজনসহ পূর্ববাংলা ত্যাগ করে। “At the time of independence, all high ranking Hindu civil servant opted for service in India instead of Pakistan.”[8]
১৯৪৭ সালের ২ জুলাই বঙ্গীয় বাটোয়ারা পরিষদ এক এশতেহারে প্রকাশ করে যে, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কাজ করতে চান তার অভিমত প্রকাশের জন্য একটি ফর্ম দেয়া হবে। উক্ত ফর্ম পূরণ করে ১২ জুলাই এর মধ্যে স্ব স্ব ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির নিকট জমা দিতে হবে।

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে অপশনের সুযোগ দেয়ার ফলে সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে পরামর্শ লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে সাধারণ হিন্দুরা নিজেদেরকে পূর্ববাংলায় অসহায় শ্রেণী বলে মনে করতে থাকে এবং দেশত্যাগের হার বৃদ্ধি পায় বলে মন্তব্য করেন শ্রী উপেন্দ্রকিশোর সরকার। তার মতে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী কর্মচারীগণকে সেচ্ছায় যে কোন ডোমিনিয়নের অধীনে চাকুরী করার সুযোগ দিয়ে এই বাস্তুত্যাগের কারণ ঘটিয়েছেন।[৫]

কলকাতায় বসবাসকারী ঢাকা জেলার বাসিন্দা বাদল সেন বলেন যে, স্বাধীনতাকালীন সময়ে সরকারী কর্মচারীদের অপশন দেয়া না হলে প্রথম পর্যায়ে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকহারে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটতো না। তাদের ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করায় অন্যদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের আরও লোককে দেশত্যাগে প্রভাবিত করে।[৬]

অঞ্জলী চক্রবর্তী মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার নালী গ্রামে বাস করতেন। তার পিতা নরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকা কলেজ ও পরে হরগঙ্গা কলেজে চাকুরী করতেন। ১৯৪৭ সালে তার চাকুরিজীবী বাবা অপশনে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে কাজে যোগ দেন। তখন তার বয়স ১৩/১৪ বছর। পিতার সঙ্গে সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। তারা গ্রাম ত্যাগ করার পর তাদের বাড়িতে লুটপাট হয়।[৭]

[8] Muhammad Ghulam Kabir, Minority Politics in Bangladesh, page 5
[৫] দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা-১, কলাম-৩,৪
[৬] বাদল সেন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা (অনুমতি নেই বলে পূর্ণ ঠিকানা দেয়া সম্ভব হল না)
[৭] অঞ্জলী চক্রবর্তী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালের এক রিপোর্টে বলা হয় ১৬,০৫১ জন পশ্চিমবাংলায় সরকারী চাকুরী লাভ করে। পাকিস্তানে চাকুরীরত ৩৩,২১৭ জন ১৯৫১ সালের মধ্যেই অপশন নিয়ে পশ্চিমবাংলায় সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেছে। ১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে স্বাধীনতাকলীন সময় পর্যন্ত সরকারী চাকুরীজীবীদের প্রায় ৩৩,০০০ জন পূর্ববাংলা থেকে বদলী হয়ে পশ্চিমবাংলায় চাকুরীতে যোগদান করেছেন।[৮]

সংখ্যালঘু বোর্ড গঠন

পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে জানা, তাদের মন থেকে নিরাপত্তাহীনতা দূর করা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে দিল্লীতে লিয়াকত- নেহেরু চুক্তিতে সংখ্যালঘু বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বলা হয়,

> “(ii) the two Government have decided apart from the deputation of there Minister referred to in E, to set up Minority Commissions, one for East Bengal, one for West Bengal and one for Assam.
>
> (i) Each Commission will consist of Minister of the Provincial or State Government concerned, who will be Chairman, and one representative each of the majority and minority communities from East Bengal, West Bengal and Assam chosen by and from among their respective representatives in the provincial or State Legislatures, as the case may be.
>
> (ii) The two Ministers of the Governments of India and Pakistan may attend and participate in any meeting of any commission.”[৯]

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার অন্যান্য জেলার মত ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানায় স্থানীয় গন্যমান্য হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সংখ্যালঘু বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৫০ সালের ৮ মে বাহাদুরপুর এ স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাস মহাশয়ের বাড়িতে এক সভায় ‘পঞ্চখণ্ড-বাহাদুরপুর সংখ্যালঘু কমিটি’ গঠন করা হয়। সভাপতি নিযুক্ত হন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র। কমিটি সংখ্যালঘুদের জন্য যে সকল দায়িত্ব পালন করবেন তা নির্ধারণ করা হয়। প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়,

“২য় প্রস্তাব:- কমিটি স্থানীয় সংখ্যালঘুদের অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় অভাব অভিযোগ, দাবী সংরক্ষণ এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ইত্যাদির প্রতিকার সহযোগে কর্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩য় প্রস্তাব :- প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীগণ যার যার অভিযোগ উক্ত কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিত ভাবে জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত অভিযোগ রেজিস্ট্রিভুক্ত করার জন্য প্রত্যেক অভিযোগকারীকে কমিটির খরচ নির্বাহের জন্য ১ টাকা হিসাবে ফি জমা দিতে হবে।”[১০] প্রায় সকল কমিটি এ সকল দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গ সরকার প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ের জন্য এ.কে.দত্ত চৌধুরীকে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেন।[১১]

---

[৮] Report on the Sample Servey--- West Bengal, page 7

[৯] Agreement between the Government of India and the Government of Pakistan, dated the 8th April, 1950, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.1 Page 3, GOEB

[১০] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.10, File- Jan, 53/ 354-482. Page 96, GOEB

[১১] পাকিস্তানী খবর, ৫ম বর্ষ ২২শ সংখ্যা, ১৪ আগষ্ট ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ১

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। তাদের দেশত্যাগ বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের সভাপতিত্বে ঢাকায় চারদিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল এম.এল.এ গণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন না হওয়ার জন্য আবেদন জানান।[১২]

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১২ সদস্য বিশিষ্ট এক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক অর্থসচিব সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। প্রাদেশিক সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের (সংখ্যালঘু শাখা) ডেপুটি সেক্রেটারি কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পান।[১৩]

তফসীলি সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

তফসিলী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বাস করে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা এবং রংপুর জেলায়। তারা স্বল্প আয়ের কারিগর সম্প্রদায়। জাল, মাদুর, ও নারিকেলের দড়ি বোনা, তেলে ঘানি চালনা, তাঁতের কাপড় বোনা, নৌকা তৈরী, জুতা তৈরী, কাসা ও ধাতুর কাজ এবং অন্যান্য কুটির শিল্প তাদের পেশা। এক শ্রেণীর মহাজনরা উচ্চহারে সুদের বিনিময়ে তাদেরকে ঋণ দিত তারা দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে সাধারণ কারীগররা দুর্দশায় পতিত হয়। কাঁচা মাল ও যন্ত্র হাতিয়ার দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।[১৪] উল্লিখিত ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কাঁচা মাল সরবরাহ ও কর্জ বাবদ মঞ্জুর করা হয়। ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তফসীলি কারিগরদের জন্য দুটি আদর্শ কারখানা স্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এ সকল পরিকল্পনা যে প্রতিষ্ঠান কার্যকর করবে সে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের যতদূর সম্ভব তফসীলিভূক্ত সম্প্রদায় থেকে নেয়া হবে। যাতে করে এ বরাদ্দ শুধুমাত্র তফসীলিদের জন্যই ব্যয় হয়। তফসীলি কারিগরদের সমবায় সমিতি গঠন করে তাদেরকে শিল্প ব্যাবসা চালাতে উৎসাহিত করা হয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তফসীলি সম্প্রদায়ের ৯৬৭ টি কারিগর পরিবারকে অর্থ সাহায্য দেয়া হয়। তারা প্রায় ২০ রকমের কুটির শিল্পের সাথে নিয়োজিত।[১৫]

তবে এতে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয় নাই কারণ তারা বেশিরভাগ বর্ণ হিন্দুদের ব্যবহারের জন্য বাসন, বাটি, থালা, হাড়ি, কলস ইত্যাদি বেশী তৈরী করত। বর্ণ হিন্দুরা বেশীরভাগ ইতোমধ্যে দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সকল জিনিসের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়, আর যে সকল মোহাজেররা পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তারা অন্য ধরনের তৈজসপত্র ব্যবহার করে। ফলে এসকল জিনিসের উৎপাদন ও বিক্রয় কমে যায়।

অল্প বয়স্ক তফসীলিদেরকে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।[১৬]

বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি

পাকিস্তানের তৎকালীন সংখ্যালঘু মন্ত্রী জনাব নুরুল হক চৌধুরী ১৯৫৬ সালের ১৬ এপ্রিল ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের যে সব সম্পত্তি হুকুমদখল করেছেন তা বিক্রি না করে তা ভোগ দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে প্রত্যাবর্তনকারী বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সবরকম

[১২] ঐ, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৭ মার্চ ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৪
[১৩] ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা, ৩১ আগষ্ট ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ২
[১৪] ঐ, ১ম বর্ষ, ২৭ শ সংখ্যা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ পৃষ্ঠা ৩
[১৫] ঐ, ১ম বর্ষ, ২৭ শ সংখ্যা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ পৃষ্ঠা ৩
[১৬] ঐ, ১ম বর্ষ, ২৭ শ সংখ্যা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ পৃষ্ঠা ৩

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করা হবে। তাদের ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষ যাতে অবহেলা না করেন সেজন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।[১৭]

প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার এক বিবৃতিতে বলেন যে, উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা হলে অমুসলমানদের দেশত্যাগের হার হ্রাস পাবে। স্পেশাল অফিসার প্রদেশের সকল অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের সহযোগিতা চাইতে পারবেন।[১৮]

১৯৫১ সালের ২৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গ বাস্তুত্যাগী (স্থাবর সম্পত্তি পরিচালনা) সংশোধনী বিল পাশ হয়।

১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই থেকে **১৩** আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাস্তুত্যাগী মালিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। বাস্তুত্যাগী মালিকগণকে **১৯৫৪** সালের **১** মার্চ হতে ৬ মাসের মধ্যে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি প্রত্যার্পণ বা বিক্রয় করে দেয়ার দাবী পেশ করতে বলা হবে। যে সব ক্ষেত্রে বাস্তুত্যাগী মালিক নিজ সম্পত্তি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করতে পারবেন না ঐ সব ক্ষেত্রে বাস্তুত্যাগী মালিক প্রয়োজন মনে করলে ঐসব সম্পত্তি মালিকের দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধির দপ্তরে স্থানান্তর করা যেতে পারে। বাস্তুত্যাগীদের অন্যান্য সকল অস্থাবর সম্পত্তি মালিকের দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা তার কোন প্রতিনিধির সম্মুখে স্থানীয় বাস্তুত্যাগীর জিম্মাদার কর্তৃক নিলামে বিক্রয় করা হবে। জিম্মাদার এর ফি বাদ দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ মালিককে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা তার প্রতিনিধির নিকট দেয়া হবে।[১৯]

চুক্তি অনুযায়ী মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা ধন সম্পদ এক দেশ হতে অন্য দেশে স্থানান্তরের সুযোগ রাখা হয়।[২০]

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবস্থা

শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুগণ মুসলমান ছাত্রদের সমান সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। সাধারণ ও কারীগরি ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রদের মতো শিক্ষা লাভ করা ছাড়াও তাদের জন্য বিশেষভাবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে।[২১]

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তফসীলিগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। একটি পৃথক সরকারী বিভাগ তাদের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন।[২২]

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পূর্ববাংলার কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করে যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মুসলিম ছাত্ররা প্রথম বিভাগ অর্জন করে আর নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্ররা ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা বৃত্তি পাবে আর উচ্চবর্ণের ছাত্ররা ৭৫% নম্বর পেয়েও বৃত্তি পায় না।[২৩] পশ্চিমবাংলা কর্তৃপক্ষের অভিযোগের উত্তরে পূর্ববাংলা কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়,

> "Special stipend are awarded to the cast Hindu and minority students other than scheduled castes out of the general fund and no discrimination is made against cast Hindu student's."[২৪]

---

১৭ ঐ, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃষ্ঠ ২
১৮ ঐ, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৪ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৫
১৯ ঐ, ২য় বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৩
২০ ঐ, ২য় বর্ষ ৪শ সংখ্যা ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ২
২১ দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান দিবস সংখ্যা ২৩ মার্চ ১৯৬৮
২২ ঐ, পাকিস্তান দিবস সংখ্যা ২৩ মার্চ ১৯৬৮
২৩ Home, Political, (CR) B Proceedings, Vol.18, , May 1953/ File No. 939-943, Page-5, GOEB
২৪ ibid, Page 17

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতর তফসীলি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে ১৫০ টি স্কলারশিপ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। মেডিকেল ছাত্রদের জন্য ১০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়। অধিকাংশ তফসীলিগণ পূর্ববঙ্গে বাস করায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের জন্যও এই স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[২৫]

তফসীলিভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য পাকিস্তান সরকার তফসীলি স্কলারশিপ বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ড প্রতি বৎসর তফসীলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান করে। ১৯৫৬ সাল এর মার্চ পর্যন্ত প্রায় ১১০৮ জন ছাত্র এই বোর্ড হতে ৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার বৃত্তি গ্রহণ করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ১০ টি বৃত্তি দেয়া হয়।[২৬]

পাসপোর্ট পদ্ধতি প্রচলন

স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান সরকার সরকারী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি হল পাসপোর্ট পদ্ধতির প্রচলন। ১৯৫২ সালের ৫ মে পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট ও প্রবেশপত্র দানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের ব্যাপারে পারমিট ব্যবস্থার পরিবর্তে আর্ন্তজাতিক বিধান সম্মত পাসপোর্ট ও প্রবেশপত্র দান ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে যারা গত দুই বছরে ফিরে আসে নাই তাদের আর ফিরে আসার ইচ্ছা নাই বলে ধরে নেয়া যায়। বাস্তুত্যাগীরা ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য পূর্ববাংলা, পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এই মেয়াদ পরে ১৯৫১ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তবে কোন বাস্তুত্যাগী যদি এই সময়ও প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয় তবে তার জন্য সুবিধা দেয়া হবে। পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারত সরকারও একমত পোষণ করে যে এতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াতের ব্যাপারে অসুবিধা দূরীকরণের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা হবে।[২৭]

পাকিস্তান সরকার ১৮ অক্টোবর ১৯৫২ তারিখ হতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের ব্যাপারে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা চালু করে। ভারত সরকার ১৫ অক্টোবর হতে পাসপোর্ট প্রথা চালু করে। ১৯৫২ সালের ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৫০ টি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৫ অক্টোবর হতে পারমিট প্রথা বন্ধ করে দেয়। পাসপোর্ট আইনে বলা হয়, "ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে প্রবেশের জন্য পাকিস্তান সরকারের কোন অনুমোদিত কর্মচারী পাসপোর্টের উপর যে ভিসা প্রদান করবেন, অর্ডিনেন্স অনুসারে তা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক একমাত্র বৈধ দলিল বলে গণ্য হইবে।[২৮]

"ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে আগমনের জন্য ছয় শ্রেণীর ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১ম শ্রেণীর ভিসা---

(ক) কার্য্যাপলক্ষে যে সকল ভারতীয় নাগরিক পূর্ব্ব বাংলার সীমানা হইতে ১০ মাইলের মধ্যে ভারতীয় এলাকায় বাস করেন এবং পূর্ব্ব বাংলার এলাকার সীমানার ১০ মাইলের মধ্যে জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিয়া থাকেন এই ভিসা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।[২৯]----

(খ) এক বৎসর বা তাহারও কম সময় অথবা সর্ব্বোচ্চ ৫ বৎসরের মেয়াদে ভিসা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।[৩০]

২য় শ্রেণীর ভিসা----

[২৫] দৈনিক আজাদ, ২৪ জানুয়ারি ১৯৪৮

[২৬] পাকিস্তানি খবর, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২৩ মার্চ ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ১২

[২৭] দৈনিক ইত্তেফাক ৫ মে ১৯৫২

[২৮] পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার নিয়মাবলী । Home, Political, (CR) B proceedings, Vol.70, File-March 1953/ 968- 972, page 1, GOEB

[২৯] ibid, page 1

[৩০] ibid, page 2

Dhaka University Institutional Repository

(১)পাকিস্তানে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তিতে স্বার্থবান আছেন বা উহা হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন এমন সব ব্যক্তি অথবা অথবা তাহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি।--

(২)পাকিস্তানে যাহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রহিয়াছে।--

(৩) পেন্‌সন প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, লিমিটেড কোম্পানি বা রেজিস্টার্ড ফার্ম্সসমূহের বিধান অনুসারে যাহাদিগকে উহা হইতে মাসে মাসে বা নির্দিষ্ট সময়ানুসারে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানে উপস্থিত হইয়া টাকা গ্রহণ করিতে হয়।---"

৩য় শ্রেণীর ভিসা

এই শ্রেণীর ভিসা ভারতীয় নাগরিকদের জন্য মঞ্জুর করা যাইতে পারে যারা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ভিসা পাওয়ার যোগ্য নয়।"[৩১]

১৫ অক্টোবর পাসপোর্ট প্রথা চালু হলে এই হার অত্যন্ত কমে যায়।[৩২] ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে হিন্দুদের দেশত্যাগের হার বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু স্রোত বেড়ে যায় এ সময়ের চিত্র তুলে ধরে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

"সম্পূর্ণ নূতন একটা কারণে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। কারণটা হল পাকিস্তান সরকারের পাসপোর্ট প্রথা চালু করার সিদ্ধান্ত। পাঁচ বছর দেশ বিভাগ হয়ে গিয়েছে তবু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত করতে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও কোন বাধাঁর সৃষ্টি হয়নি। যখন যার খুশি উভয় রাষ্ট্রে যাতায়াত করতে পারত। পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত পাসপোর্ট বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের মধ্যে একটা তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হল। এই উত্তেজনার কারণ হল এই আতঙ্ক যে, পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তনের পর পাকিস্তান ইচ্ছামত ত্যাগ করা যাবে না এবং ভারতে প্রবেশের পথ বিচ্ছিন্ন হবে। এই নূতন নিয়ম প্রবর্তনের তারিখ ঠিক হয়েছিল ১৫ ই অক্টোবর ১৯৫২। কিন্তু তার কয়েকদিন আগে হতেই তা ক্রিয়াশীল হয়ে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার বেশ পরিবর্ধিত করে। ক্রমশ তা বাড়তে বাড়তে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিরাট আকার ধারণ করে। তখন কিছুদিনের মত তা ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকের দারুন দুঃসময়ের দিনগুলির সহিত তুলনীয় হয়েছিল। এই নূতন কারণে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার কেমন ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়েছিল তা এই সময় বিভিন্ন মাসে কত উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তা দেখলে বেশ বোঝা যায়। এই বৎসর জানুয়ারি হতে জুন এই ছয় মাসে আশ্রয় শিবিরে মাসিক গড়ে ভর্তীর সংখ্যা ২০৬২ জন ছিল। তা জুলাই মাস হতে কেমন ধীরে ধীরে বেড়ে গেল এবং পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তিত হবার তারিখ উর্ত্তীর্ণ হলে কেমন হঠাৎ কমে গেল। আশ্রয় শিবিরে এই কয় মাসে ভর্তীর হার দেয়া হল।[৩৩]

সারণী-৭.১

পাসপোর্ট প্রথা চালুর পর পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের তালিকা

মাস		ভর্তীর সংখ্যা
জুলাই	১৯৫২	১১,৬০০ জন
অগাষ্ট	,,	৭৮০০ "
সেপ্টেম্বর	,,	১০,৬৫৪ "
অক্টোবর	,,	৩১,৭৫৩ "
নভেম্বর	,,	১,৭০০ "
ডিসেম্বর	,,	৭৫৫ "

সূত্রঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১৯৫

[৩১] ibid, page 2

[৩২] Profullo Kumar Chakraborti, Marginal Men: The Rfugees and the Left Political Syndrome in West Bengal, page 4

[৩৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫

পাসপোর্ট প্রথা চালুর ঘোষণার ফলে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাপক আকারে দেশত্যাগের হার বৃদ্ধি পায়। মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত এই হার ছিল অনেক বেশী।
এ চার্ট থেকে অনুধাবন করা যায় যে, পাসপোর্ট প্রথা চালু হলে দুই দেশের মধ্যে যেহেতু যাতায়াতের ওপর নিয়ন্ত্রণ হবে তাই এ সময় যারা দেশত্যাগ করে যেতে আগ্রহী তাদের দেশত্যাগের হার বৃদ্ধি পায়। অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ হতে পাসপোর্ট বিধি প্রবর্তিত হয়। আগমনের হার হঠাৎ করেই নভেম্বর মাসে রীতিমত তা পড়ে গিয়েছিল তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। তা প্রমান করে পাসপোর্টের আতঙ্কই ১৯৫১ সালের দেশত্যাগের হার বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।[৩৪] ।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি কলকাতায় দুই দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দুই দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য। পূর্ববাংলায় ফিরে আসা হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা জেলার ৩৪২ টি বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে ৬২ টি বাড়ি অধিগ্রহণমুক্ত করা হয়। ১২৮ টি বাড়ি ভারত থেকে আগত শরণার্থীরা তাদের বসবাসের জন্য দখল করে।[৩৫]
১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর ঢাকা জেলা থেকে ৯৯,৫০০ জন হিন্দু ভারতে চলে যায়। ১৯৫১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৫৯,০০০ জন হিন্দু ফিরে আসে, এদের মধ্যে ৫০,০০০ পুনর্বাসন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৭৪২১ টি বাড়ির মধ্যে ৭০০০টি বাড়ি হিন্দুদের ফেরত দেয়া হয়। বেদখল হওয়া ২৬০ টি দোকানের সবগুলো দোকান হিন্দু মালিকদেরকে ফেরত দেয়া হয়। মোট ঋণ দেয়া হয় ১৯,০০০ টাকা এবং বরাদ্দ দেয়া হয় ১,১০,২২০ টাকা।[৩৬]

এ সময় পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় ১০,৭৪,৪৫৪ জন হিন্দু দেশত্যাগ করে, ফেরত আসে ৬,২৫,৩৯৫ জন। পুনর্বাসন দেয়া হয় ৫,৩৩,৪৮১জনকে। ১,৬৬,০১০ টি বেদখল হওয়া বাড়ির মধ্যে ১,০০,৬১১ টি বাড়ি ফেরত দেয়া হয়। ৯,৭৬৬ টি বেদখল হওয়া দোকানের মধ্যে ৯,০৩৮ টি দোকান ফেরত দেয়া হয়। ঋণ দেয়া হয় ৬,৬৭,৫৯৫ টাকা এবং বরাদ্দ দেয়া হয় ৩,০৬,০১৫ টাকা।[৩৭]

অবৈধ দখল ও সরকার কর্তৃক বাড়ি অধিগ্রহণ

হিন্দু সম্প্রদায় দেশত্যাগের সময় তাদের বাড়িগুলোতে অবৈধ দখল ও ভাড়া নিয়ে ভাড়া না দেয়া, সরকারের অধিগ্রহণে অনিয়ম নিয়ে ব্যবস্থাপক পরিষদে পরিষদ সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন পরিষদ সদস্য প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। তিনি তার বক্তব্যে বাড়ি, দোকান প্রভৃতি অধিগ্রহণ করে ও অন্যের নিকট তা বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের অনিয়মের অভিযোগ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের আবেদন করেন। তিনি বলেন,

> "পার্টিশন হওয়ার পর অনেক বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ারা আজ পর্যন্ত এক পয়সাও ভাড়া দেয়না। প্রত্যেক জেলায় এই অভিযোগ আছে। এইসব ভাড়ার টাকা যাতে অবিলম্বে দেবার ব্যবস্থা হয় রাজস্ব সচিব সেদিকে নজর দিবেন। আর একটা বিষয় রাজস্ব সচিবকে নজর দিতে বলছি সেটা ভাড়া নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে।"[৩৮]

একই ধরনের অভিযোগ করেন পরিষদ সদস্য বাবু রাজেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি বলেন,

---

[৩৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫
[৩৫] Proceedings Conference between the two central Ministers, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.18, File No. May 1953/1044-1047, Page 4, GOEB
[৩৬] ibid, Page 9
[৩৭] ibid, Page 9
[৩৮] ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ২৬ মার্চ ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৫৪

> "House requisition আপত্তি করবার কোন কারণ নেই। রাষ্ট্রের কারণে House requisition করা দরকার তা মেনে নিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু যাদের উপর ভার দেওয়া হয়েছে তারা যেভাবে কাজটা করছেন তাতেই লোকের যত দুঃখ কষ্ট হচ্ছে। ------প্রথম যখন requisition আরম্ভ হয় তখন official এবং non-official নিয়ে একটা বোর্ড করা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে বর্ত্তমানে requisitioned বাড়ির সংখ্যা স্থির করে নিয়ে তখনকার সেই বোর্ড বাড়ি খালি করবার বন্দোবস্ত করবেন। তারপর যখন কোন বাড়ি requisition করা হ'ল তখন যাদের জন্য করা হল তদের থাকতে না দিয়ে non-essential এবং non-official status লোকদের থাকতে দেওয়া হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরা থাকবার জায়গা পায়না এইসব readjustment করবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম। আরও দেখা গিয়েছে যে requisitioned বাড়ী যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের অর্জন ক্ষমতা বা status না দেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর এই সব requisitioned বাড়ীর ভাড়া ঠিকমত দেওয়া হচ্ছেনা, বাড়ীর ভাড়া ন্যায্যভাবে ধার্য করার জন্য যে instructions দিন আইনের বিধান অনুসারে তারা যেন ভাড়া পায়। কিন্তু তা হচ্ছে না।"[৩৯]

বাড়ি অধিগ্রহণের অনিয়ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত। তিনি বলেন,

> "এ সম্বন্ধে একটা নীতির অভাব আছে। সরকারী আমলা নন এমন বাহিরের লোক যদি তার সঙ্গে এর খাতির থাকে তবে সেও ইচ্ছামত বাড়ী পায়। কিন্তু যার বাড়ী নেওয়া হ'ল সেও রাষ্ট্রের একজন নাগরিক; তার একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কি গভর্নমেন্টের উচিৎ নয়? তা যদি না করতে পরেন তবে যে সরকারী কর্মচারী নয় তাকে কেন বাড়ী দেওয়া হয়? আবার গভর্নমেন্টের যে আমলা ১০০ টাকার কম বেতন পান তাকেও এমন বাড়ী দেওয়া হয় তার বেতনের শতকরা ১০ টাকা করে কাটলেও বাড়ী ভাড়া হয় না।"[৪০]

ঢাকা শহরের দুটি বাড়ি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পিটিশন দাখিল করেন রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্র কুমার দাস ও বাবু হেমেন্দ্র কুমার দাস। এর কপি ভারতীয় হাই কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে। তারা তাদেরকে ঢাকায় অবস্থিত 'Das Lodge' ও 'Revoti Bhaban' এর স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হিসেবে পিটিশনে উল্লেখ করেন।

১৯৫১ সালের ১২ জুন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস থেকে বাড়ি দুটি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ চিঠিতে বাড়ি দুটির মালিকদের তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, "It is stated in the petition that 23/24 persons, including females, are permanently living in each of these houses. The house are also said to contain place of worship."[৪১]

এডিশনাল স্টেট অফিসার তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে জানানো হয় যে, এই দুই পিটিশনার অনেকদিন আগে থেকেই কলকাতার ৯৫/১ রাসবিহারী এভিনিউতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং বাড়িটি প্রায় খালি ছিল। পূর্ববাংলা সরকার 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং স্কুল' এর জন্য বাড়ি অধিগ্রহণ করে এবং কিছু অফিসারদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৬ জুন ১৯৫১ তারিখে রিক্যুজিশন আদেশ প্রদান করেন। 'Das Lodge' এ নীচ তলায় একটি ফিল্ম কোম্পানির অফিস এবং অন্য রুম গুলোতে একজন মুসলমান পরিচালক ও তার পরিবারের কিছু সদস্য বসবাস করছিল। বাড়ির মূল বাসস্থান বাড়ির মালিকের অধিকারে ছিল সেখানে কোন

---

[৩৯] ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ২৬ মার্চ ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৫৫

[৪০] সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ২৬ মার্চ ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৫৭

[৪১] Report by Addl. Estate Officer, Dacca, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 7, File-Sep`52/185-146. page 3-10, GOEB

মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ কারণ কোন হিন্দু সদস্য কোন মুসলমানের সঙ্গে বাস করতে পারেনা। দাস লজ এ নীচ তলায় ১১টি রুম।[৪২]

'Revoti Bhaban' এর নীচতলার দুই রুম এ মালিক নিজস্ব অফিস হিসেবে ব্যবহার করে, নীচ তলার অন্যান্য রুম এবং দোতলার পুরো অংশ তালাবদ্ধ ছিল। দুই একজন কজের লোক ছিল। একজন বৃদ্ধা তখন ঐ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তবে আর কোন মহিলা ছিল না। বাড়ি অধিগ্রহণের সময় পরিবারের সদস্য হিসেবে একটি নামের তালিকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দেয়া হয় যাদের সঙ্গে সম্পর্ক শ্বশুর, ভগ্নিপতি, শ্যালক প্রভৃতি যাতে মনে করা হয়েছিল যে প্রায় ২৪/২৫ জন সদস্য ঐ বাড়িতে অবস্থান করছে। তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ বাড়িতে ২/৩ জন দরিদ্র সদস্য যারা কেয়ারটেকার হিসেবে ঐ বাড়িতে অবস্থান করছিল তাদেরকে দেখতে পান। রেবতী ভবনের নীচ তলায় ৩৪ টি রুম, দোতলায় ২২ টি রুম এবং তিন তলায় ৯ টি রুম। সেখানে অফিসে ম্যানেজার সহ মাত্র ৩/৪ জন কাজ করছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানায় এ বাড়ি দুটির মূল মালিকরা যদি পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে স্থায়ীভাবে বাস করে তবে ২২ টি রুম তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।[৪৩]
বিভিন্ন সময়ে বাড়ির মালিকদের আবেদন এর প্রেক্ষিতে বাড়ির কম্পেনসেশন বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও অনেক মালিক পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। অনেকে পশ্চিবাংলায় সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা সরকারী কর্মকর্তা শ্রী এন.সি. চক্রবর্তী ঢাকা জেলা প্রশাসকের নিকট ঢাকা শহরে আজিমপুরা রোড এর অধিগ্রহণ করা বাড়ির ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ ৩০ টাকা থেকে বাড়ানো এবং সে টাকা কলকাতার ঠিকানায় মানি অর্ডার করার অনুরোধ করে ১৯৪৮ সালের ১৫ জুলাই আবেদন জানান। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তা বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হয় এবং তা কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[৪৪]

কলকাতার বালীগঞ্জ এর গরচা সেন্ট্রাল সরকারী স্টাফ কোয়ার্টারের বাসিন্দা ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের ঢাকার টয়েনবি সার্কুলার রোডের বাড়ি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের সময় ঢাকায় ছিলেন না বলে ১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল এক দরখাস্তে উল্লেখ করেন। তারা ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় গমন করেন বলে জানান। বাড়িটি অধিগ্রহণ করা হয় ১৯৪৮ সালের মে মাসে। পিটিশনার তার বাড়ির স্টান্ডার্ড অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ করে তা কলকাতার ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান।[৪৫]

পূর্ববাংলা সরকার এর Finance and Revenue Department কর্তৃক যে সকল বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করে দেখা যায় যে শুধুমাত্র হিন্দু বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়নি, অনেক মুসলমান মালিকানার বাড়িও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই তালিকায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত বাড়ির হিসাব দেয়া হয়েছে। এ সময় কালে ১১৭৪ টি বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, অধিগ্রহণ করা বাড়ির মধ্যে ৯৩৭ টি হিন্দু মালিকানার বাড়ি এবং ২৩৪ টি মুসলমান মালিকানার বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।[৪৬] হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন বাড়ি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে Finance and Reveneu Department এর House Requisition শাখায় যেসকল অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তাদের অভিযোগ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ও বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃপক্ষ যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা আলোচনা করা হল। এসকল অভিযোগপত্রের ভিত্তিতেই নীচের সারণীটি তৈরী করা হল।

---

[৪২] ibid, page 3-10
[৪৩] ibid, page 3-10
[৪৪] Finance and Revenue, House requisition, B Proceedings, Vol. 1, File no. July-54/99-101, GOEB
[৪৫] ibid, page 13. এই দরখাস্তের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, GOEB
[৪৬] Finance and Reveneu Department এর House Requisition শাখার B Proceedings, ১-৮ নং ভলিউম এর সংরক্ষিত নথি থেকে বাড়ির মালিকদের সরকারের অধিগ্রহনের অয়িমের বিরুদ্ধে পিটিশন করা ফর্ম থেকে এ তালিকা তৈরী করা হয়েছে। GOEB

সারণী-৭.২

অধিগ্রহণকৃত হিন্দু ও মুসলমান মালিকানাধীন বাড়ির সংখ্যা

ঢাকা বিভাগ– মোট বাড়ি ৪০৭ টি	হিন্দু মালিকানা ৩০৫টি	মুসলমান মালিকানা ৫৭টি
চট্টগ্রাম বিভাগ– মোট বাড়ি ৬৩৬ টি	হিন্দু মালিকানা ৪৮২ টি	মুসলমান মালিকানা ১৫৪টি
রাজশাহী বিভাগ–মোট বাড়ি ১২৮ টি	হিন্দু মালিকানা ১০৫ টি	মুসলমান মালিকানা ২৩টি
ঢাকা জেলা মোট বাড়ি ৩৭ টি	হিন্দু মালিকানা ২৬ টি	মুসলমান মালিকানা ১১টি
ঢাকা শহর মোট বাড়ি ২৮ টি	হিন্দু মালিকানা ২১ টি	মুসলমান মালিকানা ৭টি”

সূত্রঃ Finance and Reveneu Department এর House Requisition শাখার ১-৮ নং ভলিউম এর সংরক্ষিত নথি থেকে বাড়ির মালিকদের সরকারের অধিগ্রহণের অনিয়মের বিরুদ্ধে পিটিশন করা ফর্ম থেকে এ তালিকা তৈরী করা হয়েছে।

অভিযোগকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ হিন্দু মালিক কোন বর্তমান ঠিকানা ব্যবহার করেননি, ঠিকানা ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৩২ জন হিন্দু মালিক ভারতীয় ঠিকানা এবং ১ জন পূর্ববাংলার ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। বাড়ির মালিকদের অধিগ্রহণের অনিয়মের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ এর ভিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে কিছু বাড়ি অধিগ্রহণ মুক্ত করা হয়। ১৯৫০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলা প্রশাসক এক আদেশে ১৬ টি বাড়ি অধিগ্রহণ মুক্ত করে আদেশ প্রদান করেন।[৪৭]

১৯৫৪ সালের ৭ এপ্রিল হুগলি জেলার ১৭৫ মহেন্দ্র মিত্র রোড, বড় দুয়ারীর বাসিন্দা লাবণ্যপ্রভা মিত্র ও শৈলবালা দত্ত পিটিশন দাখিল করেন। তাদের ঢাকার নারিন্দার বাড়িটি অধিগ্রহণের সময় মাসিক যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে তা তারা পাননি তাই ভাড়ার পাওনা টাকা পশ্চিমবাংলার ঠিকানায় পাঠানোর জন্য আবেদন জানান। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পূর্ববাংলা সরকারের নিকট চিঠি দেন ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার।[৪৮]

জ্ঞানেন্দ্র কান্ত নাগ ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মিলিত ভাবে ১৯৫০ সালের ২৬ জুলাই পিটিশন দাখিল করে তাদের ঢাকাস্থ ১৮ ইমামগঞ্জ এর বাড়িটি অধিগ্রহণমুক্ত করার জন্য। বাড়িটিতে বসবাস শুরু করেন বিহার থেকে আগত এক প্রাক্তন জমিদার। পিটিশন করা হয় ঢাকা জেলা প্রশাসক এর নিকট ও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের নিকট। তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এ বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র ও জমিদারী কাগজপত্র সহ ১০,০০০ টাকায় তাদের দারোয়ান বিক্রয় করে দেয়। এই পরিবারের সদস্য বাবু বসন্ত কুমার নাগ পশ্চিমবাংলা সরকারের মাধ্যমে পিটিশন দাখিল করেন।[৪৯] ঢাকা জেলা প্রশাসক এর অফিস থেকে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, “It will appear that the houses were vacanted immediately with the arrival of the petitioner’s brother who has sold away the same and gone back to Bharat.”[৫০]

ডা. ইউ সেন এর গ্রাম: বাঙলা, পোস্ট: ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা। তাদের বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য বাবু জশোদালাল সেন এর উপস্থিতিতে বাড়িটি বেদখল হয়। পরিবারের অন্য সদস্যরা কলকাতায় বসবাস করছিলেন স্থায়ীভাবে। বাবু জশোদালাল সেন কলকাতায় চিকিৎসা করতে গিয়ে মারা যান। বাড়িতে বসবাস করছিলেন তার বিধবা স্ত্রী। নিজেদের বাড়িটি উদ্ধার করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানায়। সরকারী কর্তৃপক্ষ বাড়িটি দখলমুক্ত করার আদেশ দিয়েছে বারবার কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। শরণার্থীরা বাড়িটি ছেড়ে দিলেও স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন বাড়ি এবং তাদের কিছু জমিও দখল করে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডা. ইউ. সেন ভারতীয় হাই কমিশনের নিকট আবেদন জানান।[৫১]

---

[৪৭] Finance and Revenue, House requisition, B Proceedings, Vol. 1, File no July-54/ 81-92 GOEB

[৪৮] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.46, File-Feb- 55/128, page 1-2, GOEB

[৪৯] ibid, Vol.10, File- Jan-53/ 873-1042, page 3-7, 381-421 GOEB

[৫০] ibid, page 381-421 GOEB

[৫১] ibid, Vol.10, File-B Jan, 53, 908-1042, page 276 GOEB

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালের ২৩ অক্টোবর পিটিশন দাখিল করেন এস.সি গাঙ্গুলী, কুঁচবিহার থেকে। তিনি সেখানে ‘Cooch Bihar Match Company’ এর Range officer. তিনি অভিযোগ করেন যে তার গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার আদাবাড়ি গ্রামে স্থানীয় কিছু মুসলমান তার বাড়ির গার্ড এর অনুপস্থিতিতে বাড়ির তালা ভেঙ্গে অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। তিনি সুষ্ঠু তদন্তের আবেদন জানান।[৫২]

পশ্চিমবাংলার পশ্চিম দিনাজপুর থেকে কালীপদ বাগ্‌চী ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট পিটিশন দাখিল করেন যে তার অনুপস্থিতিতে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা জেলা রিলিফ অফিসার তার বাড়ি দেখাশুনা করতেন। কিন্তু এক সময় বাড়ির তালা ভেঙ্গে সেখানে শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করেন। ফলে বাড়ির অস্থাবর সম্পত্তি লুট হয়ে যায়। শরনার্থীদের সৃষ্টি করা দাঙ্গার ফলে তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৫৩]
তার পিটিশনের প্রেক্ষিতে তদন্ত করে মানিকগঞ্জের সাব-ডিভিশনাল অফিসার ১৯৫০ সালের ২৩ নভেম্বর এক রিপোর্টে জানান যে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার বাড়ি তালা বন্ধই রয়েছে। জনৈক কেদারনাথ বাগচীর বাড়ি সীজ করা হয়েছে, এ বাড়িটি দাঙ্গার (১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারির দাঙ্গা) পর থেকে খালি ছিল। তদন্তকালীন সময়ে সে বাড়িতে কোন শরণার্থী ছিল না।[৫৪]

হুগলি থেকে শ্রী জগতবন্ধু দাস পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী ও ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট ১৯৫০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে জানান যে, তার ঢাকার লৌহজং থানার বাড়ি থেকে অস্থাবর সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়, বাড়ির লোক বাধা দিলে জানায় যে সরকারের আদেশ ভেঙ্গে দেয়ার।[৫৫]
এ অভিযোগের তদন্ত রিপোর্টে মুন্সিগঞ্জের সাব-ডিভিশনাল অফিসার জানান যে, জগতবন্ধু দাস এর বোন সুশীলা দেবী যে তার বাড়ির দায়িত্বে ছিলেন, তিনি তার বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রয় করে দিয়েছেন।[৫৬]

শ্রীনগর থানার পাতাভোগ গ্রামের দেশত্যাগকারী ভদ্রলোক শ্রী গোপালচন্দ্র মুখার্জী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অভিযোগ জানায় যে তার বাড়ির গাছের ফল, পুকুরের মাছ চুরি হয়ে গিয়েছে এবং তার বাড়ির মন্দিরে মুসলমানরা প্রবেশ করে তা অপবিত্র করেছে।
তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের রিপোর্টে জানানো হয় যে, তার বাড়িতে কোন চুরির ঘটনা ঘটেনি। এমনকি খালি বাড়িতে বা মন্দিরে কোন মুসলমান লোক প্রবেশ করেনি। ভদ্রলোক চাইলে যে কোন সময় বাড়িতে ফিরে বসবাস করতে পারেন।[৫৭]

লৌহজং থানার বাড়ৈখালী গ্রামের দেশত্যাগকারী ভদ্রলোক যোগেশচন্দ্র দাস ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অভিযোগ করেন যে তার বাড়ির কেয়ারটেকার নিবারন চক্রবর্তী ও রসরাজ এর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ির অস্থাবর সম্পত্তি চুরি হয়েছে। তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী তদন্ত পরিচালিত হয়। তদন্তকালীন সময়ে সেখানে জমিদার অতুলচন্দ্র রায়, বাবু অখিলচন্দ্র সরকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বোর্ডের সদস্য বাবু হরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, রসরাজ সরকার এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান লোক উপস্থিত ছিলেন। রসরাজ জানান যে সেখানে কোন নিবারন চক্রবর্তী নেই তিনি একাই কেয়ারটেকার। তবে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। এ সময় এখানে সেখানে কিছু জিনিস চুরি হয়েছে। এ সংবাদ ইউনিয়ন বোর্ড জানতে পেরে ঐ বাড়ির অন্যান্য আসবাবপত্র চুরি হওয়ার আশংকায়

---

[৫২] ibid, Vol.10, File-B Jan `53, 160, page 508-509 GOEB
[৫৩] ibid, Vol. 10, File no. Jan `53, 618. page 578-579 GOEB
[৫৪] ibid, Vol. 10, File no. Jan `53/ 618. page 578-579, GOEB
[৫৫] ibid, Vol. 10, File no. Jan `53/ 908-1042 page 129, GOEB
[৫৬] ibid, Vol. 10, File no. Jan `53/ 908-1042.page 429, GOEB
[৫৭] ibid, Vol. 9, File no.January 53/ 546, GOEB

সেগুলো অকশনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সেখানে বিক্রয় হয় মোট ৬৩ টাকার জিনিস। এর থেকে ৫৫ টাকা ১৯৫১ সালের ৬ জুন মুন্সিগঞ্জ সাব ট্রেজারীতে জমা করা হয়।[৫৮]

যোগেশচন্দ্র দাসের পিটিশনের ভিত্তিতেই বাড়েখালি গ্রামের বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র দাস ও পবিত্র কুমার রায় এর বাড়িতে তদন্ত পরিচালিত হয়। সেখানে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি বলে তদন্তে উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে জানা যায়। বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র দাসের বাড়িতে রসিক সরকার নামে এক ব্যক্তি বাস করে। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা কোন অভিযোগ করেন নাই। জমিদার অতুলচন্দ্র রায়, বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র দাসের বাড়িতে কেয়ারটেকার দিতে বা বাড়ির আসবাবপত্রের দায়িত্ব নিতে তিনি এবং তার লোকজন এতে অস্বীকৃতি জানান। সে বাড়িতে কোন তালার ব্যবস্থা ছিল না বলে জিনিসপত্র চুরির ভয় ছিল। ফলে সংখ্যালঘু বোর্ড কমিটি সেগুলো অকশনে বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৩৬৯ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়। এর থেকে ৩১১ টাকা ১৯৫১ সালের ৮ জুন মুন্সিগঞ্জ সাব ট্রেজারিতে জমা করা হয়।[৫৯]

পবিত্র কুমার রায় এর বাড়িতে কোন জিনিস বিক্রয় করা হয় নাই। সেখানে সংখ্যালঘু বোর্ড কমিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডের অনুরোধে কালাচান্দ সরকার নামে এক ব্যক্তি কেয়ারটেকারের দায়িত্ব পালন করতে স্বীকৃতি জানান।[৬০]

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বাবু যোগেশচন্দ্র দাস বা উপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ যে কোন সময় ফিরে এসে তাদের বাড়িতে বাস করতে পারে।[৬১]

১৯৫১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা জেলায় সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করা ৩৪২ টি বাড়ির ৬২ টি বাড়ি অধিগ্রহণমুক্ত করা হয়। ১৫২ টি বাড়ি সরকারী অধিগ্রহণ আইনে অধিগ্রহণ করা হয় । ১৯৬ টি বাড়ি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া হয় যার বেশীরভাগই মুসলমান শরণার্থীদের বসবাসের জন্য।[৬২]

১৯৫১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় ভারত থেকে আগত মুসলমান শরণার্থীদের জন্য সরকারীভাবে অধিগ্রহণকৃত ৩৫ টি বাড়ি দেয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ২১৯ টি বাড়ি মুসলমান শরণার্থীদের জন্য সরকারীভাবে দেয়া হয়। ঢাকা সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ মহকুমার কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।[৬৩]

১৯৫১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত দুই দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাজ্য/ প্রাদেশিক সরকার কতগুলো বাড়ি সরকারীভাবে কতগুলো বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কতগুলো বাড়ি জবরদখল হয়েছে তার সঠিক তালিকা প্রকাশ করবে। তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটি মাসিক রিপোর্ট প্রদান করবে।[৬৪]

সরকারী তথ্য বিবরণীতে প্রকাশ করে যে, সরকার সম্পত্তি বেদখল সংক্রান্ত বিষয়ে ৬৯৯৩টি আবেদন পত্র পায়। তার মধ্যে ৩২১৩ টি বাতিল বলে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে ৬৭৩ টি দখলমুক্ত হয়। ৩১০৭ টি আবেদন স্থগিত রাখা হয়।[৬৫]

গোডাউন অধিগ্রহণ

নারায়ণগঞ্জ এর টানবাজারে অবস্থিত 'Swadeshi Salt Store' এর একটি গোডাউন সরকার অধিগ্রহণ করে জুট ফার্মের নিকট ভাড়া দিয়েছে বলে পিটিশন দাখিল করেন D.K.Bose. পিটিশনের একটি কপি জমা দেয়া হয়

---

৫৮ ibid, Vol. 9, File no. May 53/ 322-373, GOEB
৫৯ ibid,
৬০ ibid,
৬১ ibid, Vol. 9, File no. May 53/ 322-373 GOEB
৬২ ibid, Vol.18, File no. May 53/ 1044-1047, Page 30 GOEB
৬৩ ibid, Vol.18, File no. May 53/1044-1047, Page 30 GOEB
৬৪ ibid, Vol.18, File no. May 53/1044-1047, Page 4 GOEB
৬৫ ibid, Vol. 4, File no. May1952/53 Page275 GOEB

চট্টগ্রাম এর সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট। এটি একটি কাঁচা ঘর যা পাট রাখার জন্য অনুপোযোগী। পশ্চিমবাংলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি পূর্ববাংলা সরকারের নিকট ১৯৫০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে এ বিষয়টির তদন্তের জন্য অনুরোধ জানান।[৬৬] হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকারের ব্যাখ্যা করে মাইনোরিটি এ্যাফেয়ার্স থেকে বলা হয়,

> "As a matter of fact, the policy of the Govt. of East Bengal has always been to get properties restored to returning Hindu migrants and in pursuance of that policy settlement of Muslim refugees on vacant Hindu properties was discouraged."[৬৭]

এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমান শরণার্থীরা। একদিকে পূর্ববাংলা সরকারের নীতি অনুযায়ী তাদেরকে আশ্রয় লাভ করা বাড়িগুলো ছেড়ে দিতে হয়, অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা সরকারের নীতি অনুযায়ী হিন্দু শরণার্থীদের দ্বারা দখলকৃত বাড়ি থেকে হিন্দুদের সরানো সম্ভব হয়না।[৬৮]

ব্যাংক এর জায়গা দখল

ঢাকাস্থ `Bank of Commerce' (20 Netaji Subas Road, Calcutta-Head Office) এর পক্ষ থেকে একটি পিটিশন দাখিল করে অভিযোগ করা হয় যে, তাদের ৭৮/৪ লয়েল স্ট্রিট এর ব্যাংক সংলগ্ন লাখেরাজ জায়গা যা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৬২,০০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছে যেখানে একটি পাকা ঘর আছে, তা ১৯৪৮ সালে কিছু মুসলমান লোক দখল করে ব্যাংকের সাইনবোর্ড নামিয়ে দিয়ে সেখানে রেস্টুরেন্ট চালু করেছে। বাংলা ভাগ হওয়ার পর এই ব্যাংক কিছু অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং ব্যাংকের কর্মকর্তারা কলকাতা ও বিভিন্ন জায়গায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পিটিশনের একটি কপি ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনে জমা দেয়া হয় ফলে পূর্ববাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারির নিকট এ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের পক্ষ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ তারিখে প্রদত্ত চিঠিতে আবেদন জানানো হয়।[৬৯]

চাকুরী ক্ষেত্রে অবস্থান

সংখ্যালঘুদের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল যে,

> "অন্য কোন দিক দিয়ে অযোগ্য না হলে সরকার বিভিন্ন সরকারী চাকুরীতে যোগদানের জন্য দেশের সকল নাগরিকদের সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। সম্প্রদায় ও বর্ণের ভিত্তিতে কোন পার্থক্য নিরুপণ করা হয়নি। এতদ্বতীত সংখ্যালঘুদের উৎসাহ দানের জন্য সরকার তাদের ক্ষেত্রে বয়স সীমার ব্যাপারে (৩ বছর পর্যন্ত) বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছেন এবং বিভিন্ন সরকারী চাকুরির নিয়োগ বিধির ক্ষেত্রে অন্যান্য বাঁধাকেও শিথিল করেছেন। এমনকি অতীত ব্যবসা বানিজ্যেও ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা দেখানো বা বিশেষ আমদানী লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।--- "চাকুরীর বিচার বিভাগ ও সরকারী ক্ষেত্রে হিন্দুগণ যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ভোগ করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান, কলেজসমূহের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।"[৭০]

---

[৬৬] ibid, Vol. 10, File no. Jan `53/126-263, page 424-425 GOEB

[৬৭] ibid, Vol. 4, File no.May-1952/ 54, Page-294, GOEB

[৬৮] ibid, Vol. 4, File no. May 1952/ 54, Page-294, GOEB

[৬৯] ibid, Vol. 10, File no. Jan -53/ 949, page- 233-234, GOEB

[৭০] দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান দিবস সংখ্যা, ২৩ মার্চ ১৯৬৮

বিভিন্ন চাকুরীর ক্ষেত্রে অনেকে অভিযোগ করেন যে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ফলে তারা বিভিন্ন সময়ে অনিয়মের শিকার হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র গৌরীপদ ভট্টাচার্য জানান যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের বলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নেয়া হবেনা বলে জানার পর তিনি ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান।[৭১]

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মালি ছিলেন জনৈক পাম্পল ম্যাথ্যু। ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস থেকে ১৯৫০ সালের ৩ অক্টোবর পাম্পল ম্যাথ্যুকে চাকুরীতে পুনর্বহাল এর অনুরোধ জানানো হয় পূর্ববাংলা কর্তৃপক্ষের নিকট, অভিযোগ করা হয় যে সে সংখ্যালঘু বলে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর জবাবে কলেজের প্রিন্সিপাল জানান যে, পাম্পল ম্যাথ্যুকে চাকুরী ক্ষেত্রে অনিয়মের জন্য চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সংখ্যালঘু হিসেবে নয়। তার অবস্থান সম্পর্কে বলা হয় যে সে দুই মাস ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করলে কলেজে তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তাকে ছুটি দেয়া সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে তাকে অল্প কয়েকদিনের ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু জানা যায় পরের দিনই সে ঢাকা ত্যাগ করেছে। তার জায়গায় অন্য লোককে নিয়োগ দেয়া হয়। তাকে কাজে পুনর্বহাল করা হলেও সে তার কাজে অবহেলা করতে থাকে। তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে। কিছুদিন পর সে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তার গরু এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয় করে ঢাকা ত্যাগ করে। তার প্রতি কোন অবিচার করা হয়নি।[৭২]

ত্রিপুরা থেকে সুধীর রঞ্জন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট ১৯৫১ সালের ১৪ ডিসেম্বর এক চিঠিতে অভিযোগ করেন যে দিল্লী চুক্তির পর পূর্ববাংলা সরকারী প্রতিশ্রুতিতে সরকারী চাকুরীতে ৩০% হিন্দু সম্প্রদায় থেকে নিয়োগ প্রদান করার কথা থাকলেও সরকার সে প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। তিনি ঢাকার সরকারী অফিসগুলোতে তার অভিযোগের তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, "There are many departments where not to speak of 30 percent you may not find even 3 Hindu employees and there are also officer where you may not find 1 per cent Hindu."[৭৩]

তিনি তার চাকুরী না পাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে তিনি এক বৎসরে বিভিন্ন সরকারী চাকুরীর জন্য ১৭ টি ইন্টারভিউ দেন। তার কোন চাকুরি হয়নি। তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের একটি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে চাকুরী লাভে ব্যর্থ হন। তাকে জানানো হয়েছে যে নিয়োগ পরীক্ষায় সে রেজাল্ট ভাল করেন নি।[৭৪] তাই সে এ বিষয়ে ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট তদন্তের আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস থেকে অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, "--consider the desirability of issuing instruction of the various Government department and industrial and commercial concerns for ensuring adequate representation of the minorities in Government service and that of industrial firms in East Bengal."[৭৫]

এ অভিযোগের জবাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পূর্ববাংলা সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এক চিঠিতে জানায় যে সে সংখ্যালঘু হিসেবে চাকুরী পায়নি এ তথ্য সঠিক নয়, এ ব্যাংকে বিভিন্ন গ্রেডে অনেক সংখ্যালঘু চাকুরী করে এবং

---

[৭১] গৌরীপদ ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রাক্তন অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

[৭২] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 19, File no. May `53/1283-1313 page 80 GOEB

[৭৩] ibid, Vol. 19, File no.March `53/1160-1164 page 1 GOEB

[৭৪] ibid, Vol. 19, File no. March `53/1160-1164 page 1-5 GOEB

[৭৫] ibid, Vol. 19, File no. March `53/1160-1164 page 2 GOEB

সুধীর রঞ্জন নিয়োগ পরীক্ষায় অনেক কম নম্বর পেয়েছে। সে শ্রুতলিপিতে শুন্য, অংকে শুন্য এবং ইংরেজীতে ১০ নম্বর পেয়েছে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়।[৭৬]

১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা সরকার মন্ত্রী পরিষদের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যে কোন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে শুন্য পদের ৩০% এর জন্য সরাসরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকে নিয়োগ দেয়া হবে। প্রেসনোট প্রকাশ করে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।[৭৭]
১৯৪৯ সালের হিসাব অনুযায়ী পূর্ববাংলার পুলিশ বিভাগে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৬৯৮ জন এর মধ্যে গেজেটেড অফিসার ৯ জন, নন গেজেটেড ১৬৮৯ জন চাকুরী করে। এদের মধ্যে নিম্নবর্ণের ৩৬৮ জন অফিসার ছিলেন। এদের মধ্যে ঢাকা জেলায় ১ জন গেজেটেড, ১২৯ জন নন গেজেটেড এবং নিম্নবর্ণের ১ জন গেজেটেড এবং ৩৬৭ ২৭ জন নন গেজেটেড অফিসার ছিলেন।[৭৮]
১৯৪৯ সালের এক হিসাবে দেখানো হয় পূর্ববাংলায় বিভিন্ন বিভাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গেজেটেড অফিসার মোট ৯ জন, নন গেজেটেড ১৬৮৯ জন। সিডিউল কাস্ট এর গেজেটেড অফিসার ১ জন, নন গেজেটেড ৩৬৭ জন।[৭৯]

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ

জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন দ্বন্দ সংঘাত সৃষ্টি হয়, তারা পুনরায় সরকারী বা বেসরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা সমাধানে পৌঁছে। কোন বিদেশী সংস্থার কাছে তাদের অভিযোগ জানায়না। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরও স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা অধিকাংশই ভারতীয় র্কৃপক্ষের নিকট তাদের অভিযোগ জানিয়েছে। এ সকল অভিযোগের মধ্যে বিশীর ভাগ অভিযোগই এত সাধারন যে তা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই সমাধান করতে পারতেন। তাদের এসকল অভিযোগের কিছু বর্ণনা আলোচনা করা হল।
সাভার থানার সিমুলিয়া বাজারের নিশিকান্ত সরকার নামে একজন চা/পান বিক্রেতা ঢাকা জেলা প্রশাসক ও ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট অভিযোগ করে যে, তার দোকানে এসে জগদীস রায় নামে একজন ছোট ছেলে ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের জন্য পান চাইলে তিনি টাকা ছাড়া তা দিতে অস্বীকার করলে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে কিছু লোক এসে তাকে গুরুতরভাবে অপমানিত করে।[৮০] তিনি ঢাকাস্থ ভারতীয় দুতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, "প্রার্থনা, দুর্দান্ত প্রকৃতির মুসলমানদের অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে নিরীহ হিন্দু রক্ষা করে বিচার করতে আজ্ঞা হয়।"[৮১]
এর তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে ডেপুটি হাই কমিশনার পক্ষ থেকে পূর্ববাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারির নিকট ১৯৫০ সালের ১০ নভেম্বর এক চিঠি দেয়া হয়।[৮২]

জ্ঞানেন্দ্র চদ্র ভট্টাচার্য এম.এল.এ জানান মুন্সিগঞ্জে ইছাপুর গ্রামে হিন্দু মালিকানার দোকানে আগুন দেয়া হয়। ইছাপুর গ্রামে একজন হিন্দু ভদ্রলোক প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলে তার বাগানের আম বিক্রয় করে দেয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান।[৮৩]

---

[৭৬] ibid, Vol.19, File no. March `53/1160-1164 page 5 GOEB
[৭৭] ibid, Vol 27, File no. B Mar- 1949 178 GOEB
[৭৮] ibid, Vol.80, File no. 1949/39-27 GOEB
[৭৯] ibid, Vol.80, File no. 1949/39-27 GOEB
[৮০] ibid, Vol. 9, page-612-615. GOEB
[৮১] ibid, Vol. 9, page-612-615. GOEB
[৮২] ibid, Vol. 10, File no. Jan`53/ 183 page 42 45, GOEB
[৮৩] ibid, Vol.10, File Jan, 53/142, page 551, GOEB

সিরাজদিঘা থানার তাজপুর গ্রামে নবদ্বীপ দাস নামে এক হিন্দু ছেলে তার নিজের ‘Betel” field এ আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক মাসের মধ্যে জামিন নিতে পারবেনা।[৮৪] সে ঐ গ্রামে ভারত দাস, বিপিন দাস এর ‘Betel” field এও আগুন দেয়।[৮৫]
ঢাকা জেলার বিভিন্ন গ্রামে ৪টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

কালিয়াকৈর থানার একটি গ্রামে মুসলমান শরনার্থীরা জোরপূর্বক চণ্ডীমণ্ডপ দখল করে নেয়। সেখানে এক মহিলা বাচ্চা প্রসব করেন।[৮৬]

নরোত্তমপুর ইউনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকগণ মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান এর নিকট অভিযোগ দাখিল করে দরখাস্ত দাখিল করে, “আমরা সামন্ত হিন্দুরা ইউনিয়নের সভ্য মুসলমান কর্ম্মীদের সাহায্যে এই যাবত সুখী ও সাহসে আছি। কিন্তু গত ২২/২/৫০ তারিখ সোমবার দিবাগত রাত্রে ফলাহারি জয়দাস বৈষ্ণবের বাড়িতে অমানসিক খুন ও ডাকাইতে একেবারে ভীত।”[৮৭] কিছু লোকের নাম উল্লেখ করে বলা হয়, “হকু মিয়া ও মুসা মিয়া কে গ্রেফতার না করিলে আমরা কেহ্ প্রমান দিতে পারিব না।”[৮৮]

মালচর গ্রাম থেকে শ্রী গুরুপদ কর্মকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন এর নিকট এক পত্রে জানায় যে, নবাবগঞ্জ থানার চুড়াইন ইউনিয়নে তার গ্রামের বাড়িতে তিনখানা টিনের ঘর আছে। ভারতীয় ইউনিয়নে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে বলে সে সেখানেই থাকে এবং মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে আসে। গ্রামের বাড়িতে এসে জানতে পারে যে তার বাড়ি লুট হয়েছে এবং তার ঘরের জানালা দরজা ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। তিনি ডেপুটি হাই কমিশনারের নিকট অনুরোধ করেন, “আপনি গ্রামে আসিয়া এই সমস্ত ঘটনাগুলি নিজে দেখিয়া যাহাতে গ্রামে নিরাপদে বসবাস করিতে পারি তার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।”[৮৯]

কলকাতা থেকে সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য তার এক দরখাস্তে জানান যে, তার পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কলকাতার প্রকাশনা ব্যবসা। সে ব্যবসা ২০ বৎসর ধরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তার পরিবারের সদস্যরা পূর্ব থেকেই কলকাতায় বসবাস করে। তাদের পৈত্রিক বাড়ি টঙ্গীবাড়ি থানার স্বর্ণগ্রামে। সরকারী অফিসাররা তাদের অস্থাবর জিনিসপত্র অকশনে বিক্রয় করে দেয় ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে।[৯০]

কলকাতার শোভাবাজার থেকে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১৯৫০ সালের ২০ মার্চ চিঠি লিখেন মুন্সিগঞ্জের ভাগ্যকূল এর বিখ্যাত রায় পরিবারের সদস্য। তিনি জানান যে, বিভিন্ন পার্বনের সময় বিশেষ করে দূর্গাপুজার সময় পরিবারের সদস্যরা ভাগ্যকূলে যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও বিপদের আশংকায় আর যাওয়া সম্ভব হয়না এবং যারা গিয়েছিলেন তারা কলকাতায় ফিরেছেন। তিনি জানান যে, কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা তাদের বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং পরিবারের সদস্যদের বিনা অনুমতিতে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ছবি তোলে। এতে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।[৯১] কথিত আছে যে ভাগ্যকূলের রায় পরিবার দেশত্যাগ করার সময় তারা কয়েকটি লঞ্চ ভর্তি করে তাদের বাড়ির আসবাবপত্র কলকাতায় নিয়ে গিয়েছে।

---

[৮৪] ibid, Vol.10, File no. Jan, 53/142. page 551, GOEB
[৮৫] ibid, Vol.10, File no. Jan-53/142. page 550, GOEB
[৮৬] ibid, Vol.10, File no. Jan 53/142. page 550, GOEB
[৮৭] ibid, Vol.10, File no. Jan 53/ 354-482, page 210-212, GOEB
[৮৮] ibid, Vol.10, Fileno. Jan 53/ 354-482, page 210- 212, GOEB
[৮৯] ibid, Vol.9, File no. Dec 52/ page 204, GOEB
[৯০] ibid, Vol.10, File no. Jan 53/425, page 36, GOEB
[৯১] নাম অস্পষ্ট, ibid, Vol.10, File no. Jan 53/441 GOEB

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ সম্পর্কে ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় তাদের জমি বিলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলধা স্টেটের খাজাঞ্চী শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানকে ১৯৫০ সালের ১৬ মে এক চিঠিতে জানান যে, সে চাকুরী সূত্রে তার পরিবারসহ ঢাকার ওয়ারীতে বসবাস করছেন। কিন্তু তিনি গোমস্তার কাছে জানতে পারেন যে, তিনি সপরিবারে দেশত্যাগ করায় তার বাড়ি ঘর ও বিষয় সম্পত্তি মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি জানান যে তাদের দেশত্যাগের খবর ভিত্তিহীন।[৯২]

দেওভোগ গ্রামের রাধা গোবিন্দ ঘোষ জানায় যে দেওভোগ গ্রামের রমেশ চন্দ্র ঘোষ কলকাতায় মারা গিয়েছেন, কিন্তু তদন্তে প্রমান হয় যে রমেশ চন্দ্র ঘোষ কলকাতায় নাটাগঞ্জ এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। কলকাতায় তার একটি জুয়েলারী দোকান আছে। তার ভাই কালা চাঁদ ঘোষ কলকাতায় বসবাস করে।[৯৩]
ভারতীয় টাটা স্টীল কোম্পানীর একজন কর্মচারী এস.এন দত্ত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের নিকট ১৯৫০ সালের ১০ মে এক দরখাস্তে জানান যে সে তার পরিবার সহ ভারতের জামসেদপুরে অবস্থান করছেন তাই তার সম্পত্তি অরক্ষিত। তার সম্পত্তির দায়িত্ব ডেপুটি হাই কমিশনের হাতে নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে লিখেন, "I shall be pleased if you will kindly direct the custodian in Dacca on my behalf to take charge of the properties mentioned above and do the needful."[৯৪]

জয়দেবপুরের টঙ্গী থানার দত্তপাড়া গ্রামের কয়েকজন হিন্দু বাস্তুত্যাগী সংখ্যালঘু মন্ত্রীর নিকট ১৯৫০ সালের ২৮ জুন এক দরখাস্তে তাদের গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থা ব্যাখ্যা করে জানায় যে, তারা দাঙ্গার সময় তাদের বাড়ি ঘর লুট হয় সে সময় তারা পশ্চিমবাংলায় চলে গিয়েছিল, দিল্লী চুক্তির পর ফিরে আসে। কিন্তু দাঙ্গাকারীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে দরখাস্তকারীরা পুনরায় ভারতে ফিরে যান। একজন স্থানীয় থানায় এজাহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে নীল মিয়া নামে একজন আনসার সদস্য তাকে ভয় দেখায় এবং থানায় অভিযোগ করতে নিষেধ করে এবং হত্যা করার হুমকি দেয়। তারা তাদের দরখাস্তে কয়েকজন দাঙ্গাকারীর নাম উল্লেখ করেন।[৯৫]
সদ্য স্বাধীন দেশে একটি বড় সমস্যা তৈরী হয় মর্যাদার প্রশ্নে, নতুন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুসলমানদের সঙ্গে পূর্বের ক্ষমতাশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের। গৌরাঙ্গ দে চৌধুরী বলেন,

> "সকলেই যে দাঙ্গার মধ্যে এসেছেন তা কিন্তু নয় আমরা তো riot affected নয় [নই]। আমরা বুঝেছি এখানে আর থাকা যাবেনা। ওখানে নিরাপত্তার দারুন অভাব এটিই সকলে অনুমান করে এপারে চলে এসেছে। -----আগে মুসলমানরা এসে ঘরে ঢুকতো না। ওদের জন্য আলাদা জলচৌকী ছিল। আমরাও একদিন হয়তো ওদের প্রতি injustice করেছি। তখন তারাও রাস্তায় বেরুলে আমাদের দেখে জামার কলারটা টেনে আমাদের প্রতি ভ্রুকুটি করতো। অনেকে এসে আবার ঘরে ঢুকে সোজা চেয়ারেই বসে যেত।"[৯৬]

ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানায় হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি, জোরপূর্বক বাড়ি দখল সহ বিভিন্ন অভিযোগ করা হয় পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে। তদন্তে প্রমানিত হয় যে, মোট ২০ টি অভিযোগের মধ্যে ৮ টি মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১টি গ্রামে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে যে নামে কোন গ্রাম নেই। কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ

---

[৯২] ibid, Vol.10, File no. Jan 53, page 76, GOEB
[৯৩] ibid, Vol.9, File no. Dec 52, page 913, GOEB
[৯৪] ibid, Vol.10, File no. Jan 53, 402, page 87, GOEB
[৯৫] ibid, Vol.10, File no. Jan- 53, 414 page 57, GOEB
[৯৬] গৌরাঙ্গ দে চৌধুরি, জবরদখলের স্মৃতি: তিনটি সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক, ৯ বর্ষ, ১/২ পৃষ্ঠা ১১১

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। এ সকল বাড়ির লোকেরা ৩/৪ বৎসর পূর্বেই ভারতে চলে গিয়েছে। কিছুক্ষেত্রে কয়েকজন ব্যক্তির ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে তবে তদন্তে এই নামের কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।[৯৭]
ঢাকা জেলায় গরাসিয়া নামে একটি গ্রামে ডাকাতি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু এ নামে ঢাকায় কোন গ্রাম নেই।[৯৮]
লৌহজং থানার খিদিরপুরের একজন মহিলার বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ করা হলে তদন্তে জানা যায় ঐ মহিলা ১৯৪৮ সালে তার বাড়ির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সহ দেশত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।[৯৯]
কয়েকটি গ্রামে ডাকতির অভিযোগ করা হলেও তদন্তে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।[১০০]

বন্দুক সীজ সংক্রান্ত অভিযোগ

অভিযোগ করা হয় যে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বন্দুক সীজ করা হয়েছে। পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারের বন্দুক সীজ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন জানান যে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়া হয়নি। আনসার বাহিনীর পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডদের জন্য বন্দুকের প্রয়োজন হওয়ায় সরকার বন্দুক সংগ্রহ করে বন্দুকগুলির অধিকাংশ আনসার ও ন্যাশনাল গার্ডদের মধ্যে বিতরণ করে এবং বাকীগুলো বিক্রয় করে দেয়। তিনি বন্দুক সংগ্রহের আরও একটি কারণ ছিল বলে জানান যে, হায়দরাবাদের আত্মসমর্পণের পর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ করবে, সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার বন্দুক সংগ্রহ করে।[১০১]

ধর্মান্তর

ভারতীয় হাই কমিশনার পূর্ববাংলা কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৫০ সালের ২ মে এক চিঠিতে অভিযোগ জানান যে, ফেব্রুয়ারি মাসের দাঙ্গার সময় রমনা রেলওয়ে কোয়ার্টারে চারজন হিন্দু লোককে জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে পূর্ববাংলা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, যে চারজনের কথা বলা হয়েছে তাদের তিনজন হিন্দু হিসেবেই কোয়ার্টারে বাস করছে এবং একজন ভারতে চলে গিয়েছেন। দাঙ্গার সময় তারা মুসলমান কর্মচারীদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[১০২]
ধর্মীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দিল্লী চুক্তিতে বলা হয়, জোর করে কাউকে ধর্মান্তর করা যাবে না এ ব্যাপারে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।[১০৩]

সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৯৫০-১৯৫১ সালে পূর্ববাংলায় প্রায় ৮৮ জন হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৩ জন ঢাকা জেলার।[১০৪]

---

[৯৭] Home, Political (C.R), B Proceedings. Vol. 19, File no. June- 52/ 150-154 GOEB
[৯৮] ibid, Vol. 19, File no. June 52/ 307 GOEB
[৯৯] ibid, Vol. 19, File no. June 52/ 307 GOEB
[১০০] ibid, Vol. 19, File- June, 52/ 307 GOEB
[১০১] নূরুল আমিন, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ২৩ মার্চ ১৯৪৯, Political (Home) Record. Vol 3, File no. Dec 1949/ 16-17 GOEB
[১০২] Home, Political (C.R), B Proceedings. vol.15, File No. March `53/2195-2236, page 37, GOEB
[১০৩] Agreement between the Government of India and Government of Pakistan dated the 8th April 1950, ibid, Vol.1, Page 2 GOEB
[১০৪] ibid, Vol. 8, File no. Dec1952/ 818-819 GOEB

Dhaka University Institutional Repository

মন্দির

জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য এম.এল.এ জানান, মুন্সিগঞ্জ এর সিরাজদিঘা থানার ইছাপুর গ্রামে বাবু কিশোরী গোস্বামীর পারিবারিক মূর্তী ১৯৫০ সালের ১৬ মে হারিয়ে যায়। এই গ্রামের ঠাকুর বাড়ি থেকে পাথরের কালী মূর্তী চুরি হয় ৩০ মে।[১০৫]
বৈদ্যেরবাজার এর বরাদী গ্রাম থেকে 'বুড়োশিব', 'কালাচাদঁ', 'কাদেরেশ্বর', 'রামেশ্বর', অম্বিকা', 'লক্ষিনারায়ণ', 'শ্রীধর নারায়ণ', 'মহাপ্রভূ', 'শ্মশান কালী', 'দয়াময়ী কালী', মন্দির থেকে 'Sacred pots', 'Silver sowrd' চুরি হয়। 'দয়াময়ী কালী' মন্দিরের দরজা জানালা ভেঙ্গে নিয়ে যায়।[১০৬]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় লালবাগের ছিন্নমস্ত কালীবাড়ি মন্দির একজর পীর কর্তৃক বেদখল হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। এ মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন প্রভাত চক্রবর্তী। তিনি ভারতে চলে যাওয়ার পর কেউ এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করায় এটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫০ সাল থেকে এর কোন রক্ষা কমিটিও ছিল না। কালীদাস পাল ও রাধাশ্যাম পাল এ মন্দির সংলগ্ন জায়গার মালিকানা দাবী করে কোর্টে মামলা করলে কোর্ট তা নাকচ করে দেয়। জেলা কানুনগো এ মন্দিরের ম্যাপ ও এর সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে। এর সংলগ্ন ষোল কাঠা ও দশ কাঠা জায়গা সরকারী খাস জমি, ফলে জায়গার মালিকানা সরকারের। সরকারী পর্যায়ের মন্ত্রীরা এই জায়গা ঐ পীর সাহেবকে দান করে। এর ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে একজন সাধুর আশ্রয়ের জন্য দুই কাঠা জমির ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ দুই কাঠা জমি মন্দিরের সুতরাং মন্দিরের কোন জায়গা দখল হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয় তা সঠিক নয়।[১০৭]

East Bengal Temple Welfare Organization এর ১৯৫১ সালের ৬ মে এক মিটিংয়ে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের সম্মানিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় মন্দির ও আশ্রমগুলোর সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। এ সভায় ভারতীয় প্রেস এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে কমিটির সদস্যগণ মন্দির ও আশ্রম পরিদর্শন করেন। সভায় তাদের পরিদর্শনের রিপোর্ট পেশ করেন।[১০৮] এতে ঢাকা নারায়নগঞ্জের প্রায় একশ জন লোক উপস্থিত থাকে। কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এস.পি সর্বাধিকারী সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় আর.কে মিশন আশ্রম, বিহারীলালজি মন্দির, রমনা কালী বাড়ি, জয়কালী মন্দির, আনন্দময়ী আশ্রম, পাগলা শিব মন্দির, ঢাকা হরি সভা, জগৎবন্ধু আশ্রম, নারায়ণগঞ্জের লক্ষীনারায়ণ মন্দির, কালী বাড়ি ইত্যাদি মন্দির ও আশ্রমের সেবায়েত ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় মন্দির ও আশ্রম সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়।[১০৯]

ঢাকার মেয়েদের 'আনন্দ আশ্রম' নামে আশ্রমটি ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি দাঙ্গার সময় কলকাতায় সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু এর অস্থাবর জিনিসপত্র সবই সেখানে ছিল। এর সেক্রেটারি ছিলেন সিস্টার চারুশীলা দেবী। অভিযোগ করা হয় যে, 'কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজ' কর্তৃপক্ষ জোর করে আশ্রমে প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তীতে বিক্রয় বাবদ এক লক্ষ টাকার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা চুক্তি করার সময় দেয়া হলেও পরবর্তীতে আর কোন টাকা দেয়া হয়নি। চারুশীলা দেবী এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী, পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রীর

---

[১০৫] ibid, Vol.10, File no. Jan 53/142, page 552, GOEB
[১০৬] ibid, Vol.10, File noJan/53,142, page 552, GOEB
[১০৭] Report by Supdt. of Police, Dacca, ibid, Vol.47, File No. Oct1965/12, Page 9-16 GOEB
[১০৮] ibid, Vol.14, File no March 1953/1506-1509, Page 9 GOEB
[১০৯] ibid, Vol.14, File no. March- `53/1506-1509, Page 4 GOEB

Dhaka University Institutional Repository

নিকট আবেদন জানান। পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী, পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রীর নিকট এর তদন্ত করে সুষ্ঠু সমাধানের অনুরোধ জানান।[১১০] এর জবাবে পূর্ববাংলা কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক চিঠিতে জানায়,

> "It also appears that the allegation of forcible occupation of Asram premises are not true. Before sister Charusila Devi left Dacca she made over charge of the property to Mr.S.Rhamatullah, the President of the college committee and the District Masistrate, Dacca."--- It appears that the execution of a deed of sale in respect of the premises in question is being delayed by the Ashram authorities."[১১১]

সারণী ৭.৩

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অভিযোগগুলোর অবস্থান	
True	- ------ 17
Exaggerated	--- 4
False	----27
Under further Corespondence	------- 2
Pending	-------29
Total	79

সূত্রঃ Proceedings of the 25th Chif Secretaries conference, 1952
Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.7, File- Oct.52, page 5, GOEB

১৯৫২ সালের ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় দুই দেশের চীফ সেক্রেটারি সম্মেলন, সেখানে পূর্ববাংলার মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জানানো হয় যে, মোট ৮৭ টি অভিযোগ এর মধ্যে ৮টি খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর অন্যগুলোর তালিকা দেয়া হয়।
ঢাকা জেলায় মোট ১,৩৪৯ টি মন্দির রয়েছে। প্রতি ৫৬০ জন হিন্দুর জন্য একটি মন্দির এবং প্রতি ৮১৫ জন মুসলমানের জন্য একটি মসজিদ রয়েছে।[১১২]

নারী অপহরণ

ঢাকার জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য এম.এল.এ জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান এর বরাবরে কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দেন। মুন্সিগঞ্জ এর সিরাজদিঘা থানার তাজপুর গ্রামের অচিন্ত ঘোস এর বিধবা মেয়েকে আন্জু নামে এক লোক এক আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার সময় ২০০ টাকায় বিক্রয় করে দেয়। নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে উদ্ধার করা হয়।[১১৩]

ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, নারায়ণগঞ্জে উকিল প্রভূদাস এর কন্যা সুশীলা তার বাবার চাকর ইব্রাহীম এর দ্বারা অপহৃত হয়। এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[১১৪]

---

১১০ ibid, Vol.19, File no. May -53/ 1180-1282, page 24 GOEB
১১১ ibid, Vol. 19, File no. May 53/ 1180 page 25-26 GOEB
১১২ Bangladesh Population Census 1981, National Series, Dhaka, 1983, page xli, GOB
১১৩ Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.10, File no. Jan 53/142, page 552 GOEB
১১৪ ibid, Vol. 19, File no. Mar 53/ 312- 318 GOEB

Dhaka University Institutional Repository

তদন্তের পর ঢাকা জেলা প্রশাসক জানায় যে, ইব্রাহীম নারায়ণগঞ্জে একজন মোটর মেকানিক। তার সাথে সুশীলার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে ইব্রাহীম এর সাথে নারায়ণগঞ্জে চলে আসে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে তার বাবার দায়িত্বে ফিরিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে আর তাকে পাওয়া যায়নি।[১১৫]

একজন বাস্তুত্যাগী অভিযোগ করেন যে, মানিকগঞ্জের ঘিওর থানা এলাকায় বাঙ্গালা গ্রামে জয়ন্তবালা নামে একজন মহিলা অপহৃত হয়েছে। কিন্তু ঐ গ্রামের জয়ন্তবালার প্রতিবেশী তারকবন্ধু সেন, শ্রী শশীভূষণ সেন, ডাঃ বটুলাল সেন, শ্রী মাধবচন্দ্র সেন, প্রমূখ বিবৃতি প্রদান করে বলেন যে, অমৃতলাল সেন ও তার স্ত্রী জয়ন্তবালা তাদেরই শরীক ও একই বাড়ির লোক। অমৃতলাল সেন তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ প্রায় তিন বৎসর আগে ভারতে চলে গিয়েছে। এ ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অমূলক। এই গ্রামে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে নাই।[১১৬]
একটি বালিকা অপহরণের ঘটনার তদন্তে বোর্ড জানতে পারে যে, বালিকাটি জেল হাজতে আছে আর তার স্বামী পশ্চিমবাংলায় অবস্থান করছে।[১১৭]

১৯৫০ সালের ৮ ও ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় অপহৃতা নারী অনুসন্ধান ব্যুরোর চতুর্থ অধিবেশন। এতে সভাপতিত্ব করেন রিলিফ কমিশনার এন.এম. খাজা। পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে করা নারী অপহরণ ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে বোর্ড মোট ১৩টি নারী হরণ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে। বোর্ডের চূড়ান্ত তদন্তে ৪টি ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমানিত হয়, আরও ৮টি ঘটনা যে সকল সংবাদের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয়েছে তাতে অভিযোগগুলো সত্য প্রমানিত হয় নাই। তবে এ সকল ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রেরণের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫১ সালে ৫৫টি নারী নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়, এর মধ্যে ১টি ঢাকা জেলার। সরকারী তদন্তে তা মিথ্যা অভিযোগ বলে প্রমানিত হয়।[১১৮]
পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫১ সালে ৫৫টি নারী নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়, এর মধ্যে ১টি ঢাকা জেলার। সরকারী তদন্তে তা মিথ্যা অভিযোগ বলে প্রমাণিত হয়।[১১৯]

১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাস্তুত্যাগী মালিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্ববান করা হবে। শুধুমাত্র পণ্য দ্রব্যাদির সম্পর্কে কোন তৃতীয় পক্ষের দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হবে। কেবলমাত্র গুদামের ভাড়া, কোন আদালতের রায় এবং ব্যাংকের নিকট কোন মাল বন্ধক থাকলে ঐ সম্পর্কে নতুন দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হবে না। ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩ মাসের মধ্যে বাস্তুত্যাগী সম্পত্তির স্থানীয় জিম্মাদারের নিকট এই ধরনের দাবী পেশ করতে হবে। লকার ও সেফ ডিপোজিট স্থানান্তর ও ব্যাংকে রক্ষিত শেয়ার সিকিউরিটি ও ইন্সুরেন্স পলিসি খালাস সম্পর্কে এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে না।[১২০]

ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, বাড়ি লুট, অস্থাবর সম্পত্তি লুট সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ এর তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়, এবং সেগুলো তদন্তাধীন রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।[১২১] অধিকাংশ অভিযোগ করা হয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এবং তাদের সমস্যার সমাধান করার অনুরোধ করেছেন। ভারতীয় ও পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্তৃপক্ষ, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন সবসময়ই তৎপর ছিল এসকল অভিযোগের তদন্তের জন্য পূর্ববাংলা সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। অধিকাংশ লোকই

---

[১১৫] ibid, Vol. 19, File no. Mar- 53/ 312-318 page 24. GOEB
[১১৬] দৈনিক আজাদ, ১০ জুন ১৯৫০
[১১৭] ঐ, ১১ জুলাই ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৫
[১১৮] ibid, Vol.52, File no. Sep-55/ 286-400 GOEB
[১১৯] ibid, Vol.52, File no. Sep-55/ 286-400 GOEB
[১২০] পাকিস্তানি খবর, ২য় বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৩
[১২১] Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.10, File no.Jan 53/354-482, page-134- 553 GOEB

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বর্তমান ঠিকানা হিসেবে ভারতীয় ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। অভিযোগকারীদের অধিকাংশ অভিযোগের তদন্ত হয়েছে, বেশীর ভাগই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং কিছু ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে সরকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়। পূর্ববাংলার কিছু কিছু সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তহীনতা তৈরী করে। যা তাদেরকে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ উচ্চবর্ণের (যাদের আশ্রয়ে তারা ছিল) বড় অংশ দেশত্যাগ করেছে। সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক হিন্দু বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চমহলের নির্দেশে তদন্ত করে তার সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার কখনো কখনো অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। এ অভিযোগগুলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে বিভিন্ন সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কারণগুলো কিছু লোকের দেশত্যাগের পেছনে ভূমিকা পালন করেছে।

পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষার বিষয়ে ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি আরও তৎপর ছিল ভারতীয় প্রচারমাধ্যম। বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, তাদের কার্যক্রম এবং সরকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও পূর্ববাংলায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হত। অনেক সময় বিভিন্ন ঘটনার অতিরঞ্জিত খবরও প্রচারিত হত। যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে অনেক সময় আতংকের সৃষ্টি করতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের পেছনে প্রচার মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

অষ্টম অধ্যায়
প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা ও হিন্দুদের দেশত্যাগ

একটি দেশের জনসাধারণের মানসিকতার গঠনে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পত্র, পত্রিকা, রেডিও, টিভি, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি প্রচার মাধ্যম দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। কোন ঘটনার সত্য মিথ্যা প্রচারণা করে, উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রচার করে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তা আরও ভয়াবহ করে তুলতে প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
দাঙ্গার সময় দাঙ্গার ঘটনার বিস্তারে বেশী কাজ করেছে প্রচার পত্র। এরকম ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়কার একটি ঘটনার প্রচারণার প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে তপন রায় চৌধুরী বলেন,

> "একজন কোথা থেকে একটা চোথা খবরের কাগজ নিয়ে এল যার নাম আগে বিশেষ শুনিনি। লোমহর্ষক সব কাহিনিতে ভরা এই কাগজটির বিক্রি নাকি তিন দিনে বেশ কয়েক হাজার দাঁড়িয়েছিল এবং তার অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী সম্পাদকটি শুনেছি সমস্ত কাগজখানা নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসে লিখতেন। বাইরে বের হওয়া তখন নিরাপদ ছিল না।------ এখন এই বিরল প্রতিভাটি সম্পূর্ণ নিজের মস্তিস্ক থেকে কলকাতার কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ওই বজ্জাতের মনোভূমি কলকাতার রাস্তার দাঙ্গার জন্মস্থান হিসাবে সত্যের আকর হয়ে উঠল।"[১]

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে দুই দেশের শান্তি রক্ষার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এখানে প্রচার মাধ্যমে যে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হয় তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসের সহযোগীতা কামনা করা হয়। চুক্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়,

> "The Governments of the two Dominions recognised that the whole-hearted co-operation of the press is essential for creating a better atmosphere and, therefore, agreed that every effort should be made in consultation with the representative of the Press, where-ever possible, to ensure that the Press in each dominion dose not –
> (a) indulge in propaganda against the other dominion.
> (b) publish exaggerated versions of news of a character likely to inflame or cause fear or alarm to the population or a section of the population in either dominion,
> (c) publish material likely to be construed as advocating a declaration of war by one Dominion against the other Dominion or suggesting the inevitability of war between the two Dominions."[২]

চুক্তিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সংবাদ বা অভিমত যাতে কোন সংবাদপত্র, রেডিও, ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের মারফত প্রচারিত না হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩] পরবর্তীতে বিভিন্ন সম্মেলনে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু আপত্তিজনক সংবাদ সম্পর্কে পাকিস্তান ও পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

---
[১] তপন রায় চৌধুরী, বাঙাল নামা, পৃষ্ঠা ১৫২
[২] Note on the attitude of the Indian Press viewed in the light of the Calcutta Inter-Dominion Agreement of April, 1948, Home, Political(C.R) B Proceedings, Vol.1, File no. March 50/ 72, GOEB
[৩] দৈনিক আজাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পরবর্তী এক বৎসরে ১০ টি পত্রিকার ১৫৫ টি পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণামূলক লেখার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে এর একটি তালিকা করাচি সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়।[৪]

করাচিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সরকার এক প্রেসনোট জারী করে। পত্রিকায় প্রপাগান্ডা প্রচারের ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেজন্য সম্মেলনে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে প্রেসনোট প্রকাশ করে সিদ্ধান্তগুলো প্রচার করা হয়।[৫]

Lambert বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ করে সরকার বিরোধি দুটি ইংরেজী পত্রিকা `Hindustan Standard', 'Amrita Bazar Patrika' এর নেতিবাচক প্রচারণার উল্লেখ করেন, পূর্ববাংলায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার উত্তেজনাকর বর্ণনা তুলে ধরে যা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তিনি বলেন,

> "The clearest way of depicting the gathering storm in Bengal examine the Calcutta press from about mid November 1949. Pakistan press was no less prone to rumor or vituperation, the force of the storm was storing up in Calcutta."[৬]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্বে পূর্ববাংলায় তেমন বড় কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটে নাই আর দুই বঙ্গের সরকার চেষ্টা করছিলেন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে, সে সময় কিছু ব্যক্তির ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রী উপেন্দ্রকিশোর সরকার বলেন,

> "ইত্যকার অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতার বুকের উপর বসিয়া একশ্রেণীর অতি লোভী ও অবিবেচক লোক কি করিয়া যে সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন দ্বারা দৈনন্দিন প্রচারকার্য চালাইয়া উভয় গভর্নমেন্টের নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের বিভ্রান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাস্তত্যাগের জন্য এরূপভাবে প্রোরোচিত করিতে পারিতেছেন তাহা সহজে বোধগম্য হয়না বলিয়া বড়ই চিন্তাকূল হইয়া উঠিতে হয়।"[৭]

প্রপাগান্ডার নেতিবাচক ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এবং কিছু অসাধু লোক যে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এই ধরনের প্রচারণা চালাতে পারে। এই সকল প্রচারণা জনগণের মধ্যে আতংক তৈরী করে এবং এই প্রচারণার ভয়াবহ পরিণতি ১৯৫০ সালের দাঙ্গা। এ সকল দিক বিবেচনা করে ১৯৫০ সালের ৪ মে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃডোমিনিয়ন সাংবাদিক সম্মেলন। দুই দেশের প্রায় সত্তরজন সংবাদপত্র সম্পাদক অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতায় বলেন, "দুই দেশের সংখ্যালঘুদের মন হতে আতংক দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা আর্তনাদের প্রধান কর্তব্য।[৮]
এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশে দিল্লী চুক্তি কার্যকরী করার বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করা। সম্মেলনে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কিছু পত্রিকা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে লিফলেট, পেম্পলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রচার করে পূর্ববাংলাকে হিন্দুদের বসবাসের

---

৪ Note on the attitude of the Indian Press viewed in the light of the Calcutta Inter-Dominion Agreement of April, 1948, Home, Political(C.R) B Proceedings, Vol.1, File no. March 50/ 72, Page 28-32 GOEB

৫ Press note, Government of Pakistan, Ministry of Interior, Information & Broadcasting Division, Home, Political (CR), B Proceedings, Vol. 53, File no. 12p-8/ 49, GOEB

৬ Richard D. Lambert, RELIGION, ECONOMICS, AND VIOLENCE IN BENGAL Background of the Minorities Agreement, page 315

৭ দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ১, কলাম ৩,৪

৮ ঐ, ৪ মে ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

অনুপোযোগী একটি দেশ হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালায়। এই প্রচারণার একটি ভয়ংকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ১৯৫০ সালে ও ১৯৬৪ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং পূর্ববাংলার কিছু কিছু জায়গায় সংঘটিত দাঙ্গার ঘটনায়।[৯] দাঙ্গার সময় উভয় পক্ষের কাগজ পড়লে একেবারে ভিন্ন রকম চিত্র পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার ব্যাপারে পত্রপত্রিকার ভূমিকা যারা লাঠি হাতে নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করছে তাদের চেয়েও অনেকগুণ বেশী।[১০]

১৯৫০ সালের দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছিল সে সময় ভারতীয় পত্র পত্রিকায় মিথ্যা প্রচারণার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলছিল যা ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকালীন সময় থেকেই চলছিল। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা নিয়ে যেভাবে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করা হত, তা সাম্প্রতিককালের সঙ্ঘ পরিবারের ভাষার চেয়ে খুব কিছু আলাদা নয় নয়।[১১] কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় যেভাবে মুসলমানদের রাজনীতি নিয়ে বিদ্রূপ করত, তাতে মুসলমানদের ক্ষিপ্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য ছিল না।[১২] এরকম একটি পত্রিকা সম্বন্ধে শেরে বাংলা ফজলুল হক একবার বলেছিলেন, "সকালে উড়িয়া এই কাগজখান পড়লে আমারও ইচ্ছা করে হিন্দুগো মুন্ডু চিবাইতে।"[১৩] পত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে তপন রায় চৌধুরী একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন "একবার এই পত্রিকার পুজা সংখ্যায় 'ছহি হকনামা' বলে একটি রস রচনা বের হয়েছিল। সেটি পড়ে সমস্ত শিক্ষিত মুসলমান যদি ক্ষেপে উঠে থাকেন তো বলার কিছু নেই।"[১৪]

দেশভাগের ঘটনাকে তরান্বিত করে ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা, বিহার ও নোয়াখালির দাঙ্গা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু মহাসভা আরও কয়েকটি সংগঠনের প্রচার। পূর্ববঙ্গের ঘটনার বদলা নেয়ার জন্য উস্কানি দিয়ে অনেক বেনামি প্রচারপত্র বিলি হয়েছিল।[১৫] তাতে পূর্ববঙ্গের ঘটনায় হস্তক্ষেপ না করার এবং কেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়তার জন্য অর্ন্তবর্তী সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। এর ফলে একটা ধারনার সৃষ্টি হয়েছিল যে পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দুদের রক্ষা করার কেউ নেই এবং বাংলার প্রাদেশিক সরকার হত্যা ও ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু ধর্মকে উৎখাত করার নীতি অনুসরণ করছে। এ সব ঘটনা কতটা সত্যি সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল এইসব রটনার প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।[১৬]
নোয়াখালীর দাঙ্গার প্রচার পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি ও দেশত্যাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ দাঙ্গার প্রচার ছিল ঘটে যাওয়া ঘটনার চেয়ে দশগুণ কি বিশগুণ অতিরঞ্জিত বিবরণ গান্ধীজীকে দিল্লী থেকে নিয়ে যায় নোয়াখালিতে।[১৭] নোয়াখালির দাঙ্গার একটি সঠিক চিত্র প্রকাশ করেন অন্নদাশংকর রায়। তিনি কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকিল ও নেতা কামিনীকুমার দত্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

> "তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে বলেন, 'যা শুনেছেন তা অতিরঞ্জিত। নোয়াখালিতে খুন হয়েছে শ'আড়াই, ধর্ষণের কেস খুবই কম। জোর করে যাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তারা একদিন বা দুদিন বাদে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হয়েছে।"[১৮]

[৯] **বিস্তারিত** আলোচিত হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে
[১০] মৈত্রেয়ী দেবী, এত রক্ত কেন?, পৃষ্ঠা ২
[১১] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪২
[১২] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩
[১৩] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩
[১৪] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩
[১৫] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২১-১২২
[১৬] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২১-১২২
[১৭] অন্নদা শংকর রায়, যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ১১২
[১৮] অন্নদা শংকর রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১২

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ নিয়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় ইউনিয়নের কিছু পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এ প্রচারণার প্রতিবাদ করে পূর্ববঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এক প্রেসনোটে বলা হয়,

> "এমন কতগুলি বিকৃত বিবরণ প্রচার করিয়াছে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে খুবই ছোটখাট সমস্যা এবং উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা সহজেই সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান করা যায়।
> সংবাদপত্রগুলো এমন ধারণা সৃষ্টি করিতে চায় যে, পূর্ববঙ্গ সরকার বলপূর্বক পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় অঞ্চল দখল করিয়াছে। এইসব দখলের দ্বারা অঞ্চলগুলি সম্পর্কে এক দাবী তুলিতে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তথায় সৈন্য প্রেরণে বাধ্য করিবে।"[১৯]

অনেক আগে থেকেই সংবাদপত্র সমূহের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ছিল। ১৯৪৮ সালের ১৪ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পত্রিকা লেখে,

> "যেভাবে সরকারী প্রচারকার্য চলিতেছে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইতেছে, হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালানো হইতেছে এবং লুটতরাজ চলিয়াছে তাহাতে হিন্দু সম্প্রদায় আরও আতঙ্কগ্রস্থ হইয়াছে। তাহারা মনে করিতেছে যে, পশ্চিম বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট ও ভারতীয় গভর্নমেন্ট বিপন্ন হিন্দুদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ। এখন আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই।[২০]

১৯৪৮ অক্টোবর মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সূত্র উদ্ধৃত করে লেখা হয়,

> "হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসার প্রধান কারণ: দেশের শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুদের যথেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের অভাব, সেনাবাহিনী ও পুলিশে হিন্দু অফিসারদের অপ্রতুলতা, জোর করে হিন্দুদের বাড়ি দখল, বিনা বিচারে হিন্দুদের আটক রাখা, বাড়ি তল্লাশি, ব্যবসায়ীদের বৃত্তিচ্যুতি, গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি এবং সাধারণ অর্থনৈতিক সংকট।"[২১]

১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পুনঃ পুনঃ ভিত্তিহীন দূরভীসন্ধিমূলক সংবাদ পরিবেশন করবার জন্য চাপ দিলে সেই পত্রিকার সাংবাদিকের চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রমথ নাথ বিশী।[২২] তিনি পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন।
ভারতীয় পত্রিকার তৎকালীন ভূমিকা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, "some of Calcutta papers to take a saner view of the affair in dealing with news affecting the Hindus of East Bengal.[২৩]
স্বাধীনতা কালীন সময়ে দাঙ্গা না হলেও দাঙ্গার গুজব সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। এরকম একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তপন রায় চৌধুরী বলেন,

> "দেশ বিভাগের তিন- চারদিন আগে হোস্টেল ছেড়ে বরিশাল গেলাম। গিয়ে দেখি সারা শহর আসন্ন দাঙ্গার গুজবে টলমল করছে।---- বোধহয় দাঙ্গার গুজবের ফলেই নজর করলাম সবারই হাতে দা বা কাস্তে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। ভাবলাম এরা নিশ্চয়ই দাঙ্গা করার জন্যই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলেছে। ---

---

[১৯] দৈনিক আজাদ, ৫ জানুয়ারি ১৯৪৮
[২০] সুকুমার বিশ্বাস, (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কলকাতার সংবাদপত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৫
[২১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ দেশত্যাগ, পৃষ্ঠা ৫৯
[২২] রাজশাহীর এক জনসভায় এই তথ্য প্রকাশ করেন তার ভাই বাবু পি.এন বিশী, দৈনিক আজাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০
[২৩] Satish Chandra Das Gupta, Khadi Pratisthan, P.O Sodepur, 24 Pargana, West Bengal, Home, Political (C.R), B Proceeding, Vol. 44, File No.July 48/ 60, GOEB

একটু পরে মনে হল আরে– এরা তো হাটুরে।----নদীর দিকে রওনা দিয়েছে নিজের নিজের ডিঙ্গি নিয়ে বাড়ি ফিরবে বলে। ভয়ের তো কোন হেতু নেই।”[২৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ভারতীয় পত্রিকার প্রচারণা কিভাবে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে দেশের বাইরে ভুল ধারনা সৃষ্টি হয় সেই সম্পর্কে কিশোরগঞ্জের লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রী রমাচরণ ঘোষ আগ্রা থেকে এক চিঠিতে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে জানান দৈনিক আজাদ এর ১৯৪৯ সালের ৮ মার্চ তারিখের সংখ্যায়। তিনি তীর্থ ও দেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তখন আগ্রায় অবস্থান করছিলেন। তিনি লেখেন,

“মিঃ এস.কে. মুখার্জী নামে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী এডভোকেটের সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হইলে পর তিনি বলিলেন যে, এখানে তো ঐদেশ সম্বন্ধে মস্ত একটা ভুল ধারনা (Wrong information) রহিয়াছে, এবং আমি যাহা বলিলাম তাহা তাহাদের নিকট একটা বেশ সুসংবাদ (a piece of news) বটে। তখনই তিনি বাহির হইয়া গিয়া প্রায় ১৫ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বার লাইব্রেরীর হল ঘরে লইয়া গেলেন। ২০/২৫ জন সিনিয়র উকিল ও এডভোকেটের মধ্যস্থলে আমাকে বসিতে দেওয়া হইল এবং আমার ঠিক সম্মুখেই ছিলেন এখানকার বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় গণ পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত রামচাঁদ গুপ্তা মহাসয়, তিনিই আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকেন।----- নানাবিধ কথাবার্তার পর আলোচনা সমাপ্ত হয়। তাহারা বলিলেন, তা তাহাদের ধারণা ছিল যে পুর্ব্ব পাকিস্তানেও পাঞ্জাবের পুনরাভিনয় হইতেছিল এবং আমার সহিত আলোচনার পর পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা অনেকটা পরিবর্তীত হইয়াছে।”[২৫]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই ভারতীয় পত্র পত্রিকাগুলো বিভিন্ন মিথ্যা প্রচারণা, কোন ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে পূর্ববাংলাকে একটি সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সামনে তুলে ধরতে থাকে এসব প্রচারণা পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী হিন্দু এবং ভারতে বসবাসকারী তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এখানে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে এবং তাদেরকে দেশ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।[২৬] ১৯৫১ সালের ১১ আগস্ট ‘দৈনিক আজাদ’ এর সম্পাদকীয়তে ভারতীয় পত্রিকার অপপ্রচার সম্পর্কে লেখে,

“বিগত এক বৎসরের মধ্যে ভারতে ৭০টি সম্প্রদাযিক হাঙ্গামা হইয়াছে কয়েক লক্ষ পশ্চিমবঙ্গীয় মোহাজের মুসলমান দেশে গিয়া তাহাদের ঘর বাড়ি ফেরত না পাইয়া পুনরায় এদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইযাছে। এই সকল কুকীর্তি, অপকীর্তি হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইবার জন্যই ভারত পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া যাইতেছে।[২৭]

ভারতীয় মহল পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে সবসময় যেন একটি আতঙ্ক তৈরী হয় তার জন্য পরিকল্পিত ভাবেই অপপ্রচার অব্যাহত রাখে। ১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে কলিকাতা হইতে ‘রাষ্ট্র’ নামক ভারতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে, এদেশের হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধের অভাব জনিত একটি আতঙ্কগ্রস্ত মনোভাব সৃষ্টি করে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় মহল সর্বদা সচেষ্ট।

আর এই অপচেষ্টার অংশ হিসেবেই ভারতীয় পত্রিকাগুলো তাদের মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রাখে। তাদের এই প্রচারণার কিছু কিছু উদাহরণ এবং এই সকল অসত্য বিবরণের মূল ঘটনা সেই সঙ্গে আলোচিত হল।

[২৪] তপন রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬২

[২৫] রমাচরণ ঘোষ, দৈনিক আজাদ, ৮ মার্চ-১৯৪৯

[২৬] পূর্ববাংলায় বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের ভারতীয় পত্রিকা ও ভারতীয় বেতারের খবরের প্রতি আগ্রহী।
এ সময় ভারতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়। ১১ আগষ্ট, (১৯৫১ দৈনিক আজাদ ছাপার অস্পষ্টতা)

[২৭] দৈনিক আজাদ, ১১ আগষ্ট ১৯৫১, সম্পাদকীয়।

১৯৪৮ সালের ৪ মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকায় ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় নীলাম্বরপেটি গ্রামে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর ছাপানো হয়। ৫ মার্চ ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের ভিত্তিতে প্রেসনোটে জানান যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। মূল ঘটনাটি ছিল দুই জমিদারের অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। ঘটনার পরপরই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে এবং ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই রকমভাবে ব্যক্তিগত দন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে প্রচার করা হয়।[২৮]

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বেতারে ভাষণ দেন। তার এই ভাষণের সমালোচনা করে ১৯৪৮ সালের ৩০ মার্চ তারিখের 'কৃষক' পত্রিকায় বলা হয়,

> "ঢাকা হইতে বিদায় লইবার পূর্বে মিঃ জিন্না বেতার যোগে আর এক কলসি বিষ উদগীরণ করিয়া গেলেন। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের মন যাহাতে সর্ব্বদা হিন্দুদের প্রতি বিরূপ ও সন্দিহান হইয়া থাকে। যাহাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিবেশীসূলভ মনোভাব চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়।"[২৯]

'কৃষক' পত্রিকার এই মন্তব্য সম্পর্কে D.I.G., Intelligence Branch বলেন, "It promote feellings of enimity and hated between the defferent communities of Pakistan."[৩০]

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটি রাষ্ট্রের সকল ধর্মের নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শর্ত এবং প্রত্যেক নাগরিককেই তা পালন করতে হয় এবং সকলেই তা করে থাকে। পাকিস্তানের হিন্দু নাগরিকদের তাদের কর্তব্য পালনের সদুপদেশ দেয়ায় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে 'দৈনিক বসুমতি' ১৯৪৮ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখে লেখে,

> "অপরে সদুপদেশ দিতেছেন "পাকিস্তানী বনিয়া যাওয়াই একমাত্র সংগত কার্য। পাকিস্তানের প্রতি তাহারা আনুগত্য স্বীকার করুক তাহা হইলেই তাহারা মুসলমানদের মনে প্রেমের বন্যা বহিতে থাকিবে এবং তাহারা হিন্দুদের সর্ব্ববিধ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন।"[৩১]

ড. ঘোষের সমালোচনা করে এবং তিরস্কার করে একই পত্রিকায় লেখে,

> "যাহারা বিশুদ্ধ গান্ধীপন্থী তাহারা আবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "অত্যাচারে হোক আর নাই হোক, প্রধানতঃ অত্যাচারের ভয়েই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহারা মাটি আকড়াইয়া পড়িয়া থাকুক। মৃত্যু আসে আসুক, কিন্তু দেশত্যাগ করিয়া তাহারা যেন ভারত গভর্নমেন্ট বা পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে বিব্রত না করে। ----ভাবার্থ বোধ হয় এই, 'হে পাকিস্তানবাসী হিন্দুগণ যদি আবার দুই হাজার বৎসর পরাধীন হইয়া থাকিতে না চাও, তাহা হইলে এত বুদ্ধি খরচ করিয়া মুসলিম লীগের কর্তারা তোমাদিগকে পাকিস্তানে যে স্বাধীনতার নমুনা দেখাইয়াছে তাহা লইয়াই তোমরা তুষ্ট থাক। নীরবে মার খাইয়া পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দেখাও।"[৩২]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদেরকে পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে পূর্ববঙ্গে বাস করার পরামর্শ প্রদান করেন বলে উল্লেখ করা হয় 'দৈনিক বসুমতি' পত্রিকায়। পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই প্রদেশে বাস করা উচিৎ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য পূর্ববঙ্গের যুবক ও ছাত্রদিগকে

[২৮] অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪ মার্চ ১৯৪৮, Home, Political, (CR) B Proceedings, Vol. 46, File-Feb -48/171-17, GOEB
[২৯] কৃষক, ৩০ মার্চ ১৯৪৮
[৩০] Home, Political, B Proceedings, Vol. 73, File No. April-48/984, GOEB
[৩১] দৈনিক বসুমতি, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৮
[৩২] ঐ, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বলেও তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। যদিও তাদের বক্তব্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন আভাষ পাওয়া যায় না এবং তারা রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন। হেসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে এবং তাদের বক্তব্যের অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়ে উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করে 'বসুমতি' পত্রিকায় লেখে,

> "উপদেশ গুলি পাঠ করিয়া আমাদের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগিতেছে। নিজেদের অসামর্থবশত: কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও মুসলিম লীগ পরিকল্পিত ভারত বিভাগ মানিয়া লইয়াছেন। যাহারা চিরদিন ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন। কোন অধিকারে কংগ্রেসের কর্তারা তাহাদিগকে আজ ভারতবর্ষের বাহির করিয়া দিয়াছেন। ভারত বর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে। সে প্রশ্ন এখন তুলিব না; কিন্তু পাকিস্তানভুক্ত হিন্দুরা যে এখনও স্বাধীন হয় নাই।"[৩৩]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এক ভাষণের সমালোচনা করে ১৯৪৮ সালের ৭ মে তারিখে 'দৈনিক বসুমতি' তে লেখা হয় "পাকিস্তানী সাম্য ও প্রীতির গুঁতোয় পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দু ও শিখ শুন্য হইয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা সাম্য ও নীতির ঠেলায় ত্রাহী ত্রাহী ডাক ছাড়িতেছে।"[৩৪]

স্বাধীনতার এক বৎসর না হতেই পূর্ববাংলার হিন্দুদের অধিকার না থাকার কল্পিত চিত্র তুলে ধরে ১৯৪৮ সালের ১৮ মে তারিখে দৈনিক 'বসুমতি' তে লেখা হয়,

> "এখন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা বলিতে প্রধানত: পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের সমস্যাই বুঝায়। পাকিস্তান যখন ইসলামী রাষ্ট্র, তখন সেখানকার শাসনভার মুসলমানদের হাতেই থাকিবে এবং হিন্দুদিগকে মুসলমানদের প্রজারূপে বাস করিতে হইবে। মুসলমান শাসকবর্গের যদি সুবুদ্ধি হয় তাহা হইলে তাহারা হিন্দুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের সহিত সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"[৩৫]

দৈনিক 'বসুমতি' ১৯৪৮ সালের ১৮ জুন তারিখে লেখে, "পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা ইহাদের তত্ত্বাবধানে বেশিদিন থাকিলে যে নিশ্চিন্তে বেহেস্তে যাইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৩৬]

১৯৪৮ সালের ২৯ জুন তারিখের 'কৃষক' পত্রিকায় পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে অনিশ্চয়তা তৈরী হয় এমনি ভাষায় লেখা হয়,

> "পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল নরনারী বসবাস করিতেছে তাহাদের মনে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইতেছে না তাহা বড় একটা ভাবিবার বিষয় ইহার জন্য পাকিস্তানের আত্মশক্তির অভাব ততটা দায়ী নয় যতটা দায়ী নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের আশংকা।"[৩৭]

১৯৪৮ সালের ১৫ জুলাই তারিখের একই পত্রিকায় পূর্ববাংলা সরকারের নীতির সমালোচনা করে সন্দেহ প্রকাশ করে যে সরকারের নীতির পরিবর্তন না হলে পূর্ববাংলা হিন্দুশুন্য হয়ে যাবে। এতে লেখা হয়,

> "মহাত্মাগান্ধী বলিয়াছিলেন যে ভারত বিভাগের কল্পনাই মহাপাপ। সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিতের ভার পড়িল পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের উপর। আজ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিক সংখ্যক হিন্দু ও শিখই পাকিস্তান ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ এখনও হিন্দু শুন্য হয় নাই কিন্তু পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্ট এখন যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, ভবিষ্যতে যদি তাহা পরিবর্ত্তীত না হয়। তাহা হইলে সেখানে জীবিকা নির্বাহের

---

৩৩ ঐ, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৮
৩৪ ঐ, ৭ মে ১৯৪৮
৩৫ ঐ, ১৮ মে ১৯৪৮
৩৬ ঐ, ১৮ জুন ১৯৪৮
৩৭ কৃষক, ২৯ জুন ১৯৪৮

> কোন উপায় না দেখিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ হিন্দুই যে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[৩৮]

পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে একত্রীকরণের জন্য প্রচেষ্টা না করার জন্য প্রফুল্ল ঘোষ এর বক্তব্যের সমালোচনা করে ১৯৪৮ সালের ২৭ জুলাই দৈনিক 'বসুমতি' লেখে,

> "পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব গ্রহণ করা উচিৎ সে বিষয়ে ড. ঘোষ কতগুলি উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন। ভারত বিভাগের কথা উত্থাপন করা যে মহাপাপ মহাত্মাজীর মুখেই শুনিয়াছিলাম। আজ কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা বৃটিশ গভর্নমেন্টের চাপে পড়িয়া মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সেই পাপকার্য করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই কি তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করিতে হইবে?"[৩৯]

একই পত্রিকায় পাকিস্তানে হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থান এবং হিন্দুদের প্রতি মুসলমান কর্মকর্তাদের আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা অনেক ক্ষেত্রেই সত্য নয়। পত্রিকায লেখা হয়,

> "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও যে সব হিন্দু কর্ম্মচারী সেখানে রহিয়া গেলেন তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।---- আর কোন হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় নাই।---- পাকিস্তানে জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধ হইয়াছে।-------পাকিস্তানের অনেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দুদের সঙ্গে পিছন ফিরিয়া ঘৃণাভাবে কথা বলে।"[৪০]

পত্রিকার এই ধরণের মন্তব্য যে কোন মানুষের মধ্যে অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলায় কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটে নাই, যদিও ইতিমধ্যে ভারতে অনেক স্থানেই দাঙ্গা হচ্ছিল। কিন্তু ভারতীয় পত্রিকা অব্যাহত ভাবে পূর্ববাংলার সরকার ও মুসলমান জনগণের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক লেখা ভারতে প্রচার করছিল এবং পূর্ববাংলায়ও এইসব পত্রিকার কপি আসত এবং এগুলো পাঠ করে এখানে বসবাসকারী হিন্দুদের মনে অনিশ্চয়তা ও ভীতির ভাব গড়ে উঠে। তাদের ধারণা দেয়া হত ভারতে মুসলমানেরা নাগরিক, পাকিস্তানে হিন্দুরা নাগরিক অধিকার শুন্য পরাজিত জিম্মিমাত্র।

পত্রিকায় এসব অভিযোগের কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না করে এ সকল ঘটনাকে সামগ্রীকভাবে উল্লেখ করেছে। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে বিতর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পত্রিকার ৯টি কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪১]

পাকিস্তানে হিন্দুদের বসবাস ভবিষ্যতে কেন অসম্ভব হইবে তার কল্পিত বিবরণ তুলে ধরে লেখা হয়। ১৯৪৯ সালের ৩০ জুলাই তারিখে সাপ্তাহিক 'যুগবানী' পত্রিকায় লেখা হয়, "এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দু যাহারা আজো পূর্ব্ববঙ্গে আছে তারা সুখে বা সোয়াস্তিতে নেই। অনন্যোপায় হইয়াই চোখ কান বুজিয়া পড়িয়া আছে।"[৪২]

---

[৩৮] ঐ, ১৫ জুলাই ১৯৪৮

[৩৯] দৈনিক বসুমতি, ২৭ জুলাই ১৯৪৮

[৪০] ঐ, ২৭ জুলাই ১৯৪৮

[৪১] Home, Political, B Proceedings, Vol. 48, File No. Dec 48/ 182, GOEB

[৪২] 'ভারত ও পাকিস্তান', সাপ্তাহিক যুগবানী, ৩০ জুলাই ১৯৪৯

Dhaka University Institutional Repository

'যুগবানী' পত্রিকায় 'ভারত পাকিস্তান' নামক প্রবন্ধ সম্পর্কে D.I.G.P মন্তব্য করেন যে, এ সকল পত্রিকায় পূর্ববাংলা ভাগের পক্ষে সমর্থন করে এ ধরনের লেখা অত্যন্ত আপত্তিজনক। 'Council for the Protection of the Rights of Minorities' এর পক্ষ থেকে একে সমর্থন করে মিটিং করা হয় যার প্রভাব পড়ে পশ্চিমবাংলায়।[৪৩]

আলাদা হিন্দু রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে 'যুগবানী' পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষের মূল পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যা' শিরোনামে লেখা হয়,

> "সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্য ও অফিস আদালতে হিন্দুদের প্রভূত প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা বহুগুনে অগ্রসর সত্ত্বেও বর্তমানে তাহাদের উপার্জ্জনের পথ চারিদিক হইতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। ------সর্বাপেক্ষা গুরুতর ভাবনা ইসলামিক রাষ্ট্র তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড আঘাত দিতে উদ্যত হইয়াছে। বাংলার পরিবর্তে উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ও বাংলা ভাষাকে উর্দ্দু হরফে ও ইসলামীয় ছাঁচে ঢালিয়া সাজার আয়োজন করিয়াছে।[৪৪]
> পাকিস্তানে নেতারা সোৎসাহে পূর্ব্ববঙ্গকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে শাসন করিতেছেন এবং এজন্য হিন্দু যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহারা ফিরিয়া যাইতে ও শান্তিতে বাস করিতে ভরসা পাইতেছে না।------- এই কারণে ইসলামীয় শাসনে ভিন্নধর্মী ও ভিন্ন জাতি হিন্দুর বাস সম্ভব বা নিরাপদ নহে। তাহাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন এক চতুর্থাংশ মুসলমান অধিবাসীর জন্য যদি ভারতবর্ষ খন্ডিত হইতে পারে। তবে তৃতীয়াংশ হিন্দুর জন্য পূর্ব্ববঙ্গ পৃথক ভূ-ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে আপত্তির কি থাকিতে পারে।-----এই দাবী দুর্নিবার শক্তিশালী করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যার সমাধান নিহিত। ভারত রাষ্ট্রের বাঙালীরা তাহাদের স্বজনকে পাকিস্তানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।"[৪৫]

১৯৪৯ সালের ১৩ নভেম্বর 'Statesman' পত্রিকায় ঢাকার এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি ও লুট হয়। প্রায় ১ লক্ষ টাকার মালামাল লুট হয় বলে লেখা হয় এবং বর্ণনায় বলা হয় যে, প্রায় ১০০ জন সসস্ত্র লোক তলোয়ার, লাঠি,ও আরও আধুনিক অস্ত্র নিয়ে এই বাড়ি আক্রমণ করে। লোহার সিন্দুক, আলমারী, বাক্স খুলে প্রায় ২৫০ তোলা স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে নিয়ে যায়।[৪৬]
পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট করে যে, এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেখান ৩৪ নং নীলাম্বর সাহা রোড, এ বাড়িটিতে সীমানা প্রাচীরের ছাপ পরীক্ষা করে তেমন কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে এর পাশের বাড়ি ৩৪/১ নীলাম্বর সাহা রোডে রূপলাল সাহা ও ১৬৫ জগন্নাথ সাহা রোডের পুস্পরাজ সাহার বাড়িতে চুরি হয়েছে।[৪৭]

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বাংলা পত্রিকায় ১৯৪৯ সালের ৭ ডিসেম্বর রিফিউজি কনফারেন্সে আলাদা হিন্দু রাষ্ট্রের দাবীতে আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হয়।[৪৮] ১৯৪৯ সালে ৪ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাসের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ শহরে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। এই সভায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের জন্য পৃথক ভূমিখণ্ড দাবী করা হয়।[৪৯]
ভারতীয় পত্রিকার এই সকল প্রচারণার বিরুদ্ধে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ হতে বার বার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট লিখিত ভাবে অভিযোগ করা হলেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। রেডিও পাকিস্তানের এক সংবাদে বলা হয়,

---
[৪৩] Home, Political, B Proceedings, Vol. 53, File No. May 1949/ 877-878, GOEB
[৪৪] পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে পূর্ববাংলার বাঙালীরা।
[৪৫] 'বিষবৃক্ষের মূল পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যা', সাপ্তাহিক যুগবানী, ৩০ জুলাই, ১৯৪৯
[৪৬] Statesman, 13 November, 1949,
[৪৭] Home, Police, Vol.84, GOEB
[৪৮] Home, Political, B Proceedings Vol. 52, April 1949 GOEB
[৪৯] ibid

Dhaka University Institutional Repository

> "ভারতীয় গণ যখন কোন আক্রমণাত্মক পন্থা আবিস্কার করিতে চায় এবং যখন তাহারা নিজেদের দোষত্রুটি চাপা দিতে চায় তখনই তাহারা পাকিস্তানের উপর দোষারোপ করে। ----গ্রাম অঞ্চলের দুর্ঘটনা বাদ দিলেও ভারতে ইতিমধ্যে ৩৭টি জায়গায় সাম্প্রতিক দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছে। এগুলিতে ৬০২ জন মুসলমান নিহত এবং ২০৪৯ জন আহত হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে পাকিস্তানে মাত্র দুই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহাতে মাত্র ছয় জন হতাহত হইয়াছে।"[৫০]

ভারতে বিভিন্ন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেগুলির প্রধান দপ্তর ছিল কলিকাতায়। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় এক করবার জন্যই এই সব সঙ্ঘ প্রচার করছে বলে খবরে প্রকাশিত হয়।[৫১]
ভারতীয় পত্রিকার অব্যাহত মিথ্যা প্রচারনার ফলে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত ভারত ও পূর্ববাংলার দাঙ্গা। ১৯৫০ সালে সংঘটিত দাঙ্গার উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন,

> "আমার বর্তমান সফরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের হাঙ্গামার ব্যাপকতা ও তীব্রতা সম্পর্কে ভারতে একশ্রেণীর লোকের যে ধারনা প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা অপেক্ষা অনেক কম, পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র সমূহ এ সম্পর্কে সীমাহীন অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে।--- ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি সংবাদপত্র অতিরঞ্জনতো দূরের কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গালগল্পের দ্বারা একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উস্কানী দিয়াছে অন্যদিকে তেমনি ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।----- আনন্দবাজার ও যুগান্তর ১৮ই জানুয়ারী এবং হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ের উল্লেখ করে। খুলনার যে ঘটনা ঘটে দুইজন পুলিশের হত্যা ছাড়া ইহার আর কোনই গুরুত্ব নাই। ১৯৪৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে। সমগ্র ডিসেম্বর ও জানুয়ারী (১৯৫০) মাসের প্রথমার্দ্ধে এই ঘটনার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে সর্ব্বপ্রথম এই ঘটনার কথা প্রকাশিত এবং তার একরাত্রির মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গের অত্যাচারের মতবাদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৯শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অর্ন্তগত বনগাঁয় হাঙ্গামা শুরু হয় এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কলিকাতা ও কলিকাতার চর্তুদ্দিকে ইহা ভয়ংকর আকার ধারন করে। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই দেশবিভাগের পর সর্ব্বপ্রথম গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার সাম্প্রদায়িক গোলযোগ শুরু হয়।"[৫২]

গুজবের ফলে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয় যা মানুষের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। অধিকাংশ সময়ই কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুজব ছড়ানো হয়। যা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয়না। খুলনার এক জনসভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ তার ভাষণে গুজবের শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি বলেন,

> "আমি যখন খুলনায় থাকি তখন মনে কোন ভীতির সঞ্চার হয় না কিন্তু কলিকাতায় গেলেই অবিরত বিভিন্ন প্রকার গুজব শুনিবার ফলে সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া যায় গুজবের ফলে বরিশাল জেলায় ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।--- একটি মিথ্যা সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে বরিশালে লোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায় তিনি তার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন।"[৫৩]

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করে ১৯৫০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি খুলনা বারের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাবু শরৎ চন্দ্র দাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট তার প্রেরণ করে লিখেন, "খুলনা বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি আপনাকে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত নিরাপত্তার

---

[৫০] দৈনিক আজাদ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৯
[৫১] দৈনিক আজাদ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৯
[৫২] ঐ, ২৩ মার্চ ১৯৫০
[৫৩] ঐ, ২৩ মার্চ ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করতে এবং পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করছি।”[৫৪] তিনি মিথ্যা প্রচারণা পূর্ববাংলার হিন্দুদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না বলে মনে করেন। তিনি বলেন,

> “ইহার দ্বারা তাহারা সংখ্যালঘুদের সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিবে না। উহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিবেন মাত্র। ইহা তাহাদের চাল হইতে পারে। তাহাদের দেশের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটি বন্দীও [ফন্দীও] হইতে পারে। এই ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাহারা যে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিতেছেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? পূর্ব্ববঙ্গের গভর্নমেন্ট পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার যথেষ্ঠ সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, দুর্গতদের দুর্গতি বিতারনের জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এমতাবস্থায় পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা চালাইবার কোন সমর্থই থাকিতে পারেনা। আশা করি যাহারা এইভাবে সমধর্ম্মীদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টিত হইতেছে তাহারা অবিলম্বে এই কার্য হইতে প্রতিনিবৃত হইবেন।”[৫৫]

মিথ্যা প্রচারণার ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করে ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ ‘দৈনিক আজাদ’ এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,

> “একদিকে ভারতবর্ষে যখন দাঙ্গার অনুষ্ঠান চলিতেছে ঠিক অপর দিকে দাঙ্গা ও যুদ্ধের উস্কানী দেওয়ার কাজ সেখানে অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা বহু আগে আরম্ভ এবং শেষ হইয়া গেলেও প্রত্যেহ হিন্দুস্থানী সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া সে সম্বন্ধে মিথ্যা ও ভয়ানক বর্ণনাপূর্ণ দাঙ্গার কাহিনী প্রচার করা হইতেছে ফলে ভারতের দাঙ্গার উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। হিন্দুস্থানের এই অশান্ত পরিস্থিতি দাঙ্গার উত্তেজনা এর যুদ্ধংদেহী চিৎকার পূর্ব্ব পাকিস্তানী হিন্দুদের মনে আতঙ্ক হইলেও ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে।”[৫৬]

Mr. Biswas প্রপাগান্ডা প্রচারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন,

> “A Section of the Calcutta press had not been helpful and some well known Hindu leaders had done great harm. Many East Bengal Hindus had implored with the West Bengal Government to have these leading articles, stories and speeches stopped.”[৫৭]

১৯৫০ সালের ২০ এপ্রিল ‘দৈনিক আজাদ’ এর সম্পাদকীয়তে ভারতীয় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়,

> “প্রচার কার্যে সর্ব্বাধিক উৎসাহ প্রদান করিয়াছে কলিকাতার সংবাদপত্র। কলিকাতার কতগুলি সংবাদপত্র পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মনোবল হ্রাস করার জন্য তিলকে তাল, দিনকে রাত এবং সত্যকে মিথ্যা করিয়া দিনের পর দিন প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। তাহার কুফল চোখের উপর আমরা দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়দিন কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও আসামে মাসের পর মাস ধরিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিয়াছে। শুধুমাত্র দাঙ্গার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু যে এরূপ বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগ করিবেনা তা বলাই বাহুল্য।”[৫৮]

১৯৫০ সালের ২৫ জুন তারিখে দৈনিক “Rozana Hind” পত্রিকায় “THE FUTURE OF THE HINDUS OF EAST PAKISTAN” শিরোনামে একটি প্রবন্ধে পূর্ববাংলার হিন্দুদের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের ভূমিকার

---

[৫৪] বাবু শরৎ চন্দ্র দাস, ঐ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

[৫৫] দৈনিক আজাদ, ১৩ মার্চ ১৯৫০

[৫৬] দৈনিক আজাদ, ২৩ মার্চ ১৯৫০

[৫৭] Manchester Guardian, London 18.June 50, Page 15

[৫৮] দৈনিক আজাদ, সম্পাদকীয় ২০ এপ্রিল ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা করে লেখা হয় যে, পূর্ববাংলায় হিন্দুদের কোন জায়গা হবে না। যে সকল হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে গিয়েছেন তারাও আর পূর্ববাংলায় ফিরতে পারবে না।[৫৯]

এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে পূর্ববাংলার Home, Political Department এর Deputy Secretary এর নিকট এক প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। এতে বলা হয় যে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা, যার প্রভাব পড়বে যারা দেশত্যাগ করেছেন তাদের মনে, তাদের দেশে ফেরার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।[৬০]

১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে দাঙ্গা শেষ হয়ে গেলে দেশত্যাগী হিন্দুরা যখন দেশে ফিরে আসতে আগ্রহী হয়ে ওঠে তখন ভারতীয় পত্রিকাগুলো মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে, এই প্রচারণার ধারাবাহিকতা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। সে সঙ্গে চলে যুদ্ধ প্রচারণা যা পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া হিন্দুদের এবং পূর্ববাংলায় অবস্থানরত হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে কলিকাতার দৈনিক পত্রিকা 'যুগান্তর' ও 'সত্যযুগ' এ পূর্ববঙ্গের কতিপয় স্থানে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। উক্ত খবরে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা জনিত ছুরিকাঘাত, অগ্নিকাণ্ড হয়েছে এবং এইরূপ উপদ্রব দমনের জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার উক্ত অঞ্চলসমূহে ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর প্রতিবাদ করে ১৯৫০ সালের ১৮ মার্চ এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উপরোক্ত জেলাগুলির কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে নাই এবং সরকার কোথাও ১৪৪ ধারাও জারি করে নাই। উক্ত পত্রিকা দুইটিতে আরও প্রকাশিত হয়েছে যে, মাননীয় ড.মালিক মাননীয় মি:সি.সি.বিশ্বাসের নিকট হইতে এই সম্পর্কে পত্র পেয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৪ ও ১৫ মার্চ চিফ সেক্রেটারি সম্মেলনে আলোচনার জন্যে প্রস্তাব জানিয়েছেন। প্রেসনোটে এই খবরটিকেও মিথ্যা বলা হয়।"[৬১]

১৯৫০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ১৬ তম চিফ সেক্রেটারি সম্মেলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে পূর্ববাংলার চিফ সেক্রেটারি তার বক্তব্যে কলকাতার প্রধান প্রধান পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, অসত্য ঘটনার বর্ণনার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলেন যে, এ সকল ক্ষতিকর প্রপাগাণ্ডা দুই দেশের সরকারের ভাল কাজগুলোকেও অকার্যকর করে তুলবে।[৬২]

তবে বিভিন্ন প্রচারণামূলক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে জড়িত পূর্ববাংলার পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের সঙ্গে পূর্ববাংলার চীফ সেক্রেটারি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবেন বলে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন।[৬৩]

১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি হওয়ার পর দেশত্যাগী হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরে আসে এবং তারা পূর্ববাংলায় নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করে। ভারতীয় পত্রিকায় ফিরে আসা হিন্দুদের সমস্যা সম্পর্কে প্রচারণা শুরু করে। তাদের এই প্রচারণা ১৯৫১ সালেও অব্যাহত থাকে।

১৯৫১ সালের ২২ জানুয়ারি "Hindustan Standard" লেখে যে, শরণার্থীরা যদি পূর্ববাংলায় তাদের সম্মানজনক অবস্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হন তবে তারা দেশে ফেরার বিষয়ে উৎসাহ পাবেন না।[৬৪]

শ্রী নিরোদবরণ গোস্বামী অখণ্ড ভারত গঠনের সংকল্প তুলে ধরেন। তার এ বক্তব্য সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালের ২৬ জানুয়ারি। তিনি বলেন,

---

[৫৯] Rozana Hind, 25 June, 1950, Dep. Home (Political) vol. 58, File. No.B Nov.`51/136, GOEB

[৬০] Home, Political, B Proceedings, vol. 58, File. No.Nov 51/136, GOEB

[৬১] দৈনিক আজাদ, ১৮ মার্চ ১৯৫০

[৬২] Proceedings of the 16th Chif Secretarys' Conference, 23 May 1950. Home, Political(C.R), B Proceedings, Vol. 3 File no. January 1951/59- 65, Page 6-8, GOEB

[৬৩] ibid, Page 6-8

[৬৪] Hindustan Standard, 22 January 1951

"১৫ই আগস্ট তারিখটি স্মরণপথে এলে মনে সাময়িক উল্লাস জাগে বটে, কিন্তু পরূহমূহুর্তেই মর্মান্তিক বেদনা এসে উল্লাসের চাঁদকে ঢেকে ফেলে কারণ ১৫ই আগস্ট বাস্তবিক সুখের দিন নয় দুঃখের দিন ; স্বপ্নভঙ্গের দিন, পরাজয়ের দিন। যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ভারতীয় জাতির মনে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবে জেগে উঠেছিল, - - - পনরোই আগষ্ট জাতির একটা বিশিষ্ট অংশকে এক অবাস্তর ও অসম্ভব আদর্শে মোহগ্রস্ত করে রূঢ়ভাবে সেই স্বপ্নটি ভেঙ্গে নিয়ে গেল - - । আর কবে, কত সুদীর্ঘ বছর পরে খণ্ডিত ভারত ব্যবচ্ছেদের যন্ত্রণা ভুলবে, হারানো অঙ্গ পুনরায় ফিরে পাবে ভারতের ভাগ্য বিধাতাই তা বলতে পারে। ---আসুন আমরা দৃঢ় সংকল্প করি, যা আমাদের হারিয়েছে তা ফিরিয়ে আনা। যা আমাদের নেই বাহুবলে তা জয় করে নেব।"[৬৫]

১৯৫১ সালের প্রথম দিকে হিন্দুদের দেশত্যাগের হার বেড়ে গেলে "Hindusthan Standard" ১৯৫১ সালের ২৯ জানুয়ারি প্রশ্ন উত্থাপন করে লেখে যে, পূর্ববাংলার স্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানিরা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তবে প্রতিদিন বহু সংখ্যক শরণার্থীরা কেন শিয়ালদা স্টেশনে পৌছাচ্ছে তা বুঝতে পারা সত্যি কঠিন। গত সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় নয় শত করে শরণার্থী শিয়ালদা স্টেশনে পৌছেছে এবং তারা স্টেশন এলাকায় খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। দুই বাংলার সরকার এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করবেন বলে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।[৬৬]
১৯৫০ সালের লিয়াকত নেহেরু চুক্তির বিরোধিতা করে বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় লেখা, চুক্তি বিরোধী বক্তব্য ফলাও করে ছাপানো হত। সংবাদপত্রের এ ধরনের ভূমিকার সমালোচনা করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়,

"চুক্তির সাফল্য সাধনে সংবাদপত্রের দায়িত্ব লইয়া প্রচুর আলোচনা গত এক মাসে হইয়াছে। ---- বাস্তুত্যাগের ন্যায় দুখঃজনক ঘটনাকে রাজনৈতিক মূলধন করা উচিৎ নয় ইহা আমরাও মনে করি। --- চুক্তি সফল করিবার দায়িত্ব গবর্নমেন্টের। সংবাদপত্রসমূহ ইহাতে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে এবং আশা করি তাহা করিবেন।-------জনমতকে সকল সময় ও সকল অবস্থায় ঠিকপথে চালাইয়া লওয়ায় সংবাদপত্রের হাত খুব বেশী থাকে। -----আজিকার দিনে যে কোন ঘটনাই নিপুই সাংবাদিকের হাতে পরিবর্তিত, বিকৃত, অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব এবং বর্ত্তমান পরিবেশে ঐরূপ অদলবদলের ফলে জনমত উদ্বেলিত হইয়া বিপথে চলিতে পারে।-----
"দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এইরূপ চতুদ্দিক হইতে চাপ পড়িবার ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।---------উদ্ভ্রান্তচিত্ত বাস্তুহারার একথা ভাবিবার অবসর নাই, ফন্দিবাজ সকল নেতার পক্ষে একথা ভাবাই স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায়, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সাংবাদিকদের এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।"[৬৭]

উস্কানীমূলক এ সকল লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে আসাম সরকার এ সকল লেখা দিল্লী চুক্তি বিরোধী বলে সে পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৬৮]

১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখের সংবাদ পত্রগুলিতে নয়াদিল্লী হতে প্রকাশিত একটি সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়। এতে লেখা হয় যে তারা নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাক ভারত সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যে উপজাতীয় বা হিন্দু থাকতে পারবেনা বলে আদেশ জারি করেছেন এবং উপজাতীয়দের উপর অত্যাচার ও তাদের মেয়েদের অপহরণ করে, জোর করে বিয়ে করা হচ্ছে।[৬৯] পূর্ববাংলার পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' এই সকল খবর প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখে,

[৬৫] যুগশক্তি, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫১ পৃষ্ঠা ৩, Home, Political, (CR)Vol. 61, File- April 1954/299-302, GOEB
[৬৬] Hindustan Standard, 29 January 1951
[৬৭] প্রবাসী, ৫০শ ভাগ, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৯৯
[৬৮] Home, Political (CR) B Proceedings, Vol. 61, File no. April-1954/ 299-302, GOEB
[৬৯] দৈনিক আজাদ, ১৯ এপ্রিল ১৯৫৯

> "পূর্ব পাকিস্তানের নহে আসামের সহিত অন্তর্ভুক্ত গারোদের শোচনীয় অবস্থার কথা সর্ব্বজন বিদিত। গারোরা কোন কোন স্থানে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই বিরূপ মনোভাবের প্রতিকারের জন্যই মিথ্যার বেসাতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে যত দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় হিন্দু সদস্যগণ পার্লামেন্টে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেন নাই। ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের কথা। নয়াদিল্লীর কোন অন্ধকার কোনে এসব কল্পকাহিনীর সৃষ্টি।"[৭০]

ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে মানভূম সাহিত্য সম্মেলনে শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বলেন যে, বাংলাদেশ এই প্রথম খণ্ডিত হয় নাই, বঙ্গবিভাগ যতবারই হোকনা কেন কেবলমাত্র ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগই বাঙালী জাতির একটা বিপুল অংশকে উদ্বাস্তু ও পর করেছে।[৭১]

এই লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট প্রতিকার দাবী করলে পশ্চিমবাংলা সরকার এই পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয় যে, এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীদের চুক্তি ও যৌথ প্রেস কোড বিরোধী। এ ধরনের লেখা না ছাপানোর জন্য পত্রিকার সম্পাদকদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৭২]

এর পরও বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা প্রচারণা চলতে থাকে পশ্চিমবাংলার প্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ তাদের প্রচারণার ধারা অব্যাহত রাখে। 'Hindustan Standard' ১৯৫১ সালের ৫ মে লেখে যে, দেশভাগের পর থেকে প্রায় ৪০/৫০ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে কয়েক হাজার পূর্ববাংলায় ফিরেছেন। এ পত্রিকায় সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয় যে, হিন্দু দেশত্যাগীদের জন্য পুনরায় দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা হলেও পূর্ববাংলায় অবস্থান করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, বর্তমান ব্যবস্থা কোন একটি পরিকল্পনা।[৭৩] পত্রিকায় এ ধরণের সন্দেহ প্রকাশ করে কোন খবর বা বক্তব্য প্রকাশিত হলে সেটা সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করবে এটাই স্বাভাবিক এবং যে কোন কার্যক্রম ব্যর্থ হবে।

মিথ্যা খবর কি রকম ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুত বিনয় কৃষ্ণ কুন্ডু ১৯৫১ সালের ২৯ জুলাই তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা খবরের প্রতিবাদ করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন,

> "ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। এখানকার যেসব হিন্দুর আত্মীয়স্বজন ভারতে বসবাস করেন তাহারা এইরূপ মিথ্যা সংবাদে কিরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হন তাহা আমার এই পত্রে প্রকাশ পাইবে। আমার পুত্র কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ে এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে ৩০শে জুলাই তার করিয়াছে "We are anxious for yourselves" আমরা এখানে স্ত্রী পরিজন লইয়া নির্বিঘ্ন ও শান্তিতে বসবাস করিতেছি। কিন্তু এইরূপ মিথ্যা অপপ্রচারের ফলে ভারত প্রবাসী আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছে এবং টেলিগ্রাম প্রভৃতি খরচে অর্থব্যয়েরও কারণ হইতেছে। ---- যাহারা এইসব উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাদিগকে যে কি ভাষায় নিন্দা করিব তাহা খুজিয়া পাওয়া যায় নি। আমরা ইহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন ভবিষ্যতে এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া উভয়বঙ্গের সংখ্যালঘুদের ক্ষতি না করেন এবং আমাদের যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন ভারতে বাস করিতেছেন। অযথা তাহাদের মানসিক অশান্তি সৃষ্টি না করেন।"[৭৪]

---

[৭০] ঐ, ২০ এপ্রিল ১৯৫১
[৭১] সত্যযুগ, Home, Political (CR) B Proceedings, Vol. 59, File no. June 50/ 263, GOEB
[৭২] ঐ, ibid
[৭৩] Hindustan Standard, 5 May 1951
[৭৪] শ্রীযুত বিনয় কৃষ্ণ কুণ্ডু, দৈনিক আজাদ, ১৩ আগস্ট ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে জুলাই মাস ১৯৫১ সালে পার্লামেন্টে বিবৃতি দেন ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ সি.সি. বিশ্বাস। তার এই বিবৃতির প্রতিবাদ করে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী জনাব আজিজুদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন,

> "পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, গত জানুয়ারী হইতে মে পর্যন্ত ৫ মাসে যত হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়াছে তদপেক্ষা ২ লক্ষ ৫ হাজার ৪৪২ জন হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক না থাকিলে হিন্দুরা কখনই এত অধিক সংখ্যায় এই প্রদেশে আসিত না। - - - দিল্লীচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ভারতের বহু স্থানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে - - -পক্ষান্তরে দিল্লীচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গে একবারও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই। - - ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি অসংখ্যবার দিল্লীচুক্তি এবং সংবাদপত্র সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারত কর্তৃক যুক্তভাবে গৃহীত বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে। - - সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচনা দানের জন্য এবং পাকিস্তানের আঞ্চলিক সংহতি বিনষ্ট করিবার জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রচারণা চালান হইয়াছে। আমরা পুনঃ পুনঃ ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিপজ্জনক বিবৃতির প্রতিবাদ জানাইয়াছি; ইহাতে কোন ফল হয় নাই।"[৭৫]

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্র যে প্রচারণা চালাচ্ছিল তার সমালোচনা করে বলেন,

> "তাহারাও জানে ইহা ডাহা মিথ্যা কথা ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে লিয়াকত নেহেরু চুক্তি হওয়ার পর হইতে পাকিস্তানে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয় নাই। এইসব প্রচার করিয়া তাহারা চায় পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে।"[৭৬]

রাজশাহী সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য ডাঃ শৈলেশ চন্দ্র নন্দী পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তার সমালোচনা করে এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, এই সকল সংবাদ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, না হয় ইহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। এই সকল মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার মহৎ সাংবাদিকতা বা সৎ রাজনীতি নয়।"[৭৭]

দিল্লী থেকে প্রকাশিত Rozana Milap পত্রিকায় ১৯৫১ সালের ২১ আগস্ট তারিখের সম্পাদকীয়তে পূর্ববাংলার সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না করে অভিযোগ করা হয় যে, অস্ত্রধারী রাজাকাররা গ্রামে টহল দেয় যা গ্রামের লোকেদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে, তাদের সম্পত্তি লুট করে, জোর করে হিন্দুদের ব্যাবসা বাণিজ্য নিয়ে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে এবং পাকিস্তানী সরকারী কর্মকর্তাদের বিনা কারণে হিন্দুদেরকে গ্রেফতার করার কারণে হিন্দুদের মনে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং হিন্দুদের তাদের বাড়ি-ঘর ত্যাগ করতে বাধ্য করে।[৭৮]

১৯৫১ সালের ২১ নভেম্বর Advance "SQUEEZING THEM OUT" শিরোনামে লেখে যে, পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ হিন্দুদেরকে পূর্ববাংলা থেকে বের করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে এবং পাকিস্তানের এ অংশকে পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় হিন্দু মুক্ত করবে।[৭৯]

---

[৭৫] বিস্তারিত পাকিস্তনী খবর, ১মার্চ ১৭শ সংখ্যা, ৯ জুলাই ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১
[৭৬] দৈনিক আজাদ, ১৪ আগষ্ট ১৯৫১
[৭৭] ঐ, ১৯ আগষ্ট ১৯৫১
[৭৮] Rozana Milap, 21 August 1951
[৭৯] SQUEEZING THEM OUT", Advance, 26 November, 1951

১৯৫১ সালের ২৬ নভেম্বর Advance পত্রিকায় "NEW FORM OF TYRANNY" শিরোনামে পাকিস্তানের সরকারী নীতি ও কর্মকর্তাদের আচরণের সমালোচনা করে লেখে যে, পূর্ববাংলার সরকারী কর্মকর্তারা পাকিস্তান ন্যাশনাল প্রতিরক্ষা ফাণ্ড ও আনসার ফাণ্ডের জন্য গ্রেফতার ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে পূর্ববাংলা খুব শীঘ্রই হিন্দুদের জন্য নরকে পরিণত হবে।[৮০]

পত্রিকার এই সকল উস্কানীমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পূর্ববাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেন। এতে বলা হয় যে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এ সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।[৮১]
রাজশাহী সংখ্যালঘু বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং পূর্ববঙ্গ ব্যাবস্থাপনা পরিষদের সদস্য মিঃ প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন।

ভারতীয় পত্রিকার প্রচারণার অব্যাহত ভাবে চলতে থাকলে পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে সিলেটের মৌলভীবাজার মহকুমার সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য মিঃ সুনীলকুমার দাস এক বিবৃতিতে লেখেন যে, ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি খবর সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।[৮২]

বড়লেখার সংখ্যালঘু কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঃ গিরীন্দ্র নাথ দাস ও মিঃ দিজেন্দ্র দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারত তাহার সংবাদপত্র মারফতে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণার দ্বারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে তাহাদের মর্জ্জী অনুযায়ী পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে।"[৮৩]

মিঃ রাজেন্দ্র কুমার রায় পুরকায়স্ত পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জানমাল বিপন্ন রয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদপত্রে ক্রমাগত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান যে, পাকিস্তান অক্ষরে অক্ষরে দিল্লী চুক্তি পালন করছে।[৮৪]

হবিগঞ্জ মহকুমার মুবাকুরি, বামাই এবং কৃষ্ণপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক লিখিত বিবৃতিতে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ধনপ্রাণ বিপন্ন বলে যেই সব অপপ্রচার করা হয়ে থাকে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে সংখ্যাগুরুরা তাহাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে থাকে বলে যা বলা হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি আরও বলেন, ভারতের পত্রিকাগুলি যদি পাকিস্তানের কুৎসা রটনাকারী মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন হতে বিরত থাকেন তবে তা উভয় দেশের মধ্যে মঙ্গলের কারণ হবে।"[৮৫]
দেশত্যাগী হিন্দুদের অনেকে ফিরে এসেছিল এবং অনেকে পরবর্তীতে দেশের পরিস্থিতি বুঝে হয়তো ফিরে আসতে আগ্রহী হত। কিন্তু যারা ফিরে এসেছিল তাদের ফিরে আসার পর দেশের পরিস্থিতি তাদেরকে পুনরায় ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে পত্রিকাগুলি এ ধরণের প্রচারণা।

পূর্ববাংলার স্পেশাল রিলিফ অফিসার ধীরাজ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামের এক জনসভায় যে সকল বাস্তুত্যাগী ভারত হতে পূর্ববাংলায় ফিরে আসছিল তাদের প্রতি সরকার যে সকল সুবিধাদি প্রদান করেছে তার উল্লেখ করে বলেন,

> "তাহাদের আগমনের সময় পথে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পরেও তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার

---

[৮০] "NEW FORM OF TYRANNY , Advance, ২৬ নভেম্বর ১৯৫১
[৮১] Home, Political, B Proceedings, Vol. 74, GOEB
[৮২] দৈনিক আজাদ, ১২ অক্টোবর ১৯৫১
[৮৩] ঐ, ১২ অক্টোবর ১৯৫১
[৮৪] ঐ, ১২ অক্টোবর ১৯৫১
[৮৫] ঐ, ১২ অক্টোবর ১৯৫১

প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সরকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, থানার কর্মচারী ও সার্কেল অফিসারগণকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রত্যাগত বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি অন্য জিনিসপত্র কোন মুসলমান জোর পূর্বক আটকাইয়া রাখিলে তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য সরকার তাহাকে বাধ্য করেন। ইহা সত্ত্বেও বাড়ীঘর মেরামত বা গরু বাছুর ক্রয় করার অসুবিধা যাহাদের রহিয়াছে সরকার সাহায্য তহবিল হইতে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছে।"[৮৬]

সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য জনাব শতীন্দ্র মোহন রক্ষিত পাকিস্তানে হিন্দু মুসলমানদের সমান অধিকার রয়েছে বলে জানান।[৮৭] যে সকল হিন্দুরা ভারত থেকে ফিরে আসছিল তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করে ১৯৫১ সালের ২৬ মে তারিখের Advance লেখে,

"It is reported that in a Dacca village a freshly returned Hindu refugee has been brutally murdered at night. Is it indicative of the overall communal situation in East Bengal."[৮৮]

ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় পাকিস্তান বিরোধী শিরোনাম দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়, পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বারবার প্রতিবাদ করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালের ৭ জুলাই ভারতীয় হাই কমিশনের নিকট এক মেমোরেন্ডামে কয়েকটি খবরের প্রতিবাদ করে। যে খবরগুলো ছিল শ্রী অজিত প্রসাদ জৈন এর ভারতীয় পার্লামেন্টে দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে। ২৪ এপ্রিল 'Free Press Journal' পত্রিকায় প্রকাশ হয় 'Pak treatment of minorities much better' ও 'Pakistan must behave in civilized manner.'[৮৯]
শ্রী জৈন ১৯৫১ সালের ২৩ এপ্রিল ও ১০ মে তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে দেয়া ভাষণে বলেন যে, সংখ্যালঘুদের জোর করে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য পাকিস্তান সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা পৃথিবিতে আর নেই।[৯০]

ভারতীয় মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরিনাম ব্যাখ্যা করে এর প্রতিবাদ করে মেমোরেন্ডামে বলা হয় যে, ভারতীয় মন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য বন্ধুসূলভ নয় এবং তা দিল্লী চুক্তির শক্তিকে নষ্ট করে দিবে।[৯১]

ভারতীয় ডেপুটি মন্ত্রী Dr.B.V.Keskar ১৯৫১ সালের ৩০ মে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তাহীনতার সংবাদ প্রকাশ করে, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক হিন্দু শরনার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান সরকার বারবার এ ধরনের বিবৃতির প্রতিবাদ করেছে। তারপরও ভারতীয় হাই কমিশনার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট এর প্রতিকারের জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করে। এক্সপ্রেস লেটারে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরকে এর জন্য দায়ী করে বলে যে, ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার ভিত্তিহীন গুজবের ভিত্তিতে কার্যক্রম চালাচ্ছে। ১৯৫১ সালের ২০ মে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় যে অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে পূর্ববাংলা ও পাকিস্তান সরকার অবাক হয়েছে। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হবে এবং দিল্লী চুক্তি ও যৌথ প্রেস কোডের শর্ত ব্যাহত হবে বলে বলা হয়, "the Government of India and their spokesmen on the one

---

[৮৬] ঐ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
[৮৭] ঐ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
[৮৮] Advance, 26 May 1951
[৮৯] Memorendum, Govt. of Pakistan, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol.13, File No. March 1953/ 1104-1118, Page 15, GOEB
[৯০] ibid, Page 15
[৯১] Memorendum, Govt. of Pakistan, Ministry of Foreign Affairs, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 13, File No- March 1953, 1104-1118, Page 15, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

hand and newspapers which make it a practice of vilifying Pakistan contrary to the terms of Delhi Pact and joint press code, on the other."[৯২]

বাস্তুত্যাগী হিন্দু পূর্ববাংলায় ফিরে আসছেনা বলে ১৯৫১ সালের জুন মাসে ভারতের সত্যযুগ পত্রিকার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তার প্রতিবাদ করে ঢাকার লৌহজং থানার মেদিনীমণ্ডল গ্রামের খ্যাতনামা ডাঃ মণীন্দ্র কুমার ঠাকুর পূর্ববঙ্গ সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলিতে অবিরত যে ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছিল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি বিবৃতি প্রদান করে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন,

> "আমি নিজে লৌহজং জাহাজ ঘাটে গিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। দেখিয়াছি, হিন্দুরা দলে দলে পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। হিন্দুরা নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, লৌহজং, ভাগ্যকূল, প্রভৃতি জায়গায় আসার জন্য জাহাজে উঠিতেছে যে তাহাদের ভীড়ে অন্যান্য যাত্রীদের জাহাজে স্থান পাওয়া মুশকিল হইয়াছে। প্রত্যাগামী হিন্দুদের এই ভীড় হ্রাসের জন্য জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানী গোয়লন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত স্পেশাল স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"[৯৩]

এই সকল অপপ্রচারের প্রতিবাদ করে পূর্ববঙ্গ সরকার এক প্রেসনোট প্রকাশ করে ১৯৫০ সালের হাঙ্গামার ফলে ১৯৫১ সালের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১৩ লক্ষ ১০ হাজার মুসলমান বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গে আসে এবং তাদের মধ্যে ৭ লক্ষ ২২ হাজার দিল্লী চুক্তির পর ভারতে ফিরে যায়। এই সময়ের মধ্যে ২০ লক্ষ ৭৪ হাজার হিন্দু ভারতে যায় এবং প্রায় ১৬ লক্ষ ৩২ হাজার ফিরে আসে।[৯৪] ভারতীয় সরকারের এক প্রেসনোটের উদ্বৃতি দিয়ে পূর্ববাংলা সরকার এক প্রেসনোটে বলে,

> "গত ২০শে আগস্ট তারিখে কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে ভারত সরকারের যে প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যার তারতম্যের কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দর্শনা ও বেনাপোলে দুই দেশের সরকারের কর্মচারীগণ যুক্তভাবে যাত্রীদের যে সংখ্যা সংগ্রহ করিতেছেন উহা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"[৯৫]

ভারতীয় পত্রিকাগুলো পূর্ববাংলার হিন্দুদের সমস্যার সমাধানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতীয় সরকারকে চাপ দিতে থাকে। ১৯৫১ সালের ১ নভেম্বর 'Advance' পত্রিকায় লেখে,

> "When the pact has failed to solve the problem of the East Bengal Hindu, - - - with the problem of Hindus remaining unsolved, no real peace can come to India. It would be suicidal for India to sacrifice the 10 millions of Hindus in East Bengal at the altar to expediency from any selfish consideration[৯৬]

হিন্দু সম্প্রদায়ের এই সময় নিরাপত্তাহীনতা বোধ করার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও পত্রিকার ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া। এ সময় ভারত বার বার যুদ্ধের হুমকী দিচ্ছিল এবং ভারতীয়

---

[৯২] Express Letter, Govt. of Pakistan, Ministry of Foreign Affairs, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 13, File No. March 1953/1104-1118, Page 13, GOEB
[৯৩] বিস্তারিত দৈনিক আজাদ, ১৮ জুন ১৯৫১
[৯৪] ঐ, ২২ এপ্রিল ১৯৫১ (সম্পাদকীয়)
[৯৫] দৈনিক আজাদ ২৪ আগস্ট ১৯৫১
[৯৬] 'Advance, 1 November, 1951

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকাগুলিতে যুদ্ধের ব্যাপারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দুদের দেশত্যাগের কিছু অংশ যুদ্ধ প্রচারণার ফলেও হয়েছে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের যুদ্ধের উস্কানীমূলক মন্তব্য প্রকাশ করার অভিযোগে পূর্ববাংলা ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে ১৯৫০ সালের ৪ এপ্রিল স্যোসালিস্ট পত্রিকার ২য় বর্ষের ৩৬ তম সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[৯৭]

বাংলা দৈনিক 'বসুমতি' পত্রিকায় ১৯৪৮ সালে মে মাসে ৩টি, জুন মাসে ১টি, জুলাই মাসে ৬টি, আগস্ট মাসে ৯টি, সেপ্টেম্বর মাসে ১৪টি, অক্টোবর মাসে ৬টি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ৫টি আপত্তিকর লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়।
সাপ্তাহিক 'নয়া দুনিয়া' পত্রিকায় ১৯৪৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ৬টি, ৩১ অক্টেবর ৪টি পাকিস্তান বিরোধী উস্কানিমূলক লেখার জন্য অভিযোগ জানানো হয়।
বোম্বে থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা 'People's Age' পত্রিকায় ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট সংখ্যার ৪টি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় জুন মাসে ৭টি, জুলাই মাসে ১টি, আগস্ট মাসে ৩টি, অক্টোবর মাসে ৫টি, নভেম্বর মাসে ১টি আপত্তিকর লেখা প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী দৈনিক 'Hindustan Standard' পত্রিকায় আগস্ট মাসে ৪টি, সেপ্টেম্বর মাসে ৭টি, অক্টোবর মাসে ২টি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ২টি, সেপ্টেম্বর মাসে ১টি, অক্টোবর মাসে ১টি লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।
'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার বিরুদ্ধে এপ্রিল মাসে ১টি, মে মাসে ১টি, জুন মাসে ১টি, জুলাই মাসে ২টি, আগস্ট মাসে ৪টি, আপত্তিকর লেখা প্রকাশিত হয়। পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট অভিযোগ জানানো হয়।
দৈনিক পত্রিকা 'ভারত' এ এপ্রিল মাসে ১টি, মে মাসে ৮টি, জুলাই মাসে ৪টি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট অভিযোগ জানানো হয়।
দৈনিক বাংলা পত্রিকা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এপ্রিল মাসে ১টি, জুলাই মাসে ৫টি, আগস্ট মাসে ১১টি, সেপ্টেম্বর মাসে ৬টি, অক্টোবর মাসে ১টি, নভেম্বর মাসে ৪টি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৯৮]
ভারতীয় পত্রিকাসমূহের বিভিন্ন প্রচারণার জবাবে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ভারতের তৎকালীন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে বলা হয় যে, গ্রামাঞ্চলের দুর্ঘটনা বাদ দিলেও ভারতে ইতিমধ্যে ৩৭ টি জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘটিত হয়েছে। এগুলিতে ৬০২ জন মুসলমান নিহত এবং ২০৪৯ জন আহত হয়েছে। আর এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানে মাত্র দুই জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে এবং মাত্র ৬ জন হতাহত হয়।[৯৯]
পাকিস্তানের সরকারী মহল থেকে আরও জানায় যে, ভারতীয়গণ বহু সংস্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং কলকাতা সে সকল সঙ্ঘের প্রধান দপ্তর। তারা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় এক করবার জন্য প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। [১০০]

পূর্ববাংলা সরকার পত্রিকায় প্রকাশিত ও পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত বহু অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করেছেন। তদন্তের ফলে অধিকাংশ ঘটনাই অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংবাদগুলি প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতার রং চড়িয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্ববাংলা সরকার এ সকল মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে প্রেসনোট প্রকাশ করে প্রতিবাদ

---

[৯৭] Home, Political (C.R), B Proceedings, vol.56, Mar 50, GOEB
[৯৮] ibid, vol 15, File No. March 50/ 72, Page 28-35, GOEB
পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো পত্রিকায় প্রকাশিত আপত্তিকর প্রবন্ধের তালিকা থেকে এ তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
[৯৯] দৈনিক আজাদ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৯
[১০০] ঐ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৯

Dhaka University Institutional Repository

জানায় এবং অনেকবার পশ্চিমবাংলা ও ভারতীয় সরকারের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছে কিন্তু কোন লাভ হয় নাই।

এ সকল পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি ও অবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে বলে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট তালিকা প্রদান করে অভিযোগ জানানো হয়। পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আশা করা হয় যে পশ্চিমবাংলা সরকার এসকল পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পত্রিকাগুলো সঠিক তথ্য প্রকাশ করবে এবং অসত্য ও উস্কানীমূলক লেখা প্রেকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তবে ভারতে এ সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না।[১০১]

লিফলেট

সংবাদপত্রের পাশাপাশি ভারতীয় বিভিন্ন সংগঠন এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন লিফলেট প্রকাশ করে তা ভারতে এবং পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে দিয়ে প্রচারণা চালাত। যশোরের নড়াইল থানার রূপগঞ্জ বাজার থেকে "হিন্দু! জাগৃহি!!" শিরোনামে লিফলেট উদ্ধার করা হয়। লিফলেটটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

> "যে পাপের হিন্দু শাস্ত্রমতে কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই, সেই মহাপাপের যতটুকু ততটুকু প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমরা এই বিষয়গুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া চলিব:-
> (১ম) অত্যাচারী বিধর্মী মুশলমানের সহস্রগুণে প্রতিশোধ গ্রহণ।
> (২য়) যাহারা এই জন্মভূমি পবিত্র হিন্দুস্থানকে তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে চাননা তাহারা আমাদের শত্রুস্থানীয়।--
> (৮ম) মুশলমানেরা যত বড় শত্রু হউনা কেন তাহাপেক্ষা বেশী শত্রু ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়ীরা, তাহাপেক্ষা আরও বেশী শত্রু যাহারা স্বধর্ম্মে থাকিয়াও বিধর্মী শত্রুকে সহায়তা করে। সেই বিভীষণদিগকে যেন কখনও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না ভুলি।"[১০২]

পূর্ব্ব ভারত রাষ্ট্রীয় সজ্ঞ (ঠিকানা:-২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলকাতা।) এর পক্ষ থেকে 'পূর্ব্বভারতের রাজনীতি (নং-১)' শিরোনামে একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়। এতে মুসলমানদের বর্বর জাতি হিসেবে উল্লেখ করে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে পুরাতন বেদবাদ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভারতীয় সরকার ও জনগণকে উস্কানি দিয়ে বলা হয়,

> "ভারতের তিন দিকে তিনটি সাংঘাতিক সমস্যার কারণ সৃষ্টি করিয়া ইংরেজ সরকার দেশত্যাগ করিয়াছে। -----দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের তোষণপ্রিয়তা ও দুর্ব্বলতা এবং মুসলমানদের বর্ব্বরবাদপ্রিয়তা এবং ইংরেজদের দুষ্টতা এই সমস্যাগুলির জন্য দায়ী।
> মধ্যভারতের হায়দারাবাদ, পশ্চিম ভারতের নতুন সৃষ্ট পাকিস্তান অঞ্চল এবং পূর্ব্ব ভারতের পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া জটিল পরিস্থিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ----পশ্চিম ভারতে সৈন্য প্রবেশ করাইয়া দিলে ইহা হইতে অনেক কম খরচায় বর্ব্বরদের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সহজ হইত। এবং কাশ্মিরও কোন্দিন উদ্ধার হইয়া যাইত। ------দুইদিন বাদে মুসলমানরা বুঝিবে পর জাতীয় বর্ব্বর মত গ্রহণ করিয়া নিজের দেশে ও পৃথিবীর নিকট বর্ব্বর বলিয়া তিরস্কৃত হওয়া অপেক্ষা নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষদের বেদবাদ অনুসরণ করা বেশী মঙ্গলকর।-----যদি ভারত আবার অখণ্ড না হয় তবে পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দু থাকিতে পারিবে না এবং সমস্ত ভারতের মুসলমানগণকে পাকিস্তানে যাইতে হইবে।----যদি শক্তিবাদীতা দ্বারা আজই পাকিস্তান হইতে বর্ব্বরদের আড্ডা না ভাঙ্গা যায় জাতীয়তাবাদের ভণ্ডামীতে উহা রুদ্ধ করা যাইবে না।"[১০৩]

---

[১০১] Home, Political (C.R), B Proceedings, vol.15, File No. March `50, 72, Page 28-35, GOEB
[১০২] Home, Political, B Proceedings, Vol. 59, June 50/ 263 GOEB
[১০৩] Home, Political,(C.R) B Proceedings, vol. 4, File No. 1949/242-248, Page 5, GOEB

'Council for Protection of Right of Minorities' (209 Lower Circular Road) এর পক্ষ থেকে `PARTITION OF EAST BENGAL and Establishment of a separate State-only solution of Minority Problem in East Bengal' শিরোনামে একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়। এতে পূর্ববাংলায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের হিন্দুদের অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে হিন্দুদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলা হয়,

> "The only solution of this problem of Minorities of East Bengal is the partition of East Bengal and formation of an independent, secular and democratic state on the basis of the strength of Minorities in East Bengal and secularly minded Muslims."[১০৪]

'স্বাধীন বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষী বাহিনী' নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে **'নরপশু মুসলমানদের জঘন্য অত্যাচার'** শিরোনামে একটি লিফলেটে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে এবং হিন্দুদের দুর্বলতার জন্য তিরস্কার করে লেখা হয়,

> "একবার নয় দুইবার নয় বারে বারে হিন্দুদের উপর মুসলমান পশুদের জঘন্য অত্যাচার হিন্দুর নামে যে কলঙ্কের ছাপ দিয়াছে 'হিন্দু শৌর্য-বীর্য হীন' ইহাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে লেখা থাকিবে। বর্ত্তমানে পূর্ববাংলায় (পাকিস্তানে) মুসলমান শয়তান সকল এবং 'পশু পাকিস্তানী সরকার' নোয়াখালীর কালশিরা গ্রামের রজনী মাঝির বাড়ী লুট করিয়াছে। ইহার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকার উপর। বাগেরহাট থানার বহু লোককে জোর পূর্ব্বক মুসলমান করাইয়াছে। ওখানকার 'চতুস্পদ এস,ডি,ও' প্রত্যেক হিন্দুকে মুসলমান হইতে বলিতেছে। মাটিভাঙ্গা স্টেশনে 'শয়তান পাকিস্তান সরকার' ৩০০/৪০০ আশ্রয়প্রার্থীকে বলপূর্ব্বক আটক করিয়াছে। -----শত শত সতীনারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে।
>
> আপনি কি হিন্দু? আপনার ধর্ম্ম কি আপনি তাও জানেন না ! আপনার মা, ভগ্নি, ছোট ভাইয়ের উপর পশুবৎ পাশবিক অত্যাচারে-নীরব থাকাই কি আপনার ধর্ম্ম !------আপনি নীরবে সবই সহ্য করে যাচ্ছেন ! তবে কি আপনি বীর্য হীন ছিঃ ছিঃ !------
>
> জাগ্রত হউন, বীরদর্পে এগিয়ে আসুন আপনার পবিত্র ভারতবর্ষে 'পাকিস্তানকে' চিরতরে উচ্ছেদ করুন আপনারা দলে দলে প্রতিবাদ তুলুন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ 'হিন্দুস্তান'। প্রতিজ্ঞা করুন 'হিন্দুস্তানের' ভিতর 'পাকিস্তান থাকিবে না। ঐ সকল বিদেশী পশুদের ধ্বংস করুন। শত্রু নিধন আপনার ধর্ম্ম।------ পাকিস্তান ধ্বংস হউক ! মুসলমান ধ্বংস হউক !!"[১০৫]

এ লিফলেটের বক্তব্য থেকেই অনুমান করা যায় যে যারা এটি প্রকাশ করেছে তাদের পূর্ববাংলা সম্পর্কে মূলতঃ কোন ধারনাই নেই। কালশিরা, নোয়াখালী, বাগেরহাট, মাটিভাঙ্গা ইত্যাদি নামগুলোই কেবল শুনেছে এ সকল স্থান কোথায় সে সম্পর্কেও তাদের কোন ধারনা নেই। তারা লুট হওয়া টাকার যে অঙ্ক উল্লেখ করেছে তা যে কতটা অসম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। কালশিরা নিম্নশ্রেণী নমঃশুদ্র অধ্যুষিত একটি গ্রাম। তাদের কি পরিমান সম্পত্তি থাকতে পারে সে সম্পর্কেও প্রচারকারীদের কোন ধারনা নেই। হিন্দুদের রক্ষা করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমান জাতি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে উস্কানি দেয়া এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও ঘৃণার সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

আর একটি লিফলেটে পূর্ববাংলায় আলাদা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবীতে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের দেয়া ভাষণ ও বক্তব্য তুলে ধরা হয়। J.P Mitter পৃথক রাষ্ট্রের দাবী বলেন, "We therefore demand partition of East

---

১০৪ ibid

১০৫ Home, Political (C.R), B Proceedings, vol. 4, File No. 1949/ 242-248, GOEB

Bengal to escape from the tyrann and intolerance of theocratic Government. By pursuing a discriminatory policy they have brought about the economic ruin of the minorities."[১০৬]

এতে পূর্ববাংলায় হিন্দুদের বিভিন্ন সমস্যা ও আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এ ধরনের প্রচারপত্র খুব সহজেই সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং দুই দেশ ও জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পরিস্থিতি জটিল করে তুলে।

১৯৫১ সালের ৫ মার্চ রাজশাহিতে কলকাতার দুইজন হিন্দু যুবককে আপত্তিকর প্রচারপত্র বিলি করবার সময় গ্রেফতার করা হয় এবং এদের সঙ্গেও আরও কয়েকজন আত্মগোপন করে।"[১০৭]

বুকলেট

কলকাতার 'Arunachal Mission World Peace' অফিস থেকে প্রকাশ করা হয় 'Indo-Pakistan Federal Union' নামে একটি বুকলেট। এতে লেখক মনে করেন যে, জনসংখ্যা বিনিময় পূর্ববাংলার মন্দির, মূর্তী সমূহের বিশেষ করে সিতাকুণ্ডের মত পবিত্র স্থান স্থানান্তর সমস্যার কোন সমাধান করা যাবেনা আর মুসলমানদের কোন অধিকার নেই এ সকল স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করার। তিনি মনে করেন যে, পাকিস্তানে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যালঘুদের একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গঠন করাই একমাত্র সমাধান। ভারতের অবশ্যই সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করাই একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন। [১০৮]

'NOW OR NEVER' শিরোনামে একটি বুকলেট প্রকাশ করে 'Council for Protection of Right of Minorities'. এতে বলা হয় যে ১৯৪৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে লক্ষী মণি নামে ১৪ বছরের এক বালিকাকে রাজা মিঞা নামে এক লোক তার পিতার নিকট থেকে জোর করে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে লালবাগ থানায় মামলা করা হয়।[১০৯]

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত করে পুলিশ ইন্সপেক্টর রিপোর্ট প্রদান করে যে, মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সে নিজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার পিতার গৃহ ত্যাগ করে। সে শান্তিনগরে তার স্বামী রফিকুজ্জামান চৌধুরীর (রাজা মিঞা) সঙ্গে বসবাস করছিল। সে গর্ভবতী অবস্থায় মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর মারা যায়। এটি কোন ক্রিমিনাল কেস নয়।[১১০]

১৯৪৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর পূর্ববাংলা সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়, কলকাতা থেকে সংখ্যালঘু সংরক্ষণ কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী 'NOW OR NEVER' পত্রিকাটির সকল সংখ্যা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এ পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ, অনুবাদ অথবা উদ্ধৃতি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়।[১১১]

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির (১৬৮/১ রমেশ দত্ত স্ট্রিট, কলিকাতা) থেকে প্রকাশিত হয় শ্রী আদিত্যনাথ দাস প্রণীত পুস্তিকা 'পাকিস্তানে আগুন জ্বলে হিন্দুরা যায় রসাতলে'। এতে কাব্যকারে লেখা হয়,

"বার বার আগুন জ্বলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে,

---

১০৬ PLIGHT OF MINORITIES IN EAST BENGAL Demand for "Separate Secular" State, Home, Political (C.R), B Proceedings, vol.50, File No. B Feb. 53, 214-215 Page- 84, GOEB

১০৭ ibid, Vol. 59, June 50/ 263, GOEB

১০৮ ibid, Vol. 54, page-1, GOEB

১০৯ ibid, vol.15, File No. March 53/2289-2297, GOEB

১১০ ibid, vol.15, File No. March 53/ 2292, GOEB

১১১ দৈনিক আজাদ, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৯

বার বার হিন্দুর সর্ব্বনাশ করছে মুসলমানে।
নানা অত্যাচার চালিয়ে তারা হিন্দু জাতির পরে
ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে তারা বাধ্য করে তাদের।

বাগেরহাটে লাগলো আগুন দাউ-দাউ-দাউ জ্বলে
কালশিরা গ্রাম পুড়ে হ'ল ছাই তোমার কোপানলে

পাকিস্তানে আগুন জ্বলে, হিন্দুরা যায় রসাতলে,
মুসলমান গুণ্ডাদলে চালায় অত্যাচার।

মায়ের বুক হতে কাড়ে শিশু, তরাসে কাপে অষ্টবসু,
আছ্‌ড়ে মারে কচি শিশু নর পিচাশের দল।।
প্রৌঢ়দের বুকে ছুরি মারে, যুবকদের গুলি করে,
বৃদ্ধদের লাথি মেরে পাঠায় যমের বাড়ী।

হিংসার তারা আগুন জ্বলে, মারছে হিন্দুদের পিষে দলে,
হিংস্র জন্তুদের নাই দয়া মমতার লেশ।।"[১১২]

এতে আরও বর্ণনা করা হয় যে মুসলমানরা নামাজ পড়ার সময় অর্ধেক নামাজের পর গিয়ে দশজনকে হত্যা করে এসে আবার নামাজ পড়ে। এতে আরও অনেক ধরনের লোমহর্ষক অত্যাচারের বর্ণনা করা হয়েছে। যা পড়ে যে কোন সাধারণ হিন্দু লোকের মনেও ভীতির সঞ্চার হবে এবং প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠবে। সুযোগ মত অত্যাচার করবে নিজের প্রতিবেশী মুসলমানের উপর অথবা ভয় পেয়ে দেশত্যাগ করে পালাবে অজানা আতঙ্কে।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির থেকে আরও প্রকাশিত হয় শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত পুস্তিকা 'পাকিস্তানে হিন্দু দলন'। এতে কাব্যকারে লেখা হয়,

"পূর্ব্ববঙ্গ মুস্লিম-রাষ্ট্রে ,-শুনতে মোরা পাই,
এখনো চলে নানা অত্যাচার হিন্দুর উপরে ভাই।
নিত্য সেথায় নারী-ধর্ষন চলে –শুনছি কত ঘরে,
সুন্দরী নারী দেখ্‌লে পরে –ধর্ম্মান্তরিত করে।

হিন্দু পল্লীতে শত অত্যাচারের বন্যা বয়ে যায়।

দানব রাজ্যে কি হ'ল পাকিস্তান– মানর সেথায় নাই?
পাকিস্তানে হিন্দুর অবস্থা যাযাবরের মত,
নিত্য উচ্ছেদ হচ্ছে তারা দেখ্‌ছি শত শত।

চাক্‌রির তরে যারা করে বাস –হিন্দুস্তানে ভাই।
তাদেও 'টিকি'তে এবার পড়েছে টান– রক্ষা আর নাই।
খাস্‌ করছে তাদের জমি –'গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান',
পূর্ব্ববঙ্গের চাক্‌রে বাবু! তোমার নেইকো পরিত্রাণ।

দেড় কোটিকে কর্‌লে হয়রাণ হবে সাড়ে চার কোটী হয়রানী।"[১১৩]

---

[১১২] দাস, শ্রী আদিত্য নাথ, পাকিস্তানে আগুন জ্বলে, হিন্দুরা যায় রসাতলে, মহাজাতি সাহিত্য মন্দির, ১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা (মিনার্ভার নিকটে), ibid, Vol. 9, File no. January '53/ 392, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

এতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে হিন্দুদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদে, হিন্দু বাড়ি দখল, রিক্যুইজিশন, জমি দখল, হিন্দুর জমি খাস জমি হিসেবে দখল করা, হিন্দুদের সম্পত্তি লুট করা, ডাকাতি করা, বাড়ি থেকে জোর পূর্বক তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদির বর্ণনা। এ সকল বর্ণনা পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় অবস্থানকারী যে কোন মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

নাটক

'Indian People's Theatrical Association (ac.P.I) Organization' পক্ষ থেকে শ্রী দীজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা নাটক 'বাস্তুভিটা' প্রকাশ করা হয়। এর কিছু কপি কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করা হয়। হিন্দুদের দেশত্যাগের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয় মুসলমান যুবক কর্তৃক হিন্দু নারী নির্যাতন, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের হয়রানি করা ইত্যাদি। এই নাটকে মুসলমানদের দ্বারা একটি প্রাইমারী স্কুল জ্বালিয়ে দেয়ার, হিন্দু ব্যবসায়ীদের বাজার লুট করার দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ নাটকে বর্ণনা করা হয়, পূর্ববাংলায় হিন্দুদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ নয়। এছাড়া ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় মুসলমানরাই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে 'the Muslim nation are ferocious.'[১১৪]
এ নাটকটি সাধারণ মানুষের মনে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে বলে মন্তব্য করেন জেলা ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। তাদের রির্পোটে বলা হয়, "this book will assist to stir up communal feeling and enmity among the Hindus and Muslims of this district where in communal enmity and peace fully prevail.".[১১৫]
১৯৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে এটি নিষিদ্ধ করা হয়।[১১৬]

১৯৫১ সালের ৩০ মে স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় Dr. Keskar জানিয়েছেন যে ভারতীয় সরকার সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে খবর রাখেন এবং তাদের প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। আর সেজন্য হিন্দুরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে।[১১৭] ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার এ সকল গুজব যাচাই না করেই তার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার দিল্লী চুক্তি মেনে চলছে এবং ভারতীয় সরকার ও ভারতীয় পত্রিকাগুলো এ ধরনের গুজব প্রচার করলে তা হবে দিল্লী চুক্তি ও যৌথ প্রেস কোড বিরোধী।[১১৮]

এ ধরনের প্রচারণা হিন্দুদের মনে মুসলমান বিরোধী বৈরী মনোভাব তৈরী করে। মুখের কাহিনী ছড়ায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, খবরের কাগজে প্রকাশিত কাহিনী ছড়ায় ব্যাপক ক্ষেত্রে।[১১৯] পূর্ববাংলা সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় সরকার কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্বলিত বহু লিফলেট, পুস্তিকা রয়েছে যার প্রকাশকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ববাংলা সরকার ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এর প্রতিকারের জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও পশ্চিমবাংলা সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এধরনের

---

[১১৩] দাস, শ্রী আদিত্য নাথ, পাকিস্তানে হিন্দু –দলন, মহাজাতি সাহিত্য মন্দির, Home, Political (C.R), B Proceedings, Vol. 9, File no. January '53/ 392, GOEB
[১১৪] Letter from District intelligence Branch, Trippera, Comilla, the 19 May 1948, ibid, Vol. 45, File No. Dec.1948-1949/. 132-133, Page- 13,GOEB
[১১৫] Letter from District intelligence Branch, Trippera, Comilla, the 19 May 1948, ibid, Page 13 GOEB
[১১৬] ibid, Page 13,GOEB
[১১৭] Statesman, 30 May 1951
[১১৮] Statesman, 30 May 1951
[১১৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ৫৬

প্রচারণা হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরী করে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে হিন্দুদেরকে দেশত্যাগে প্রভাবিত করে।

ভারত হিন্দু প্রধান রাষ্ট্র বলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতের প্রতি আগ্রহ ছিল। অন্যদিকে ভারতের সরকার ও সাধারণ জনগণেরও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিভিন্ন কারণে আগ্রহ ও সচেতনতাবোধ ছিল যা তাদেরকে ভারতে আশ্রয়দান ও পুনর্বাসনে আগ্রহের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে ভারতে পুনর্বাসনের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রচারণা ও চেষ্টা চলতে থাকে। যা ভারতীয় ও পশ্চিমবাংলা সরকার এবং কিছু উদ্যোগি নেতৃবৃন্দ পুনর্বাসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সভা সমিতিতে দেয়া তাদের বক্তব্য প্রচার মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয় এবং তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রচারিত হলে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতে বাসস্থান গড়তে আগ্রহী করে তুলে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ও দেশত্যাগকারী হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা

পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে। তারপরও পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় আবার কখনও পরিষদ অধিবেশনে, প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে অতিরঞ্জিত, উস্কানীমূলক বক্তব্য দিতেন যা পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে এবং পশ্চিমবাংলায় বসবাসরত তাদের আত্মীয় স্বজনদের মনে ব্যাপক ভীতি ছড়িয়ে পড়ত ফলে তারা এদেশে বসবাস করার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে যা তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ করে প্রচারণা চালিয়ে হিন্দুদের মনে ভীতি ও নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের এই সকল নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে অনেক সময়ই ভারতীয় সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সাধারণভাবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা হলেও সেই ব্যবস্থাগুলো পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতে চলে যেতে উৎসাহিত করেছে। ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন রকম বক্তব্য, প্রচারণা, পূর্ববাংলা সম্পর্কে নেতিবাচক বিভিন্ন বক্তব্য যে সাধারণ হিন্দুদের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তা অনুধাবন করে পূর্ববাংলার সরকারী কতৃপক্ষসহ বিভিন্ন রাজনেতিক-অরাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এখানে বসবাসরত হিন্দুগণ এমনকি অনেক সময় ভারতীয়দের পক্ষ থেকেও অনেকে বিব্রত বোধ করতেন।

সমস্যার পাশাপাশি হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ দেশভাগের পরপরই জনসংখ্যা বিনিময়ের দাবী তুলেছিল। পূর্ববঙ্গের নেতা সামসুদ্দীন আহমেদ অভিযোগ করেছিলেন যে হিন্দু মহাসভার উস্কানীতেই সংখ্যালঘুরা চলে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার দুমাস পরেই কলকাতার প্রবাসী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, "পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাদের পিছনে হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতার উস্কানী রহিয়াছে। ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।"[১]

কৃত্রিমভাবে যে নূতন রাষ্ট্রের সঙ্গে তার ভাগ্য সংযুক্ত হল তার রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে সে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেনা। একটাই সমাধান তা হল অন্য রাষ্ট্রে চলে যাওয়া। নূতন রাষ্ট্রে নূতন পরিবেশে তার মানিয়ে নেয়া দুস্কর।[২] দেশের রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন তাই ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে খণ্ডিত বাংলা প্রদেশই ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য হিসেবে অবস্থান করবে। খন্ডিত পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাছ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এর পর শুরু হয় সান্তনা ও প্রতিশ্রুতির বহর।[৩] আন্তরিকতা ভরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দুর্ভাগ্য পীড়িত শরণার্থীদের দুহাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়ে সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ সুবিধা দেবার আবেদন জানিয়েছিলেন গান্ধীজী।[৪]

দুই দেশের নেতারাই তখন বারবার ঘোষণা করেছেন, সময় সময় যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তারা পালন করবেন। তাদের এই আশ্বাসে বিশ্বাস করে অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়নি। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আসা শুরু হয়ে যায় যখন দেশভাগ, বঙ্গবিভাগ মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।[৫]

---

[১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ দেশত্যাগ, পৃষ্ঠা ৬০
[২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭-৮
[৩] অনিল সিংহ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, পৃষ্ঠা ২
[৪] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩
[৫] শংকর ঘোষ, হস্তান্তর, পৃষ্ঠা ১৮৫

উদ্বাস্তুদের অনেকেরই ভরসা ছিল যে, স্বাধীন ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানাতে শিয়ালদহ স্টেশনে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা রাখবেন। কারণ দেশ বিভাগের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, গান্ধীজী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ জাতীয় নেতারাই ঘোষণা করেছেন যে, দেশ বিভাগের জন্য যদি সংখ্যালঘুদের পাকিস্তানে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে ভারতই তাদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন দেবে। (পূর্ববঙ্গেরই ছেলে প্রফুল্ল ঘোষ তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী) তিনি অবশ্যই উদ্বাস্তুদের অভ্যর্থনা, আশ্রয়দান ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন।[৬]

নেহেরুজী প্রচ্ছন্নভাবে পূর্ববাংলার শরণার্থীদের "বিদেশী" আখ্যা দিয়েছেন একেবারে শুরু থেকেই। তাদের নিজেদের দেশেই বরাবর তাদের রক্ষা করার আশ্বাস দিয়েছেন যদিও তার জানা ছিল অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তাদের (নেহেরুজীদের) "নিজেদের দেশে" আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অনিল সিংহ দুঃখ করে বলেন, "হায় ভগবান কংগ্রেসের দৌলতেই আমরা উদ্বাস্তুরা "নিজ দেশে" বিদেশী সাব্যস্ত হয়ে গেলাম।"[৭] পণ্ডিত জওহেরলাল নেহেরু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় বলেছিলেন যে তিনি সাময়িকভাবে পাকিস্তান মেনে নিচ্ছেন।[৮] ব্রিটিশ সরকার ভারতকে বিভক্ত করার ঘোষণা করলে ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ হতে তার কর্ণধার জওহেরলাল নেহেরু একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করেছিলেন,

> "দেশ বিভাগের পর যাদের নাড়ীর যোগ ভাবী ভারত রাষ্ট্রের সহিত ছিন্ন হবে অথচ যারা রয়ে যাবে ভাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রে, তাদের কল্যাণচিন্তা ভারতের ভারতীয় শাসকদের মনে নিত্য জাগ্রত থাকবে এমনকি প্রয়োজন হলে তারা যদি দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়, তাদের ভারতের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হবে।"[৯]

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন যে, নয়াদিল্লী যেহেতু পূর্ববাংলার শরণার্থীদেরকে 'জাতীয় সমস্যা' বলে স্বীকার করেছে সুতরাং এই ঘোষণার পরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবেলা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকেই করতে হবে।[১০] ১৯৫০ সালে ১৭ আগষ্ট লোকসভার বিতর্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জওহেরলাল নেহেরুর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। বক্তব্যটি হচ্ছে,

> "পূর্ববঙ্গে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হবে তাদের নিজেদের দেশেই তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা। আর যদি অন্য উপায় না থাকে এবং বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমাদের নিজেদের দেশেই তাদের আশ্রয় দেওয়া। পূর্ব পকিস্তানে যারা সংখ্যালঘু তারা নিশ্চিত আমাদের দায়, এই অর্থে যে তারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে, আর তা যদি না সম্ভব হয় তাদের নিরাপদ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।"[১১]

ঘোষণার এই অঙ্গিকারই ভবিষ্যৎ দুর্দিনের আশংকা হতে তাদের পরিত্রাণ করবার একমাত্র ক্ষীণ আশার আলোকবর্তীকাই সেদিন বিরাজ করছিল।[১২] ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার আগে থেকেই হিন্দু নেতৃবৃন্দ পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়া শুরু করে। তারা পশ্চিমবাংলা যেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় সে ব্যাপারে পূর্ববাংলার হিন্দুদের বোঝাচ্ছিল যে পূর্ববাংলা হিন্দুদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে এবং পশ্চিমবাংলাই হবে হিন্দু শরণার্থীদের জন্য স্বর্গ, ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেসের ময়মনসিংহ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ধারণা দেন। হিন্দু

---

[৬] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), পৃষ্ঠা ১৮-১৯
[৭] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩
[৮] দৈনিক আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৬৪
[৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭-৮
[১০] দৈনিক আজাদ, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
[১১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১
[১২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭-৮

নেতৃবৃন্দ পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে যেভাবে বোঝাচ্ছিল তার ব্যাখ্যা করে Profulla Kumar Chakrabarti বলেন,

> "The Congress leadership of India as well as of West Bengal talked sweetly to the East Bengal Hindus, assuring them that if West Bengal was included within the Indian Union, the East Bengal Hindus would find a haven of refuge in West Bengal should the Muslim League make it impossible for them to live in East Bengal."[১৩]

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে এক প্রার্থনা পরবর্তী সভায় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি ভারতের দায়িত্ব সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার সাথে এক বক্তব্যে বলেন,

> "কল্পিতভাবে বা বাস্তবে আতংকগ্রস্থ হয়ে যেসব হিন্দু পাকিস্তানে তাদের নিজগৃহে থাকতে পারবেনা, তাদের একটা সমস্যা আছে। তাদের কাজকর্ম বা গতিবিধিতে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়, তাদের নিজেদের প্রদেশে যদি তাদের সহিত বিদেশীর মত আচরন করা হয়, তাহলে সেখানে তারা থাকতে পারবেনা। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্কিত প্রদেশের নিশ্চিত কর্তব্য এমন উদ্বাস্তুদের দু'হাত খুলে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ সুবিধা দেওয়া।"[১৪]

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উষ্কানীমূলক বক্তব্য অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে, স্যার যদুনাথ সরকারও এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুদেরকে প্রভাবিত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে স্যার যদুনাথ সরকার তার বক্তব্যে হিন্দুদের এই দেশত্যাগকে, ইংলিশ পিউরিট্যানদের হল্যান্ড এবং ফ্রান্সের প্রটেস্টানদের দেশত্যাগ করে চতুর্দশ লুইয়ের সময় হল্যান্ড, এশিয়া ও ইংল্যান্ড আশ্রয় গ্রহণকারীদের সঙ্গে তুলনা করে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থান এর ভবিষ্যদ্বানী করেন তার বক্তব্য তুলে ধরে Profulla Kumar Chakrabarti বলেন,

> "Sir Jadunath could easily visualize that East Pakistan was lapsing into barbarism and the Hindu population there had no future, no chance of honorable work and fair employment by service or trade, no hope of real political equality or economic prosperity by honest open competition."[১৫]

স্বাধীনতার মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পাকিস্তানের মুসলমান শাসনে যে দেশের কি অবস্থা হবে তার কাল্পনিক ভবিষ্যদ্বানী করে স্যার যদুনাথ মুসলমান শাসনে প্যালেস্টইনের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন,

> "It was then a poor desert country with an ignorant, impoverished, half-civilized population leading a sort of animal existence and dying of disease, dust and hunger like neglected cattle.[১৬]

তিনি হিন্দু শাসনের প্রসংশা করে তার এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলমান শাসনে পাকিস্তানের অবস্থাও এরকম হবে। তার এই বক্তব্য একটি সদ্যস্বাধীন দেশের সাধারণ লোকের মনে কতটা ভীতি

---

[১৩] Profulla Kumar Chakrabarti, Marginal Men: The Rfugees and the Left Political Syndrome in West Bengal, Page 22

[১৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

[১৫] Profulla Kumar Chakrabarti, op-cit, Page 24

[১৬] Profulla Kumar Chakrabarti, op-cit, Page 24

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে সে দেশের সংখ্যালঘুদের মনে তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তিনি পূর্ববাংলার ভয়ংকর পরিণতি হবে তা বোঝানোর জন্য আরও কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরেন।[১৭]

স্যার যদুনাথ সরকারের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা ভারতীয়দের কাছে এতটাই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল যে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছেন। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে নিজামের রাজ্যে হায়দেরাবাদে পুলিশি অভিযান ঘটে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার দলে দলে শরণার্থীরা এসে উপস্থিত হতে থাকেন, ফলে ভারতের মাটিতে সমস্ত পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকও ক্যাম্প হয়ে যায়।[১৮]

পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগণা থেকে সতীশ চন্দ্র দাস এক চিঠিতে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নওয়াব নাজিমুদ্দীন এর নিকট হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ করা এবং দেশত্যাগকারী হিন্দুদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের অনুরোধ জানান। পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কাজ দিয়ে, খাদ্য ও বাসস্থান দেয়ার বিভিন্ন রকম প্রতিশ্রুতি প্রদান করে প্রলুব্ধ করা হলে এ সকল প্রতিশ্রুতি হিন্দুদের পূর্ববাংলা ত্যাগের হার বৃদ্ধি করবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

> "This fact will stand act that the West Bengal Government takes care of the evacuee arrivals from East Bengal. Then, despite all the preaching against mass evacuation more and more evacuees will be encouraged come and demand of the West Bengal Government the promised amenities."[১৯]

পশ্চিমবাংলা সরকার পূর্ববাংলার হিন্দুদের সরাসরি দেশত্যাগে উৎসাহিত না করলেও যে সকল হিন্দুরা পশ্চিমবাংলায় আশ্রয়গ্রহণ করছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সে সকল কার্যক্রম পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে আকৃষ্ট করবে বলেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন।

> "There should be no practical encouragement to the East Bengal evacuees by attempt to settle those that have arrived. Because then, more and more will come. The thinner the left over population becomes greather will be the urge for them to come over. And this is happening."[২০]

পূর্ববাংলা সম্পর্কে যে সময় পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন অপপ্রচার হচ্ছিল সেই সময় পশ্চিমবাংলার গভর্নর কৈলাশনাথ কাটজু চারদিন ব্যাপী পূর্ববঙ্গ সফর করে ১৯৪৯ সালের ২৯ জুন পশ্চিমবাংলায় ফিরে যান। তিনি ফিরে গিয়ে কলকাতায় পূর্ববঙ্গের শান্তিপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা করে বলেন,

> "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি সচক্ষে দেখিয়াছি যে, ভারতের যে কোন অংশের ন্যায় ঢাকাতেও নাগরিকগণ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করিতেছে। ------ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এইরূপ শান্তি সম্প্রীতি, সৌহার্দ্দ ও সহযোগিতার কৃতিত্ব পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের। - তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অপূর্ব উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ভাব দেখাইয়া আসিতেছে বাহিরের শত উত্তেজনাতেও তাহারা বিভ্রান্ত বা কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। ইহার সবচেয়ে বড় প্রমান পাকিস্তান কায়েম হইবার পর আজ পর্যন্ত যারা পূর্ব বাংলায় কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই। - - ইহা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক ও এক শ্রেণীর সংবাদপত্র পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের প্রতি কল্পিত দুর্ব্যবহারের কাহিনী

---

১৭ Profulla Kumar Chakrabarti, op-cit, Page 24

১৮ অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫

১৯ Home, Political (CR) B Prioceedings, Vol. 44, File No. March 1948/ 12 E 1, page 1 GOEB

২০ ibid, page 2

প্রচার করিয়া পূর্ববাংলা তথা প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়া থাকেন।”[২১]

১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে, সাময়িকভাবে পাকিস্তান সফরকারী মুসলমানদের ভারতে প্রত্যাবর্তনের পারমিট বাতিল করা হয়। ভারত সরকার স্বল্পকালীন সময়ের জন্য পাকিস্তান ভ্রমণকারী মুসলমানদের “প্রত্যাবর্তনে আপত্তি নাই’ সার্টিফিকেট দিত। আগস্ট মাস থেকে সেটি বাতিল করা হয়। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে করাচীর সরকারী মহল থেকে অভিযোগ করেন যে, সাময়িকভাবে পাকিস্তান সফরকারী ভারতীয় মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বন্ধ করার জন্য এবং তাদের সম্পত্তির জিম্মাদারদিগকে ঐ সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করার সুযোগ দানের জন্যই ভারত সরকার গত আগষ্ট মাসে ঐরূপ সফরকারী মুসলমানদের “প্রত্যাবর্তনে আপত্তি নাই” সার্টিফিকেট বাতিল করে দেন।[২২]

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দেরাবাদে পুলিশ এ্যাকশনের পর হিন্দুদের দেশত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। তবে এর পূর্বে হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং ভারতীয় সরকারের মধ্যে যখন বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা চলছিল তখন থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দুদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হচ্ছিল। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে দেশত্যাগের প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং ১৯৪৯ সালে শেষ দিকে এই হার আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময়ের দেশত্যাগ স্বাধীনতার পর দেশত্যাগের প্রথম ধাপ।[২৩]
১৯৪৯ সালের শেষে যে পরিস্থিতি দাড়িয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল অন্তত কিছুকালের জন্য পূর্ববাংলা থেকে আগত বাস্তুত্যাগীর সংখ্যা নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তাদের জন্য আশ্রয়দানের সমস্যা আর থাকবেনা।[২৪] ১৯৪৯ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে কিছু ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে যা সেখানকার মুসলমানদের দেশত্যাগে বাধ্য করে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মসজিদ দখল করে তাকে অপবিত্র করা এবং কিছু ক্ষেত্রে মসজিদকে বাসস্থানে পরিবর্তিত করা। কলকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় রাইটার্স বিল্ডিংস মসজিদের ইমাম সাহেবের এক পত্র। তাতে প্রকাশ করা হয় যে আবাসিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে মসজিদ ব্যবহার করা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। কলকাতায় বিভিন্ন এলাকায় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ২০টি মসজিদ অপবিত্র করা হয়।[২৫]
১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ এর আমিনুদ্দৌলা পার্কে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক জে.দেশপাণ্ডে দৃঢ়তার সাথে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ভারতের সাথে পাকিস্তানের মিলনের দাবী করে ঘোষণা করে বলেন,

> “ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদই এই বিরাট দেশের অবনতির মূল কারণ। ----আমাদের আজ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতে হইবে যে, হিন্দু মহাসভা এদেশে হিন্দু রাষ্ট্র করিতে ও ভারতের সহিত পাকিস্তানকে পুনরায় যুক্ত করিয়া অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ভারতীয় সরকারের নীতি মুসলমানদের নিকট একান্ত আত্মসমর্পন।”[২৬]

হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে বীর সাভারকার এবং ড. খারে যে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে তাদের এই প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা দিয়েছে কংগ্রেস সরকার। ভারত সরকার মুদ্রার অবমূল্যায়ন গ্রহণ করে আর্থিক দিক দিয়া ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য তারা পাকিস্তানকেই দায়ী

[২১] বিস্তারিত ibid, Vol. 62, File No. Feb. 50/ 32-38 GOEB
[২২] দৈনিক আজাদ, ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৯
[২৩] Profulla Kumar Chakrabarti, op-cit, page 1-2
[২৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০
[২৫] দৈনিক আজাদ, ২ ডিসেম্বর ১৯৪৯
[২৬] ঐ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯

করেন কারণ পাকিস্তান তার মুদ্রার মূল্যমান কমাতে রাজী হয় নাই।"[২৭] ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অব্যাহত প্রচারণার উত্তরে পূর্ববাংলা সরকারের ১৯৪৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর এক প্রেসনোটে বলা হয়,

> "সরকার গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ লক্ষ্য করিতেছে যে ভারতীয় নেতাগন বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও বাস্তুত্যাগ সম্পর্কে "আষাঢ়ে গল্প" পুনরায় জিয়াইয়া তুলিতে চাহিতেছেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষণ সমিতির মত কয়েকটি বেসরকারী সংগঠন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছেন।---- এই প্রচার অভিযানের পশ্চাতে যে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা হইল আসাম হইতে পাইকারীভাবে মুসলমান বহিস্করণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।"[২৮]

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এই ধরনের কর্মকান্ড পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও পত্রিকাসমূহকে অনবরত উস্কানীমূলক বক্তব্য পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ প্রচারে উৎসাহিত করে যা ভারতে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং ১৯৫০ সালের দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

হিন্দু মহাসভার উস্কানীমূলক বক্তব্যের প্রভাব কি হতে পারে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশ্বেও আতংক প্রকাশ পায়, সিংগাপুরের ব্রিটিশ পত্রিকায় এর কঠোর সমালোচনা করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে ব্রিটিশ পত্রিকা 'স্ট্রেইটস টাইম' এ বলা হয়,

> "হিন্দু মহাসভার দাবীর ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মনোমালিন্য আরও উগ্র হবে, ইহা নিশ্চয়ই ভারতীয় উপমহাদেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট সমস্যার পক্ষে কল্যাণকর নয়। সুতরাং হিন্দু মহাসভার পাকিস্তান বিরোধী দাবীকে ধিক্কার দেয়া উচিৎ।[২৯]

মহাসভার উস্কানীমূলক বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বক্তৃতায় বলেন,

> "বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের একত্রীকরনের কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এ ঘোষণা অতিমাত্রায় দায়িত্বহীন।---------জনসাধারণকে ধোকা দেওয়ার জন্যই হিন্দু মহাসভার সভাপতি এই প্রকার বিবৃতি দিয়াছেন। আজ আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে ভারতের সহিত পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার কোনই প্রশ্নই উঠিতে পারে না। - - - অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব ও অবাস্তব একথা ভালভাবে জানিয়া হিন্দু মহাসভার সভাপতি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই প্রকার সর্ব্বনাশা প্রচারণায় মত্ত হইয়াছে। ---- "দুই বৎসরের জন্য মহাসভা চুপচাপ ছিল আজ সহসা তাহারা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। পাকভারত পুনর্মিলনের ধুয়া তুলিয়া আর একদিন মাথাচাড়া দিয়া উঠায় আমরা হারাইয়াছিলাম মহাত্মা গান্ধীকে। যাহারা পাক ভারত মিলনের কথা বলে তাহারা মূর্খ। - - যাহারা পুর্ণমিলনের কথা বলে আমি তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।"[৩০]

হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ করে পূর্ববাংলার ব্যবস্থা পরিষদের তফসীলি সদস্য ও যুক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুত দারকানাথ বারোরী ১৯৪৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর, এক বিবৃতিতে বলেন,

> "ড. খারে এবং শ্রীযুত সাভারকার পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হইয়াছে। ইহার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার প্ররোচনা দিতেছেন।-------পাকিস্তানের তফসিলী শ্রেণীর স্বার্থ

---

[২৭] ঐ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৯

[২৮] দৈনিক আজাদ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯

[২৯] ঐ, ১ জানুয়ারী ১৯৫০

[৩০] ঐ,৬ জানুয়ারি ১৯৫০। পাকিস্তানের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা দিল্লী কর্তৃপক্ষ ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালে মহাত্মা গান্ধী এটিকেই সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী বলে উল্লেখ করে এবং নিজে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের পাওনা মিটিয়ে দিতে রাজী হলে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। হিন্দু মহাসভার প্রতিচ্ছায়া ভারতের সেবক সংঘ গান্ধীর এই শান্তিস্থাপন ভূমিকায় আতংকিত হয়ে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি সেবক সংঘের নাথুরাম গড়স গুলি করে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

> রক্ষার জন্য তাহাদের কোন অভিভাবকের প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহারা মনে করে না। কি করিয়া ইহা রক্ষা করিতে হয় তাহারাই তাহা জানে।"[৩১]

হিন্দু মহাসভার কলকাতা সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা ও গৃহীত প্রস্তাবলীর তীব্র সমালোচনা করেন এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জানুয়ারি মাসে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে জনসভার বক্তব্যের সমালোচনা করেন।[৩২] মহাসভার এ ধরণের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে ১৯৪৯ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তান পার্লামেন্টে প্রশ্নত্তোরকালে সহকারী বৈদেশিক সচিব জনাব মাহমুদ হোসেন ভারত সরকারকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুরোধ জানান।[৩৩]
১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে কলকাতা হতে 'রাষ্ট্র' নামক ভারতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল এদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তা বোধের অভাবজনিত একটি আতঙ্ক গ্রস্ত মনোভাব সৃষ্টি করে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় মহল সর্ব্বদা সচেষ্ট। ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রয়েছে এবং এই উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যই এই সব কাহিনী লোকসভায় শুনিয়ে ভারতীয় প্রচার যন্ত্রগুলোকে সহস্রমুখে তাহা ছড়িয়ে বেড়াতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।"[৩৪]

পূর্ববঙ্গ তফসিলী জাতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র দাস এক বিবৃতিতে বলেন যে, এইরূপ প্রলগভ উক্তি ও অবাস্তব প্রস্তাব উভয় ডোমিনিয়নের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করবে।[৩৫]

পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সর্দার প্যাটেল সম্ভাব্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল এর একটি মন্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাংবাদিক শংকর ঘোষ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পূর্ববাংলার বিরুদ্ধে যে সকল গোপন কার্যক্রম চলছিল যা একটি দেশের স্থিতিশীলতাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলতে পারে। তিনি এ রকম এক ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> "পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের উৎখাত করে সেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকা পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া হবে। -----পাকিস্তান যে আপসে তার কোন এলাকা ভারতকে ছেড়ে দিত না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের কিছু এলাকা ছিনিয়ে নেওয়ারও একটি প্রস্তাব হয়েছিল। ------যশোপ্রকাশ সুন্দরবনের কোন একটি জায়গায় একটি বেআইনি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন – অনুমান করা যায় সর্দার প্যাটেলের জ্ঞাতসারে – এবং সেই বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে প্রচার চালানো হত, সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলা ও তার সংলগ্ন এলাকার জন্য একটি প্রবাসী সরকার গঠনের ঘোষণাও করা হত এই প্রচারের জন্য খুলনা জেলাকে বেছে নেয়া হয়েছিল সম্ভবত এই কারণে যে হিন্দুগরিষ্ঠ এই জেলাটি রাজাজির প্রস্তাব ও অন্তর্বর্তী বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে পড়লেও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। --- সে সময় সর্দার প্যাটেলের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানের কিছু এলাকা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার এই প্রচেষ্টার নানা কথা শোনা যেত, গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এইসব ঘোষণাও মাঝে মাঝে রিপোর্টারদের হাতে পৌঁছে যেত। -----কিন্তু এই বেতার-আক্রমণের পিছনে যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন ছিল তা স্পষ্ট হয়ে গেল যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর

[৩১] ঐ, ১ জানুয়ারি ১৯৫০
[৩২] ঐ, ১ জানুয়ারি ১৯৫০
[৩৩] দৈনিক আজাদ, ১৪জানুয়ারি ১৯৫০
[৩৪] ঐ, ১১ আগষ্ট ১৯৫১ (সম্পাদকীয়)
[৩৫] ঐ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৫০

> প্রধান জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা এবং পূর্বাঞ্চলের সেনা প্রধান এস বি এস রায় পর পর কয়েকদিন অসামরিক পোশাকে ডাঃ রায়ের বাড়ি এসে তার সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করলেন।[৩৬]

ডাঃ রায় এর একান্ত সহকারী সরোজ চক্রবর্তী তার এক বর্ণনায় বলেন যে, তারা পরপর তিনদিন গোপন আলোচনায় বসেন। তৃতীয় দিনে ডাঃ রায় তাকে রুমে ডেকে পাঠালে তিনি সেখানে ঢুকে দেখেন যে জেনারেল কারিয়াপ্পা তার হাতের বেটন দিয়ে অবিভক্ত বাংলার ম্যাপের ওপর খুলনা জেলার একটি জায়গা দেখাচ্ছেন। তারা খুলনা ও যশোরে পাকিস্তানের দুর্বল জায়গা ও ভারতের সেনা চলাচল ও রসদ সরবরাহ নিয়ে তারা আলোচনা করছেন। তারা সরোজ বাবুকে দেখতে পাননি।[৩৭]
সর্দার প্যাটেল একসময় পূর্ববাংলায় সেনা প্রেরণের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির কথা শুনলেন তখন তার মনে হয় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার নৈতিক অধিকার ভারত হারিয়েছে।[৩৮]

মাস্টার তারা সিং ১৯৪৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাতিয়ালায় এক মিটিং এ ভারতীয় সরকারকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরামর্শ প্রদান করেন এবং তার ও শিখদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন. "The Sikhs were prepared to sink all their differences with the Hindu leaders of the Indian Union for the sole object of destroying Hyderabad, first and finaly Pakistan."[৩৯]
কোন কোন মহল থেকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করার জল্পনা কল্পনার নানা অলীক কথাবার্তাও প্রচারিত হতে থাকে।[৪০] পূর্ববাংলা আক্রমণের একটি পরিকল্পনার বর্ণনা দেন মনীন্দ্র পাল, তিনি বলেন,

> "মনে হয় ১৯৫০ সাল নাগাদ আমরা পূর্ববাংলা আক্রমন করতে পারি শম্ভুবাবু ও আমরা মিটিং করি ব্রুকবন্ড- এসপ্লানেডে, সেখানে একটা অফিস ছিল। – ওখানে রাত্রি আড়াইটা তিনটা নাগাদ বসা আছি শ্যামাপ্রসাদের জন্য তিনি বললেন এসব করতে যেও না। আমরা আক্রমন করতে চেয়েছিলাস পূর্ববাংলা, কারণ আমাদের অস্ত্র এসে গেছে নদীয়া বর্ডারে। ---কারণ আমাদের সমস্ত লোকজনদের মেরে, ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিচ্ছে, ভীষণ অবস্থা। এই ঘটনা ১৯৫০ সাল নাগাদ। বহু মানুষকে ট্রেনে পাঠায়, বহু মারা যায়। তার জন্য এরকম একটা আক্রমণের ব্যবস্থা করি। কর্পুরী ঠাকুর বিহার থেকে বহু লোক চার পাঁচ লরি নিয়া এসে গেছে নদীয়া বর্ডারে। খালি আমাদের অর্ডার। আর্মি নয় সিভিলিয়ানদের সঙ্গে।---আমরা ছিলাম। কলোনি কমিটির লোকজনও ছিলেন। বহু লোক যোগ দিয়েছিল।[৪১]

পূর্ববাংলা আক্রমণের পরিকল্পনার ব্যাপারে মানস রায় বলেন, চীনের কাছে হেরে আমরা পাকিস্তানের জন্য তৈরী হচ্ছি।[৪২]
বাঁকুড়ার এক জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহেরলাল নেহেরুকে লক্ষ্য করে পূর্ববাংলায় অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে পূর্ববাংলার হিন্দুদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে হিন্দুদের ফেরত পাঠানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করে বলেন,

---

[৩৬] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, যশোপ্রকাশ মিত্র সর্দার প্যাটেলের একজন আস্থাভাজন বাঙালি ব্যারিস্টার, রাজনৈতিক মহলে পরিচিত কারণ তিনি মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের কৌঁসুলীর সহকারী ছিলেন। পৃষ্ঠা ২১৬
[৩৭] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭
[৩৮] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮
[৩৯] Home, Political (CR), B Proceedings, vol. 4, File No. May `52/242-248, Page 94
[৪০] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০২
[৪১] মণীন্দ্র পাল , ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদক- ত্রিদিব চক্রবর্তী পৃষ্ঠা ১২১। ঢাকায় একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন, তিনি মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রর্বীর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তার বাড়ি আক্রান্ত হলে তিনি পালিয়ে কলকাতায় গমন করেন।
[৪২] মানস রায়, কাঁটা দেশে ঘরের খোঁজ, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদক- ত্রিদিব চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২৬০

> "পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে অস্ত্র দাও তাহারা পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবে এবং মুসলমান গুন্ডাদের হাত হইতে নিজেদের ধন সম্পত্তি উদ্ধার করিবে। মেয়েদের উপর অত্যাচারের কোন প্রতিকার তাহারা করিতে পারে নাই।-------আঘাতের পর আঘাতে তাহারা নিস্পৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। মনুষত্ব্যের উপর এত বড় অপঘাত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো হয় নাই।"[৪৩]

এ ধরনের বক্তব্য একটি জাতি বা শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে তুলে দেশে দাঙ্গার পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিমবাংলায় অনধিকার উচ্ছেদ বিল

১৯৪৯ সালের জুন থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগের হার কমে যাচ্ছিল। কিন্তু 'The West Bengal land development and planning Act (Act XXI of 1948)' পাশ হলে এ সময় ১২,৫৮০ দেশত্যাগী হিন্দু পরিবারের লোককে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়া হয়।।[৪৪]
স্বাধীনতাকালীন সময়ে এবং স্বাধীনতার প্রথমদিকে ব্যপকহারে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় সরকার সকলকে বৈধ নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। প্রণতি দত্ত বলেন, "Just after partion in 1947, massive refugee migration took place and later all illegal migration was considered legal by Indian Government."[৪৫]

পূর্ববঙ্গের যে সকল লোক পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অন্যের জমি অনধিকার দখল করে রেখেছিল তাদেরকে সকল স্থান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য সরকার একটি বিলের খসড়া আইন পরিষদে পেশ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। উক্ত বিল পেশ করবার পূর্বেই সেখানে এক তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদে বাস্তুহারা অনধিকারী উচ্ছেদ বিল পেশ করবার সংকল্প ঘোষণার পর হতে বিভিন্ন দলের বহু নেতা পূর্ববঙ্গীয় বাস্তুহারাদের নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। সভা, সমিতি, মিছিল, করে উক্ত বিলের বিরোধীতা করা হয়। বিরোধীদলগুলি ২ মার্চ প্রদেশ ব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারা পরিবর্তন করে পরিষদে উত্থাপিত হবে। প্রথমেই এই বিলের নাম পরিবর্তন করে, 'অনধিকারী দখলদারী উচ্ছেদ বিল' এর পরিবর্তে নূতন নামকরণ হয় 'উদ্বাস্তু পুনর্বসতি ও অন্যান্য অনধিকারী জমি দখলকারী উচ্ছেদ' বিল। 'বাস্তুহারা' যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মতে এর নতুন সংজ্ঞা হয়,

> "যে ব্যক্তি বা যাহারা পরিবার পোষ্যসহ পূর্বে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, (বর্তমানে যাহা পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়েছে) তিনি বা তারা যদি ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় ও ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তথাকার বাস পরিত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে এসে থাকেন তবে তিনি বা তারা হবেন প্রকৃত বাস্তুত্যাগী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ।"[৪৬]

তৃতীয় সংশোধনীতে বলা হয়,

---

[৪৩] দৈনিক আজাদ, ২০ জুলাই ১৯৫০

[৪৪] Profulla Kumar Chakraborti, op-cit, Page 26

[৪৫] Pranati Datta, Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception Study, The Qualitative Report, Volume 9, Number 2, June 2004, Indian statistical Institute, Kolkata, India, Page 337

[৪৬] বিস্তারিত দৈনিক আজাদ, ৪ এপ্রিল ১৯৫১, ২২ এপ্রিল ১৯৫১

Dhaka University Institutional Repository

"যদি কোন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কোন অধিকার বিহীন ভাবে দখলীকৃত জমির উপর বসবাসের উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ করে থাকেন তবে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঐ জমির জন্য সুনির্দিষ্ট সময় অন্তে বা অন্য কোনভাবে টাকা দিয়া ঐ জমিতে বসবাস করিবার অনুমতি পাইবে এবং যতদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগকে অন্য বাসগৃহ নির্মাণ, জমি, গৃহ না দিতে পারিবেন ততদিন তাহারা ঐ দখলীকৃত জমিতে বসবাস করিতে পারিবেন। সরকারকে এমনস্থানে উক্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে জমি বা গৃহ দিতে হইবে। সেখানে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মতানুসারে সে বা তাহারা সরকারী আদেশকালে তাহাদের জীবিকার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা চালাইয়া যাইবার পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধাগ্রস্ত হবেনা।"

৬ এপ্রিল পশ্চিমবাংলা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে "উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিলের তিনটি ধারা গৃহীত হয়।[৪৭] আইনটি পাশ হলে লিয়াকত নেহেরু চুক্তি এবং প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের এবং সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের উপর এর প্রতিক্রিয়া হবে বলে সন্দেহ করা হয় দৈনিক আজাদ এর ১৯৫০ সালের ৪ এপ্রিল সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়তে পূর্ববঙ্গের দেশ ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ফিরতে শুরু করলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববঙ্গ সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের বর্ণনা করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আইন পাশ হবার পর পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। উক্ত আইনের বিধানগুলি দিল্লীচুক্তি বিরোধী।

এই আইনের ফলে এই আশংকা করা হয় যে, বহু হিন্দু পরিবার স্বপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছে আবার এখানে এসে পাকিস্তানী সেজে এদেশের আইনের সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠছে। জমিদারী উচ্ছেদ বিল কার্যকরী হওয়ার পূর্বে জমিদার শ্রেণীর যারা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল তারাও আর একবার দেশে ফিরবার চেষ্টা করবেন কেবল সুযোগ সন্ধানে।"[৪৮]

এই আইন এর সংশোধনের ফলে ভারত ত্যাগকারী মুসলমানদের দেশে ফিরে যাওয়ার বাঁধা উল্লেখ করে মোহাজেরদের সিলেট শাখার এক সভায় সরকারের নিকট দাবী জানানো হয় পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী আইনের প্রয়োগ বন্ধ করার এবং মোহাজেরদের উচ্ছেদ করে প্রত্যাগত হিন্দু বাস্তুত্যাগীগণকে সাহায্য না করার। এই আইনের থেকে হিন্দু বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের পথে একটি বাঁধার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এর জন্য ভারতের এই আইনটি কিছুটা দায়ী।

১৯৫০ সালের ২৮ মার্চ, বাস্তুত্যাগী উচ্ছেদ বিলের প্রতিবাদে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডা: সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে বাস্তুত্যাগীদের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু নীতির সমালোচনা করে সভায় বক্তারা বক্তৃতা করেন। সভা শেষে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে শোভা যাত্রা বের হয়।[৪৯] ২৮ মার্চের সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়,

"এই সম্মেলন সমগ্র হিন্দুস্থানকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি তাহার দায়িত্ব উপলব্ধি করতে এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্মানিত নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য দাবী করতে এবং হিন্দুস্থানকে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা করিতে অনুরোধ করছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্মানিত নাগরিকরূপে বাস করা অসম্ভব বলে মনে করেন তাদের বাসস্থান ও আর্থিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা করা উচিৎ। ----- পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি তাদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করা উচিৎ এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করা উচিৎ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংখ্যালঘুদের নিয়ে এক একটি হিন্দু অঞ্চল গঠন করবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার এবং অর্থ সংগ্রহ ও উপযুক্ত এলাকায় হিন্দুদের বসতি স্থাপন করবার জন্য প্রতি জেলায় সংখ্যালঘু রক্ষা কমিটি গঠন করা দরকার।"[৫০]

[৪৭] বিস্তারিত দৈনিক আজাদ, ১৬ এপ্রিল ১৯৫১,

[৪৮] বিস্তারিত দৈনিক আজাদ ১৬ এপ্রিল ১৯৫১, ২২ এপ্রিল ১৯৫১

[৪৯] ঐ, ৩০ মার্চ ১৯৫১

[৫০] বিস্তারিত প্রবাসী ৪৭শ ভাগ ১ম খন্ড, শ্রাবণ-১৩৫৪ ৪র্থ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩১৮

এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টির নেতা ডা: সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি বলেন যে, যে সকল বাস্তুত্যাগী নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই আইনের বিরোধিতা করছেন। এই বিলটিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ও পুজিঁবাদ ভাবাপন্ন বলেও আখ্যা দেন।[৫১]

ভারতের বাস্তুত্যাগী সম্পতি অর্ডিন্যান্সের সমালোচনা করে পূর্বপাকিস্তান আদিবাসী অচ্ছুৎ লীগের নেতা স্বামী কলিজুগোবিন্দ কবিরপন্থী সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, "মোহাজেরদের সম্পত্তি সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল ভারত সরকার তাহা নির্বিচারে এই অর্ডিন্যান্সের ফলে পদদলিত করে চলেছেন।[৫২]

পূর্ববাংলার হিন্দু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ভারতীয়দের আগ্রহ

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দেশত্যাগী শরণার্থীদের জন্য পশ্চিমবাংলায় কোন পুনর্বাসন কেন্দ্র ছিল না। ভারতীয় মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতি সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে নজর দেন, তিনি ১৯৪৮ সালের ১৩ মার্চ এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দু দেশত্যাগীদের বসবাসের জন্য পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্প গুলোকে ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন। রাজ্যের তৎকালীন পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, সেজন্য ঘোষণা করলেন যে, সরকার উদ্বাস্তু কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্য ৬০ লক্ষ বিঘা কর্ষণযোগ্য পতিত জমি অধিগ্রহণ করার নিমিত্তে শ্রীঘ্রই একটি বিল আইনসভায় উপস্থাপন করবেন।[৫৩] পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের "Productive citizen" হিসেবে তৈরি করার উদ্দেশ্যে এবং এটি কি করে সম্ভব তার একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন,

> "In the circumstances the Government would bring forward a legislation to acquire waste but cultivable land of West Bengal for distribution among the agricultural refugees so that they might prove themselves productive citizens. It was estimated that there were 60 lakh bighas of such land. The West Bengal Government also approached the central Government to make over the military camps to the State Government for the accommodations of refugees for the time being."[৫৪]

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের পুনর্বাসন কর্মসূচী ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববাংলা ত্যাগী হিন্দু শরণার্থীরা কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে তার এক পরিকল্পনা তুলে ধরে ১৯৫০ সালে "Bengal Rehabilitation Oganization" পরামর্শ প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ, মনিপুর, বিহার অঞ্চলের ১.৫ মিলিয়ন অব্যবহৃত জমিকে কৃষি কাজে ব্যবহার করে কলোনি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী মহল।

> "It was claimd that there existed 1.5 million acres of cultivable waste land within West Bengal which could be profitably used for agricultural colonisation and settlement of refugees. ----Possibilities existed for land

---

[৫১] দৈনিক আজাদ, ২ এপ্রিল ১৯৫১

[৫২] ঐ, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ (সম্পাদকীয়)

[৫৩] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

[৫৪] Profulla Kumar Chakraborti, op-cit, Page 16

> colonisation schemes to be undertaken in proximate areas like Manipur, Bihar and Tripura."[৫৫]

এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল হিন্দু শরণার্থীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে সংরক্ষণ করা এবং এদেরকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা। ব্যাখ্যা করে বলেন,

> "The plan expressed the optimism that `Refugee rehabilitation, scientifically planned and implemented, may give a new lease of life to the decadent, truncated state' and called for mechanised and cooperative farming through large scale land colonisation."[৫৬]

অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখার্জী পূর্ববঙ্গের কৃষকদের দক্ষতা এবং "Land colonisation" এর জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি একটি পরিকল্পনা দিয়ে বলেন,

> "The uncultivated land (excluding current fallow) amounted to 173 Lakh acres in Assam, 64.5 lakh acres in Bihar and twenty eight lakh acres in West Bengal.----- East Bengali farmers possessed `the sturdy spirit of individualism, courage and enterprise' which was needed for land colonisation..[৫৭]

কাছাড় কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রী বীরেন্দ্র পুরকায়স্ত আসামের ভূমির পরিমাপ ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরে বাঙ্গালী হিন্দু শরণার্থীদের জন্য আসামে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং আসামের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, আর এই প্রস্তাব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার এই প্রস্তাব আসাম ও আসামের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে কতটা প্রভাবিত করবে তার চিত্র তুলে ধরে এবং এ প্রস্তাবের সমর্থন করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়,

> "আসামকে রক্ষা করিতে হইলে সীমান্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রের অনুগত লোকদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্ববঙ্গাগত হিন্দুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া, আসামের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতিকার করা যাইতে পারে। ------ কেন্দ্রীয় সরকার যদি পুনর্বসতির ভার নেন, তবেই আসামের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ় ও উন্নত হইতে পারে। আসামের বর্ত্তমান পরিমাপ (মণিপুর ও খাসিয়া রাজ্যসমূহ) ৬৬,৭৪৩ বর্গমাইল।-----প্রতি বর্গমাইলে বাস করে মাত্র ১২৮.৯ জন। ------যদি আসামে আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের আমদানী করা হয় তবে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি হবে ২০০ এবং যদি এক কোটি লোকের পুনর্বসতি করানো হয় তবে জনসংখ্যা দাঁড়াইবে ২৭৮.৭। আসাম পর্ব্বতপূর্ণ প্রদেশ। এ অবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ লোককে অনায়াসেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। -----প্রদেশের অগণিত বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার ও বিস্তীর্ণ অনাবাদী অঞ্চলসমূহে শষ্যৎপাদনের ব্যবস্থা দ্বারা শুধু প্রদেশেরই উপকার হইবে তাহা নহে, ভারতের খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যপারেও অনেকটা সহায়তা হইবে।"[৫৮]

---

[৫৫] Gyanesh Kudaisya, op-cit, Page 112
[৫৬] Gyanesh Kudaisya, op-cit, Page 112
[৫৭] Gyanesh Kudaisya, op-cit, Page 112-113
[৫৮] প্রবাসী, ৫০শ ভাগ, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য-১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০

কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে অনেক জবর দখল কলোনি গড়ে উঠে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৭,৮৫৫ টি পরিবার ২১৯২ একর এলাকায় আবাস গড়ে তোলে। ৭৮টি কলোনি রেগুলাইজেশন করা হয় ১৯৫৫ সালের মধ্যে।[৫৯]
কলোনি এলাকায় পূর্বে যে মুসলমান বসতি ছিল সে সকল মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র দে (ভানু) বলেন,

> "ওদের মধ্যে বেশির ভাগ ভয়েই পালিয়ে যায়।--- অরবিন্দনগরের মুসলিমদের চলে যাওয়ার পেছনে বোধ হয় তৎকালীন হিন্দুদের খানিকটা চাপ ছিল।--- এখানে খানিকটা প্রেসার দেয়া হয়েছিল বলে আমার ধারণা। ফলে ওরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় ১৯৪৯ নাগাদ।---- কোন ক্ষতি করা হয়নি। ওরা মানে তৎকালীন যুবকরা চেয়েছিল মুসলিমরা এখান থেকে চলে যাক।"[৬০]

হিন্দুদের দেশত্যাগের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় ১৯৫০ সালে ঢাকা শহর সহ পূর্ববাংলার কয়েকটি স্থানে দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার পর এবং এই দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার পেছনে ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং পত্রিকা ভূমিকা রেখেছে। ১৯৫০ সালের আলোচিত দাঙ্গার জন্য দায়ী যে বাগেরহাটের কালশিরার ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় নেতা এবং পত্রিকার প্রচারণা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়,

> "সম্প্রতি ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতায় বক্তৃতায় মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা' ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীর হাঙ্গামা এবং বঙ্গবিভাগ প্রভৃতির উল্লেখ হইতেও তাহারা অনুপ্রেরণা লাভ করে। ----- পশ্চিমবাংলার পত্রিকাগুলির অপপ্রচারের পিছনে, হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে মহাসভার নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকেই দায়ী করা হয়। আরও বলা হয় তাদের এই উত্তেজনাপূর্ণ অপপ্রচার ইতিমধেই ফলবতী হইয়াছে।[৬১]

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি হতেই পশ্চিমবঙ্গে একটানা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলতে থাকে ফলে বহু সংখ্যক মুসলমান পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে।[৬২] এরই প্রভাবে পূর্ববাংলার দাঙ্গা শুরু হয়। তবে এই দাঙ্গা মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হয় কিন্তু এরপরও দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা চলতে থাকে আর এতে ইন্ধন যোগায় মিথ্যা প্রচারণা।"[৬৩]
আসাম কংগ্রেসের নেতা জনাব রোশী কুমার চৌধুরী মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের প্রটেকশনের একমাত্র উপায় হচ্ছে যুদ্ধ।[৬৪]

হিন্দু মহাসভার নেতা জনাব দেশপাণ্ডে পূর্ববাংলায় হায়দেরাবাদের মত পুলিশী অ্যাকশনের জন্য দাবী করেন। পণ্ডিত নেহেরু যখন কলিকাতায় আসেন তখন তাকে কোন গান গেয়ে বা স্বাগতম জানিয়ে সম্বর্ধনা দেয়া হয়নি। কিন্তু পোস্টার এবং পোস্টকার্ডে লেখা হয় 'Gives us war'। পুরুষ এবং মহিলারা অস্ত্র দাবী করে পাকিস্তানের পূর্ব অংশে প্রবেশের জন্য।"[৬৫] ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুন উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পণ্ডিত নেহেরু কলকাতা সফরে আসেন। এ সময় পণ্ডিত নেহেরুর নিকট কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। পণ্ডিত নেহেরুর আগমন উপলক্ষ্যে দমদম বিমান ঘাটি হতে কলকাতা পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ মাইল পথের যেখানে সেখানে রাস্তার উপর অনেক নানা প্রকার শ্লোগান লিখিত পতাকা দ্বারা শোভিত করা হয়। 'বাংলার সন্তান পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার জন্য

[৫৯] Committee of Review Rehabilitation work in West Bengal. 19th Report, Page 5 GOWB
[৬০] সুভাষচন্দ্র দে (ভানু), ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৯৭
[৬১] দৈনিক আজাদ ৪ জানুয়ারি ১৯৫০
[৬২] ঐ, ৪ জানুয়ারি ১৯৫০
[৬৩] দৈনিক আজাদ ১৪ মার্চ ১৯৫০
[৬৪] জনাব সামসুদ্দীন আহমেদ খন্দকার, দৈনিক আজাদ ৪ জানুয়ারি ১৯৫০
[৬৫] EBLA Proceedings Report ৯ মার্চ ১৯৫০

মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত। অত্যাচারের হাত হইতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার জন্য অবিলম্বে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দাবী করিতেছে।'[৬৬] দাবীগুলো উক্ত পতাকায় লিখিত হয়।[৬৭]
প্রধানমন্ত্রীর সতীর্থ যারা লাট প্রাসাদে আগমন করেন তারা 'অস্ত্র চাই, পূর্ব্ববঙ্গের মুক্তি নাই। বাংলাকে এক করতেই হবে।' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণ করেন, 'পূর্ব্ববঙ্গ মুক্তি আন্দোলনের' পক্ষ হতে এটা করা হয়। যে সব ধ্বনি তুলে কলকাতায় হিন্দু যুবক সম্প্রদায় প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করে, সে সবও বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। এ সব ধ্বনির বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহেরু পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করেন নাই।[৬৮] ভারতীয় সরকারের মনোভাব সম্পর্কে সাধন দে বলেন, "ইস্ট বেঙ্গল উদ্বাস্তুদের কেন্দ্রীয় সরকার কোন মূল্যই দেয়নি। পাঞ্জাবে দিয়েছে। সমস্ত দায় দায়িত্ব নিয়েছে। সম্ভবত এখানকার জন্য এমন চিন্তা ছিল যে, বাংলাদেশ তো একটা কলোনি, তাকে দখল করে নেব।"[৬৯]

বিধান রায় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সরকারের উপর যারা আশ্রয়ের জন্য নির্ভর করবে তাদের থাকবার জন্য যত বেশী সম্ভব আশ্রয় শিবির খোলার ব্যবস্থা করা হোক।[৭০]

পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উদ্বাস্তুদের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন ভারত সরকারের উদ্বাস্তু মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বি.জি.রাও। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু মন্ত্রণালয় যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, রেলপথে যেখানে উদ্বাস্তুরা প্রথম ভারত ভূমিতে প্রবেশ করবে সেখানে প্রাথমিক ত্রাণের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হবে, তাদের প্রাথমিক ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে এবং তারা যে উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে প্রবেশ করেছে তার প্রমাণস্বরূপ তাদের একটি স্বাক্ষরিত প্রমানপত্র দেওয়া হবে। এই প্রমাণপত্রের ভিত্তিতেই যারা আশ্রয় শিবিরে স্থান চায় তারা তা পেতে অধিকারী হবে। যারা অন্য ধরনের সাহায্য চায় তারা তা পাবে। এই প্রমাণপত্র পরে বর্ডার স্লিপ নামে খ্যাত হয়েছিল।[৭১]

শ্রী রাও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করলে বিধান রায় তাতে আশ্বস্ত করেন যে, যত লোক আসবে তাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব হবে।[৭২] পশ্চিমবাংলা সরকারের এরকম সিদ্ধান্ত দ্রুত প্রকাশিত হয়ে পড়লে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতি নজর দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লোক বিনিময়ের প্রস্তাব পেশ করলে জওহরলাল নেহেরু বলেন,

> "এই (লোক বিনিময়) প্রস্তাব এমন একটি জিনিস যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক এবং আত্মিক নীতির বিরোধী। তার সঙ্গে আরও একটি মহত্তর নীতি জড়িত আছে তা হল আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গের প্রশ্ন।"

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন,

> "পণ্ডিত নেহেরু যখন পাঞ্জাবে মানুষ বিনিময়ের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন, তখন তার এই বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নটিকে ঠাণ্ডা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন মনে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাঁর উচিৎ হবে

[৬৬] দৈনিক আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৫০
[৬৭] দৈনিক আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৫০
[৬৮] দৈনিক আজাদ, ৯ মার্চ ১৯৫০
[৬৯] সাধন দে, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৭৪
[৭০] বিস্তারিত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮
[৭১] বিস্তারিত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮
[৭২] বিস্তারিত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

> বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নটিকে ঠান্ডা ঘরে আবদ্ধ রেখে অভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারতদের মত বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া।"[৭৩]

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে পরিবর্তন করতে পারেনি। নূতন নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান হতে নূতন যারা আসবে তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা হবে না কেবল সাময়িক আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা ১৯৫০ সালের ২ মার্চ কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের এবং উদ্বাস্তু সমস্যায় আগ্রহশীল ব্যক্তিদের যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষকে জানানো। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল 'নূতন নীতি অনুসারে নূতন উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে না, তাদেরকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়দান করা হবে এবং ত্রাণকার্য চালানো হবে। বিভিন্ন রাজ্য প্রতিনিধিরা যাতে করে তাদের রাজ্যে এই অস্থায়ী আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে তার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। শ্রী সাকসেনা ধারনা করেছিলেন যে উদ্বাস্তুর সংখ্যা হবে দুই লক্ষ।[৭৪] কেন্দ্রীয় সরকারের আশা ছিল যে দাঙ্গা মিটে গেলে এবং শান্ত পরিবেশ ফিরে এলে এ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।[৭৫] কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন উদ্বাস্তু দরদী মেঘনাদ সাহা। তিনি নতুন উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের বিষয়ে ভারতীয় সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন,

> "পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার বিপক্ষে যা যুক্তি দেখানো হচ্ছে তা একান্তই দুর্বল এবং পূর্ববঙ্গ হতে নূতন হাঙ্গামার ফলে যারা আসছে, সেই পরিবারগুলির পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করা ভারত সরকারের অন্যায় হবে। তার ফলে তারা কর্তব্য হতে বিচ্যুত হবেন। তাহলে ভারতের বর্তমান নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে।"[৭৬]

স্বাধীনতাকালীন পরিস্থিতিতে দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানে যে সকল সংখ্যালঘু হিন্দুরা থাকবে এবং যারা দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদের উদ্দেশ্য করে সুস্পষ্ট ভাষায় মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরু এরকম প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের প্রতি তারা সকল দায়িত্ব পালন করেছেন। নেহেরুর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান ১০/১৫ বছরের বেশি তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। ঘটনা ও পারিপার্শিকের চাপে ভারতের অঙ্গীভূত হতেই হবে।[৭৭]

১৯৫০ সালের ৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার ৭ জন মুসলমান সদস্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহেরলাল নেহেরুর নিকট স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়,

> "পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলিয়াছে তাহাকে কোনই গুরুত্ব দেওয়া হইতেছেনা, পক্ষান্তরে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কাহিনীকে ফলাও করিয়া প্রচার করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করিয়া তোলা হইতেছে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকেই ভারতীয় মুসলিম গণ নিরীহভাবে জীবন যাপন করছে।"[৭৮]

১০ মার্চ ১৯৫০ তারিখে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে সদস্যগণ বলেন,

---

[৭৩] লোকসভা বিতর্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬২
[৭৪] বিস্তারিত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩
[৭৫] বিস্তারিত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪
[৭৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০
[৭৭] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১
[৭৮] দৈনিক আজাদ ১৭ মার্চ ১৯৫০, ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ১৯ জানুয়ারি থেকেই পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গা শুরু হয় এবং ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি তা চরমে ওঠে কিছুটা কমে আবার তা ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বৃদ্ধি পায়।

"পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে অনবরত যে ব্যাপক হাঙ্গামা চলছিল তাহার ফলে এখানে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং যে সকল মোহাজের পূর্ব্ববঙ্গে আসেন তাহারা বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা দান করেন। তাহার ফলেই যে ঢাকার সাম্প্রতিক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাহা পরিষদের সদস্যগণ ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন।[৭৯]

কলকাতা ও জলপাইগুড়িতে দাঙ্গা প্রশমিত হওয়ার দিন দুয়েকের মধ্যে বরিশালের অবস্থা শান্ত হয়।[৮০]
মহাসভার পাকিস্তান বিরোধী প্রচারের ফলে ১৯৫০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মুন্সিগঞ্জের ৫৫০০ জনেরও অধিক হিন্দু ভারতে চলে গিয়েছিল। যে সমস্ত হিন্দু সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে গিয়েছিল, তারাও তাদের সম্পত্তি ফিরে পায় এবং যারা তখনও কলকাতায় রয়েছিল তারা পূর্ব পাকিস্তানস্থিত আত্মীয়-স্বজন সংখ্যালঘু কল্যাণ কমিটিগুলির কাছে জানিয়েছিল যে তারা শীঘ্রই ধনসম্পত্তিসহ দেশে ফিরে আসবে। বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু কল্যাণ কমিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টগণ মুসলমানদের নিকট হতে টাকা পয়সা উঠিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন।[৮১]

১৯৫০ সালের ২৯ মার্চ নিউইয়র্ক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, "বিগত ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার দায়িত্বহীন উক্তির ফলেই পূর্ববঙ্গে শুষ্ক বারুদে অগ্নি সংযোগ হয়।[৮২]
১৯৫০ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত খুলনা জেলা বোর্ডের এক সভায় কালশিরার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই সভায় চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ জনাব এস.এম.ফজলুর রহমান এবং শ্রীযুত নিত্যানন্দ বিশ্বাস তাদের বক্তৃতায় বলেন যে 'কালশিরার ঘটনা সাম্প্রদায়িক নয়, কম্যুনিস্ট উপদ্রব মাত্র।"[৮৩]
এ সভায় কালশিরার ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রীযুত প্রমথ বিশ্বাস বলেন যে, ব্রিটিশ আমলে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ কর্মচারীদের হত্যা করলে গ্রাম অত্যাচারের বন্যায় প্লাবিত হয়ে যেত, কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে নাই।"[৮৪] শ্যামগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা এক বিবৃতিতে বলেন,

"যে সব দরদী পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য এতটা ব্যস্ত তাহারা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিলেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা উপকৃত হইবে বেশী। ----পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য এতটা ভাবনার প্রয়োজন নাই কারণ আপনাদের বেশী ভাবনাতে আমাদের ভাবনা বাড়েই কমে না।"[৮৫]

১৯৫০ সালের এপ্রিলে সম্পাদিত দিল্লী চুক্তির পর যখন পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল কিন্তু হিন্দু মহাসভা এই চুক্তি ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ১৯৫০ সালের ৯ মে তারিখে নাগপুরে হিন্দু মহাসভার নিখিল ভারত কমিটির এক সভায় হিন্দু মহাসভা মূল যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে বলা হয়,

"দিল্লীচুক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রের লৌকিকত্ব এবং অপক্ষপাতের মূলনীতির মুলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে। ভারতের নীতিতে পাকিস্তান বিশ্বাসী নয় এবং এই চুক্তির দ্বারা ভারতবর্ষ পাকিস্তানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাকে তোষণ করিয়া চলিয়াছে, এই অবস্থায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই ভারত সরকারের উচিৎ ছিল।"[৮৬] লিয়াকত নেহেরু চুক্তি ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য হিন্দু মহাসভা পূর্ণদ্দোমে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়।"[৮৭]

[৭৯] দৈনিক আজাদ ১৪ মার্চ, ১৯৫০
[৮০] এম. আর.আখতার মুকুল, ভাসানী মুজিবের রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৩১
[৮১] দৈনিক আজাদ, ১০ মার্চ ১৯৫০
[৮২] ঐ, ৩০ মার্চ ১৯৫০
[৮৩] ঐ, ৮ এপ্রিল ১৯৫০
[৮৪] ঐ, ৮ এপ্রিল ১৯৫০
[৮৫] ঐ, ১৩ মার্চ ১৯৫০
[৮৬] ঐ, ১১ মে ১৯৫০
[৮৭] ঐ, ১১ মে ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলকাতা কংগ্রেস নেতাদের সম্মেলনে আবেদন করেন,

> "যে সব কংগ্রেসী নেতা সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন তাদের পূর্ব্ব পাকিস্তানে ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ এবং সেখানে যাইয়া সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। তবেই যারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এখানে আসিয়াছে তাদের মধ্যে অন্তত কিছু লোক পূর্ব্ববঙ্গে তাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবে। ইন্দো পাকিস্তান চুক্তির শর্তানুসারে দুই দিক হইতেই দেশত্যাগ বন্ধ করিতে হইবে যদি ইহা না করিতে পারা যায় তবে চুক্তির অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।[৮৮]

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ঠিক বিপরীত ধরনের কার্য অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের নামে মিথ্যা ও কল্পিত বিভিষিকা এবং যুদ্ধাতংক সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদিগকে ঘরছাড়া করবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলন করা হয় এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যন্ত এমন ভাব দেখাতেন যে তারা যেন উভয়বঙ্গের লোক বিনিময় হলেই খুশী হন।[৮৯]

ভারতের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা হচ্ছে আর ভারত তা বন্ধ করতে না পেরে বিভিন্ন প্রচারণা দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের দেশত্যাগের ঘটনা ঢেকে রাখতে চায়। পূর্ববঙ্গ হতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে ভারতের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সত্যই যারা অনুভব করেন, তারা যেন সংখ্যালঘুদিগকে রাজনৈতিক দাবা খেলার ঘুটি বলে মনে না করেন।[৯০] উভয়বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান গমনাগমনের পরিসংখ্যান বেনাপোল ও দর্শনা বন্দর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের কর্মচারীদের দ্বারা যুক্তভাবে গৃহীত তথ্য পাওয়া যায়।

১৯৫০ সালের ১৯ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের ব্যাখ্যা দিয়ে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের নির্যাতনের ও দেশত্যাগের হার উল্লেখ করেন এবং এ সকল খবর কেন শোনা যায় নি তার কারণ ব্যাখ্যা করে পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন যে, পূর্ববাংলার অসহায় হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোন ঘটনা ভারতে প্রকাশিত হয়নি কারণ পূর্ববাংলার কোন খবর বাইরে প্রকাশ করার কোন সুযোগ ছিলনা। যখন ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রায় ১৫,০০০ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় পৌঁছায় তখন তাদের কাছ থেকে সব জানা যায়। তিনি আরও জানান যে দিল্লী চুক্তি হওয়ার পরও প্রায় ১,৬০০,০০ থেকে ২ মিলিয়ন হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং তাদের মাধ্যমে নৃশংস নির্যাতনের বর্ণনা আলোতে আসে। ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখদের পরিকল্পিতভাবে বিতাড়িত করা হয় তাদের সম্পত্তি দখল করার জন্য।[৯১] As a result of this life for the minorities in Pakistan has become nasty, brutish and short."[৯২]

পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট এক প্রতিবাদ পত্রে সরকার এ ধরণের বক্তব্যকে পত্রিকার প্রচারণা দিল্লী চুক্তির বিরুদ্ধে 'Sabotage' বলে অভিহিত করে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে এর প্রভাব পড়বে বলে মন্তব্য করা হয়।[৯৩]

১৯৫০ সালের এপ্রিলে সম্পাদিত দিল্লী চুক্তির পর দেশত্যাগী হিন্দুদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসায় তারা দেশে ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু সে সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ৮ অক্টোবর ১৯৫০ কাটোয়ার অনুষ্ঠিত এক জনসভায় যোগেন্দ মণ্ডলের উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলেন,

---

৮৮ ঐ, ২০ এপ্রিল ১৯৫০
৮৯ ঐ, ২০ এপ্রিল ১৯৫০
৯০ ফিরোজ খান নুন, ঐ, ১০ আগষ্ট ১৯৫০
৯১ Statesman, 20 April 1950
৯২ ibid, 20 April 1950, Home, Political, (CR) B Proceedings, Vol. 66. File No. Jan.-53/ 105-132, GOEB
৯৩ ibid, Vol. 66. File No.Jan.-53/ 105-132, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

"পাকিস্তানে বাস করিতে পারেনা, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ছাড়া পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস অসম্ভব। হিন্দুদের উৎখাত, উৎসাদন ও অত্যাচার করিয়া পাকিস্তান ২/৩ কোটি টাকার সম্পদ দখল করিয়াছে। আজ কেন আমরা এক কোটি পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের এক তৃতীয়াংশ ফিরিয়া পাওয়ার দাবী করিবনা? যে সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানের জন্য লড়াই করিয়াছেন তাহাদের ক্রমশঃ ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে বলা কর্তব্য।"[৯৪]

ড. মুখার্জী ১৯৫০ সালের ২২ মে সালে কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এক গণসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে জনগণ ও সম্পত্তি বিনিময়ের প্রস্তাব করেন পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও বিহারের কিছু অংশের সঙ্গে একত্রীকরণের উদ্যেশ্যে বলেন,

"The only way left was exchange of population and property. This would be neither easy nor pleasant but it was the only peaceful method to shake the life and property of millions of innocent people. If as a result of exchange of property it appeared that the value of the property of East Bengal Hindus was not balanced. They must demand compensation from Pakistan."[৯৫]

বীরহামপুরে এক জনসভায় ২৮ মে ১৯৫০ তারিখে ড. মুখার্জী দিল্লী চুক্তির সমালোচনা করে দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন,

"The success of the Nehru-Liaquat agreement must be judged by who the Hindu minorities of East Pakistan felt secure and not by what the Government of India might say." The exodus of minorities from East Bengal was continuing and this indicates the Delhi Agreement had not helped to create confidence or feeling of security in the minds of Hindu.[৯৬]

সে পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৪০,০০০ হিন্দু পূর্ববঙ্গে ফিরেছে।[৯৭]

ড. মুখার্জীর অব্যাহতভাবে উস্কানীমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকার বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক এস.আর.নন্দী এক বিবৃতি দেন। এটি ১৯৫০ সালের ৮ জুলাই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারির দাঙ্গার উল্লেখ করে এর কারণ হিসেবে পূর্বে সংঘটিত পশ্চিমবাংলার দাঙ্গাকে দায়ী করেন এবং এর পরবর্তী স্বাভাবিক অবস্থাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করার জন্য ড. মুখার্জীর অব্যাহত উস্কানীমূলক বক্তব্যকে দায়ী করে বলেন যে, তিনি একজন হিন্দু হিসেবে পূর্ববাংলার হিন্দুদের সম্পর্কে ড. মুখার্জীর ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা শুনে তিনি মানসিকভাবে খুবই মর্মাহত হয়েছেন। তার মতে পূর্ববাংলার হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায় ভাল আছে এবং তারা স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করছে। তবে ড. মুখার্জীর এ ধরনের বক্তব্য কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে বলেন,

" Mr. Mukherjee is therefore doing harm to East Pakistan Hindus by challenging Mr. Nehru exhorting Hindus not to believe in the Delhi Pact and threatening the use of force which is likely to endanger the lives of innocent East Pakistan Hindus."[৯৮]

---

৯৪ ibid, Vol. 66. File No.B Jan.-53 / 105-132 GOEB
৯৫ ibid, Vol. 66. File No. B Jan.-53 /105-132 GOEB
৯৬ ibid, "Statesman 22 May 1950
৯৭ ibid,
৯৮ ibid,

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৫০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার শরণার্থীদের এক সম্মেলনে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি পন্ডিত নেহিরু ও কংগ্রেসের মাসিক অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে সমালোচনা করে বলেন, "They wanted to make condition here so bad for the refugees that they went back to East Bengal regardless of consequences.[৯৯] তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট এক প্রতিবাদ পত্রে বলা হয়

> "The propaganda campaign of Dr. Mookherjee helped by a section of the West Bengal Press is highly to embitter inter communal relation in both India and Pakistan to undo what the Delhi Agreement has so far achieved in restoring normaley in both the country.[১০০]

১৯৫০ এর নভেম্বরে Halee এর মিটিং এ ড. মুখার্জী পূর্ববাংলার হিন্দুদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, "The peace which was now prevailing in East Bengal was really a peace of the grave."[১০১]

এর প্রতিবাদ করে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট এক প্রতিবাদ করে এবং পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলা হয় যে, ড. মুখার্জীর এ সকল প্রপাগান্ডা পশ্চিমবাংলার প্রভাবশালী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১০২]

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্যকে ভিত্তি করে কলিকাতার কিছু পত্রিকাও উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রচার করতে থাকে যা দুই দেশেরই সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে ভীতি গড়ে উঠে। তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট পাঠানো প্রতিবাদ পত্রে তার বক্তব্য বিরোধী বলে বলা হয় যে, তার বক্তব্য দিল্লী চুক্তি বিরোধী এবং দুই দেশের পারস্পরিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তার এসকল বক্তব্য বিভিন্ন পত্রিকায় হেডলাইন হিসেবে প্রচারিত হয়ে তা সাধারণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই দেশেরই সংখ্যালঘু জনগণের মনে ভীতির সৃষ্টি করে। এটি দুই দেশের মধ্যেকার যৌথ প্রেস কোড বিরোধী।[১০৩]

মেঘনাদ সাহা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের ফলে পশ্চিমবাংলা সরকার নীতি পরিবর্তন করে ঠিক করে যে, এদের মধ্যে যারা ভারত রাষ্ট্রেই থেকে যেতে চাইবে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করবে। এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল। এই নূতন নীতি গৃহীত না হলে লিয়াকত আলীর সহিত চুক্তি সম্পাদনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করত এবং তীব্রতর হত।[১০৪]

পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু স্রোতে যখন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার রাজনীতি- অর্থনীতি বিপর্যস্ত তখন সর্দার প্যাটেল পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিছু এলাকা ছেড়ে দেয়ার দাবী জানান।[১০৫]

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ছিল। কংগ্রেস সংসদীয় দলের অধিকাংশ সদস্য নেহেরু নীতির সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন, তাদের ধারণা হয় যে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে লোক বিনিময় ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যার অন্য কোন সমাধান নেই।[১০৬] নেহেরুর চেয়েছিলেন যে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকুক, তিনি সাধারণ নাগরিক হিসাবে পূর্ববঙ্গে গমন করে চেষ্টা করে দেখতে

[৯৯] Hindustan standard, 25 September, 1950
[১০০] Home, Political (CR) B Proceedings, Vol. 66. File No.Jan.-53/105-132 GOEB
[১০১] ibid
[১০২] ibid, page 22
[১০৩] ibid
[১০৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬
[১০৫] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০
[১০৬] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৯

চেয়েছিলেন যে, সম্পর্কের অবনতি রোধ করা যায় কি না। এ বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট এক পত্রে মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি সর্দার প্যাটেলের নিকট এক পত্রে অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। বিবৃতিটি তিনি সংসদে পাঠ করবেন বলেও স্থির করেছিলেন।[১০৭]
যোগেন মণ্ডলের বক্তব্যের প্রতিবাদে পণ্ডিত নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন। পণ্ডিত নেহেরু মনে করেন যে, অনেক হিন্দু যারা পূর্ববাংলায় ফিরেছে তারা ভারতীয় সরকারের কাছে যে সকল সুযোগ সুবিধা আশা করেছিল তা তারা পায়নি বলেই নিজ বাসস্থানে ফিরেছে, সুতরাং হিন্দুদের সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন,

> "যদি বলা হয় যে, উত্তর প্রদেশ থেকে যারা দিল্লীতে আসবে তাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করা হবে তবে উত্তর প্রদেশ থেকেও বহুসংখ্যক লোক দিল্লীতে এসে সমাগত হবে। তিনি মনে করেন যে দুই বাংলার মিলন বা পূর্ববাংলা থেকে সকল অমুসলমানদের পূর্ববাংলা ত্যাগ করাই একমাত্র সমাধান নয়।"[১০৮]

যখন মনে হচ্ছিল যে যুদ্ধ বা লোক বিনিময় ছাড়া অন্য কোন পথ নেই এবং যখন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় সামরিক আইন জারি করা হয়েছে তখন পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে ভারত সফরের জন্য আমন্ত্রণ পাঠান। আপোষ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার জন্যই এই আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে পন্ডিত নেহেরুর আমন্ত্রণে লিয়াকত আলী খান ভারত সফরে আসলেও তিনি স্পষ্ট জানান যে, সর্দার প্যাটেলের সম্মতি না থাকলে যে কোন চুক্তি করা হবে অর্থহীন। লিয়াকত আলী খান সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে আলোচনা করেন। সাতদিনের আলোচনায় ১১টি খসড়া চুক্তির পর তাদের আলোচনার দুই দিন পর চূড়ান্ত চুক্তি সাক্ষরিত হয়।[১০৯] দিল্লী চুক্তির পর প্রায় ১২ লক্ষ শরণার্থী পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করে।[১১০]

দিল্লী চুক্তির পর পণ্ডিত নেহেরুর উদ্বাস্তু নীতির প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ক্ষীতিশ নিয়োগী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পদত্যাগ করে কলকাতা শহরে বীরোচিত সম্বর্ধনা পান। চুক্তির বিরুদ্ধে যে জনরোষ সৃষ্টি হয় তাতে তারা নেতৃত্ব দেন এবং এতে বিধান রায় এর সমর্থন ছিল। এই চুক্তির পর কলকাতায় যে জনরোষ প্রকাশ পেয়েছিল তা প্রশমনের জন্য সর্দার প্যাটেল কলকাতা সফর করেন। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুর মনে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করা যেন তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে না আসেন এবং যারা এসেছেন তারা যেন সেই পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে আবার পুরানো বাসভূমে ফিরে যায়।[১১১] কিন্তু চুক্তি বিরোধী প্রচারণার ফলে সেই উদ্যোগ ব্যাহত হয়।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সদস্য মি.এন.সি,চ্যাটার্জী বাংলার সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের জন্য পরিকল্পিত লোক বিনিময়ের প্রস্তাব দেন।[১১২]

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা হয়েছিল তাকে নিয়ন্ত্রিত লোক বিনিময় বলে বিধান রায় ম্যাজিস্ট্রেটদের এক সভায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে সীমান্ত এলাকায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠন করতে হবে। সে সময় সীমান্তে চাষ বা বাসস্থান করার মত এক কাঠা জমিও খালি ছিল না। সে সময় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সে সময়ের মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়। এ কার্যক্রম অসম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে পুরো প্রস্তাবটি ছিল যে সীমান্ত এলাকা বরাবর মুসলমানদের সরিয়ে দশ মাইল এলাকা খালি করে দিতে হবে। দশ মাইল এলাকা খালি করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দুদের পুর্নবাসন পরিকল্পনাটির খবর প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ রায়

---

১০৭ শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৯-২২০
১০৮ দৈনিক আজাদ, ১৮ অক্টোবর ১৯৫০
১০৯ শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮
১১০ স্পীকার, পশ্চিমবাংলা বিধান সভা বাজেট অধিবেশন ১৯৫১, Vol.iii, No-1, উদ্ধৃত- Pranati Choudhury, op-cit, page-2,
১১১ শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩২
১১২ দৈনিক আজাদ, ৪ জুন ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পনের কুড়ি দিনের মধ্যেই সীমান্তের মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে কোন লিখিত নির্দেশ না দিয়ে মৌখিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এর কিছুদিন পর পশ্চিমবাংলার তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণ শংকর রায় মুর্শিদাবাদ সফরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্নদাশংকর রায় কে বলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমান্ত এলাকা থেকে পঞ্চম বাহিনীকে বহিষ্কার করা জরুরী। তবে অন্নদা শংকর রায় এ আদেশ পালনে অস্বীকার করলে তাকে ছুটি দিয়ে সেখানে অন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ দেয়া হয়।[১১৩] এ সময় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু দেশের বাইরে থাকার সুযোগে এ কার্যক্রম পরিচালনা করার তাগিদ ছিল তবে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে আসলে মুসলমানদের বিতাড়নের এ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।[১১৪]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর লিয়াকত নেহেরুর দিল্লী চুক্তির পর যে সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেশত্যাগকারী হিন্দু জনসাধারণ পূর্ববাংলায় ফিরছিল এবং বেশীরভাগ হিন্দুই ফিরতে মনস্থির করেছে সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কিছু কার্যক্রম তাদের পূর্ববাংলায় ফেরার পথে বাধার সৃষ্টি করে। এর একটি অন্যতম কার্যক্রম ছিল ভারত সরকারের বাস্তুত্যাগী উচ্ছেদ বিলের প্রতিবাদ করে মিছিল, মিটিং করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তন করা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদে আইনটি পাশ হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগকারী মুসলমানরা তাদের বাসস্থান ফিরে পেতে বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং পূর্ববাংলায় আগত মোহাজেরদের দখল করা ঘরবাড়িও অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে ফিরে আসা হিন্দুদের ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বার বার প্রতিবাদ করার পর পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অপারগতা প্রকাশ করে ১৯৫০ সালের ৩০ জুলাই পাঠানো চিঠিতে ড. মুখার্জী এবং পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারার কারণ হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের অজুহাত দিয়ে বলা হয় যে, ভারতীয় সংবিধান সকল নাগরিকের জন্য সমান স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে এবং এসকল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।[১১৫]

এ সময় ভারতীয় সরকার ভারত বিরোধী প্রচারণার অভিযোগ তুলে 'হিন্দুস্থান হামারা পার্টি' এর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল। এর পরও বিভিন্ন উস্কানীমূলক ও অসত্য বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বার বার পূর্ববাংলা সরকারের নিকট থেকে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হলে পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫১ সালের ৩০ জুলাই চিঠির উল্লেখ করে জানানো হয় "The Goverrnment have nothing more to add in the matter."[১১৬]

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সে সময়ে হাবড়া মিটিংয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য অধিকার ও সরকারের কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করে বলেন, "Legislation was therefore necessary for conferring the right on the refugees. But more sanction of the citizenship right was not sufficient "[১১৭] শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ড. মুখার্জী বলেন,

> "Would also be given some training in agriculture and technology in order to enable them to earn by their own efforts without depending on

---

১১৩ শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৭
১১৪ শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২১৮
১১৫ Home, Political (CR) B Proceedings, Vol. 66. File No. B Jan.-53/ 105-132 GOEB
১১৬ ibid, page 52
১১৭ Hindusthan Standard 12 November 1950

Dhaka University Institutional Repository

others. For this purpose government was agreeable to sanction a grant of Rs, 50,000 for haveing a school building.[১১৮]

এই সভায়ই বক্তব্য রাখেন শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। তিনি বলেন, "It was regrettable that the refugees were not being given the right of franchise."[১১৯] হাবড়ার জনসভায় যে রেজ্যুলেশন গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে 'Hindustan Standard' লেখে যে, ১৯৪৯ সালের ২৫ জুলাই পর্যন্ত যে সকল শরণার্থী ভারতে এসেছ তাদের নাগরিকত্ব ও অধিকার প্রদান করা এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা ও বাড়ি তৈরী করার ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন।[১২০]

ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ড. মুখার্জীকে এক চিঠিতে জানান ১৯৪৯ সালের ২৫ জুলাইয়ের পর যারা স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা থেকে ভারতে এসেছে তাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংসদের আসন্ন অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে।[১২১] এ থেকে ভারতীয় সরকারের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। নেতৃস্থানীয় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদদের গোপনে ভারতে চলে যাওয়ার পেছনে ভীতি কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। আর নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কংগ্রেসীদের কাছে ছিল, স্বাধীন ভারতে মর্যাদাপূর্ণ চাকুরী বা অর্থকরী সুযোগ সুবিধার হিল্লে করার একটি প্রলোভনের ইশারা।[১২২] এ ভীতি ছিল পূর্ববাংলায় তাদের আধিপত্য হারানোর ভয়।

পাক-ভারত সমঝোতার ভিত্তিতে বরিশালের সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য কোলকাতার খিদিরপুর থেকে চারটি স্টীমার এসে হাজির হলো। 'খয়রাতি জাহাজ' অর্থাৎ এসব স্টীমারে যেসব সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু ওপারের হাতছানিতে চলে যাচ্ছেন, তাদের জন্য কোন পয়সা লাগবে না।[১২৩] ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় পূর্ববাংলার হিন্দুদের পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় নেয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে ভারত সরকার। পূর্ববাংলার অনেক অঞ্চলে পরিবহন সুবিধা ছিলনা বলে অনেক স্থানে হিন্দুরা আটকে পড়েছিল বলে ভারতীয় সরকার খবর পেয়ে স্টীমার সার্ভিসের ব্যবস্থা করে। এ বিষয়ে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে এইসব অঞ্চলের বাস্তুত্যাগী হিন্দু পরিবার আটকে পড়ে গিয়েছিল তারা প্রতিকূল পরিবেশে দুর্ভাবনাগ্রস্থ মন নিয়ে একান্ত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। তাদের সমস্যা দ্রুত সমাধানে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তৎপর হবেন এতখানি আশা করা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হবে। এদের খবর যখন পশ্চিমবাংলায় পৌঁছলো তখন উদ্বাস্তু দরদী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তার দ্রুত সমাধানের জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। তখন পূর্ববঙ্গে জলপথে দুটি স্টিমার কোম্পানি পরিবহনের কাজে লিপ্ত ছিল। তারা হল আই.জি.এস.এন এবং বি.আই.এস.এন কোম্পানি। কর্তৃপক্ষকে ডেকে তাদের সাথে আলোচনা করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেন। চুক্তি হল যে যেসব স্থানে নদীর উপকূলে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি অসহায় অবস্থায় আটকে পড়ে আছে সেসব স্থানে স্টীমার পাঠিয়ে এই দুই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ধার করবেন এবং জলপথে তাদের এনে দেবেন। তখন শ্রী সন্তোষকুমার বসু ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন। টেলিফোনে তার সাথে সংযোগ স্থাপন করে ডাঃ রায় ওদিক থেকে এই ব্যবস্থাকে সফল করতে যা কিছু করা দরকার সে বিষয়ে নজর দিলেন। শ্রী বসু এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকার হতে যেটুকু সহযোগিতা দরকার তা আদায় করে নিয়েছিলেন ফলে এ ব্যবস্থা অনুযায়ী এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি উদ্ধার করবার কাজ অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়েছিল। এই কাজে মোট পনেরটি স্টিমার নিযুক্ত হয়েছিল।

[১১৮] ibid, 12 November 1950
[১১৯] ibid, 12 November 1950
[১২০] দৈনিক আজাদ, ২৯ মার্চ ১৯৫১ পৃঃ ২
[১২১] Hindusthan Standard, 12 November 1950
[১২২] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫
[১২৩] এম. আর আখতার মুকুল, ভাসানী মুজিবের রাজনীতি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩১

> এইসব নদীমাতৃক অঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্র হতে উদ্বাস্তুদের সংগ্রহ করে এই স্টিমারগুলি একসঙ্গে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল।-----
> নির্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় স্টিমারগুলি হাজির হলে উদ্বাস্তু পরিবাগুলিকে নামিয়ে নিয়ে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ----এই বিরাট দায়িত্ব একরকম সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হয়েছিল। তার কারণ যে সকল কর্মচারীর উপর এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, এই ছিন্নমূল পরিবারগুলির জন্য তাদের হৃদয়ভরা সহানুভূতি।"[১২৪]

এ সময় পশ্চিমবাংলায় সরকারী বিমানের পাশাপাশি অনেক বেসরকারী বিমান পরিবহণ সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এরকম একটি সংস্থার সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিধান রায়। তিনি তাঁর এই সংস্থাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঢাকা বিমানবন্দরে আটকে পড়া শরণার্থীদের বিনা ভাড়ায় উদ্ধার করে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে যাওয়ার। অবশ্য যারা ভিড় করে অপেক্ষা করে ছিলেন তারা সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন, বিমান ভাড়া দেওয়ার সামর্থ তাদের ছিল।[১২৫]

স্বাধীনতা পরবর্তী কালে প্রচারমাধ্যম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এদের ভূমিকার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত প্রচারণার ফলে সাধারণ মানুষও পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের করুণা ও সহানুভূতির প্রাচুর্য এই দুঃসময়ে ত্রাণের কাজ এমনকি পুনর্বাসনের কাজকেও সহজসাধ্য করে দিয়েছিল। অস্থায়ী আশ্রয়শিবির স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হলে আপোসে জমির দখল পাওয়া যেত মালিকগন হতে কোন বাধা আসতোনা। বারাসাত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক বারাসাত শহরের অতি নিকটে মধ্যমগ্রামের স্থানীয় লোকেদের সহায়তায় এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আপোষে দখল পেয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের খাওয়ানোর জন্য অনেক উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১২৬] এখানে আশ্রিত উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে সেবা করার উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের অনেকগুলি নূতন স্থাপিত। উদ্বাস্তুদের সেবা করবার উদ্দেশ্যেই তারা জন্মগ্রহণ করে।[১২৭]

নভেম্বর ১৯৪৭- এ বাসু দত্ত RT হোস্টেলে থাকতো– তিনি অনেককে কাঁধে-কোলে করে এনেছেন। ----ওকে দেখেছি কাঁধে করে লোক আনতে।[১২৮]

বঙ্গ বিভাগের আগেই অনেক সচ্ছল হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করে। বঙ্গবিভাগের আগে যাদের কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বাড়ি ছিল তারা তো বটেই, তা ছাড়া যারা ভারত সরকারের অধীনে কাজ করবেন বলে স্থির করেছিলেন, আইন ও ডাক্তারী পেশায় যারা নিযুক্ত ছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের এই মোটামুটি সচ্ছল হিন্দু অংশটি ১৯৫০ সালের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছিলেন।[১২৯] তারা কোন সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেন নি। পুনর্বাসনের জন্য তারা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করেননি। নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিয়েছিলেন। এর জন্য কংগ্রেস সরকারের উপর তাদের বিরূপতা কিছু কম ছিল না। তাদের জীবনের এই ক্লেশ ও অনিশ্চয়তার জন্য তারা দেশবিভাগ ও বঙ্গবিভাগকেই দায়ী করেছিলেন। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসই তাদের সবচেয়ে ক্রোধভাজন হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এই ক্রোধকে সংগঠিত করে বাম দলগুলি অভাবনীয় রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করে।[১৩০] উদ্বাস্তুদের ভোট যোগারের ব্যাপারে

[১২৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩
[১২৫] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৪
[১২৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫
[১২৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬
[১২৮] সাধন দে, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৬৯
[১২৯] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২০
[১৩০] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২০

অকংগ্রেসী দলগুলি কংগ্রেসের চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল।[১৩১] ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের মনে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে কংগ্রেস সরকার তাদের বোঝা মনে করছে না।[১৩২]
স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শরণার্থীদেরকে প্রথমে একটি রেশনকার্ডের ব্যবস্থা করে দিতেন, এই রেশনকার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে দেখা হত। এটি দেখিয়ে একজন শরণার্থী সহজেই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমান করে ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতেন। এরাই পৃষ্ঠপোষক নেতৃবৃন্দের ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করতেন।[১৩৩] প্রণতি দত্ত তার পর্যালোচনা ব্যাখ্যা করে বলেন,

> "The political parties try to encash migrants' wretched condition by providing patronage from their end; ---To enrich vote bank political leaders help them to avail ration card. Ration card is the proof of citizenship. So a number of facilities can be availed after getting retion card ,e.g.., Govt. jobs, purchasing lands,posseanuy article etc.' It is very easy to get a ration card and then to become a Voter."[১৩৪]

১৯৫০ সালের শুরুতে ভারতীয় শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার সাথে তাল রেখে পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু স্রোত বেড়ে যায়। ভারতীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুর সংখ্যা ভারতের শাসনতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর থেকে বেড়ে যায়। প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সকল হিন্দু লোক দেশত্যাগ করে তারা প্রায় সব নিম্নবিত্ত। তাদের এমন কোন সংস্থান ছিল না যার উপর নির্ভর করে তারা নিজেদের চেষ্টায় পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসিত হতে পারে বা তাদের কোন পেশাদারী প্রশিক্ষণ ছিল না যার উপর তাঁরা নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারে। আবার পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সহানুভূতিও কমে এসেছিল।[১৩৫] স্বভাবতই এই উদ্বাস্তু স্রোতের চাপ প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহন করতে হচ্ছিল। ততদিনে বিরোধী দলগুলি এই নিরাশ্রয় ছিন্নমূল মানুষগুলোর মধ্যে এক নতুন ভোটব্যাংকের সন্ধান পেয়েছে এবং তাদের দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে দায়ী করে সরকার বিরোধী প্রচার শুরু করে দেয়।[১৩৬] কোন রাজনৈতিক দলেরই সংশয় ছিল না যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে এই কয়েক লক্ষ ভোটার সামগ্রিকভাবে রাজ্য বিধান সভায় না পারলেও যে সব কেন্দ্রে উদ্বাস্তুদের ঘন বসতি সেসব কেন্দ্রে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবেন। তারা ধারনা করে যে এ সকল উদ্বাস্তুদেরকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিলে তাঁরা আর পূর্ববঙ্গে ফিরবেন না। তাদের ভোটাধিকার প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলি উদ্বাস্তুদের কল্যাণ চিন্তায় এ সব যুক্তির অবতারণা করত তা নয় তাদের নিজেদের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত ছিল।[১৩৭] পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জনৈক সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেন,

> "পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বৎসরে প্রায় ২৪ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করেছে। উপরোক্ত হাঙ্গামায় ১৭৪৫ জন হিন্দু নিহত এবং ৫২০ জন নারী অপহৃত ও নিখোঁজ হয়েছে। এই সব রিপোর্ট হাঙ্গামার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে সকল আত্মীয় স্বজন অথবা প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছেন তাহাদের নিকট হতেই উক্ত সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যে সামান্য কয়েকটি কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট আত্মীয় স্বজন মৃত্যুর রিপোর্টের

---

[১৩১] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১
[১৩২] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১
[১৩৩] Pranati Datta, Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception study, The Qualitqatative Report 9-2, Page 352
[১৩৪] Pranati Datta, ibid, Page 352
[১৩৫] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১
[১৩৬] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬
[১৩৭] শংকর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১

সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণের জন্য পিড়াপীড়ি করেছেন সেই কয়টি কেন্দ্র ব্যতীত অপর রিপোর্টগুলি যাচাই করা হয় নাই। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তি অনেক অসমর্থিত সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১৩৮]

হিসাবে গোলমাল বা বর্ণনাকারীদের তথ্য মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত হবার সম্ভাবনা থাকলে প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়িয়ে সরকারীভাবে উপরোক্ত সংখ্যা ঘোষণা করা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অসংগত ও অন্যায় হয়েছে তা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন।[১৩৯] "অপহৃত নারীদের সম্পর্কে যে সকল তথ্যাদি ডাঃ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশ সত্য বলেও ডাঃ রায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না সঠিক তথ্য ছাড়া। প্রত্যাগত মুসলমানদের ঘরবাড়ী ফিরিয়ে দেয়ার ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যই নানা দিক দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা আরম্ভ হয়েছে। নিজেদের আইনের মর্যাদা রক্ষিত হয় অথচ মুসলমানরা ফিরে না যায় এই জন্য একটি চাঞ্চল্যকর ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার নীতি আজ পশ্চিমবঙ্গের বিরাট একটি শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয় বিভিন্ন পত্রিকায়।[১৪০] এই বিষয়ে ১৯৫০ সালের ২ মে পূর্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়,

"১৯শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পূর্ববঙ্গে হাঙ্গামার নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন সংবাদপত্র উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দাঙ্গায় ১৭ শতের উপর লোক নিহত হইয়াছে এবং ২৯১ জন হিন্দু নারীকে অপহরণ করা হয়। কিন্তু ডাঃ রায় নিজেই পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে তাহার তথাপি কোন কোন সংবাদপত্র এই বিষয় লইয়া মাতামাতি করিতেছে শুধু তাই নয় কেহ কেহ এই সমস্ত সংবাদ সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া দাঙ্গায় নিহতদের সংখ্যা ৬ হাজার (গত বৎসরের দাবী) হইবে। হ্রাস করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিন্দা করিতেছে।--------২৯১ টি বালিকাকে অপহরণ করা হইয়াছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐগুলি সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ২৯১ টির মধ্যে ২০৭ টির ব্যাপারে তদন্ত চালান হয়, এতদ্ব্যতীত অপহৃতা নারী উদ্ধার ব্যুরো ২৯টি বালিকা অপহরণের সংবাদ দেন তা সম্পর্কেও তদন্ত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ৮৬ টি কেস সম্পর্কে তদন্ত এখনও হয় নাই। এই সমস্ত অভিযোগের ২৩৬ টি অভিযোগের মধ্যে ১৭৪ টি সম্পূর্ণ মিথ্যা ২৩ টি ক্ষেত্রে এগুলো কিছুটা সত্য বলা যায় তন্মধ্যে দুইটির ব্যাপারের সহিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা জড়িত। উক্ত ২৩টির সঙ্গে জড়িত লোকজনের সকলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে এবং বালিকাদিগকে তাহাদের আত্মীয় স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অবশিষ্ট বালিকাদের মধ্যে ৪ জনের শ্লীলতাহানী করা হয়। ২ জন হাঙ্গামার সময় মারা যায়। ৩ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ২৬ জন স্বেচ্ছায় এছলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুছলমানদিগকে বিবাহ করিয়াছে। এই শেষোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।"[১৪১]

১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবাংলা সরকার পরিচালিত আশ্রয় শিবির গুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ১৯৫১ সালের এপ্রিলের মধ্যে পূনর্বাসন স্থানে পাঠানোর প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবাংলায় নূতন সমস্যা সৃষ্টি করল। পশ্চিমবাংলা সরকারের আশ্রয় শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা ৩০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে স্থানান্তরিত হল। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি হতে আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্তুদের ভর্তীর সংখ্যা বেশ কমে এসেছিল। তখন মাসিক গড়ে দাড়িয়েছিল ৪৮০০ এর মত। যে অস্থায়ী আশ্রয়শিবির গুলি ছিল তাতেই স্থান হয়ে যেত। কিন্তু এই বছরের জুন মাস থেকে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের সংখ্যা বেড়ে গেল। এই বছর জুন মাসে ৯৮০০ মানুষকে আশ্রয় দিতে হয়েছিল। এই উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধির কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না। এসময় পূর্ব

---

[১৩৮] বিধান চন্দ্র রায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা, ১৯ এপ্রিল ১৯৫০, Home, Political (CR) B Proceedings, Vol. 66, File No. Jan 53/ 105-132, GOEB

[১৩৯] দৈনিক আজাদ ২০ এপ্রিল ১৯৫০ (সম্পাদকীয়)

[১৪০] ঐ, ২০ এপ্রিল ১৯৫০

[১৪১] দৈনিক আজাদ ৩ মে ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে কোন অশান্তি ঘটেনি। আসল কারণ হল অর্থনৈতিক। এ বছর পূর্ব পাকিস্তানে ফসল ভাল হয়নি। ফলে দরিদ্র মানুষের অভাব অনটন বেড়েছিল। এ ছাড়া ছিল ভারতীয় মুসলমান শরণার্থীদের চাপ, যা সরকারের পক্ষে মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালের ১১ আগস্ট 'দৈনিক আজাদ' এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,

> "বিগত এক বৎসরের মধ্যে ভারতে ৭০ টি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে কয়েক লক্ষ পশ্চিমবঙ্গীয় মোহাজের মুসলমান গিয়া তাহাদের ঘর বাড়ি ফেরত না পাইয়া পুনরায় এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল কুকীর্তি, অপকীর্তি হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইবার জন্যই ভারত পাকিস্তানের সংখ্যালঘূদের নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া যাইতেছে। মূলতঃ এই সব দূরভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারের মূল কারণ এইখানেই সীমাবদ্ধ নহে। পুর্ব পাকিস্তানের তথা পাকিস্তান সরকারের উপর উদ্বাস্তুদের একটা অসহনীয় চাপ দিয়া এই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করাই এই সকল পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু ও ভারতের উদ্দেশ্য। ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রয়েছে এবং এই উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যই এই সব কাহিনী লোকসভায় শুনিয়ে ভারতীয় প্রচারযন্ত্রগুলোকে সহস্রমুখে তাহা ছড়িয়ে বেড়াতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।"[১৪২]

ভারতীয় ডেপুটি মন্ত্রী Dr.B.V.Keskar ১৯৫১ সালের ৩০ মে এক বিবৃতিতে বলেন যে, বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান মাল ও সম্মানের নিরাপত্তাহীনতার সংবাদ পাওয়া যায়, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক হিন্দু শরণার্থী ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করছে। পাকিস্তান সরকার বারবার এ ধরনের বিবৃতির প্রতিবাদ করেছে। তারপরও ভারতীয় হাই কমিশনার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট এর প্রতিকারের জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করে। এক্সপ্রেস লেটারে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরকে এর জন্য দায়ী করে বলে, এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হবে এবং দিল্লী চুক্তি ও যৌথ প্রেস কোড এর শর্ত ব্যাহত হবে,

> "Indian Deputy High Commissioner acted entirely on the basis of unverified rumors. The fact that the Amrita Bazaar Patrika and the Hindustan Standard of 20 May 1951, have reproduced verbatim the language used by the "Indian Deputy High Commissioner' at Dacca in his official communication to the Government of East Bengal is significant and the Government of Pakistan are astonished that there should be such a close link between the official representatives and the Government of India and their spokesmen on the one hand and newspapers which make it a practice of vilifying Pakistan country to the terms of Delhi Pact and joint press code, on the other."[১৪৩]

১৯৫৮ সালে হিন্দু মহাসভার পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, ভারত ও পাকিস্তানকে একটি কেন্দ্রের অধীনে এনে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব গৃহিত হয়।[১৪৪]

১৯৫৮ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে পাকিস্তানের ফিরোজ খান নুন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর হতে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পশ্চিমবাংলার চরমপন্থী দলগুলো পশ্চিমবাংলার মুসলমান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করে। হিন্দু মহাসভার নেতা এন.সি.চ্যাটার্জী ও ভারতীয় লোকসভার

---

[১৪২] দৈনিক আজাদ, ১১ আগষ্ট ১৯৫১ (সম্পাদকীয়)

[১৪৩] Express Letter, Govt. of Pakistan, Ministry of Foreign Affairs, Home, Political (C.R) B Proceedings Vol. 13, File No. March 1953/ 1104-1118, Page 13 GOEB

[১৪৪] দৈনিক আজাদ ৮ অক্টোবর ১৯৫৮ (সম্পাদকীয়)

ভিতরে ও বাইরে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ চুক্তি করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[১৪৫]

ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ সি.সি বিশ্বাস ১৯৫২ সালের জুন মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে" বলে বিবৃতি দেন।[১৪৬] তার এই বিবৃতির প্রতিবাদ করে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেন,

> "পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে আমি দৃঢ়তার সহিত তাহার অস্বীকার করিতেছি। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রমান স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, গত জানুয়ারী হইতে মে পর্যন্ত ৫ মাসে যত হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়াছে তদপেক্ষা ২ লক্ষ ৫ হাজার ৪৪২ জন বেশী হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়াছে। পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক না থাকিলে হিন্দুরা কখনই এত অধিক সংখ্যায় এই প্রদেশে আসিত না। - - - - আমরা পুনঃপুনঃ ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিপজ্জনক বিবৃতির প্রতিবাদ জানাইয়াছি; কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু এম.এল.এ দের গ্রেফতার সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ঠ হইবে যে, আমি মিঃ বিশ্বাসকে বার বার জানাইয়াছি যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বা নেতা হিসাবে ইহাদের গ্রেফতার করা হয় নাই রাষ্ট্র বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য তাহাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য কার্যকলাপের জন্য উল্লিখিত ব্যক্তিদের সহিত কতিপয় মুসলিম এম.এল এ সহ বহু সংখ্যক মুসলমানকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই সমস্ত এম.এল.এ র গ্রেফতারের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের আস্থা বিনষ্ট হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ৩রা জুলাই ভারত পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"[১৪৭]

নেহেরু তার বিবৃতিতে বলেন জনসাধারণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যায় পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং পূর্ববঙ্গ হতে ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগের মনোভাব বৃদ্ধি পায় নাই।"[১৪৮]

মাস্টার তারা সিং 'Vir Bharat' নামক পত্রিকার এক প্রবন্ধে ভারতীয় সরকারকে পাকিস্তানের হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করা, লোক বিনিময় অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়ে পরামর্শ প্রদান করে লেখেন,

> "The easy way to save the Hindus of East Pakistan is to exchange the population and property between the two Bengals. ---As far as my opinion is concerned, I am ready to say that in order to realize compensation, Bharat should declare war against Pakistan."[১৪৯]

ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতীয় সরকারের মুসলমান ও শরণার্থীদের প্রতি গৃহীত সরকারী নীতি, রাজনীতিবিদদের ভূমিকা সম্পর্কে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন,

> "কলকাতায় বিশেষভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিহার ও আসামে পূর্ববাংলার শ্রমিকদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার চলছিল। ছাটাইও চলছিল অনেকদিন থেকেই। ---কলকাতা বন্দর থেকে সিলেটের জাহাজীদের বিতাড়িত করা হয়েছে। সারেং সুকানী ও বন্দরের শ্রমিকদের ছাটাই শুরু হয়েছে। হোটেলের বয়, বেয়ারা, দপ্তরী (বুক বাইন্ডার), দর্জী এদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা প্রায়ই হচ্ছে। কারণ ঐ পদ্ধতি ছাড়া কোনভাবেই তাদের তাড়ানো সম্ভব ছিল না। সরকার মুখে ভাল কথা বললেও

[১৪৫] দৈনিক আজাদ, ৯ অক্টোবর ১৯৫৮

[১৪৬] পাকিস্তানী খবর, ১ম বর্ষ ১৭ শ সংখ্যা, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১

[১৪৭] পাকিস্তানী খবর, ১ম বর্ষ ১৭ শ সংখ্যা, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১

[১৪৮] পাকিস্তানী খবর, ১ম বর্ষ ১৭ শ সংখ্যা, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১

[১৪৯] Pasban 4 Nov. 1952, Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol.19, File No July 1953/35-36, Page-1 GOEB

> তাদের অধীনস্ত সরকারী কর্মচারীদের অবিচার অত্যাচার করার মনোবৃত্তি দমন করার ক্ষমতা নেতাদের ছিল না।"[১৫০] পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক সংকটের সূচনা হয়। মুসলিম লীগের চেয়ে প্রগতিশীল কংগ্রেসের রাজনীতিবিদরা এখনো সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করতে সাহস পান না।[১৫১] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, "---- যারা ছিন্নমূল হয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে কোন লোক কোন কাজের জন্য উপযুক্ত পেলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক নিযুক্ত করি না। তা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক।"[১৫২]

ভারতীয়দের সহায়তায় পূর্ববাংলার কিছু কিছু অফিসার ও সাংবাদিকদের সন্দেহজনক আচরন ও ভারতীয় মারওয়ারীদের নিকট থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগের বর্ণনা দিয়ে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন,

> "খবর পেলাম পূর্ব বাংলার কয়েকজন অফিসার বিশেষ করে আয়কর বিভাগের অফিসার বেশ কয়েকদিন যাবৎ গ্রান্ড হোটেলে অবস্থান করছেন। -----মারওয়ারীরা তাদের সম্পূর্ণ খরচ বহন করছে। অন্যদিকে কলকাতার হোটেল বিল্টমুরে মেতে আছেন। আমার ধারনা হয় এসব লোক হুন্ডি করে টাকা এনেছেন না হয় ঢাকার ভারতীয় এটাসি এসব খরচ যোগাচ্ছেন। কারণ সাংবাদিকরা যেহেতু উচ্চস্তরের সরকারী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পান -তাই তারা সরকারী গোপন সংবাদ সরবরাহ করতে পারেন। সেজন্য দেখা যায় ভারতীয় হাই কমিশন প্রায় প্রতি মাসেই প্রেসম্যানদের জন্য অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। সেখানে দেদার পানাহারের ব্যবস্থা থাকে অন্যদিকে যারা গ্রান্ড হোটেলে আছেন তাদের খরচ যদি মারওয়ারীরা দেয়, তবে নিশ্চই কোন রকম বড় সুবিধার বিনিময়ে।"[১৫৩]

সন্দেহজনক আচরন দুই দেশের জনগণের বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা সৃষ্টি হয়।

শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রীর নিকট ১৯৬২ সালের ২৭ মে এক চিঠিতে পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতে প্রবেশের বাঁধা দূর করে এবং বেঙ্গল ও আসামের সীমানা পুনঃ নির্ধারন করে তাদেরকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম ও দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন করে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি ভারতে প্রবেশের বাঁধা দূর করা হলে মাত্র পাচঁ থেকে আট লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করবে বলে ধারণা দেন।[১৫৪]

ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তদন্ত করে সঠিক ধারনা প্রদান করার জন্য R.Gupta কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। রিপোর্টে আশংকা প্রকাশ করেন যে, যেখানে পূর্ববাংলায় ১০০ লক্ষ হিন্দু রয়েছে সেখানে তিনি কি করে ভাবছেন যে, ভারতে প্রবেশের বাধা দূর করা হলে মাত্র পাঁচ থেকে আট লক্ষ হিন্দু ভারতে আসবে। R.Gupta বলেন, "I do not think it would be advaisable to withdraw restriction on migration as we would most probably be flooded with huge influx of refugees."[১৫৫]

এর উত্তরে ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে R.Gupta এর দেয়া রিপোর্টে বলা হয় 'As far as we have been able to gather the number of death would be well under 1000.'[১৫৬]

শ্রী লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রীর নিকট চিঠিতে ভারত-পাকিস্তান পুনঃএকত্রীকরণের প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের উস্কানী দিয়ে বলেন, "This can only be possible by restoring to military action."[১৫৭]

---

১৫০ কামরুদ্দীন আহমেদ, বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী, পৃষ্ঠা ১২৮
১৫১ কামরুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
১৫২ কামরুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫
১৫৩ কামরুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৫১
১৫৪ Ashutosh Lahiry, C.S, Home, Political, West Bengal State Government
১৫৫ Report, R. Gupta, 27 July 1962 C.S Page 1. Home, Political, West Bengal State Government, Page 1
১৫৬ ibid, Page 1
১৫৭ ibid, Page 2

Dhaka University Institutional Repository

তার এ একত্রীকরণের প্রস্তাব যে কতটা অসংলগ্ন সে সম্পর্কে ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত তদন্ত কমিটি আশংকা প্রকাশ করেন। এ সর্ম্পকে মন্তব্য করে তদন্ত কমিটি প্রধান R.Gupta তার উত্তরে এ বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, এটি কুটনৈতিকভাবে অপ্রীতিকর। এ ছাড়াও একত্রীকরণের প্রস্তাবে পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ লোকেরই হয়তো সমর্থন থাকবে না কারণ পূর্বের ন্যায় একীভূত বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সবসময় মুসলমান প্রধান সরকার গঠিত হবে। তিনি বলেন,

> "I doubt weather this hypothesis and premises are correct at all. In any case supposing by some process East Pakistan were to merge with India and the former undivided province of Bengal was to come into existence again. I do not think the majority of people in West Bengal would at all welcome it. I would mean having a permanent Muslim majority in population and therefore in the Government for all time to come."[১৫৮]

শ্রী লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রীর নিকট চিঠিতে ভারত সরকারকে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করে লোক বিনিময়ের পরামর্শ প্রদান করেন।[১৫৯]

পূর্ব পাকিস্তানে যখন স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে সেই সময় নেতৃবৃন্দের এ ধরনের পরামর্শ নিশ্চয়ই সংখ্যালঘুদিগকে বিভ্রান্ত করে। কেননা এ সকল খবর ভারতীয় পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করে। সংখ্যালঘু লোকদিগকে তাদের স্ব স্ব গৃহে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা যখন সবচেয়ে বড় কাজ, সে সময় এরকম একটি উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং উদারভাবে বাস্তুত্যাগের সার্টিফিকেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারত সরকার অবাঞ্চিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। বস্তুত হিন্দুদিগকে পাকিস্তান ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাজের বিরুদ্ধে আগেও একাধিকবার অভিযোগ করা হয়েছে।"[১৬০]

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার বিবৃতিতে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদিগকে সহজতর পন্থায় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেন। সবাইকে আসতে হবে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে। সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনারে অফিস থেকে। তবে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের শর্ত হল এই যে, সংশ্লিষ্ট পরিবারটি আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে থাকবে এবং সরকারের কাছে পুনর্বাসনের দাবীদার হবে না।[১৬১]

এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে পাকিস্তান সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার মি.জি.এ.পার্থ সারথীর নিকট প্রতিবাদ পত্রে জানায় "ভারতের স্বরাষ্ট্র উজিরের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মানসিক পরিস্থিতি জটিলরূপ ধারন করবে।"[১৬২]

ভারতীয় সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধানের দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদিগকে বাস্তুত্যাগের উৎসাহ দেওয়ার দিকেই বেশী আগ্রহের পরিচয় দান করেন। উদারভাবে বাস্তুত্যাগ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে না হতেই পূর্ব পাকিস্তানে সেই কাজ শুরু করা হয়।[১৬৩]

এ সময় ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তা হচ্ছে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব। এই বিষয়ের প্রতিবাদ করে ঢাকার সাতটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে এর

---

[১৫৮] `Letter, Report, R. Gupta, 27 July, 1962 Page 2 Home, Political, WESG
[১৫৯] ibid, Page 2
[১৬০] দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪,
[১৬১] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬
[১৬২] দৈনিক আজাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
[১৬৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

সমালোচনা করে উভয় দেশ হতে সংখ্যালঘুদের পাইকারীভাবে দেশত্যাগ অব্যাহত থাকায় তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলেন,

> "পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের ফলে সংশ্লিষ্ট কোন দেশেরই সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান ঘটিবেনা বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। যে কোন কারণেই হউকনা কেন, উভয় দেশ হইতে বাস্তুত্যাগ অব্যাহত থাকায় তারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। উভয় দেশের পক্ষেই পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানাতীত হইয়া যাইবে এবং ইহাতে তিক্ত মনোভাব দৃঢ়মূল হইয়া এই উপমহাদেশের শান্তি ও প্রগতিকে মারাত্মকরূপে ব্যাহত করিবে।"[১৬৪]

বিদেশী বিভিন্ন সংবাদপত্র বহুবার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ভারতীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিতভাবে বিদ্বেষ সৃষ্টি বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। ভারতে অব্যাহতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চলতে থাকলে এটি যে পরবর্তীতে জটিল আকার ধারণ করতে পারে এ সম্পর্কে ১৯৬৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বৃটেনের খ্যাতনামা সাংবাদিক মিঃ জিংগলী মার্টিন একটি প্রবন্ধে বলেন, "ভারতীয় জনমতকে মোছলেম বিরোধী করে তোলার ফল শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবং এর দ্বারা ভারতে বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রীদের পথ প্রশস্ত হবে না। - - -মনে হয় সাম্প্রদায়িকতাই ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ। সম্প্রতি আমরা কলিকাতায় উহার জঘন্যরূপ প্রত্যক্ষ করছি।"[১৬৫]

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ব্যাপারে ভারতের অতি আগ্রহী মনোভাব প্রকাশ পায় নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদেরকে ভারতের জাতীয় সমস্যা বলে ঘোষণা। নয়াদিল্লীর এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "এখানকার পূর্ব পাকিস্তানী মোহাজেরদের দায়িত্ব একান্তভাবেই নয়াদিল্লীর। নয়াদিল্লী একে জাতীয় সমস্যা বলে স্বীকার করে ঘোষণার পরে যে নয়া পরিস্থিতির দেখা গিয়েছে উহা মোকাবেলা করার দায়িত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নয়াদিল্লীর উপর এসে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ এ সম্পর্কে ব্যয়ভার গ্রহণে রাজি থাকতে পারে না।"[১৬৬]

নতুন জটিল পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপিত হলেও দেশত্যাগের হার কমেনি।[১৬৭] ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ভারতের ৩১ জন সংসদ সদস্য এক বিবৃতি প্রচার করেন, বিবৃতিটি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রচার করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ক্রমাগত নির্যাতন চালাবার নীতি ত্যাগ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ দেওয়ার এবং সংখ্যালঘুদের উপর দুর্ব্যবহার দ্বারা যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে মানবতার নামে প্রতিবাদ করার জন্য বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন জানায়।

১৯৬৪ সালের ৩০ মার্চ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী কমিটির সভায় বক্তৃতা দানকালে ভারতের দফতরবিহীন মন্ত্রী জনাব লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেন, "পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দশার বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে বলেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মালই যে শুধু নিরাপদে নাই, তা নয়, এমন কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রীলোকের ইজ্জত পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।"[১৬৮]

১৯৬৪ সালের ৩০ মার্চ এই সভায় ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এম.সি. খান্না তার পার্টির সদস্যদের বলেন যে, "পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের বিতাড়িত করছে।[১৬৯] নেতৃবৃন্দের এই সকল বক্তব্যের ফলে

---

[১৬৪] দৈনিক আজাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

[১৬৫] ঐ, ১৬ মার্চ ১৯৬৪

[১৬৬] ঐ, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

[১৬৭] এ সময় হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

[১৬৮] দৈনিক আজাদ ২ এপ্রিল ১৯৬৪

[১৬৯] ঐ, ২ এপ্রিল ১৯৬৪

ভারত সরকার ও সরকারী দলের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের এই ধরণের উগ্র উক্তির ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়।[১৭০]

ভারতীয় রাজনীতিবিদদের উস্কানীমূলক বক্তব্য পূর্ববাংলার হিন্দুদের উপর প্রভাব পড়ে। এই দাঙ্গার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের ইংগিত না থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারত সরকার এরূপভাবে অকৃতকার্য হত না।[১৭১]

হিন্দুদের মধ্যে শুধুমাত্র প্রচারকার্যই নয় এমনকি ভারতীয় এজেন্টগণ পূর্ববঙ্গের থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগকে সর্বোতভাবে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা করছিল। হিন্দুদের দেশত্যাগের পিছনে ভারতীয় এজেন্টগণ কাজ করেছে। এছাড়াও এসময় যারা অর্থাৎ যে সকল ভারতীয় মুসলমান এবং পূর্ববাংলার হিন্দুগণ সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশত্যাগে আগ্রহী ছিল তাদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা করত এ সকল এজেন্টরা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে।

> "The main cause of this exodus is allurement given to these poor people of getting financial and other benefits in India by some unscrupulous people belonging to both the communities and locally known as Adam Beparis."[১৭২]

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা প্রসঙ্গে রাও ফরমান আলী বলেন,

> "হিন্দুদেরকে ভারতে চলে আসার জন্য তারা প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাদের আর্মী পার্সোনেলের সাজ নিয়ে বিশেষ করে রাতের বেলায় নির্বিচার গোলাগুলির মাধ্যমে সীমান্ত এলাকাগুলোতে আতংক সৃষ্টি করেছে। ভারতীয়দের প্রস্তুতি ছিল সর্বব্যাপী মিলিটারি অ্যাকশনের আগেই তারা শরণার্থীদের জন্য শিবির তৈরী শুরু করেছিল।"[১৭৩]

পাক ভারত যুদ্ধের সময়কাল থেকে ১৯৬৪ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী আরও ৬ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনে "অনধিকারী" গণ্য করা হয়েছে।[১৭৪]

উদ্বাস্তু সংগঠন

ইউ.সি আর সি,'র নির্দেশে আন্দোলনের কর্মীরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে আত্মনিয়োগ করে। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা পুনর্বাসনের দাবীকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপক প্রয়াস গ্রহণ করে। একই লক্ষ্যে তৎকালীন শিক্ষক, ছাত্র, মহিলা এবং কর্মচারীদের মধ্যে পুনর্বাসনের দাবী ও সমাজ জীবনে তার তাৎপর্য তুলে ধরেছিলেন পুনর্বাসন সংগামে নিযুক্ত কর্মীরা।[১৭৫] পুনর্বাসন সংগ্রাম উদ্ভূত হয়েছে এক অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকেই। বাচাঁর তাগিদেই উদ্বাস্তুরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে গোড়া থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার দিকে এগিয়ে যান। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মী সারা দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। পুনর্বাসন সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য এখানেই।[১৭৬]

কলকাতায় অবস্থিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার পরিত্যক্ত সামরিক ক্যাম্প ও ব্যারাক সমূহ যথা লেক ক্যাম্প, যোধপুর ক্যাম্প, লেক ক্যাম্প, যাদবপুর ক্যাম্প, বি ও আর ক্যাম্প, দুর্গাপুর ক্যাম্প প্রভৃতি প্রফুল্ল ঘোষের আমলেই

---

১৭০ ঐ, ২ এপ্রিল ১৯৬৪

১৭১ ভারতীয় পত্রিকার মন্তব্য দৈনিক আজাদ, ৩ এপ্রিল ১৯৬৪

১৭২ Pakistan Observer, 26 April 1964

১৭৩ রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম" ডঃ মুনতাসীর মামুন কতৃক অনূদিত, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৮৯

১৭৪ অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭

১৭৫ অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮

১৭৬ অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮

উদ্বাস্তুদের দখলে চলে যায়। প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রী মণ্ডলীতে রিলিফ মন্ত্রী ছিলেন, ময়মনসিংহের শ্রী কমল কৃষ্ণ রায়। কমল বাবুই এসকল ক্যাম্পকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের জন্য সাময়িক আস্তানা হিসেবে খুলে দেন। এ সকল ক্যাম্পের মধ্যে যাদবপুর ছিল ছোট খাট শহরের মত এবং আকারেও বড়। এখানে আশ্রিত উদ্বাস্তুগণ 'যাদবপুর রিফিউজি এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে নিজেরাই ক্যাম্প শৃঙ্খলা পরিচালনা করতেন।[১৭৭]

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারী নীতি পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। যাদবপুরের মিলিটারি ক্যাম্পের জমির মালিক ছিলেন ভারত সরকার। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু নীতি পরিবর্তীত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রকাশ্যে ঐ জমিতে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু নীতিকে পরিবর্তন করতে পারবেন। তাই বিজয়গড় কলোনী প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গোপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিলেন।[১৭৮]

পুনর্বাসন সংগ্রামে জবরদখল উপনিবেশ গুলি একটি নূতন পথের দিশারী। সেই পথ অনুসরণ করে চলেছে অসংখ্য শরণার্থী নিজেদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। শুধু অকৃষিজীবি মধ্যবিত্তরাই নন কৃষিজীবিগণও এই পথের পথিক।[১৭৯] পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু জনতার দাবী দাওয়া নিয়ে সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার ছিল 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ' বা 'অল বেঙ্গল রিফিউজি কাউন্সিল অব এ্যাকশন'। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বাস্তুহারা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়।[১৮০] উদ্বাস্তু সমাগমের প্রথম দিকে কিছু বিশিষ্ট উদ্বাস্তু দরদী দেশপ্রেমিকের পূর্ব পাকিস্তানাগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারী অবহেলার বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুদের সংহত করে, গণ আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে সংগঠিত প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছিল।[১৮১]

১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি কর্মপরিষদের নেতৃত্বে শিয়ালদহের প্রায় ১৫ হাজার উদ্বাস্তুর এক গণ ডেপুটেশন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজভবনে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে পুলিশ লাঠি ও গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং কর্মপরিষদের সভাপতি শ্রী মহাদেব ভট্টাচার্যসহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করে। একদল উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবীতে শিয়ালদহ ষ্টেশনেই অনশন শুরু করেন। প্রায় দু সপ্তাহ পরে শরৎচন্দ্র বসু তাদের অনশন ভঙ্গ করান। এর পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কর্ম পরিষদের এক সভায় শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস সরকারের উদ্বাস্তু নীতির সমালোচনা করে দেশভাগের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি জাতীয় নেতাদের গালভরা প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সভার পরই বিধান চন্দ্র রায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়ে সাধ্যমত ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।[১৮২] ১৪ জানুয়ারি পুলিশী হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ 'ছাত্র ধর্মঘট' করেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে ৪/৫ জন ছাত্র নিহত হয়।[১৮৩]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর হিন্দু মুসলমান পুনর্বাসন প্রশ্ন প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রী অনীল সিংহ রাজ্যের সকল উদ্বাস্তু সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে রাজ্যস্তরে এক সম্মেলন আহ্বান করে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দেন।[১৮৪] দক্ষিণ কলকাতার বিচ্ছিন্ন কলোনি সমূহকে একটি প্রতিনিধি

---

[১৭৭] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
[১৭৮] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
[১৭৯] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯
[১৮০] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯
[১৮১] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫
[১৮২] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০১
[১৮৩] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০১
[১৮৪] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি স্থানীয় আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃত্বাধীনে আনয়নের জন্যে জন্যই পঞ্চাশ সালের এপ্রিল মাসে এক সফল সম্মেলনে 'দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতি' সংগঠিত হয়।[১৮৫]

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে নেতাজীনগরের নারকেল বাগানে দক্ষিণ কলকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কুদঘাট ও তিলজলার তেত্রিশটি কলোনির প্রতিনিধিরা যোগদান করে। এই সম্মেলনে মূল প্রস্তাবে কলোনি স্বীকৃতি ও বিনামূল্যে উদ্বাস্তুদের দখলীকৃত জমির মালিকানা দেয়ার দাবীতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৮৬] পশ্চিমবাংলার জমি ছিল রাজা, মহারাজা, জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে।[১৮৭] প্রত্যক্ষভাবে জমি দখলের আহবান দেওয়া হয় সরাসরি জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। কৃষক সভা অনেকদিন থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী তুলেছিলেন। ....অনধিকার দখল কারীদের উচ্ছেদের আইন এসেছিল তাদেরই চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন এবং ১৯৫৫ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়।[১৮৮]

দখলীকৃত জমির আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ইউ,সি,আর,সি এর পক্ষ থেকে। সরকারের নিস্পৃহতায় ব্যাপকহারে পতিত জমি দখলের ফলে জমির মালিকরা বিভিন্ন সময়ে পুলিশ বা গুণ্ডা দিয়ে জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের কলোনি ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। হুগলীর মাহেশ কলোনিতে জমি মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় ইউ.সি.আর.সি এর পক্ষ থেকে। কোর্ট মামলা সম্পর্কে রায় ঘোষণা করে বলে যে, কোন ব্যক্তি কোথাও তিন মাস জবরদখল করে বসবাস করতে থাকলে, সেখানে পুলিশ হামলা চালাতে পারে না। সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও চলবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা করা যেতে পারে মাত্র।[১৮৯] অপর দিকে দেওয়ানী মামলা করতে হলে সর্বপ্রথম জবরদখলকারীদের নামধাম সংগ্রহ করে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তার দখলীকৃতজমির মূল্যের উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে কোর্ট ফি দিয়ে মামলা রুজু করতে হতো। সে মামলা কতদিন বা কত বছর ধরে চলতে পারে তার কোন নিশ্চয়তা ছিলনা। পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি ও পরিত্যক্ত বাড়ির দখলদার উদ্বাস্তুগণের এক বিরাট আইনগত বিজয় রচিত হত মাহেশের ঐ রায়ে। অর্থাৎ পুরোনো দখলদারীগণ আইনী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলো।[১৯০]

জমির মালিক অর্থাৎ সামন্ত প্রভুদের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে সরকার আইনসভায় পেশ করার জন্য গোপনে "বেআইনি জমি দখলকারীদের উচ্ছেদ বিল" নামে একটি বিল পেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাত্র পঞ্চাশ পয়সা কোর্ট ফি দিয়ে মামলা করার সুযোগ রাখা হয়। গোপনে রচিত এই বিলের একটি অবিকল নকল ইউ,সি,আর,সির হাতে এলে ইউ.সি.আর.সি'র নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কলোনিতে শুরু হল উচ্ছেদ আইন বিরোধী সভা সমাবেশ ও প্রচার অভিযান। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এই প্রচার অভিযান অনতিকাল মধ্যেই ইউ,সি,আর,সির নেতৃত্বে তৎকালের বৃহত্তম গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল উচ্ছেদ আইন প্রতিরোধ করে সকল জবরদখল কলোনির সরকারী স্বীকৃতি ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আদায় করা।[১৯১] ২৮ মার্চ বিলটি আইনসভায় উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী কমিউনিস্ট সংগঠন আর.ই.আর.সি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এবং ইউ,সি,আর,সি মনুমেন্টের পাদদেশে কেন্দ্রীয় সমাবেশ আহ্বান করে। মনুমেন্টের পাদদেশে সেদিনের বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু। প্রফুল্ল ঘোষ সমাবেশে এসে জানিয়েছিলেন যে বিলটি সেদিন উত্থাপন করা হবে না। ২৯ মার্চ ছাত্র ধর্মঘট হয়। ৩১ মার্চ ইউ.সি.আর.সি'র নেতৃত্ব ঘোষণা করে যে তাঁরা উচ্ছেদ আইনের বিল নিয়ে সরকারের সঙ্গে

[১৮৫] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫
[১৮৬] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা ৯০
[১৮৭] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬
[১৮৮] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮
[১৮৯] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫
[১৯০] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫
[১৯১] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭

আলোচনা করবে। নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, ঘটনাসমূহ ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং ডাঃ রায় এর তাতে হাত ছিল। কেননা ডাঃ রায় উচ্ছেদ বিলটি আইন সভায় পেশ করার তারিখ বার বার পরিবর্তন করছিলেন। ইউ.সি.আর.সি'র নেতাদের সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণার পরপরই ডাঃ রায় তাদেরকে আলোচনার জন্য আহ্বান করেন।[১৯২] আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়,

> "(১) উদ্বাস্তুদের সঙ্গী এবং জবরদখলকারীদের মধ্যে কে উদ্বাস্তু আর কে নয় তা নির্ধারণ করবেন যোগ্য কর্তৃপক্ষ।
> (২) জবরদখলকারীদের বিকল্প পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না এবং জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে।
> (৩) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারও কোন ক্ষোভ থাকলে, তার মিমাংসার জন্য একটি আপীল ট্রাইবুনাল থাকবে।"[১৯৩]

এ বিলটি আইনসভায় পেশ করা হলে সামন্তপ্রভুদের প্রতিনিধি ও মন্ত্রীসভার সদস্য কংগ্রেস নেতা শ্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতির নেতৃত্বে আইন সভার মুসলমান ও কিছু কংগ্রেস সদস্য এর বিরোধিতা করেন। মুসলমান সদস্যদের পক্ষে সৈয়দ বদরুদ্দোজা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা ৩৮-২০ ভোটে হেরে যায়। ১৪ এপ্রিল ১৯৫১ সনে এটি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং উদ্বাস্তু নয় এমন জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ বিল রূপে গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসু ও পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় একে উদ্বাস্তুদের বিরাট বিজয় বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৯৪]

ইউ.সি.আর.সি সরকারের নিকট প্রস্তাব দেয় যে, উদ্বাস্তুদের যেন স্বাধীনভাবে জমি সংগ্রহের সুযোগ দেয়া হয়। এর ফলেই এল,পি বা "বায়নানামা" স্কীমের জন্ম হয়। এই পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে প্রায় ৩৬,০০০ পরিবার ক্যাম্প জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে।[১৯৫]

ইউ.সি.আর.সি'র পক্ষ থেকে ক্যাম্পবাসী সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের হাতে 'পুনর্বাসনের একটি বিকল্প পরিকল্পনা' উপস্থিত করা হয়। এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কি পরিমান পতিত ও চাষের অযোগ্য জমি আছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হয় এবং সম্ভাব্য শিল্প সম্পর্কেও পরিকল্পনা থাকে। এই বিকল্প পরিকল্পনাকে সরকার খন্ডন করতে পারেনি।[১৯৬]

বিভিন্ন আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে শ্রী কে পি মেথরানীকে সেক্রেটারি করে একটি 'তথ্য অনুসন্ধানী কমিটি' নিযুক্ত করেন । ইউ, সি, আর, সি সমগ্র পশ্চিমবাংলার সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে এবং একটি রিপোর্ট ও সুপারিশ এই কমিটির কাছে পেশ করে।[১৯৭] ইউ, সি, আর, সি কারও উপর দোষ না চাপিয়ে ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করে এবং পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব পেশ করে। ঐ কমিটি ঐ রিপোর্টটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল এবং অনেকগুলি সুপারিশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৫৪ সালে "মন্ত্রী কমিটির" অনুমোদনে পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির অনেকগুলিকে ঢেলে সাজাবার নির্দেশ থাকে। তার ফলে বহু কেন্দ্র পুনর্গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে নতুন পুনর্বসতি কেন্দ্র স্থাপনের সময় ইউ.সি.আর.সি'র প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করা হয়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাড়িয়েছিল ৫,৫৭,৫৪৪ ।[১৯৮]
দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা না হলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। পূর্ববাংলার শরণার্থীদের জন্য "দুরস অপেক্ষা" নীতি গ্রহণ করা হয়। ফলে পুনর্বাসন সংগ্রাম হয়ে ওঠে মূলতঃ রাজনৈতিক সংগ্রাম। উদ্বাস্তুগণ নিজেদের বাঁচার তাগিদেই গণতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগে করেন। তৎকালীন সংবাদপত্র,

---

[১৯২] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯
[১৯৩] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০
[১৯৪] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০-১২১
[১৯৫] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩
[১৯৬] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪
[১৯৭] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮
[১৯৮] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯

মাসিকপত্র এবং ইউ সি.আর.সির দলিলগুলির মধ্যে এই চিন্তাধারা প্রতিফলিত ও সংগ্রামের গণতান্ত্রিক চেতনা সুস্পষ্ট।[১৯৯]

উদ্বাস্তু ফ্রন্টই পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে ব্যাপক গণআন্দোলন পরিচালনা করেছে। উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে কিন্তু ছিলেন প্রধানত দেশব্যাপী কমিউনিস্টরাই। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২০০]

তথ্য অনুসন্ধানী কমিটি'র কাছে ইউ.সি.আর.সি'র প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ১৯৫৭ সালে রাজ্য সরকার একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন। ২৫৯ টি কলোনি উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সাল থেকে। জবর দখল কলোনিগুলিও উন্নয়ন তালিকায় স্থান লাভ করে। তখন উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল শহরের কলোনির ক্ষেত্রে প্লট প্রতি ১৬০০ টাকা এবং গ্রামীণ কলোনির ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ অবধি ৫.৭০ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়।[২০১]

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারী নীতি পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। যাদবপুরের মিলিটারি ক্যাম্পের জমির মালিক ছিলেন ভারত সরকার। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু নীতি পরিবর্তীত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রকাশ্যে ঐ জমিতে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু নীতিকে পরিবর্তন করতে পারবেন। তাই বিজয়গড় কলোনী প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গোপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিলেন।[২০২] ১৯৫১ সালে পণ্ডিত নেহেরু কলকাতায় এলে তাকে বিজয়গড় কলোনি পরিদর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের নিজস্ব উদ্যোগে আত্মপ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য।[২০৩]

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার উন্নয়ন খাতে ১৭৯ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবী করেন।[২০৪]

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি রিভিউ কমিটি নিয়োগ করেন এবং এই কমিটি গুলি ক্যাম্প, সরকারী কলোনি, জবরদখল কলোনি এক্স ক্যাম্পসাইট, হেড়োভাঙ্গা স্কীম ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের উদ্বাস্তুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে।[২০৫]

ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে ভারতীয় নাগরিক হয়ে উঠার ক্ষেত্রে সবরকম সহযেগিতা করেছেন। এ সকল শরণার্থীরাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করেছে। এ সম্পর্কে প্রণতি দত্ত বলেন,

> "Defferent political parties in defferent periods gave them safeguards for which local administration could not impose strict law and order.--- Illegal migrants are illigaly enrolled in voters list and used as vote banks. Indian politicians have often encouraged Bangladeshi migration to graner their vote."[২০৬]

---

[১৯৯] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭
[২০০] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭
[২০১] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
[২০২] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
[২০৩] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
[২০৪] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
[২০৫] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯
[২০৬] Pranati Datta, Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception study, Page 345

রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে যে সহযোগিতা করে এবং শরণার্থীরাও বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থন প্রদান করে তাদের সামর্থ মত। দুই পক্ষের পারস্পরিক সহযোগীতার ফলাফল ব্যাখ্যা করে মানস রায় বলেন,

> "the refugee population would provide the Communist Party of India (CPI) with Cadres and also some of its prominent leaders.----Together those factors resulted in the electoral defeat of Congress in 1967. The party replacing the old guard of the independence –movement era—,"[২০৭]

বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা সাহায্য ও সমর্থন নৈতিকতাভাবে তাদের পাশে ছিল। কিন্তু বামপন্থী সরকার ক্ষমতার আসার ফলে পুনর্বাসন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সরকার প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন একেবারে সামনের সারিতে।[২০৮] রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংগ্রামে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়।[২০৯]

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভারতীয় মুসলমানদের উপর গুপ্তচরবৃদ্ধির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এর ফলাফল ভেবে পূর্ববাংলায় হতাশা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ৯০ লাখ হিন্দুকে ডেকে নিয়ে সেখানকার পাঁচ কোটি মুসলমানকে পাকিস্তানের দিকে ঠেলে দেয়ার নীতিই যদি অনুসরণ করে যেতে থাকে তা হলে তাল সামলাবার জন্য পাকিস্তানকে তৈয়ার হতে হবে বলে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়।[২১০] হিন্দুদের ভীতিকর মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্ষমতা ছেড়ে ব্রিটিশরা চলে যায়, ফলে আইন শৃংখলার অবনতি এবং প্রভাবশালী হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ায় স্থানীয়ভাবে পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রায় অভিভাবকহীন হয়ে পড়াতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক ভীতি সৃষ্টি হয়। আর এই মানসিক ভীতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনগুলোর অতিরঞ্জিত প্রচারণা, যুদ্ধের হুমকি এবং উস্কানীমূলক বক্তব্য। এই সাথে চলে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবাংলা বাসীদের উদ্বুদ্ধ করা যেন পূর্ববাংলার হিন্দুগণ ভারতে তাদের সম্মানজনক অবস্থানে পৌছতে পারে। এই ধরণের বক্তব্য পরবর্তীতে পূর্ববাংলায় অবস্থানরত হিন্দুদের ভারতে ডেকে নেয়ার প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয় এবং পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশত্যাগ করতে এবং ভারতে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

ভারতীয় সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ, বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে যেমন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরকে দেশত্যাগে প্রভাবিত করেছে তেমনি এ সকল নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করার নামে বিভিন্ন আইন পাশ করতে। ভারতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পূর্ববাংলার হিন্দুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী হিন্দুদের সহায়তা করার নামে করা হলেও এ সকল সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে বসতি স্থাপন করতে হিন্দুদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল।

---

[২০৭] Manas Ray, Growing Up Refugee, History Workshop Journal, Issue 53, Calcutta, 2002, Page 151
[২০৮] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪
[২০৯] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪
[২১০] রাষ্ট্র, জানুয়ারি ১৯৪৯, দৈনিক আজাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়
ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত পুনর্বাসন কার্যক্রম

বিভিন্ন সময় ভারতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশত্যাগী হিন্দুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা সাধারণভাবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা হলেও সেই ব্যবস্থাগুলো পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতে চলে যেতে উৎসাহিত করেছে। পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী হিন্দু শরণার্থীদের জন্য ভারতীয় সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। সরকার শরণার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি অনুযায়ী। এরপর গ্রামীণ ও শহুরে শ্রেণীকে পুনর্বাসনের জন্য আলাদা আলাদা পদ্ধতি অবলম্বন করে। পুনর্বাসন কাজের সুবিধার জন্য শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত। একটি শ্রেণীকে ফেলা হত যে পরিবারগুলি পুনর্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হত তাদের এবং অপর শ্রেণীতে ফেলা হত যারা পুনর্বাসনের অযোগ্য তাদের।[১]

১৯৫০ সালের দাঙ্গা পূর্বকালীন সময়ে যারা দেশত্যাগ করেন তারা প্রাণভয়ে বাস্তুত্যাগ করে নি। তারা প্রধানত দেশত্যাগী হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ায় তারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অধিকার পাবেনা এই ছিল তাদের আশংকা।[২] এ শ্রেণীর পুর্নবাসন ব্যবস্থা ছিল এক ধরনের।
পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবথেকে বড় দলটি ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। তখনও পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়নি যে, অত্যাচারের চাপে হিন্দু পরিবারগুলি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। যারা কৃষিজীবী এবং গ্রামের মানুষ তারা রাজনীতিতে এমন অভিজ্ঞ নয় যে পাকিস্তান ধর্ম ভিত্তিক মুসলমান রাজ্য হওয়ায় হিন্দু হিসেবে তাদের কি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা অনুধাবন করবে। তাই ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে।[৩] পরবর্তীতে ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা পর ভারতে যে উদ্বাস্তু স্রোত সৃষ্টি হয় সে শ্রেণী ছিল এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।[৪] সুতরাং ভারতীয় ও পশ্চিমবাংলা সরকারের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের প্রয়োজন ও সামর্থের ভিত্তিতে।
১৯৪৯ সালের শেষের দিকে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ভারতে গমনের হার স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তখনকার মত উদ্বাস্তু সমস্যা গড়ে ওঠবার সমস্যাও কমে যাচ্ছিল।[৫] সে সময় ১২,৫০০ পরিবারের জন্য পুনর্বাসন করা ছিল জরুরী। এই সকল পরিবারগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। পূর্বপাকিস্তানে তারা জোত- জমা দেখত, ছোটখাট ব্যবসা করত, দোকান চালাত ইত্যাদি। এদের বেশিরভাগ পরিবারই কলকাতার সংলগ্ন শিবিরগুলোতে স্থান পেয়েছিল। আর একদল ছিল কৃষিজীবী পরিবার। আর ছিল তাঁতী শ্রেণী, একদল শিক্ষিত কারীগর শ্রেণী এবং অল্প কিছুসংখ্যক মৎসজীবী শ্রেণী।[৬] তাদেরকে তাদের শ্রেণী, পেশা, প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। একটি পরিকল্পনা রচিত হয়।[৭]

১৯৫০ সালের পর উদ্বাস্তু স্রোত বৃদ্ধি পেলে উদ্বাস্তুরা অনেক নীচু জমি, পতিত ও অনাবাদি জমি দখল করে অস্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। কলকাতা কর্পোরেশনের দমদম, দক্ষিণ দমদম, পানিহাটি এলাকায় এবং কর্পোরেশন

---

[১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ৪৬
[২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬
[৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮
[৪] ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার প্রকৃতি, ধরন, দেশত্যাগের হার, দুই দেশের সরকার ও জনগণের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।
[৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬
[৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭
[৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

এলাকার বাইরে টালীগঞ্জ, যাদবপুর, কসবা, বেহালা, গরফা, সন্তোষপুর এলাকায় প্রায় ১৯৫টি কলোনি গড়ে ওঠে। প্রণতি চৌধুরী এ সকল কলোনি গড়ে উঠা সম্পর্কে বলেন,

> "As the city of Calcutta attract milion of refugees before 1950. A large number of colonies emerged within Calcutta Corporation area itself. -----It is thus clear that the emergence of the squatter's colonies in the Municipal and Corporation areas in large number is mainly due to the better infrastructural families [facilities] and more job opportunities available in these area."[৮]

পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত সময়ে ভারতে বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগ করে। দেশত্যাগকারী মুসলমানদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল পেশাজীবী শ্রেণী। ফলে সেখানে পেশাজীবী শ্রেণী, বিশেষ করে কৃষক, তাঁতী প্রভৃতি পেশায় কর্মপোযোগী শ্রেণীর শুন্যতা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও কলিকাতা শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক পূর্ববঙ্গীয় লোক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, তারাও তাদের কাজ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে ফিরতে বাধ্য হয়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বেশীরভাগই ছিল ধনী জমিদার সহ উচ্চবর্ণের লোক। পশ্চিমবঙ্গে খুব কম পরিমান অর্পিত সম্পদ ছিল, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে তাদের বিভিন্ন সময়ে নুতন উৎপাদনমুখী জমি তৈরী এবং কর্মজীবী লোকের প্রয়োজন হয়। দেশবিভাগের ফলে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গার ফলে হাজার হাজার মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি, শিল্প বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হলে এর সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এ সম্পর্কে Kudaisya বলেন,

> "Its regional economy, particularly the jute sector, had suffered great disruptions and it did not have the resources to bear the additional burden of relief and rehabilitation. Moreover, the land- man ratio in west Bengal was already precarious and could endure no further agricultural colonization on expansion."[৯]

দেশভাগের ঘোষণার পরপরই হিন্দুরা পূর্ববাংলা ত্যাগ করছিল। দিনে দিনে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়ছিল। যাদের আর্থিক সংগতি নেই, সরকারের উপর প্রাথমিক আশ্রয়ের জন্য এবং পুনর্বাসনের জন্য নির্ভর করে তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলল। আশ্রয় শিবির খুলে এবং কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করে চলছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু হয় সরকার ও বেসরকারী উদ্যোগে।[১০] প্রথম দিকে চব্বিশপরগনা জেলার হাবড়া ও বাইগাঁছি গ্রাম অঞ্চলে কয়েকটি আশ্রয় শিবির চালু করেছিল। আর যারা সরকারের উপর নির্ভরশীল নন তারা ভিড় করেছেন কলকাতা শহরেই। ১৯৪১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল কোন জেলাগুলি পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হবে আর কোন জেলা ভারতের থাকবে। সেই হিসাবে যারা সংগতিসম্পন্ন তারা ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেদের উদ্যোগেই দেশ বদল করেন। এরা প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের কলকাতায় আত্মীয় স্বজন ছিল। প্রধানত তাদেরই ভরসায় এরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যে নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসিত হয়ে যান।[১১] কলকাতার উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার দুরকম ব্যবস্থা করেছিলেন। যাদের ভাড়া দেয়ার সামর্থ আছে কেবল বাড়ি সংগ্রহ করাই সমস্যা। এ শ্রেণীর

---

[৮] Pranati Choudhury, Refugee in West Bengal, page 19-21

[৯] Gyanesh Kudaisya, `DIVIDED LANDSCAPES, FRAGMENTED IDENTITIES: EAST BENGAL REFUGEES AND THEIR REHABILITATION IN INDIA 1947-79' , Page 111-112

[১০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

[১১] শংকর ঘোষ, হস্তান্তর, পৃষ্ঠা ১৮৫,

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বাস্তুর জন্য সরকার কয়েকটি বাড়ি হুকুম দখল করেছিলেন এবং তারপর তাকে ভাগ করে ছোট ছোট ফ্লাটের আকারে ভাড়া দিতেন। আর এক শ্রেণী যারা অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল তবে ভাড়া নিজেরা বহন করবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন কলিকাতা অঞ্চলে সেনানিবাস গড়ে উঠেছিল তেমন পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে নানা স্থানে সেনানিবাস গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর এগুলো কোন কাজে লাগছিল না। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল।[১২] স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গত্যাগী উদ্বাস্তু পরিবারের ভিড় কলকাতা অঞ্চলে জমতে থাকে। তাদের বাসস্থানের সমস্যা একদিকে অপর দিকে এতগুলি খালি ব্যারাক পড়ে রয়েছে।[১৩] এই পরিস্থিতিতে সমাধানের পথ এই ব্যারাকগুলিকে কাজে লাগানো। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবারগুলি খালি ব্যারাকগুলি নিজেরাই দখল করে বসবাস শুরু করে।[১৪]

কলকাতা শহরের বিস্তার ঘটছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই। স্বাধীনতার ঠিক আগে হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে নিউ আলীপুর আবাসিক অঞ্চল ও অভিজাতদের জন্য রিজেন্ট পার্ক আবাসিক অঞ্চল গড়ে ওঠে। এই আবাসিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ কতগুলি বিত্তবান মানুষের হাতে চলে গিয়েছিল। যেদিকে আবাসিক অঞ্চলের বিস্তার ঘটছে সে অঞ্চলে চাষের জমি স্বল্পমূল্যে কিনে পতিত রেখে দেয়া হত। তারপর চাহিদা বাড়লে সেখানে জমির উন্নয়ন সাধন করে জমি বহু দামে বিক্রয় করা হত।[১৫]

দক্ষিণ কলকাতার উদ্বাস্তুগণ নিজস্ব উদ্যোগে নিজস্ব উদ্যোগে পতিত জমি জবরদখল করে নিজেদের পুনর্বাসন নিজেরাই করতে এগিয়ে গিয়ে অর্ধ শতাধিক জবরদখল কলোনী গড়ে তোলেন– বিচ্ছিন্নভাবে; কিন্তু একটির দৃষ্টান্তে অপরটি গঠিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে।[১৬]

উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের বন্দোবস্ত নিজেরাই করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনিময় এবং পুরো গ্রাম বিনিময়ের ঘটনা বিরল নয়। অনেকে নিজেদের সামর্থ দিয়ে জমি কিনে নিয়েছে। ঘর বাড়ি তৈরী করে নিজ নিজ আশ্রয় ও জীবিকার সংস্থান গড়ে তুলেছে।[১৭] এর পাশাপাশি তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্লট নিয়ে তাদেরকে পূর্ববাংলা থেকে ডেকে নিয়েছেন। প্রদ্যুৎকুমার বসু বলেন,

> "আমার মামার বাড়ি ঠাকুরগ্রাম। উপেন্দ্রনাথ ধর, সমর ধর– এঁরা আমার মামা। তাই বাবাকে বললেন যে তোমরা পাকিস্তানে থাকতে পারবে না, এদেশে চলে এস। এখানে রিফিউজিদের নিয়ে কলোনি হচ্ছে, তোমরা চলে এস। আমার বাবা গোয়ালন্দে চাকরি করতেন। আমার বাবা প্রভাতকুমার বসু ছিলেন নামকরা ডাক্তার। আমরা মামাদের সঙ্গে চলে এলাম।"[১৮]

কলকাতায় অবস্থিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার পরিত্যক্ত সামরিক ক্যাম্প ও ব্যারাক সমূহ যথা লেক ক্যাম্প, যোধপুর ক্যাম্প, যাদবপুর ক্যাম্প, বি ও আর ক্যাম্প, দুর্গাপুর ক্যাম্প প্রভৃতি ড. ঘোষের আমলেই উদ্বাস্তুদের দখলে চলে যায়। ড. ঘোষের মন্ত্রী মণ্ডলীতে রিলিফ মন্ত্রী ছিলেন, ময়মনসিংহের শ্রী কমল কৃষ্ণ রায়। কমল বাবুই এসকল ক্যাম্পকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের জন্য সাময়িক আস্তানা হিসেবে খুলে দেন। এ সকল ক্যাম্পের মধ্যে যাদবপুর ছিল ছোট খাট শহরের মত এবং আকারেও বড়। এখানে আশ্রিত উদ্বাস্তুগণ 'যাদবপুর রিফিউজি এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে নিজেরাই ক্যাম্প শৃঙ্খলা পরিচালনা করতেন।[১৯]

---

[১২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২
[১৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২
[১৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২
[১৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫
[১৬] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), পৃষ্ঠা ১০৫
[১৭] অনিল সিংহ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, পৃষ্ঠা ২৬
[১৮] প্রদ্যুৎকুমার বসু, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৩৫
[১৯] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা ২৬

কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাসস্থান সংগ্রহ করতে পারলে জীবিকা নির্বাহের পথ খুলে যায় এই বোধ মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারদের মধ্যে এই কারণে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু বৈধ উপায়ে অল্প ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলে বাসস্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যেখানে সম্ভব হয় সেখানেই তা ব্যয়সাপেক্ষ। সেই অর্থ ব্যয় করবার মত সামর্থ এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের মধ্যে কম মানুষেরই ছিল। অপর পক্ষে কলকাতার আশে পাশে অনেক খালি জমি পড়ে আছে। সাধারণত এই জমির মালিক কোন অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তি, সম্ভবত তিনি এই জমি ফেলে রেখেছিলেন মূল্য বাড়লে পরে বিক্রয় করে ভাল লাভ করলেন এই আশায়। কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এই ধরনের জমি প্রচুর ছিল। যেখানে লাভের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত জমি কিনে ফেলে রেখে দিতেন।[২০]

এই পরিস্থিতি হতেই জবরদখল কলোনি গড়ে তুলবার প্রেরণা এসেছিল। একদিকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাসস্থান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাবোধ, অপরদিকে অনধিকৃত খালি জমির ছড়াছড়ি। খালি জমি দখল করলেও তা অনধিকার প্রবেশ হয় এবং আইন লংঘন করার সামিল হয়। কিন্তু যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তারা এসেছিল তাতে তাদের এই নৈতিক বাধার শক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ----ফলে আইন সঙ্গত নয় এমন কাজ করতেও তাদের বাধা থাকে না। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষেও এ অবস্থায় জবরদখলের চেষ্টায় বাধা দেওয়া সম্ভব হয়না। কাজেই সবদিক হতে বাস্তব পরিস্থিতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে ব্যাপকহারে কলকাতার সংলগ্ন এলাকার খালি জমি জবরদখল করে কলেনি গড়ে তোলবার উৎসাহ বেড়ে যায়। এইভাবেই জবরদখল কলোনি সৃষ্টি হয়।[২১] বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র বসু (ভানু) জানান,

> "মন্ত্রী নিকুঞ্জবহারী মাইতির কাছ থেকে লোক বসাবার অনুমতি নেওয়া হয়। তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না –তারঁও এই লোক বসানোয় সায় ছিল।----- ১৯৪৯ সালেও মুসলিমদের দেখেছি। ঢাকার নারিন্দার---- বলে একজন থাকতেন। তিনি ভয় দেখিয়ে মুসলিমদের তাড়িয়ে দেন যাতে ঐ বাড়িতে কিছ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিতে পারে। ----মানে জাদরেল লোক অনেকেই মান্য করত, ভয় পেত। উনার ভয়ে মুসলিমরা পালিয়ে যায়, পরে আরেকদল লোক উদ্বাস্তুদের নিয়ে ঐ খালি ঘরগুলোতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে।[২২]

পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু উদ্বাস্তুপল্লী গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ছাউনী অবলম্বন করে। এমনই একটি স্থান যাদবপুরের কিছু জমি জবরদখল করে শুরু হয় যাদবপপুর বাস্তুহারা কলোনি ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে। শিয়ালদহ স্টেশনের আশ্রিত মানুষদের থেকে ১২টি পরিবারকে নিয়ে এসে এই কলোনি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কয়েকজন। লোকমুখে শুনে ও সংবাদপত্রে প্রচারের ফলে বহু শরণার্থী তখন নিজে থেকেই আসতে শুরু করেন।[২৩]

যাদবপুর বিজয়গড় কলোনি গড়ে উঠেছিল গত মহাযুদ্ধে হুকুমদখল করা সরকারী জমির উপর সরকারের মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে।[২৪] কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রথম যে উপনিবেশ উদ্বাস্তু পরিবারের নিজেদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, তা হল বিজয়গড় কলোনী। সরকারের হুকুমদখল করা জমিতে সৈন্যদের জন্য যে ছাউনি গড়ে উঠেছিল মহাযুদ্ধের পর সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। শ্রী সন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে এই পরিবারগুলি এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করবার কথা সরকারের নিকট উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবের সম্মতিসূচক ইঙ্গিত তারা পেয়েছিল।[২৫] এভাবে যাদবপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বাঘা যতীন কলোনি, নেহেরু কলোনি, নেতাজী নগর কলোনি গড়ে উঠেছিল।[২৬]

[২০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০
[২১] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭
[২২] সুভাসচন্দ্র বসু, ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সম্পাদক- ত্রিদিব চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ২০০
[২৩] ত্রিদীব চক্রবর্তী, ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, পৃষ্ঠা ১৪-১৫
[২৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭
[২৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫
[২৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হতে জবরদখল কলোনিগুলো ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে লাগলো। অনেকগুলি পরিবার দলবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ স্থান নির্বাচন করত। তারপর তার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হতেন। তারপর একদিন আকস্মিকভাবে একযোগে পরিবারগুলি এসে জায়গাটি দখল করে নিত। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিবারকে জমি বিলি করা হত। তারাও বাশেঁর খুটি ও হোগলার বেড়া দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দখল বজায় রাখার জন্য ঘর তুলে নিত। উম্মুক্ত পতিত জমিতে আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত দখলের কাজ এইভাবে সমাপ্ত হয়ে যেত বলে মালিক বাধা দেয়ার সুযোগ পেতনা। কলোনি গুলির স্বাধীনতাসংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা বা শহীদদের নামে নামকরণ করা হত।

ম্যাপ: ১০.১ Calcutta wards where Hindu refugee replased Muslim inhabitants, 1964

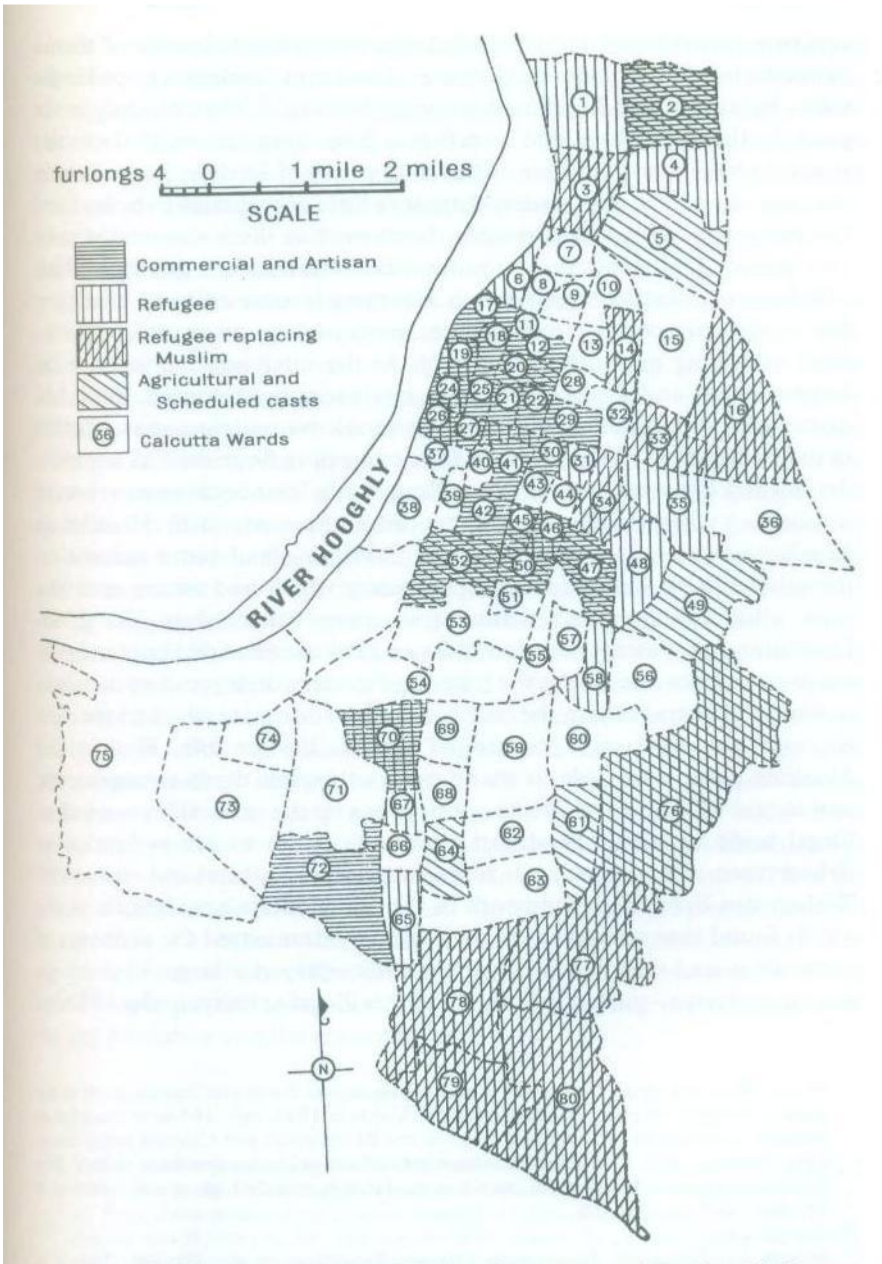

4.3 Calcutta wards where Hindu refugees replaced Muslim inhabitants, 1964 (N. K. Bose, *Calcutta: 1964. A social survey*, Bombay, New Delhi, Calcutta and Madras, 1968).

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে যখন ব্যাপক হারে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাংলায় আগমন শুরু হল, তখন জবরদখল কলোনি অতি দ্রুত নানা স্থানে গড়ে উঠতে লাগল। এ ব্যাপারে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি খুব তৎপরতার সহিত কাজ করত। আজ যে মাঠ খালি পড়ে আছে কাল ভোরে দেখা গেল সেখানে অনেকগুলি উদ্বাস্তু পরিবার তাদের মালপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। এর পেছনে যে একটা প্রস্তুতিপর্ব থাকত তা অনুমান করে নেয়া যায়। স্থানটি আগে নিশ্চয় জরিপ করে গিয়ে থাকবে। তারপর এক প্লানও প্রস্তুত হয়ে থাকবে। কারণ জমি দখল নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জরিপ করে বিভিন্ন স্থানে তা খুটির সাহায্যে চিহ্নিত করে যেত। বিভিন্ন পরিবার নিজ নিজ দাগ দখল পাবার আগেই চারখানি খুটি পুতে, জায়গাটি হোগলার বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করত। তারপর ধীরে ধীরে সেখানে পরিবারের সাধ্যমত কলোনি গড়ত। তাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল সামান্যই।[২৭]

উদ্বাস্তুদের নেতা শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চতর বিচার বিভাগীয় সার্ভিসের অফিসার। তার উদ্যোগে গড়ে ওঠে বাঙ্গুর কলোনি। এ জায়গা ছিল গভীর হোগলা বনে আচ্ছন্ন। তবে কলকাতা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল বলে এ জায়গাটি নির্বাচন করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল মধ্যবিত্ত রুচি সম্মত শ্রেণীর জন্য।[২৮]

এভাবে ১৯৪৯ সালে যা শুরু হয় ১৯৫০ সালে তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যতগুলি জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল, সে সবই ১৯৫০ সালের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তার কারণ যত সম্ভাব্য জমি খালি পড়ে ছিল তা এর মধ্যে সবই দখল হয়ে গিয়েছিল।[২৯] বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দানের পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে অনিচ্ছুক সরকারের আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে পতিত জমিতে জীবন প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল টালীগঞ্জে ১৯৪৮-৪৯ সালে – সেই উদ্যোগই দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যেই। কম বেশী প্রায় এক কোটি বিঘা জমি দখল করেছিল উদ্বাস্তুরা।[৩০] বৃহত্তর কলকাতায় সবশুদ্ধ ১৩৩ টি জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল। তাতে মোট দু' হাজার একর জমি জবরদখল করে ২১৩৭৭ টি পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। জবরদখল কলোনিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শহীদ যতীন দাস কলোনি, বিজয়গড় কলোনি, নেতাজীনগর কলোনি, বিবেকনগর কলোনি ইত্যাদি।[৩১]

পশ্চিমবাংলার তৎকালীন গভর্নর ড. কাটজু চাইতেন জবরদখল কলোনিগুলোর মালিকানা সমস্যার আইনসঙ্গত সমাধান। তিনি জবরদখল কলোনিগুলো পরিদর্শন করে এর সমাধানের চিন্তা করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১ আগস্ট তিনি পুনর্বাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তায় বিজয়গড় কলোনি পরিদর্শন করে এর আইনসঙ্গত সমাধানের বিষয়ে কলোনির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলে তারা আইনসঙ্গত মালিকানার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।[৩২] পুনর্বাসন সচিব পরামর্শ দেন "প্রথমত হুকুমদখল আইন প্রয়োগ করলে জমি দখল নেয়া তরান্বিত হবে। দ্বিতীয়তঃ নতুন যে আইন পাশ হয়েছে (ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইন) তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরে ১৯৪৫ সালে যে মূল্য প্রচলিত ছিল, সেই মূল্যেই জমি পাওয়া যাবে। ফলে দেশের এই দুর্দিনে চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে মালিক অযথাভাবে মুনাফা নিতে পারবেনা।"[৩৩]

জবরদখল কলোনি বৈধ করণের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। জবরদখল কলোনি বৈধ করণের জন্য সরকার পরিবার পিছু খরচের হার নির্ধারণ করে ১২৫০ টাকা। কিন্তু তাতে সকল জবরদখল কলোনির বৈধকরণ সম্ভব হয় না। পরবর্তীতে হিসাব করে দেখা যায় যে এই হার যদি বর্ধিত করে ৬০০০ টাকা করা হয় তাহলে সব কলোনিরই

[২৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮
[২৮] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫২-৫৩
[২৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৮
[৩০] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 114
[৩১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৮
[৩২] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭- ৩৮
[৩৩] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮

বৈধকরণ সম্ভব হয়। এই হার গ্রহণ করা হয়।[৩৪] যারা অবস্থাপন্ন তারাই সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। যারা তেমন অবস্থাপন্ন নয় কিন্তু উৎসাহী, তারাও নিজেদের পায়ে দাড়াতে চেষ্টা করেছিল। এরাই জবরদখল কলোনি করতে উৎসাহী হয়েছিল।[৩৫]

পশ্চিমবাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এই সমস্যাটির ভার তিনি নিজে নিয়ে তার দ্রুত সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ এবং ত্রাণ সচিবের পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। ডাঃ রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পুনর্বাসন কাজের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হবে। এতকাল পুরানো ত্রাণ বিভাগই উদ্বাস্তদের কাজ দেখে আসছিল। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁর দূরদর্শীতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, পরে যখন পুনর্বাসনের দায়িত্ব আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছিল, তখন এই ব্যবস্থা খুব কাজ দিয়েছিল। ডাঃ রায় নিজেই এ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩৬] এ বিভাগের পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ এবং পুনর্বাসন সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয় চব্বিশ পরগনা জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ডাঃ রায় ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় তার অনুপস্থিতিতে পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় উদ্বাস্তদের জন্য ভূমি খুজে বের করার। ড. কাটজু উপদেশ দেন ছোট প্লেন ভাড়া করে গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে একাজ সহজে সমাধান হবে।[৩৭] ড. কাটজু প্রস্তাব দিলেন উদ্বাস্ত পরিবারদের প্রতিনিধিরা তাদের পছন্দমত জমির সন্ধান এবং বিবরণ এনে দিতে পারেন। তার ভিত্তিতে জমি হুকুমদখল হলে অবশ্যই তারা সেখানে উঠে যাবে। এই প্রস্তাবে উদ্বাস্তরা তখনি রাজী হয়ে গেলেন। উদ্বাস্ত নেতা শ্রী শৈলেন চৌধুরী একটি বাগানবাড়ির সন্ধান দেন এর নাম ডালমিসের বাগানবাড়ি, সেটি হুকুমদখল করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের পর কলোনির উদ্বাস্তদের বাস্ত জমি বিলির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। গড়ে ওঠে নাকতলা ১নং কলোনি।[৩৮]

যে জমি জবরদখলকারীদের স্থানান্তরিত করে মুক্ত করা হয়েছিল, তা নতুন উদ্বাস্ত পরিবার জবরদখল করে নিয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মধ্যে এই জবরদখল করে কলোনি স্থাপনের রীতি অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল, তখনকার জটিল পরিস্থিতি। কলকাতার উপকণ্ঠেই অনেক পতিত জমি পড়েছিল। সেখানে বাসস্থান করতে পারলে জীবিকা অর্জনের সমস্যার সমাধান করা যায়।[৩৯]

যারা চাষ করে খায় তারা জীবিকার জন্য কৃষি সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, যদি তাদের চাষের উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করে দেওয়া যায়। এই কারণেই দেখা গিয়েছে কৃষিজীবী উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন সমস্যা একদিকে সহজ বরং তারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে।[৪০]
সালানপুরে পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পতিত ডাঙ্গা জমিকে কৃষিযোগ্য করে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন দেয়া। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ জমি কৃষিযোগ্য করা যায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। এই পরীক্ষা সফল হলে পশ্চিমবাংলার মধ্যেই অনেক উদ্বাস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া সম্ভব হবে। কারণ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর ডাঙ্গা জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।[৪১] পুনর্বাসন সচিব মাঝে মাঝে বিভিন্ন আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করতেন আশ্রয় শিবিরগুলোতে কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা দেখার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কোথাও কোন

[৩৪] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫
[৩৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮
[৩৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
[৩৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২
[৩৮] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮
[৩৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০
[৪০] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬
[৪১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮

অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে কিনা তা দেখা। আর সম্ভব হলে তার দখল নেয়া যাতে সেখানে পুনর্বাসনের জন্য কলোনি স্থাপন করা যায়। এই রকম অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই সরকার কর্তৃক স্থাপিত অনেক কলোনির ইতিহাস শুরু হয়।[৪২]

যে সব উদ্বাস্তু পরিবার সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে আশ্রয় শিবিরে বাস করত তাদের যেমন খাওয়ার জন্য ডোল দেবার ব্যবস্থা ছিল, তেমনি পরার জন্য বস্ত্র দেবার ব্যবস্থা ছিল। কি হারে বস্ত্রাদি দেয়া হবে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশ ছিল। প্রতি পরিবারের মানুষের জন্য বছরে দুবার এক প্রস্থ করে জামা ও কাপড় দেবার ব্যবস্থা ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

সারণী: ১০.১

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আশ্রয়শিবিরে বরাদ্দ পোশাক

শ্রেণী	বরাদ্দের পরিমান
বয়স্ক পুরুষদের জন্য	দুখানি ধুতি ও দুখানি জামা
বয়স্ক মেয়েদের জন্য	দুখানি শাড়ি, দুখানি সায়া ও দুখানি ব্লাউজ
বালকদের জন্য	দুখানি হাপপ্যান্ট ও দুখানি সার্ট
বালিকাদের জন্য	দুখানি জামা ও দুখানি অধোবাস

সূত্রঃ উদ্বাস্তু, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২০৬

এই ব্যবস্থার ফলে জামা, হাফপ্যান্ট, ফ্রক প্রভৃতির চাহিদা বিপুল পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং এগুলি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্য নেয়া হত। সাধারণ ছ'মাস অন্তর বছরে দু'বার করে এগুলি বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে বিলি করা হত।[৪৩]

কৃষিজীবী পরিবারগুলি প্রধানত বর্ধমান জেলার শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন বর্ধমান জেলার প্রশাসক শ্রী বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পুনর্বাসন কাজে উৎসাহী ছিলেন। এই জেলার পূর্ব অঞ্চলে অনেক বিস্তৃত এলাকা অনাবাদী ছিল। বিশেষ করে কালনা ও কাটোয়া মহকুমার ভাগীরথি নদী সংলংগ্ন অনেক চাষের উপযুক্ত জমি পুনর্বাসনে ব্যবহার করার যোগ্য ছিল। এই জায়গায় এই কৃষক পরিবারগুলি নিজেদের চেষ্টায় ভূমি সংগ্রহ করে নিজেদের পুনর্বাসনের ভার নেবার কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। সরকার কৃষি ও বাস্তুজমি কিনবার ঋণ, চাষের বলদ কিনবার ঋণ এবং এক বৎসরের খোরাকী দেবেন- এই ব্যবস্থা হয়েছিল।[৪৪]

যারা দরিদ্র অথচ আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস রাখেনা তারাই সরকারী আশ্রয় শিবিরে ভর্তি হয়ে সরকারের সাহায্যে পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী পরিবারগুলি কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় শিবির গুলিতে স্থান নিয়েছিল।[৪৫] এই শ্রেণীর জন্য শিবির ছিল তিনটি হাবড়া, বাইগাছি ও গয়েশপুরে। হাবড়া, বাইগাছি ও গয়েশপুরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক বিস্তৃত ভূখণ্ড সরকার হুকুমদখল করে বিদেশী সৈন্যদের জন্য অস্থায়ী বাসের জন্য ব্যবহার করছিল। কাজেই বড় বড় ডরমেটরী ধরনের ঘর তৈরী করেছিল। নূতন করে দখল করবার হাঙ্গামা ছিল না। দ্বিতীয়ত এক সঙ্গে অনেক মানুষের বাস করবার উপোযোগী অনেক বাড়ি ছিল বলে এখানে আশ্রয় শিবির গড়ে উঠেছিল।[৪৬] গয়েশপুর অঞ্চলে পরবর্তীতে একটি উপনগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হলে সেখানে তাদের বাড়ি করার জন্য চার কাঠা করে জমি দেয়া হয় এবং বাড়ি করার জন্য ঋণ দেয়া হয়। তবে জমি কমে যাওয়ায় যারা পূর্ব থেকেই এখানে ছিল তারা এর প্রতিবাদ করে এবং এ বিষয় নিয়ে বিরোধ ক্রমশ দানা

[৪২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮
[৪৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৬
[৪৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭
[৪৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮
[৪৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০

বাঁধতে থাকে। নানা রাজনৈতিক দলের নেতা তাদের সমর্থন করে আন্দোলন শুরু করে। পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি রাজনৈতিক দল এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল।[৪৭]

যারা পণ্যদ্রব্যের উৎপাদক তাদের সম্পর্কেও সেকথা খাটে। এ শ্রেণীতে প্রধানত পড়ে তাঁতি সম্প্রদায়। তারাও তাঁত পেলে আর কাপড় বোনবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সুতো পেলে বস্ত্র উৎপাদন করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। কারণ দেশে এখনও তাঁতের কাপড়ের প্রচুর চাহিদা আছে।[৪৮]
যারা বিশেষ বিশেষ শিল্পে দক্ষ তারাও অনুকূল পরিবেশ পেলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তাদের মধ্যে রয়েছে তাঁতীদের অবস্থান। তারা কাঁচামাল যোগার করে দিলে বা কিছু মূলধন দিলে চালিয়ে নিত। তারা দলে দলে নদীয়া জেলায় পুনর্বাসন নিয়েছিল।[৪৯]
তাঁতীদের একটি ছোট দল কলিকাতার সংলগ্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন চেয়েছিল। তবে তার পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি বড় তাঁতী দল নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। যে অঞ্চল তারা নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করেছিল তা ছিল স্বরূপনগর অঞ্চল। তা পূর্বে কৃষ্ণনগর এবং পশ্চিমে নবদ্বীপ, এই দুটি বিখ্যাত প্রাচীন নগরের মাঝখানে অবস্থিত। আশ্রয়বাসী তাঁতীরা কিন্তু এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। তারা চেয়েছিল এমন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে যেখান হতে তাঁতে উৎপাদিত কাপড় বিক্রয় করা যায়। এ সম্পর্কে হাওড়ার হাট উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁতের কাপড়ের এত বড় পাইকারী বিপনণ বোধ হয় বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। তারই আকর্ষণে তারা কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতে চেয়েছিল।[৫০] রাজপুরের নিকট চৌহাট্টা গ্রামে অনেকখানি জমি সংগ্রহ করা গিয়েছিল। তাঁতীদের পছন্দ হওয়ায় এখানেই তাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়।[৫১] জিরাটে একটি সরকারী কলোনিতে পুনর্বাসন নিয়েছিল তন্তুবায় শ্রেণী।

যারা মৎস্যজীবী তারা মাছ ধরবার সুবিধা আছে এমন স্থানে বসতে পারলে, তারা নিজেদের পায়ে দাড়াবার ক্ষমতা রাখে।[৫২] পূর্ববঙ্গের আশ্রয় শিবিরবাসী মৎসজীবীরা অধিকাংশই গয়েশপুরের আশ্রয় শিবিরে বাস করত। তারা ইচ্ছা প্রকাশ করে যে তারা কাচঁড়াপাড়ায় পশ্চিমপ্রান্তে ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে তারা খুশি হবে। প্রয়োজনমত জমি পাওয়া শক্ত ছিল না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাচঁড়াপাড়া অঞ্চলে রেল লাইনের দুধারে বিরাট জমি হুকুমদখল করা হয়েছিল। সুতরাং যে জমির প্রয়োজন তা সরকারের দখলেই ছিল। এখানেই ছিল পরিকল্পিত কল্যানী নগরী। এ পরিকল্পনা অক্ষুন্য রেখে নদীর তীরে কয়েক শত বিঘা জমি নিয়ে মৎসজীবীদের একটা পছন্দমত পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়।[৫৩] এই জায়গাটির নাম মাঝের চর। ১৯৪৯ সালে যত আশ্রয়প্রার্থী মৎসজীবী ছিল সকলকে এখানে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর যে সকল উদ্বাস্তু সরকারের আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ছিল ১৯৫১ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে তাদেরকে পুনর্বাসন স্থলে সরিয়ে নিতে হবে। এ নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়েছিল।[৫৪]

রানাঘাটে একটি আশ্রয় শিবির করা হয়েছিল, ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় এক লক্ষ লোকের থাকবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে রানাঘাটে ও ধুবুলিয়ায় অনেকখানি জমি হুকুমদখল হয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। রানাঘাটের জমিতে মালপত্র রাখার জন্য টিনের চাল ও পাকা মেঝের ঘর তৈরী হয়েছিল। যার পারিভাষিক নাম 'নিসেনহাট'। প্রতিটি নিসেনহাটে কুড়িটি পরিবারের স্থান দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

[৪৭] বিস্তারিত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১-৫৪
[৪৮] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৬
[৪৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২
[৫০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯
[৫১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯
[৫২] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬
[৫৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯
[৫৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮

এরকম ৯০টি ঘর ছিল। এছাড়া এর সংলগ্ন ফাকা জমিতেও ঘর তৈরী হয়।[৫৫] কৃষ্ণনগরের উত্তরে জলাঙ্গী নদী পার হয়ে প্রায় দশ মাইল উত্তরে বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করে বিমানবন্দর নির্মাণ করা হয়েছিল। সৈন্যদের থাকবার জন্য বড় বড় ঘরও ছিল। এখানে আরও ঘর তুলে প্রায় ৬০ হাজার লোকের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়।[৫৬] জনসংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় আশ্রয় শিবির ছিল ধুবুলিয়ার আশ্রয় শিবির এবং দ্বিতীয় স্থানে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প।

অনেক মুসলমান পশ্চিমবাংলা ত্যাগ করে চলে গেলে তাদের অনেক সম্পত্তি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। হাঙ্গামার মুখে সম্পত্তির মালিক পূর্ববঙ্গে চলে গেলে সদ্য আগত উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবার তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে নিজেদের আশ্রয় স্থান সংগ্রহের সমস্যার সমাধান করে নিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে মুসলমান উদ্বাস্তু পরিবার পাকিস্তানত্যাগী হিন্দুর সম্পত্তি গ্রহণ করেছে। আবার অনেক সময় বকেয়া খাজনার নালিশ করে জমিদার ডিক্রী জারী করে খাস জমির দখল নিয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক চাষের ও বাসের জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকেছে। ১৯৫২ সালের এক সরকারী তথ্যে দেখা যায় যে, মোট ৪৪,৬৬১ টি মুসলমান পরিবার নদীয়া জেলা ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল। ২২,৫৫৫ টি পরিবার পুনরায় পশ্চিমবাংলায় ফিরে এসে তাদের সম্পত্তি ফেরত পাবার জন্য আবেদন করলে তাদের মোট এক লক্ষ একর জমি ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৫৭] পশ্চিমবাংলা সরকারের অনুসন্ধানী কমিটির তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবাংলা থেকে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেশত্যাগের হার নদীয়া জেলায়। তার পরেই তাদের সংখ্যা চব্বিশ পরগনা জেলায়। অবশ্য উত্তরের জেলাগুলি হতেও চলে যায় কিন্তু তাদের সংখ্যা কম ছিল।

> "চব্বিশ পরগনা ও নদীয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত জমির মোট পরিমান ২ লক্ষ ৬ হাজার একর।
> জমির মালিককে দখল দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৪ হাজার একর জমি।
> বিনিময় ব্যবস্থায় হস্তান্তর হয়েছে ১৬ হাজার ৮০০ একর জমি।
> পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের দখলে আছে ৫৬ হাজার একর।[৫৮]
> পরিত্যক্ত জমি পড়ে ছিল ২৬,০০০ একরের মত।"[৫৯]

যে জমিগুলো এর মূল মালিকদের কাজে লাগছেনা সে জমিগুলো যাতে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করে। প্রথম প্রস্তাবে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হুকুমদখল করার অনুমতি দেওয়া হোক। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী এলাকায় ক্যারু এন্ড কোম্পানি কয়েকশত একর জমি কিনে একটি আখের খামার বানিয়েছিল। এখান থেকে আখ উৎপাদন করে তারা বেলডাঙ্গার চিনির কলে চালান দিত। সেই চিনির কল উঠে যাওয়ায় আখের চাষও উঠে গিয়েছিল। ফলে তাদের সেই জমি অনাবাদী পড়েছিল। এদিকে সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল জমি। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই জমি পুনর্বাসন বিভাগের হাতে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৬০]

[৫৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮
[৫৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮
[৫৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৬
[৫৮] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭
[৫৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২২
[৬০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫

ম্যাপ: ১০.২ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, অনিল সিংহ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা প্রচ্ছদ

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মালিককে দেওয়া হয়নি তাদের সম্পর্কে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তার ক্ষমতা ছিল জমি এক বছরের মেয়াদে ইজারা দেয়ার। কিন্তু এই অল্প মেয়াদের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়না তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করে যে সমিতিকে দীর্ঘকালের ইজারা দেবার ক্ষমতা দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬১]

জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষিজীবীদের জন্য ফাটাপুকুরি নামের একটি জায়গায় ১৩৫০ একর অনাবাদি জমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে ২৫০ টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে সমবায়ের ভিত্তিতে জমি চাষের ব্যবস্থা করা হলেও পরবর্তীতে আলাদাভাবে চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সরকারের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু কলোনিগুলির মধ্যে এটিই প্রথম, এর জন্ম ১৯৪৮ সালে।[৬২]

জলপাইগুড়ি জেলায় দিনে দিনে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যারা কিছু আর্থিক সংগতি রাখে, তাদের খাসমহলে জমি দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উৎসাহ দেয়া হল। যারা এসব সংগতি রাখেনা তাদেরকে ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত বাড়িতে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। শহরের পশ্চিম প্রান্তে তিস্তা নদীর ধার ঘেসে সরকারী হাতিশালার প্রকাণ্ড মাঠে ত্রিপল ও দরমার বেড়া দিয়ে ঘর তুলে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৩] সে শহরের রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মী শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র রায়কে সম্পাদক নিযুক্ত করে ত্রাণকার্য পর্যবেক্ষণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। একটি পরিকল্পনা রচিত হয়। বয়স্ক এবং কার্যক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের কাজ দিয়ে সে কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী দুই শ্রেণীর জন্যই আলাদা আলাদাভাবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শহরের মধ্যে পান্ডাপাড়া এলাকায় সরকারী খাস জমিতে কলোনী তৈরী করে অকৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা হয়।[৬৪] শিলিগুড়ি যাবার পথে রেল লাইনের পাশে পতিত জমিতে জমির মালিকরা একটি পরিকল্পনা তৈরী করে সেই জমি অকৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে দেয়। নাম দেয়া হয় মোহিতনগর কলোনি।[৬৫]

পূর্ববাংলা থেকে আগত হিন্দুদের শুধু পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসন সম্ভব ছিল না তাই পশ্চিমবাংলার বাইরে উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যায় পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে বেশির ভাগ উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কারণ আলাদা পরিবেশে তারা খাপ খাওয়াতে না পেরে পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসে। তবে দুটি জায়গায় ব্যতিক্রম, এক- উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল, দুই- আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর প্রদেশ সরকার হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত তরাই অঞ্চলকে অরণ্যমুক্ত করে কৃষিযোগ্য করবার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তরাই অঞ্চলের সহিত বাঙালী পরিচিত। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর অংশ তার অন্তর্ভুক্ত। তার বৈশিষ্ট্য সেখানে বারিপাত হয় খুব বেশি। কিন্তু জল নিকাশের ব্যবস্থা করলে নানা ফসলের উৎপাদন করা যায়। তার মধ্যে পাট অন্যতম।

সুতরাং উত্তর প্রদেশ সরকার এই অঞ্চলে পাট চাষের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু পাট এমন একটি ফসল যার উৎপাদন রীতি বাঙালী বিশেষ করে পূর্ববাংলার চাষীই ভাল জানে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে সবচেয়ে ভাল পাট উৎপাদন হত পূর্ববাংলায়। সেইজন্য উত্তর প্রদেশ সরকার পূর্ববাংলার পাট চাষীদের নিয়ে গিয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করতে উৎসুক হলেন।[৬৬]

উত্তর প্রদেশ সরকার যে প্রকল্প রচনা করেছিলেন তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। যেখানে বাঙালী উদ্বাস্তুদের বসানো হয় সেখানে শুধু বাঙালী পরিবারেরই পুনর্বাসন করা হয়। প্রথম দফায় তারা পাঁচশ উদ্বাস্তু চাষী পরিবারকেই

---

[৬১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২২
[৬২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯
[৬৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ ১৭
[৬৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯
[৬৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা ১৮
[৬৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০

নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় আরও পাঁচশ গেল। সুতরাং এক হাজার পরিবারের একটি বাঙালী উপনিবেশ গড়ে উঠল। বিদেশ হলেও এই ব্যবস্থার গুনে একটি ছোট বাঙালী সমাজ গড়ে উঠল।[৬৭]

আন্দামানে উপনিবেশ গড়ে তোলার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল ছিল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ২০৪ টি দ্বীপের সমষ্টি। তাদের মধ্যে তিনটি দ্বীপ বড়। আন্দামানের যা পরিবেশ তা এক দিক হতে পূর্ববাংলার অনুরূপ। আন্দামান বিষুব রেখার নিকট অবস্থিত হওয়ায় গ্রীস্মাঞ্চলে পড়ে। সমুদ্রের মাঝখানে মৌসুমি অঞ্চলে হওয়ায় প্রচুর বারিপাত হয়। কাজেই আমন ধান উৎপাদন করা খুব সহজ। দ্বীপগুলিতে নীচু পাহাড়ও আছে, সমতল ভূমিও আছে। টিলা ও সমতল ভূমির একত্র সমাবেশ পূর্ববাংলারও কোন কোন অঞ্চলে আছে যেমন চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা। এ দুটি স্থানের সঙ্গে আন্দামানের সাদৃশ্য প্রচুর।[৬৮]

এছাড়া যেখানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন হচ্ছে সেখানে মানুষের বাস প্রথম আরম্ভ হচ্ছে। সুতরাং সেখানে যারা যাবে তারাই প্রথম সমাজ গড়ে তুলবে। সে সমাজ নিজেদেরই সমাজ। এ বিদেশে গিয়ে অন্য মানুষের মধ্যে বাস করা নয়, এ হল নতুন স্বদেশ ও নতুন সমাজ গড়ে তোলা। নিজের হাতে গড়া নতুন সমাজের মধ্যে বাস করাও তার পক্ষে সমস্থানীয় হয়। এখানকার জমি উর্বর। দীর্ঘকাল অনাবাদী থাকার ফলে তার শষ্য উৎপাদন প্রচুর। সুতরাং ধানের ফলন ভালই হয়।[৬৯]

স্বাধীন ভারত সরকার দক্ষিণ আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারের সংলগ্ন এলাকায় নতুন বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের এখানে সুবিধা দেয়ার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৯ সালের মে মাসে প্রায় দুইশত উদ্বাস্তু পরিবার এখানে প্রেরিত হয়। কিছু অকৃষিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে এই শ্রেণীর পুনর্বাসনের জন্য তেমন সুবিধা না থাকায় কিছুদিন পর ১৫০ জন পশ্চিমবাংলায় ফিরে।[৭০] ফলে ভারত সরকার সরকারী খরচে আন্দামানে আর শরণার্থী পাঠাতে অস্বীকার করে। পশ্চিমবাংলার পুনর্বাসন বিভাগ থেকে আন্দামানে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পাঠানো হয়েছিল সে ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়,

> “এ কথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব বৎসর যতগুলি উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামানে গিয়েছিল তাদের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছে তবে একথাও সত্যি যে বেশী সংখ্যক পরিবার রয়ে গিয়েছে। যারা ফিরে এসেছে তারা এদেশে কায়িক শ্রমের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষমতা রাখত না। সুতরং নির্বাচনের দোষেই এমন হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রধানত কঠোর কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত কৃষিজীবী পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখলে যারা যাবে তারা ফিরে আসবেনা। যে ত্রুটি ধরা পড়েছে, তা সংশোধন করা সম্ভব।”[৭১]

ভারতীয় সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে পুনর্বাসনের ব্যয় বহন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ৭২টি পরিবারকে আন্দামানে পাঠানো সম্ভব হয়। প্রথমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হত দক্ষিণ আন্দামানেই। আন্দামানের উন্নয়ন ও তার সম্পদের ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার এখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুনর্বাসনের জন্য জমি নির্বাচন ও পুনর্বাসনের কাজ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রাথমিক কাজ শেষ হলে তবেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। তবে সরকারের এই নীতি সামান্য পরিবর্তীত হয়েছিল

[৬৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০
[৬৮] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২
[৬৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২
[৭০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২
[৭১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২

এবং নির্বাচিত জমি তৈরী হবার আগেই উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাস্তা নির্মানের কাজে ব্যবহার করা হত। মার্চ মাসে পাঠানো হয় ৩০ টি পরিবার।[৭২]

এরপর ভারত সরকার ব্যাপকহারে উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যে, মধ্য আন্দামানের জঙ্গল কাটিয়ে সেখানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। নতুন দ্বীপে পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে এলে তখন বেশী সংখ্যায় উদ্বাস্তুদের পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। তার আগে ১৯৫১ সালের জুলাই পর্যন্ত ছোট ছোট যে জমি তৈরী হত তাতে উদ্বাস্তু পরিবারদের দক্ষিণ আন্দামানের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হত। এ সময়ের মধ্যে আটটি দলে মোট ৩৮৪ টি পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছিল।[৭৩]

এই পরিবারগুলিকে বিদায় দেবার আগে তারা যাতে পুনর্বাসনের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ছাড়া তাদের সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও দিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম যে দল উদ্বাস্তু ১৯৪৯ সালে আন্দামানে গিয়েছিল তারা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যন্ত্রপাতি দেয়া হয়। জঙ্গল পরিষ্কার করবার এবং চাষ করবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও দিয়ে দেয়া হত, যেমন কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুডুল ইত্যাদি। কিছু জিনিসপত্র দেয়া হত যেমন বাসনপত্র, ঝুড়ি, থালা ইত্যাদি। নতুন এক প্রস্থ করে জামা কাপড় দেয়া হত। যেসব ফসল গ্রামের গৃহস্থরা বাড়ির উঠানে উৎপাদন করে তার কিছু কিছু বীজ প্রতি পরিবারকে দেওয়া হত। প্রতি সমর্থ মানুষদের জন্য এক জোড়া ক্যাম্বিসের জুতো সুপারিশ করা হয় যাতে কাঁটা ফুটে জখম না হয়। এগুলি দান হিসেবে বাটা কোম্পানি থেকে পাওয়া যায়।[৭৪] জমির পরিমান বেশী হওয়ায় সমগ্র জমি একজনের পক্ষে চাষ করা সম্ভব হত না। যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে শষ্য উৎপাদন করে সম্মৃদ্ধ হয়েছে, তাদের অনেকে নিজেদের জমিতে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করবার জন্য আশ্রয় শিবিরে এসে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্ধান করে গেছে। তাদের প্রতিনিধি জাহাজের সঙ্গে চলে এসে সঙ্গে লোক নিয়ে গিয়েছে। ভাগ্য খুব অনুকূল হলে জ্ঞাতি মিলে গেছে, তা না মিললে এক গ্রামের মানুষ মিলেছে। তাও না মিললে অপরিচিত কৃষক পরিবারকে নিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। এইভাবে বেসরকারী রীতিতেও অনেক উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামানে সেচ্ছায় গিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছে।[৭৫]

আন্দামানের পুনর্বাসন সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। এরপরে যতবার আন্দামান হতে পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের পাঠাতে বলা হয়েছে, কোনবারই নির্দিষ্ট সংখ্যার উদ্বাস্তু পরিবার পাঠাতে কোন অসুবিধা হয়নি।

পূর্ববাংলায় দেশ বিভাগের পূর্বে মধ্যবিত্ত হিন্দু ঘরের সন্তানদের অর্থনৈতিক বিন্যাস যা ছিল তার সঙ্গে তারা সঙ্গতি রেখে চালিয়ে নিতে পারত। কিন্তু দেশ বিভাগের পর বাস্তুত্যাগ করার ফলে সেই অর্থনৈতিক বিন্যাস নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তা আর সম্ভব হয় না। তাদের জমি জমা থেকে প্রাপ্ত ফসল এবং কোন কোন পরিবরের কোন সদস্য কোন পরীক্ষায় পাশ করে মফস্বল শহরে বা কলকাতায় চাকুরী পেত, তা দিয়ে তাদের সংসার চলে যেত। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু হয়ে এসে তারা একরকম পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার হয় যাতে তারা চাকুরী করতে পারে।[৭৬]

উদ্বাস্তু তরুণরা সব থেকে বেশী পছন্দ করত চাকুরী। এই কারণেই উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য ব্যপকহারে চাকুরীর পথ খুলবার চেষ্টা হয়েছিল। টিটাগড়ে নানা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি দিয়ে উদ্বাস্তু তরুণদের শিক্ষানবিশ রাখা হত, যাতে দক্ষতা অর্জন করলে সেখানেই তারা কাজ পেয়ে যায়।[৭৭] টিটাগড় এবং আব্দুল রোডে শালিমারের নিকট ছেলেদের জন্য শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে

[৭২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২
[৭৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩
[৭৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৪
[৭৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৫
[৭৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৭২-১৭৩
[৭৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

তাদের শিক্ষা, শরীরচর্চা ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফলে এগুলি অনেকটা আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।[৭৮]

অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু যুবকদের বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ কিছুটা সফল হলেও ব্যাপকহারে তা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ব্যাপকহারে বেকার সমস্যা সমাধান খানিকটা সম্ভব হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ সংস্থার মাধ্যমে। তাদের ব্যবহৃত একটি বাসের দেখাশুনার কাজে একাধিক মানুষ নিয়োগ করা হয়। স্বাধীনতাকালীন সময়ে কলিকাতা অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় সীমাহীন। আর বাসের সংখ্যা বাড়ালে সেখানে উদ্বাস্তু যুবকদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়। কোন দক্ষতা অর্জন করতে না পারলেও কন্ডাক্টর হিসেবে কাজে লাগানো যায়। কাজেই এই পথে ব্যাপকহারে পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়েছিল। পুনর্বাসন বিভাগ হতে পরিবহণ বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে মোটা টাকার ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছিল।[৭৯] এদের সঙ্গে একটা চুক্তি করা হয়েছিল যে উদ্বাস্তু বিভাগ হতে বাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্য ঋণ দেওয়া হবে এবং পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে তারা মনোনীত উদ্বাস্তুদের চাকুরী দেবে। কলকাতার সংলগ্ন যেসব স্থানে উদ্বাস্তু শিবির বসানো হয়েছিল সেখান হতে নির্বাচন করে শত শত উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।[৮০] বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই পরিবহণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আরও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[৮১]
হাবরার কাছাকাছি গঙ্গানগর কলোনিতে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত কয়েকজন উৎসাহী যুবক সমবায়ের রীতিতে পরিবহণ ব্যবসায়ের পরিকল্পণা গ্রহণ করেন। এতে সরকারের পক্ষ থেকে সমর্থন জানানো হয় কারণ এ পদ্ধতিতে মালিক-শ্রমিক বিরোধ থাকে না। বাস চালাতে কয়েকজন মাত্র কর্মীর দরকার। বাস কিনে নিয়মিত চালাতে পারলেই হত। ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাস চালালে যাত্রীর অভাব হয় না। সুতরাং প্রয়োজনীয় মূলধন ধার দিয়ে এ বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল এদের এমন পরিমান ঋণ দেওয়া হবে যাতে দুটি বাস ক্রয় করতে পারে। তা হতে যে লাভ হবে তার কিছু অংশ হতে মূলধন শোধ হয়ে যাবে। লাভের কিছু অংশ যারা শেয়ার কিনবে তাদের মধ্যে ভাগ হবে একটি উদ্বৃত্ত আয় আসবে। আর যারা কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হবে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ১৯৫৪ সালের ১০ জানুয়ারি এ ব্যবস্থার উদ্বোধন হয়। এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য উদ্বাস্তু কলোনীগুলিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং আরও কয়েকটি কলোনি গঙ্গানগরের অনুসরণে সমবায় রীতিতে পরিবহণ ব্যবসা আরম্ভ করেছিল।[৮২]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার কারণে যারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের অনেকেই পূর্ববাংলায় ফেরে। আবার অনেকে ভারতে থেকে যায়, স্থায়ীভাবে বাস করতে চায়। যারা স্থায়ীভাবে বাস করতে চায় সরকার তাদের পুনর্বাসনে ঋণ দেবার নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন কার্যক্রমের পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রীপরিষদের সদস্য বর্গকে নিয়ে একটি তথ্যানুসন্ধ্যনী কমিটি গঠিত হয়। পশ্চিমবাংলায় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজের তথ্যানুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। এ সময়কালের পশ্চিমবাংলা সরকারের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধ্যনী কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে, এতে বলা হয়,

> "পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের মূল দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী। কারণ তাদের পুনর্বাসনের রীতি স্বভাবতই অভিন্ন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের জন্য মাত্র দুটি মূল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। প্রথম সরকার কর্তৃক সংগৃহত জমিতে পুনর্বাসন। দ্বিতীয় উদ্বাস্তুদের নিজেদের সংগৃহিত জমিতে পুনর্বাসন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এবং একটি

[৭৮] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৯৮
[৭৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭
[৮০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৩
[৮১] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৮
[৮২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ থাকায় পুনর্বাসন বিভাগ এদের জন্য দুটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তা হল ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং অনুরূপ রীতিতে বড় ভূমাধিকারীর জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।"[৮৩]

ম্যাপ: ১০.৩

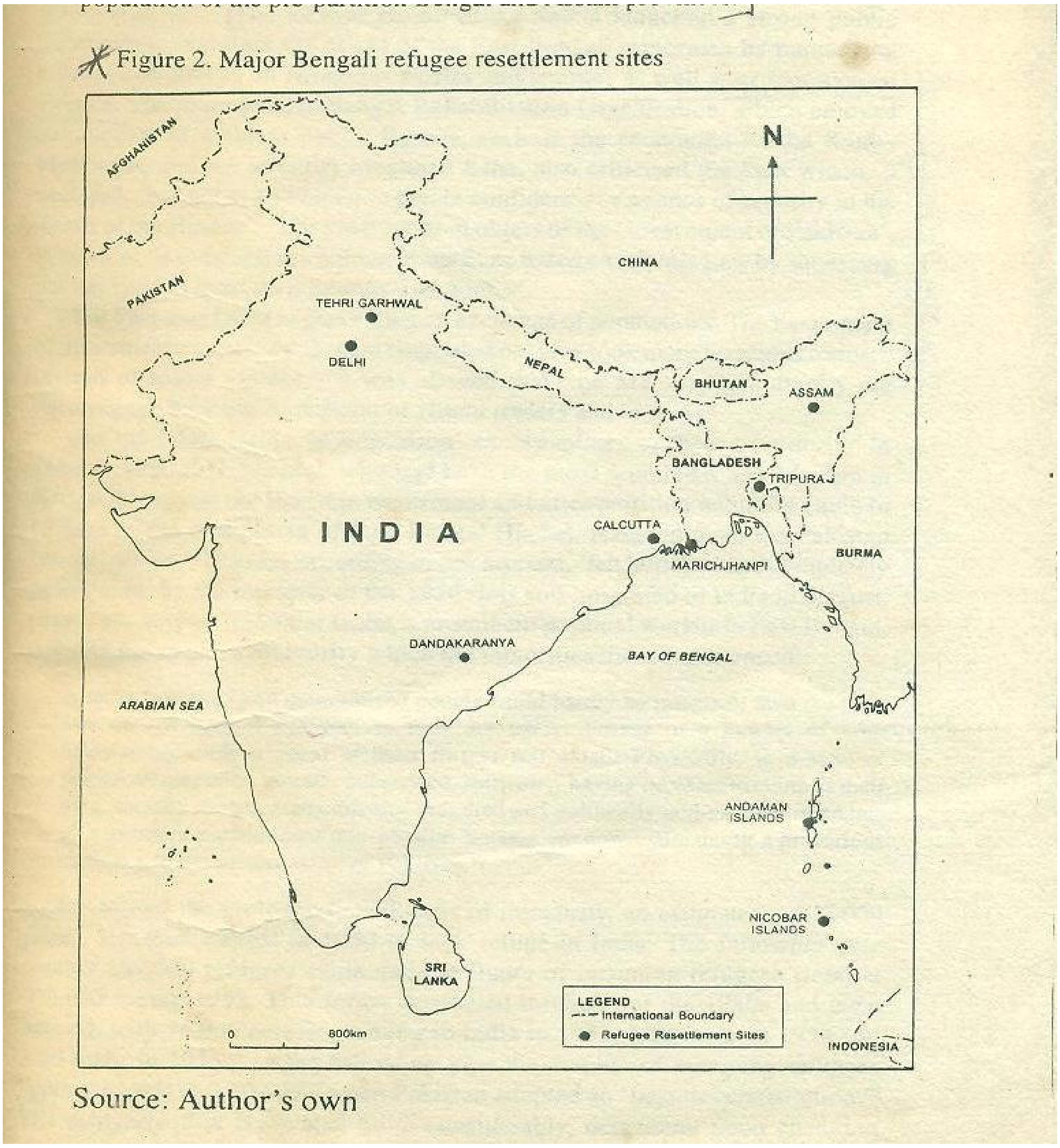

সূত্র: Gyanesh Kudaisya, Divided Landscapes, Fragmented Identities: East Bengal Refugee and their Rehabilitation, in India 1947-79, Studies on Conttemporary South Asia, No. 2, Sage Publications, New Delhi, 1995, Page 108

১৯৫২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২,৩০,০০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে মোট ২৫,০০০ পরিবার পুনর্বাসন স্থান ত্যাগ করেছিল। পুনর্বাসনের সাহায্য পাবার পর

[৮৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৩

আত্মপুনর্বাসনের অসমর্থ হয়ে যারা নূতন করে বাস্তুভূমি ত্যাগ করেছিল তাদের শতকরা হার ১১ এর মত। শতকরা ৮৯টি পরিবার পুনর্বাসন স্থানে রয়ে গিয়েছিল।

সারণী: ১০.২

কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

পরিকল্পনার শ্রেণী	পুনর্বাসনপ্রাপ্তের অনুপাতে বাস্তুত্যগীর শতকরা হার
সরকার সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবী	১৯.৫
সরকার সংগৃহীত জমিতে সবজী উৎপাদক	১৭
সরকার সংগৃহীত জমিতে বারুজীবী	৩
নিজের সংগৃহীত জমিতে কৃষিজীবী	৪.৩
ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায় কৃষিজীবী	৫৫.৩

সূত্রঃ উদ্বাস্তু, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২৩২

সরকারের সংগৃহিত জমিতে কৃষিজীবীদের কলোনি ত্যাগের হার ১৯.৫% অথচ যে কৃষিজীবী পরিবারগুলো নিজেদের নির্বাচিত জমিতে পুনর্বাসন নিয়েছে তাদের কলোনি ত্যাগের হার মাত্র ৫.৩%। নিজে জমি নির্বাচন করলে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি সে নিজে বাছাই করতে পারে। অন্যদিকে সরকারের পছন্দ করা জমিতে যে পুনর্বাসন পায় তার আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাঙ্খা তেমন প্রবল নয় বা এমনও হতে পারে পাকিস্তানে ফিরে যাবার আকর্ষণ এত তীব্র হয় যে সে পাকিস্তানে চলে যায়। অপরপক্ষে বিশেষজ্ঞের অভাবে জমিও নির্বাচিত হতে পারে যা চাষের অযোগ্য।[৮৪] সকল পরিকল্পনা সমানভাবে সাফল্য লাভ করেনি। কয়েকটি প্রকল্প থেকে শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর পশ্চিমবাংলা সরকার এ বিষয়ে বিশেষভাবে এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে পুনর্বাসন প্রকল্প ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ খুজে বের করে পুনর্বাসন প্রকল্প পদ্ধতি বদলে আশ্রিতদের দক্ষতা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হত যাতে করে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শরণার্থীরা যেন কলোনি ত্যাগ করে না যায় সেজন্য বিভিন্ন কলোনিতে অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে শরণার্থীদের কলোনি ত্যাগের হার বেড়ে গেলে সরকার এই অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্বাসন বিভাগে একজন কৃষি বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দিয়েছিল। তার কাজ ছিল কৃষিজীবীদের কলোনির প্রস্তাব আসলে সম্পর্কিত জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে অভিমত দেওয়া যে, সেই জমি কৃষির উপযুক্ত কিনা। বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার নিকট থেকে অনুকূল অভিমত পাওয়া গেলে তবেই সে পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া হত। তা না হলে পরিত্যাগ করা হত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তাহেরপুরের কলোনি অসফল হওয়ার পর অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের শিল্পাঞ্চলেই রাখা হয়েছিল।[৮৫]

জমি কিনবার জন্য ঋণ একর প্রতি ১৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয় ফলে যে জমি পাওয়া সম্ভব হচ্ছিলনা তা সম্ভব হল। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারি হয়েছিল। সরকারের একার পক্ষে জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিলনা। তখন উৎসাহী উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় জমি সংগ্রহ করে নিজেদের পুনর্বাসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।[৮৬]

যারা অকৃষিজীবী তাদের জীবিকার ব্যবস্থার জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রথমে ঋণের হার করা হয় ৫০০ টাকা। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটা বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করা হয়। তাদের এক মাসের খোরাকি বরাদ্দ ছিল। তা বর্ধিত করে তিন

[৮৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৩
[৮৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৩
[৮৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৫

মাসের জন্য খোরাকি ঋণের ব্যবস্থা হয়। ফলে যারা ছোটখাট ব্যবসার উপর নির্ভরশীল তাদের এই ব্যবস্থার ফলে আর্থিক বল বর্ধিত হয়।[৮৭]

উদ্বাস্তু যুবকদের মধ্যে নানা বিষয়ে কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দক্ষতা অর্জনের পর তারা অনেকে কারখানায় কাজ পেত। যারা পড়াশুনায় ভাল হত তাদের উচ্চতর শিক্ষা দেবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। পরে উচ্চ পরীক্ষায় পাশ করার ফলে তাদের কাজ পাওয়া সহজ হত।[৮৮]

যে কলোনি কলকাতা হতে বেশি দূরে অবস্থিত সেখানকার যুবকদের এই সুবিধাগুলি দেওয়া সম্ভব হত না। সেই কারণে সেই স্থানেই নূতন শিল্প গড়ে তোলা ছাড়া উপায় ছিল না। এই কারণেই দেখা যায় অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের কলোনিতে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল।[৮৯]

১৯৫২ সাল হতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হলে এই সময় ব্যাপকভাবে নূতন রাস্তা ও সেচ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। তখন দামোদর উপত্যকার কাজ পূর্ণ উদ্যোমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এইসব উন্নয়নমূলক কাজে তাদের কাজে লাগানো যায়। তাই অতিরিক্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে, সরকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছেন তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের কাজের সংস্থান করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে মাটি কাটার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে পুনর্বাসন বিভাগ যাতে করে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের কাজের সংস্থান করা সম্ভব হয়। পুনর্বাসন বিভাগ সবচেয়ে বেশী কাজ পায় রাস্তা বিভাগ হতে। পুনর্বাসন বিভাগের ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় শিবির হতে ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছিল।[৯০]

১৯৫৪ সালের শেষে একটি জিনিস ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, পশ্চিমবাংলার নূতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠবে। কারণ উদ্বৃত্ত জমি সব ব্যবহার হয়ে গেছে। পুনর্বাসন বিভাগ এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়েছিল যাতে উদ্বাস্তুরা নিজেদের ওপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে তাদের পুনর্বাসন করে নিতে পারে।[৯১] এ সময় পুনর্বাসন বিভাগে একটি নূতন পুনর্বাসন নীতি গড়ে উঠেছিল যার নাম 'বায়নানামা' পরিকল্পনা। যে আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন চায় তাকে নিজে চেষ্টা করে জমির সন্ধান করতে হবে এবং জমির মালিকের সাথে আলাপ আলোচনার পর সরকারের নিকট গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। তারপর গৃহ নির্মাণ শেষ হলে আশ্রয় শিবির ত্যাগ করে পুনর্বাসন স্থানে যাওয়ার পর অন্য ঋণ পাবে।[৯২]

কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে এক বিস্তৃত এলাকা জল নিষ্কাশনের অভাবে জলময় হয়ে থাকত এবং সে কারণে পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ তার জল মুক্ত করে তাকে ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সোনারপুর ও আড়পাড় অঞ্চল এককালে শস্যমণ্ডিত সম্মৃদ্ধ জনপদ ছিল। সোনারপুর ও আড়পার অঞ্চলে অনেক ধানের জমি ছিল। পরে তা জলাভূমিতে পরিণত হয়। গভীর জলে মগ্ন হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে ধান চাষ উঠে গেল। ফলে যে অঞ্চল এককালে শষ্যমণ্ডিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তা জলাভূমিতে পরিনত হয়। এই এলাকাকে জলমুক্ত করার জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পটির দায়িত্ব সেচ বিভাগ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি উপদেষ্টা সর্দার দাতার সিং। তিনি চেয়েছিলেন কলকাতার সংলগ্ন এই অঞ্চলগুলি জল নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করে এই পতিত জমিগুলি উদ্ধার করে শষ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হোক। সেচ বিভাগের বরাদ্দ টাকা শেষ হয়ে গেলে তারা পুনর্বাসন বিভাগকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। যে জমি উদ্ধার হবে তার একটি ন্যায্য অংশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহারের জন্য

[৮৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫
[৮৮] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩২
[৮৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৩
[৯০] বিস্তারিত হিরন্ময়, বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮-২৪১
[৯১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৫
[৯২] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৫

দেয়ার দাবী মেনে নেয়া হয়। এই প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং এর ফলে ২৩,০০০ একর জমি জলমুক্ত হয়েছিল।[৯৩]

উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের বন্দোবস্ত নিজেরাই করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনিময়, এবং পুরো গ্রামকে গ্রাম বিনিময়ের ঘটনা বিরল নয়। অনেকে নিজেদের সামর্থ দিয়ে জমি কিনে নিয়েছে। ঘর বাড়ি তৈরী করে নিজ নিজ আশ্রয় ও জীবিকার সংস্থান গড়ে তুলেছে।[৯৪]
শহর ভিত্তিক পুনর্বাসনের জন্য দেয়া হয় House building loans, trade and Business loan, Co-operative loans, Personals loans ইত্যাদি। আর গ্রামীণ জনগণের জন্য দেয়া হয় বিভিন্ন ঋণ, বাড়ি ঘর তৈরী ও কৃষি জমি যারা কৃষিকাজ করে তাদের জন্য আর অকৃষিজীবিদের জন্য বাড়ি তৈরীর ঋণ এবং জমি। ১৯৫০ সালে প্রথম শরণার্থী সংকট মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯৫৩ সালে। ভারতীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়, প্রতিবেদনে বলা হয়, "Centers or to worksite camps which may be either in the nature of irrigation and other works undertaken by the West Bengal Government or test works specially started for the purpose."[৯৫]

সরকার পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টি দেয় যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। পুনর্বাসনের জন্য শহুরে এবং গ্রামীণ জনগণের পেশা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ গোষ্ঠীকে কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবি হিসেবে ভাগ করা হয়। কৃষিজীবিদের বাড়ি তৈরী এবং কৃষিকাজের জন্য জমি দেয়া হয়। শহর অঞ্চল ব্যতীত প্রধানত আশ্রয় শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে গৃহনির্মাণের জন্য যে ঋণ দেয়া হয়েছিল তার সংখ্যা ১,১৪,৪৬৩। যারা গৃহনির্মাণ ঋণের সদ্ব্যবহার করেছে তাদের সংখ্যা ১,০৮,৩৬৯।[৯৬]
বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা যতীন্দ্রচন্দ্র দাশ জানান যে, তিনি ব্যবসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ থেকে ৮০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।[৯৭]
কৃষিজীবীদের জন্য চার ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। Type Scheme, Union Board Scheme, Barujibi Scheme and Horticulturists Scheme, Ordinary type Scheme এ সরকারী ভাবে জমি দেয়া হয় অথবা তারা নিজেদের জমি ক্রয় করে সরকারের ঋণ গ্রহণ করে। প্রতি পরিবার সর্বোচ্চ মূল্য ১৯০০ টাকা করে পায়। এর মধ্যে বাড়ি তৈরী বাবদ ৫০০, কৃষিকাজের জন্য মূল্য ৬০০, ৬ মাসের জন্য অর্থাৎ ফসল উঠা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ প্রয়োজনীয় সেচ এর জন্য মূল্য ১০০ এবং মূল্য ৫০ প্রতি একরে। সরকারী ভাবে প্রতি পরিবার ২ একর জমি এবং Private Settlement যা ছিল ১১/৩ একর।[৯৮]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা অনেক আগেই দেশত্যাগ করতে শুরু করেছিল। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে দেশত্যাগকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে হিন্দু সম্পত্তি বিক্রির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পূর্ববাংলা সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সরকারী রেকর্ড পত্রে দেখা যায় ১৯৬৮-৬৯ সালের সময় পর্বে ৮০ কোটি বা তারও বেশী টাকার সম্পত্তি হিন্দুরা বিক্রি করেছে। হিন্দুরা এই সম্পূর্ণ টাকাই ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং পরে তারা নিজেরা গিয়েছে সেই টাকার ফল ভোগ করতে।[৯৯] এরা সরকার থেকে

---

[৯৩] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৩৮-২৪১
[৯৪] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
[৯৫] বিস্তারিত Pradip Kumar Bose, Refugees in West Bengal. The state and contested Identities, (Article), Mahanirban Calcutta Research Group, Calcutta, 2000, Page 1-2
[৯৬] Pradip kumar Bose, ibid, page 13
[৯৭] যতীন্দ্রচন্দ্র দাশ, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২০৬
[৯৮] Pradip kumar Bose, op-cit, page 13
[৯৯] রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯

বাড়ি তৈরীর জন্য প্লট অথবা বাড়ি ক্রয়ের জন্য সাহায্য লাভ করে। প্রতি পরিবার সর্বোচ্চ ও মেইনটেন্যান্স বাবদ এক মাসের জন্য মূল্য ৫০০ টাকা এবং এক মাসের জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা লাভ করে। গ্রামীণ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য চারটি স্কীমে যে পরিমান পরিবারকে কি পরিমান সাহায্য দেয়া হয় তা চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সারণী: ১০.৩

স্কীম অনুযায়ী বরাদ্দ

Scheme	No. of family	expenditive	Average family expenditure	No of family deserted	Y. of desertion
Type scheme a.Govt sponsaed	5442	6418839	1180	1063	19.5
b. private	68041	22200490	326	2924	43
Total	73456	32594570	390	3987	54
Union board scheme	9773	6990680	713	5401	53

Source: Report of the Commitee of Ministers for the Rehabilitation of displaced Person in West Bengal, 1955, Pradip Kumar Bose, Refugees in West Bengal, The state and contested Identities. (Article), Mahanirban Calcutta Research Group, Calcutta, 2000, Page 28

নগরভিত্তিক শরণার্থী পরিবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে স্থায়ী হয় আবার অনেকে বিভিন্ন পুনর্বাসন কর্মসূচীর সহযোগিতা গ্রহণ করে। তারা যে সকল ঋণ গ্রহণ করে তা হচ্ছে। House building Loans, Trade loans, or Professional Base loan, Cooperative loan ইত্যাদি । একটি সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭,৫০০ টি পরিবার trade and business loan নিয়েছে এবং এ বাবদ ৯১ হাজার ও ৪ লাখ টাকা প্রদান করা হয়।[১০০]

গ্রামীণ অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য যে সকল স্কীম গ্রহণ করা হয় তার একটি চার্ট দেয়া হল

সারণী: ১০.৪

গ্রামীণ অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য গৃহীত স্কীমে বরাদ্দ

Scheme		No. of family	Total expenditive	Average family expenditure	No of family deserted	Y. of desertion
Type scheme	vernment sponsared sc sponsaed	6166	708	4362913	1175	19.7
Private scheme		89044	317	28,231657	8204	9.4
Union board scheme		2526	848	22,25829		
Variant of Union board scheme		4080	1076	489507		

Source: Pradip Kumar Bose, Refugees in West Bengal, The state and contested Identities. (Article), Mahanirban Calcutta Research Group, Calcutta, 2000, Page 22- 28

[১০০] Pradip kumar Bose, op-cit, page 13

শরণার্থীদের প্রাপ্ত সুযোগের বর্ণনা দিয়ে পশ্চিমবাংলা সরকারের রিলিফ ও পুনর্বাসন দপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়, "On an average about 3800 displaced persons were employed daily by the Contract Division and over Rs.14 lakh has been disbursed as wages and payment for materials to displaced person.[১০১]

পশ্চিমবাংলার ৩৮১ টি সরকারী কলোনি গড়ে উঠে। এসকল কলোনিকে কেন্দ্র করে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৩০টি কলোনিতে ও ৪টি টাউনশিপ (তাহেরপুর, গয়েশপুর, হাওড়া এবং খোশবাস মহল্লা) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে।[১০২] সরকার কলোনিগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়,

> "West Bengal Government has sent up a proposal for giving financial assistance to the municipalities on the basis of loans for capital expenditure like water- suply, drainage, roads and street lighting and subsidy for running the services for a period of three or four years on a tapering basis. The schemes for 12 municipalities have so far been sent up for sanction on this basis."[১০৩]

State Statistical Bureau ৫০টি ক্যাম্পে জরিপ করে শরণার্থীদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

> "The total number of displaced persons both men and women so far trained in different technical trades and vocations like weaving, tailoring etc., in 29,526 of these 5,852 are women trained in non residential training centers, as a result of which they can now supplement their income. There are 20 Production Centers for both men and women run by the Rehabilitation Department in which 2,105 persons are employed."[১০৪]

শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা হয়। সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব লাভ করে। 'Refugee Bussinessnen's Rehabilitation Board' এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ২,১৮০ টি এবং 'Rehabilitation Finance Administration' এর মাধ্যমে কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য ৩৪০ টি অগ্রিম প্রদান করে বলে একটি সরকারী শরণার্থী পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জানানো হয়।[১০৫]

এই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয় যে, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা জন্য সরকার পাঁচ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১১,০০০ শরণার্থী নিয়োগ লাভ করে।[১০৬] কিছু ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদান করে শরণার্থীদের চাকুরী দেয়ার শর্তে। সরকার মাঝারী শিল্প নির্মাণের জন্য ৫ কোটি টাকা পরিমান পুঁজি দেয়। এই সব

---

[১০১] Relief and Rehabilitation of displaced persons in west Bengal, Refugees Relief and Rehabilitation Department, Report. October 1957, Government of West Bengal, Page 6, GOWB

[১০২] ibid, .page 5

[১০৩] ibid, page 6

[১০৪] ibid, page 6

[১০৫] ibid, Page 7

[১০৬] ibid, Page 7

ক্ষেত্রে শিল্প নীতি ছিল যে প্রাইভেট শিল্পপতিরা ৫০% পুঁজি যোগান দিবে এবং সরকার ৫০% অগ্রিম ঋণ হিসাবে প্রদান করবে তবে শর্ত যে, দেশত্যাগী শরণার্থীদেরকে কাজে নিয়োগ দিতে হবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায়।[১০৭]

সরকার শরণার্থীদের সমবায়ে তৈরী পণ্য বিক্রয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালে `Refugee Handicrafts sales Emporium' গড়ে তোলা হয়। প্রাদেশিক সরকার পুনর্বাসন বিভাগ সরকারীভাবে ও বেসরকারী শরণার্থী পুনর্বাসন সংগঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রস্তুতকৃত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৯ লক্ষ টাকা লাভ করে। সরকার আরও ট্রেনিং ও উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং শরণার্থী এলাকাগুলোতে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১০৮]

এদের তৈরী পণ্য প্রথম দুই বৎসরেই বিক্রয় হয় ৩৫,০০০ টাকা এবং লাভের পরিমান ছিল ৬,০০০ টাকা।[১০৯]
২য় পরিকল্পনার সময়ে সরকার ৩০,০০০ শরণার্থীকে এই সকল মাঝারী শিল্পে নিয়োজিত করে। ১৯৫৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৫৯ টি শরণার্থী সমবায় থেকে ২৪৮ লাখ টাকা পরিমান বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রতিটি Weaving Cooperative কে দেয়া হয় মূল্য ৩,৮৫,৪৫ পরিমান বরাদ্দ।[১১০]

ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য নানা কুটির শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কুটির শিল্প স্থাপনের মূল সমস্যা হল এর মালের বিপনণের সমস্যা। যত কম মূল্যের পণ্য উৎপাদন করতে পারবে ততই তার বাজারে চাহিদা বাড়বে। এই লক্ষ্যে সরকার গারোবা যন্ত্র নামে একটি যন্ত্র ক্রয় করে, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ছাট কাপড় থেকে তুলা তৈরী করে সেই তুলা দিয়ে তক্‌লির সাহায্যে সুতা তৈরী করতে পারে। কিন্তু যে সুতা উৎপন্ন হল তা তো ভোগ্য পণ্য নয়। তা উৎপাদক পণ্য। তাকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তর করতে নতুন ব্যবস্থার দরকার হয়। যে ধরনের সুতো এই কলে উৎপাদিত হয়, তাতে সুক্ষ কিছু করা যায় না কিন্তু এর সাহায্যে সতরঞ্জি, কার্পেট, আসন এবং বিছানা ঢাকা দেবার চাদর হয়। সুতরাং এই পণ্যগুলি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের তাঁত আনা হল। পুনর্বাসন বিভাগ সরকারের নিকট থেকে এটি গ্রহণ করে। কারণ পুনর্বাসন বিভাগ কলকাতার শিল্পাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তু পরিবারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল, যাতে এই ধরনের একটি কারখানা খুললে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। টিটাগড়ের শেডগুলি এই কারখানার পক্ষে বেশ উপযোগী হবে বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু সবগুলি শেড দরকার না হওয়ায় সামনের শেডগুলি কারখানার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং পেছনের শেডগুলিতে অভিভাবকহীনা মেয়েদের একটি আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়। উদ্বাস্তু যুবকদের তাঁতগুলি কিভাবে চালাতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হল।[১১১]

সমাজকর্মী শ্রী জীবনানন্দ ভট্টাচার্যকে সরকার পুনর্বাসন বিভাগের সরকারী কর্মী হিসেবে গ্রহণ করে। তাকে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি আরও নানা ধরনের কুটির শিল্প স্থাপন করে তাতে উদ্বাস্তু যুবকদের শিক্ষা দেবার জন্য উৎসাহী হলেন। উদ্বাস্তু বালকদের নানা ধরনের কুটির শিল্পে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেবার জন্য এখানে নানা শিল্প স্থাপন করা হয়। যেমন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করা, কাঠের কাজ, কামারের কাজ, ছাপাখানার কাজ ইত্যাদি। টিটাগড় কুটির শিল্প কারখানাকে কেন্দ্র করে রেশম শিল্পের উন্নতি সাধন করা হয় এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা করে চরকার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু শ্রী হরিশ মিস্ত্রি।[১১২]

---

[১০৭] ibid, Page 7
[১০৮] ibid, Page 7
[১০৯] Pradip kumar Bose, op-cit, page 23
[১১০] Pradip kumar Bose, op-cit, page 22-23
[১১১] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩
[১১২] বিস্তারিত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৬

জীবিকা ও কর্মসংস্থানের দাবী পুনর্বাসন আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবী।[১১৩] কলোনিগুলোর উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবীকে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ সমস্ত উদ্বাস্তুদের অনুপ্রাণিত করে তুলেছে।[১১৪] উপনিবেশ গুলিতে ছোট ছোট অজস্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। এই সমস্ত কুটির শিল্পগুলিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্য সমবেত ও সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন।[১১৫]

পুনর্বাসন প্রকল্প পর্যালোচনা করার জন্য সরকার তথ্যানুসন্ধানী কমিটি গঠন করে। কমিটি পুনর্বাসন কাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাদের সুপারিশ পেশ করে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ সভা আহ্বান করে। সভায় তথ্যানুসন্ধানী কমিটির সুপারিশগুলি সবই গৃহীত হয়। যে সুপারিশগুলি গৃহীত হয় তা উদ্বাস্তুদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থের অনুকূলে যায় যেমন পূর্বে কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন স্থানে পাঠাবার পর জমি উদ্ধার করে, ফসল উৎপাদন করে তাদের আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য নয় মাস পর্যন্ত মাসিক ৫০ টাকা হারে খোরাকি হিসাবে ঋণ দেওয়া হত। সভায় ঠিক হয় প্রয়োজন হলে আরো এক বৎসর পর্যন্ত অর্ধেক হারে খোরাকি দেওয়া চলবে। ফলে যে জমি কৃষিযোগ্য করতে সময় লাগে সেখানেও কৃষিজীবী উদ্বাস্তুকে বসানো সহজ হল।[১১৬]

১৯৫৮ সালে ভারত সরকার দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গঠন করা হয় ‘Dandakaranya Development Council’ উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহান্দি জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার ৭৮,০০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল। পশ্চিমবাংলার নেতৃবৃন্দ এ প্রকল্প নিয়ে বেশ আশাবাদী ছিলেন। বছরে প্রায় ২৭,০০০ একর বনভূমি পরিষ্কার করে ১৮৪ টি গ্রামে ৭৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[১১৭]
শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রীর নিকট ১৯৬২ সালের ২৭ মে এক চিঠিতে দন্ডকারণ্য প্রকল্পের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে অতিরিক্ত বরাদ্দের আবেদন জানিয়ে লেখেন যে, দণ্ডকারণ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করে এক মিলিয়ন শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।[১১৮]
সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলায় স্থান সংকুলান হচ্ছে না বলে প্রচার করে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকারী বিবৃতির পর সংবাদপত্রগুলিতে “নয়া বাংলা” পত্তনের মোহিনী চিত্র প্রতিনিয়ত প্রচারিত হতে থাকে দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এমনকি তথাকথিত প্রগতিশীলদের একাংশও এই প্রচারে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। এই অবস্থার পটভূমিকায় সরকারী হুকুমজারী হয় ক্যাম্পবাসী শরণার্থীদের প্রতি। বলা হয় দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, নইলে ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়া হবে।
ইউ.সি.আর.সি’র পক্ষ থেকে ক্যাম্পবাসী সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসনের জন্য সরকারের নিকট পুনর্বাসনের একটি বিকল্প পরিকল্পনা’ উপস্থিত করা হয়। এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কি পরিমান পতিত ও চাষের অযোগ্য জমি আছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হয় এবং সম্ভাব্য শিল্প সম্পর্কেও পরিকল্পনা থাকে। এই বিকল্প পরিকল্পনাকে সরকার খণ্ডন করতে পারেনি।[১১৯]
ইউ.সি.আর.সি’র পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে পরিমান অর্থব্যয়ে দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা রচিত হবে বলা হচ্ছে তার এক তৃতীয়াংশ অর্থব্যয়ে ক্যাম্পবাসী সমস্ত পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুন্দরভাবে

---

[১১৩] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
[১১৪] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫
[১১৫] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
[১১৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৫
[১১৭] Gyanesh Kudaisya, op-cit, page 116
[১১৮] Asutose Lahiry, letter to the Prime Minister, 27 May 1962,. Home, Political, B Proceedings, Page 3, West Bengal State Government. India
[১১৯] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই কাজের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রভূত পরিমানে লাভবান হবে।[১২০]

শুরু হয় উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ। জোর করে ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পগুলি থেকে শরণার্থীদের দণ্ডকে নিয়ে যাবার কাজ আরম্ভ হয়। উদ্বাস্তুরা রুখে দাড়ান সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে। কাউকে ভয় দেখিয়ে জোর করে দণ্ডকে নেওয়া যাচ্ছেনা দেখে সরকার একটি আপোষে সম্মত হন। আপোষের শর্ত ছিল জোর করে কাউকে নেয়া হবে না-সেচ্ছায় যারা যেতে রাজী কেবল তাদেরই নিয়ে যাওয়া হবে।[১২১]

কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ঘোষণা না করেই বিস্তারিতভাবে সংশ্লিষ্ট দফতর গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতে প্রবেশকারী হিন্দুদিগকে সম্বর্ধনা জানাবার বিস্তারিত পরিকল্পনা দণ্ডকারণ্য হতে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের স্থান সংকুলান ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতের পক্ষ হতে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো হয়।[১২২]

১৯৬৪ সালে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নতুন শরণার্থী যারা সরকারী পুনর্বাসন গ্রহণ করতে চাইবে তাদেরকে পশ্চিমবাংলার বাইরে পুনর্বাসন করা হবে।[১২৩] ১৯৬৪-৬৫ সালের যুদ্ধের ফলে যারা পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ শরণার্থীকে সীমান্ত স্টেশন থেকে সোজা দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১২৪]

পূর্ববাংলার হিন্দুদের পুনর্বাসন এর বিষয়ে ভারতীয় সরকার ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সাংগঠনিক কার্যক্রমে আগ্রহ সম্পর্কে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "পূর্ববঙ্গ হতে যারা বাস্তুত্যাগ করে আসছিল তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম বাঙলা, কারণ সাংস্কৃতিক জীবনের দিক থেকে পশ্চিম বাঙলার মানুষের সংগে তারা এক। যারা পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয়ের জন্য এসেছিল তাদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল পশ্চিম বাঙলায়ই স্থায়ীভাবে তারা বাস করতে পারবে। সেই আশা পূর্ণ হওয়া অনেক সহজ হত যদি পাঞ্জাবে যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল সে নীতি এখানেও প্রয়োগ করা হত। প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিম বাঙলার মানুষের সহানুভূতি খুব প্রবল ছিল বলে এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ভূমি সংগ্রহ আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক জমি সংগ্রহ করে সেখানে তাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছিল।[১২৫]

পুনর্বাসন কেন্দ্রে না পাঠানো পর্যন্ত শরণার্থীগণকে যে ক্যাম্পে রাখা হত সেগুলির নাম ছিল ট্রানজিট ক্যাম্প। আরও তিন ধরনের আশ্রয় শিবির ছিল – পি.এল.ক্যাম্প, উইমেনস্ ক্যাম্প ও ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প। অক্ষম ও পঙ্গু ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী আশ্রয়শিবিরগুলিকে "পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি" সংক্ষেপে পি.এল অর্থাৎ স্থায়ী দায়সম্পন্ন শিবির আখ্যা দেওয়া হয়। 'উইমেন্স ক্যাম্প' বা মহিলা শিবিরগুলো অনাথ বিধবা ও অভিবাবকহীন মেয়েদের আশ্রয়স্থান ছিল। ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পগুলি ১৯৫১ সালে গঠিত হয়। পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত জমিতে উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্যে বড় বড় ক্যাম্পগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন এলাকায় দল বেঁধে তাবুর মধ্যে রাখা হত। কাজের বিনিময়ে তারা পারিশ্রমিক পেতেন। জমির উন্নয়ন হবার পর সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে এটাই ছিল সরকারী লক্ষ্য। সারা রাজ্যে প্রায় ৩২ টি এই জাতীয় ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই কাজ হবার পর তৈরী জমিতে উদ্বাস্তুরা স্থান পাননি।[১২৬]

---

[১২০] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪
[১২১] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫
[১২২] স্টেটসম্যান, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
[১২৩] Pranati Chaudhuri, ibid, page 18
[১২৪] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০
[১২৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪
[১২৬] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

সরকারের তত্ত্বাবধানে বালিকাদের দুটি আবাসিক শিবির স্থাপিত হয়েছিল। একটি অবস্থিত কলকাতার রিজেন্ট পার্কে অশোক এ্যাভিনিউতে। এখানে বালিকাদের পাঠ্যশিক্ষা ছাড়া নানা রকমের হাতের কাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। অপরটি স্থপিত হয়েছিল উত্তরপাড়ার এক বিরাট জমিদার বাড়ি ভাড়া নিয়ে। এর উদ্দেশ্য ছিল একটু সতন্ত্র। সরকারের আশ্রিত যেসব বয়স্ক মেয়ে ছিল তাদের নানা রকমের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যেই এই আবাসিক শিবির স্থাপিত হয়েছিল। এখানে তাদের কাপড় বোনা, সাবান উৎপাদন, দর্জির কাজ প্রভৃতি নানা কুটির শিল্প শেখাবার ব্যবস্থা ছিল।[১২৭]

কলকাতায় মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেখানে বয়স্ক মেয়েদের এই ধরনের নানা কাজ শিখিয়ে উপার্জক করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজ সেবিকারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির দেখাশুনা করতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে আশ্রয়বাসী বয়স্কা মেয়েদের হাতের কাজ শেখাবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে আশ্রয়বাসী মেয়েদের ব্যাপকভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল।[১২৮]
এদের মধ্যে আনন্দ আশ্রম, নারী সেবা সঙ্ঘ, উদয় ভিলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম এবং অল বেঙ্গল উইমেন্স হোম। আনন্দ আশ্রম উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসে। তার নূতন গৃহ স্থাপিত হয় বাঁশদ্রোনীতে শ্রীমতি চারুশীলা দেবীর তত্ত্বাবধানে। এখানে মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। আশ্রয় শিবির হতে শিক্ষণের উপযুক্ত মেয়েদের নির্বাচন করে এখানে শিক্ষণের জন্য পাঠানো হত।[১২৯]

যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এ.কে.ফজলুল হকের বাড়ি ছিল সৈয়দ আমীর আলী এ্যাভিনিউ এ। এখানে শ্রী সীতা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ‘নারী সেবা সঙ্ঘ’ নামে মেয়েদের একটি শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেয়েরা আশ্রয় শিবির হতে নির্বাচিত হয়ে এখানে আসতো।[১৩০]

১৯৪৮ সালে মহিলাদের সমবায় আন্দোলন হিসেবে ‘বানী ভবন মহিলা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন অবলা বসু। উদয় ভিলার শিক্ষা কেন্দ্রটি ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এটির দায়িত্বে ছিল শ্রী বীনা দাসের ওপর। এখানে উদ্দেশ্য ছিল শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া নয়, শিক্ষার শেষে উৎপাদন কেন্দ্র খুলে তাতে মেয়েদের কাজ দিয়ে পুনর্বাসন দেয়া। সুতরাং এটির বিন্যাস হয়েছিল আরও ব্যাপকভাবে। উৎপাদন কেন্দ্রটি সমবায় সমিতি রূপে গঠিত। এখানে যারা কাজ করে তারা কাজ করে যেমন পারিশ্রমিক পায় তেমন সমিতির সদস্য হিসেবে মুনাফার অংশ পায়।[১৩১]
এ সময় প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এটিকে শরণার্থী মহিলাদের জন্য Home হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় উদয় ভিলাকে এই প্রকল্পের জন্য দান করেন।[১৩২] ‘Women’s Cooperative Insdustrial Home’ উদয় ভিলায় স্থানান্তরিত করা হয়। এটিই সবচেয়ে বড় পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এতে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৫৯-৬০ সালে বিচ্ছিন্ন মহিলাদের পরিবারের সঙ্গে বসবাসের জন্য স্বল্প ব্যায়ে ৪০০টি বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া হয়। ১৯৫০-৫৫ সাল পর্যন্ত এর ৫টি শাখা গড়ে উঠে। (১) সিরামিক (২) তাঁত (৩) সেলাই (৪) ছাপা (৫) আর্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষক যোগান দিত, শিক্ষকদের বেতনও সরকার দিত। এদের জন্য সরকার আরও নুতন বিল্ডিং তৈরী করে দেয়। উদয় ভিলায় তৈরী পণ্য পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তার

[১২৭] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮
[১২৮] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮
[১২৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯
[১৩০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯
[১৩১] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯
[১৩২] উদয় ভিলা ছিল কলিকাতা হাইকোর্টের এর্টনী উদয় বোস এর বাগান বাড়ী। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার আর্মীর জন্য অনেক বাড়ি রিক্যুইজিশন করে। সকল বাড়ি পরবর্তীতে ফেরত দেয়া হলেও এটি আর ফেরত দেয়া হয় নি। ৩০ একর জমির উপর এই বাড়িটি স্থাপিত।

বাজার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য প্রদেশ থেকেও তারা অর্ডার পেত। ১৯৬২ সালে সরকার এ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেয়।[১৩৩]

ইলিয়ট রোডে অবস্থিত অল বেঙ্গল উইমেন্স হোমের কেন্দ্রটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সমাজকর্মী শ্রী বিমলা সিংহ। এখানেও বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের জন্য ক্যাম্পের মেয়েদের নির্বাচন করে পাঠানো হত। উদ্বাস্তু শিবির থেকে অপহৃতা বা ধর্ষিতা মেয়েদেরকে উদ্ধার করে এখানে আশ্রয় দেয়া হত। [১৩৪]

যে সকল বৃদ্ধা নারী অপরের আশ্রিতা হয়ে বাস করতো, তারা জীবিকা অর্জনে অসমর্থ এবং তারা কোন পরিবারের সঙ্গেও যুক্ত নয়। এরা স্বভাবতই ধর্মপরায়ণ এবং তারা তীর্থস্থানে থাকতে পারলে মানসিক তৃপ্তি পায়। তাদের জন্য বেলুড়ে ভাগীরথী নদীর তীরে একটি বাড়ি ভাড়া করে আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়। এখানে তারা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করার সুযোগ পায়।[১৩৫]

অন্যান্য প্রকল্প

ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্যদের জন্য উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কলোনি স্থাপন করলেই সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হত। বিভিন্ন শিবির গুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যার ভিত্তিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হত। স্কুলের জন্য শিক্ষকের দরকার হয়। সাধারণত ২৫ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। এ ধরনের বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্ব ভারত সরকারই বহন করতেন। সুতরাং কোন কলোনি স্থাপিত হলেই সেখানে কয়েকটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হত। সে পদগুলির জন্য সেখানে যে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন নিত তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হত।[১৩৬] একটি রির্পোটে বলা হয়,

> "The total school going population age group of 6 to 13 in Homes/ Infirmaries is estimated at 5639. Of them, 4634 would be in primary and junior high school stages and the remaining 1,005 in high school/ higher secondary schools, vocational/technical training and post higher secondary stages. There are 24 primary schools attached to P.L Home in the State.[১৩৭]

তবে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি শিথিল করা হত। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে একটি রিপোর্টে বলা হয়,

> "Most of the teachers- in these schools are untrained- some are even without the minimum educational qualification. There are 150 teachers in the primary schools attached to P.L Homes. Out of these, 70 are matric and above and 50 are non- matric. The percentage of trained teachers is 20.7. Amonget the matric and above qualified teachers, only 15% are traind and the rest i.e. 87% are untrained. Amonget the non-matric teachers 27.5% are traind and the rest 72.5% are untrained.------

[১৩৩] Balan Gangapadhyay, Reintegrating the displaced, refracturing the domestic: a report on experience of Uday Vila, Refugees in West Bengal, 2009, Page 98-100

[১৩৪] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০০

[১৩৫] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০০

[১৩৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩২

[১৩৭] Committee of Review of rehabilitation Work in West Bengal, 15th Report, page 10 GOWB

Their scales of salaries are also higher than that of the teachers in Government sponsored primary schoos." [১৩৮]

সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৭০০০ শিক্ষক নিযুক্ত হয়। তাদের ৯৫% শরণার্থীদের থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১৩৯]

পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে শরণার্থী এলাকাগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালে তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিমবাংলায় শরণার্থী পুনর্বাসন এলাকাগুলোতে ১৯৪৯-৫০ সালে ৪০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৭ সালের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৮০টি। প্রায় ১,৯০০৪৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত।[১৪০]
১৯৪৮ সাল থেকে সেকেন্ডারী স্কুলে ক্লাশ ix/ x এর শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফী, পরীক্ষা ফী বরাদ্দ ছিল এবং বই ও অন্যান্য স্টেশনারী ক্রয়ের জন্য ৭৫ টাকা দেওয়া হত।[১৪১]
সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল। এবং শিক্ষকগণ বেশীরভাগই স্থায়ী সরকারী কর্মচারী হিসেবে ছিলেন।[১৪২] শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পেত। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪০/ টাকা। জুনিয়র বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ৩৮% নম্বর পেলে বই কেনার জন্য ৩০/ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হত।[১৪৩]

স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর অনেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। অনেকে ভোকেশনাল ট্রেনিং গ্রহণ করে নিজেদের পছন্দমত পেশা গ্রহণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর আশ্রিতরা যাতে নিজেদের পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে সেজন্য একটি কমিটি তাদের রিপোর্টে কিছু ভোকেশনাল ও কারিগরী প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বৃত্তি প্রদানের সুপারিশ করে।[১৪৪]

শিক্ষার্থীদের বাসস্থান সুবিধা দেবার জন্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হোস্টেলের জন্য পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়। 'রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস' হোম সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত হত। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ তাদের প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নগদ এবং ঋণ হিসেবে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতো।[১৪৫]
সরকার আইনজীবী, ডাক্তার, কবিরাজদের বই এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য Professional loan প্রদান করে। এতে ১০৪৭ টি পরিবার মোট মূল্য ৮.৩৬ লাখ পরিমান বরাদ্দ পায় (১৯৫৪ সালের হিসাব অনুযায়ী)। সরকার পুর্ববঙ্গ ত্যাগকারী শরণার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়। শিক্ষা খাতে ৩টি পদ্ধতিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। শরণার্থী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হয় Merit cum means ভিত্তিতে, তাদেরকে কারিগরী শিক্ষা এবং চাকুরী ভিত্তিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয় তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে।[১৪৬] মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রদের ক্লাস V থেকে X পর্যন্ত বই কেনা এবং স্কুলে বেতনের জন্য বৃত্তি দেয়া হয়।[১৪৭] পুনর্বাসন

[১৩৮] 15th Report, ibid, page 12
[১৩৯] 15th Report, ibid, page 9
[১৪০] 15th Report, ibid, page 9
[১৪১] 15th Report, ibid, page 9
[১৪২] 15th Report, ibid, page 12
[১৪৩] 15th Report, ibid, page 14
[১৪৪] 15th Report, ibid, page 6
[১৪৫] 15th Report, ibid, page 9
[১৪৬] Pradip kumar Bose, op-cit, page 25-26
[১৪৭] Pradip kumar Bose, op-cit, page 25-26

মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কলোনিতে নতুন মাধ্যমিক স্কুল খোলার জন্য এবং অনেক স্কুলে শরণার্থী ছাত্রদের জন্য সুবিধা দানের লক্ষ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে ২৩৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মূল্য ৩.৩৫ লাখ পরিমান বরাদ্দ লাভ করে। ভারত সরকার ঋণ ও ভাতা বরাদ্দ দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পুরাতন কলেজ সম্প্রসারণ ও নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুদান দেয় যাতে শরনার্থী ছাত্ররা সুবিধা লাভ করে। একটি উদাহরণ হচ্ছে কলকাতার কলেজ ছাত্রদের জন্য মূল্য ১০ লাখ বরাদ্দ দেয়া হয়। ফলে নুতন ১২টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০টি সম্প্রসারিত হয় ৯টি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট সম্প্রসারিত হয় ১৯৫৪ সালের মধ্যে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৬৪৫ জন শরণার্থী বিভিন্ন প্রকল্পে ট্রেনিং গ্রহণ করে। এখানে খরচ করা হয় ১৮ লাখ।[১৪৮]

স্বাস্থ্য খাতে সরকার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশ্রয় শিবিরগুলোতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হত। জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতেন।[১৪৯]

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার উন্নয়ন খাতে ১৭৯ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবী করেন।[১৫০] ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও উদ্বাস্ত আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি রিভিউ কমিটি নিয়োগ করেন। এবং এই কমিটি গুলি ক্যাম্প, সরকারী কলোনি, জবরদখল কলোনি, এক্স ক্যাম্পসাইট, হেড়োভাঙ্গা স্কীম ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের উদ্বাস্তদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে।[১৫১] পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটা অংশ ঠিকই ধারনা করেছিলেন যে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তরা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিসেবে নির্যাতিত শরণার্থী নয় তারা অর্থনৈতিক সাহায্যের আশায় দেশত্যাগী,

> "They increasingly took the view that generous relief and compensation on the part of official agencies would act as a magnet and attract more refugees from across the border. These crossing the border perceived by them as economic migrants and not as minorities who were being forcibly displaced due to persecution and harassment?"[১৫২]

বেসরকারী উদ্যোগ

সরকারী সাহায্যে একটি বেসরকারী উদ্যোগ হচ্ছে পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী হিন্দু মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য গড়ে উঠে কিছু সংগঠন। যে সকল পরিবারে পুরুষ অভিভাবক নেই, বিধবা মা ও সন্তান নিয়ে গঠিত সে সকল পরিবারের অভিবাবক নারী হওয়ায় এদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় শিবিরের নামকরণ করা হয় নারী আশ্রয় শিবির (উইমেন্স ক্যাম্প)। চব্বিশ পরগণা জেলার টিটাগড় ও কার্তিকপুরে, নদীয়া জেলার রানাঘাটের রূপশ্রী পল্লীর পাশে, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে একেবারে নদীর ধারে এবং ভদ্রকালীতে এইসব আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। ধুবুলিয়ার এক অংশও তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এক সময় এদের জন্য স্থানের অভাব এত হয়েছিল যে কলকাতার বাবুঘাটে পোর্ট কমিশনের অধীনে অবস্থিত একটি ধাত্রীনিবাসও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৫৩]

---

[১৪৮] Pradip kumar Bose, op-cit, page 25-26
[১৪৯] 15th Report, op-cit, page 7 GOWB
[১৫০] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
[১৫১] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯
[১৫২] Ranabir Samaddar, Marginal Nation, Transborder Migration From Bangladesh to West Bengal, Sage Publilishing House, Delhi 1999, page 98
[১৫৩] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮

দেশত্যাগী হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য বেসরকারীভাবে কিছু সংগঠন ভূমিকা পালন করে আর তাদের এই সকল উদ্যোগ Magnet'[১৫৪] এর মত পূর্ববঙ্গে বসবাসরত হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করাকে আকর্ষিত করে দেশত্যাগে আরও আগ্রহী করে তোলে। এখানে উদাহরণ হিসেবে কিছু অঞ্চলের চিত্র তুলে ধরা হবে। সেটি হচ্ছে ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁও মহকুমার গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর। গাইঘাটা থানার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে এটি গড়ে উঠে। ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর জেলার ওরাকান্দি থেকে নমশুদ্রদের একটি গোষ্ঠী গাইঘাটার চিকনপাড়া মৌজার চলে আসে। এই গোষ্ঠীর প্রধান প্রমথরঞ্জন ঠাকুর স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে বিপুল পরিমান জমি দখল করে এখানে শিল্প গড়ে তুলে। এই অঞ্চলটি বর্তমানে ঠাকুরনগর। এই মাতুয়া গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন হরিশচন্দ্র ঠাকুর। এরা নমশুদ্র আন্দোলন গড়ে তোলে যা আদর্শগত ভাবে এটি একটি প্রাক শিল্প সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছিল।[১৫৫] প্রথমে এখানে একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জমি নেয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট। জমির রেজিস্টার্ড মালিক হন প্রমথরঞ্জন।

মাতুয়া শিক্ষকগণ এখানে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেন। ১৯৪৯ সালে এখানে শ্রী হরি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্দিরটি স্থানীয় নমশুদ্র আন্দোলনের Nerve Centre হিসেবে গড়ে উঠে। ১৯৫১ সালে ঠাকুরনগর রেলস্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর বসন্তকালে এখানে বারুনী মেলা হয়। এই মেলায় দুই বাংলার হাজার হাজার মাতুয়া গোষ্ঠী বিশেষ করে নমশূদ্ররা মিলিত হয়। দেশবিভাগ পূর্ববর্তী সময়ে এখানে অল্প জনসংখ্যা ছিল। এখানকার মুসলমান জনগণ দেশভাগের পর ব্যাপকহারে পশ্চিমবাংলা ত্যাগ করলে নমশুদ্ররা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে এখানে জনসংখ্যা ছিল ৫৬,৫৫৮ জন, ১৯৭১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৩৩,৯১৬ জনে। (তবে ১৯৫১ সালের পূর্বের কোন তথ্য এখানে দেয়া হয়নি।)।[১৫৬] পূর্বে এখানে কোন লোকসভার আসন ছিলনা। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এটি হাবড়ার একটি অংশ ছিল, পরে গাইঘাটা আলাদা আসন লাভ করে।[১৫৭] এই অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য কিভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরকে দেশত্যাগে আগ্রহী করেছে সে সম্পর্কে রনবীর সমাদ্দার বলেন,

> "The existence of a sect headquarter, the predominantly namasudra character of the locality as distinct from its earlier mixed character, the presence of educational institutions, the growth of horticulture and caste and clan linkages have all combined to act like magnet for "refugees" displaced persons and migrant's mostly of namasudra persuasion from across the border."[১৫৮]

শরণার্থীরা ভারতে বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি করেছে আবার অনেক সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে। এ সকল কার্যক্রমে পূর্ববাংলায় বসবাসকারী হিন্দুগণও বিভিন্ন সময়ে বিব্রত বোধ করেছে। তারপরও পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে ভারতে যেতে উৎসাহিত করা হয়েছে ভারতেররাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই। বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার উন্নতি সাধন পূর্ববাংলা ত্যাগ করাকে আরও উৎসাহিত করেছে। প্রণতি দত্ত বলেন,

> "The development in the agriculture and small scale and cottage industry sector has been remarkably made at present in West Bengal; particularly land reforms have been done at the grass root level by the government for the interest of the working and marginal class people. As a result, it

---

১৫৪ Ranabir Samaddar, op-cit,   page 98
১৫৫ Ranabir Samaddar, op-cit,   page 98
১৫৬ Ranabir Samaddar, op-cit, page 98
১৫৭ Ranabir Samaddar, op-cit, page 96-101
১৫৮ Ranabir Samaddar, op-cit, page 96-101

Dhaka University Institutional Repository

increases economic progress and job opportunity for the labor and marginal worker."[১৫৯]

হিন্দুদের দেশত্যাগে প্রলুব্ধ করা বা তাদেরকে ভারতে ডেকে নেয়া এবং তাদের পুনর্বাসনের পেছনে ভারতীয়দের বিভিন্ন স্বার্থ কাজ করেছে। এই সকল কার্যক্রমের পেছনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী ভূমিকা পালন করেছে। কখনও সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের প্রচারনাকে বিস্তৃত করার জন্য শরণার্থী ইস্যুকে কাজে লাগাতে, নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে, কখনও কাশ্মির ইস্যুর কারণে, আবার কখনও পাকিস্তানকে বিশ্ববাসীর চোখে হেয় করা বা পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর আঘাত হানতে। ১৯৫০ সালের পূর্বে পূর্ববঙ্গে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল, কিন্তু এ সময়ও দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, তবে এর ধরণ ছিল অন্যরকম। অসত্য, অতিরঞ্জিত এবং উস্কানীমূলক বক্তব্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে এবং এ সময় দেশত্যাগের ধরনও পাল্টে যায়। এ সময় উস্কানীমূলক কার্যকলাপের পেছনে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনের কিছুটা প্রভাব পড়েছে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় তখন তেইশ লক্ষের উপর উদ্বাস্তু ছিল।[১৬০]

১৯৪৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছে। তিনি যুক্ত নির্বাচনের ঘোষণা দেন। পূর্ববঙ্গের দেশত্যাগী শরণার্থীদের সম্পর্কে তিনি ঘোষণা দেন যে, ১৯৪৫ সালে যারা পূর্ববঙ্গে ভোটার ছিলেন এবং দেশবিভাগের পর ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেছেন, তারাই আসন্ন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।"[১৬১] পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী হিন্দুগণ পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে বারাসাতে দ্রুত ভোটার হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। রনবীর সমাদ্দার উল্লেখ করেন, "We can notice figures of Panchayet level also to see the world of Namasudra migration and their rapid Indianazation.[১৬২]
পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী শরণার্থী হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানের এক চিত্র তুলে ধরে এবং বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন,

> "পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন, যেমন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর পদ্মজা নাইডু। কিন্তু তারাও মনে হয় দাঙ্গার ব্যাপারে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তাদের দুজনেরই ধারণা ছিল এসব দাঙ্গার পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। ধর্মের দোহাই যতই দিক বা পূর্ব পাকিস্তানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করুক আসলে তারা চায়, মুসলমানদের ঘরদোর ও সম্পদ দখল করতে। - - - - ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, দেহ বিক্রয়, সব মিলিয়ে যে তারা তাদের নিজস্ব সমাজ সৃষ্টি করেছে। পশুর চেয়ে তার নিকৃষ্ট মনে হয়েছে আমার। অথচ এদের জন্যে সি আই টি (কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট) কলোনিতে অনেকগুলো ছোট ছোট ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করেছেন এবং মাঝে মাঝে জোর করে অনেকগুলো পরিবারকে কলোনিতে এনে পুলিশ মোতায়েন করেছেন। ----ঐ লোকগুলো শিয়ালদা রেল স্টেশনে যে সব যাত্রী নামত, তাদের মালপত্র উধাও করে দিত - - - -- আর যদি কাউকে গ্রেফতার করা হত, অমনি তাকে ছেড়ে দেবার জন্য বিরোধী দল মিছিল বের করত। কংগ্রেস সরকারকে যেভাবেই হেয় প্রতিপন্ন করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মার্কসিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা কেউ বড় একটা পিছিয়ে থাকতো না।"[১৬৩]

[১৫৯] Praniti Datta, op-cit, Page 350
[১৬০] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫
[১৬১] Ranabir Samaddar, op-cit, age 98-99
[১৬২] Ranabir Samaddar, op-cit, page 98
[১৬৩] বিস্তারিত কামরুদ্দীন আহমদ, বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী, পৃষ্ঠা ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অনেকেই জানিয়েছেন যে, তারা কোনরকম নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেন নি, তাদের কেউ কেউ ভারতে সুযোগ সুবিধা পেয়ে চলে গিয়েছেন, আবার কেউ সুযোগ সুবিধা না পেয়ে পূর্ববাংলায় ফিরেছেন, কেউ যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও টাকা যোগার করতে না পেরেদেশত্যাগ করতে পারেন নি, অনেকে তাদের গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা পূর্বে গিয়েছেন তাদের প্ররোচনায় গিয়েছেন কারণ ভারতে অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন বলে আশা দেওয়া হয়েছিল।

কেস স্টাডি ১

ফণিভূষণ ভৌমিক ও তার পরিবার ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর দেশত্যাগ করেন। তবে কোন ভয়ে নয়। গ্রামের সকলে চলে আসছিল তাই তারাও দেশত্যাগ করেন। তারা সাতগাছিয়ায় জমি কিনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। পশ্চিমবাংলায় গিয়ে তারা সাতগাছিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তার মামা থাকতেন, তার কাছেই উঠেছিলেন, পরে জমি কিনে স্থায়ী হন। তিনি জানান যে, সে সময় ঢাকার তুলনায় কম মূল্যে জমি কিনতে পেরেছিলেন তাই অনেক জমি ক্রয় করেন।[১৬৪]

কেস স্টাডি ২

গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৬৩ সাল থেকে স্থায়ীভাবে সাতগাছিয়ায় বসবাস করতে শুরু করেন স্ত্রীর পরামর্শে। তার ছেলেরা বড় হচ্ছিল, তাদের পড়াশুনার জন্য স্ত্রীর পরামর্শে পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। তার শ্বশুড় বাড়ির লোকেরা অনেক আগেই পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। সে সময় আত্মীয় স্বজনরা সকলেই দেশত্যাগ করে, তাই তিনিও দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে তাদের চারটি শরিক অনেক আগেই দেশত্যাগ করেছিল। প্রথমে হিলি বর্ডারের কাছে বাবুরঘাটে বসবাস শুরু করেন, পরে স্বল্পমূল্যে জমি ক্রয় করে সাতগাছিয়ায় স্থায়ী হন। সাতগাছিয়ায় তিনি সাতগাছিয়া সেকেন্ডারি স্কুলের ক্লার্ক ছিলেন।[১৬৫]

কেস স্টাডি ৩

মনোরঞ্জন কুণ্ডু, বাড়ি ছিল মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থানার হাসারা গ্রামে। তিনি বরিশালে মুদি দোকানদারী করতেন। দেশভাগের সময় সবাই যখন দেশত্যাগ করছিল তখন তিনিও দেশত্যাগ করেন, ১৯৫০ সালের মুলাদি রায়টের পর। তবে তারা নিজেরা কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি। ভিটাবাড়ি ছাড়া তার কোন সম্পত্তি ছিল না। ১৯৫২ সালে সাতগাছিয়ায় যান আগের পরিচিত লোকজনের মুখে শুনে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা দেশত্যাগ করে তাই তিনিও দেশত্যাগ করেন।[১৬৬]

কেস স্টাডি ৪

মেঘলাল সাহা বলেন যে, সবাই চলে আসছিল তাই তিনিও পশ্চিমবাংলার নদীয়ায় কম দামে বেশী জমি কিনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। এ অঞ্চলে ৪০০/৫০০ পরিবার সকলেই একই কারণে অর্থাৎ কম দামে বেশী জমি কিনে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তিনি কলকাতায় চাকুরী করতেন, ১৯৬২ সালে বেথুয়াডহরীতে আসেন।[১৬৭]

---

[১৬৪] ফণিভূষণ ভৌমিক, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
[১৬৫] গনেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
[১৬৬] মনোরঞ্জন কুন্ডু, ঢাকা কলোনি, সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
[১৬৭] মেঘলাল সাহা, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ৫

নিতাই বল্লভ সাহা জানান যে, সবাই চলে আসছিল তাই পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছিল বলে তিনিও চলে আসেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন আসে তখন তারা এদেরকে উৎসাহিত করে। প্রথমে তার দাদা এসে ব্যবসা শুরু করে পরে তারা সবাই আসে। কম দামে বেশী জমি কিনে এখানে চলে আসে। আগে যারা এসেছে তারা জমি কিনতে সাহায্য করে। প্রথমে কলকাতায় বাস করা শুরু করেন, পরে বেথুয়াডহরীতে। তার ছয় বোন, চার ভাই পশ্চিমবাংলায় থাকে। প্রথমে তাদের মুদি ব্যবসা ছিল।[১৬৮]

কেস স্টাডি ৬

নিতাই সাহা জানান যে, তাদের গ্রাম নওয়াবগঞ্জ থানার মাহতাবপুর গ্রামে কোন নির্যাতনের শিকার হননি। তাদের গ্রামে কোন সমস্যা হয়নি। তিনি প্রথমে কলকাতায় ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বেথুয়াডহরীতে আসেন। এখানে জায়গা কিনে বাড়ি করে তারা আসেন। তিনি জানান যে বেথুয়াডহরীতে সবাই এভাবে এসেছে। বেথুয়াডহরী হাসপাতালের সামনে তার ঔষধের দোকান আছে।[১৬৯]

কেস স্টাডি ৭

গোপাল সাহা ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ভারতে আছেন। তিনি তার শিবালয় থানার পাকুড়িয়া গ্রামে কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তিনি জানান যে সবাই এসেছে তাই তিনিও এসেছেন। তারা দুই ভাই একসাথে এসেছেন। তিনি প্রথমে এ এলাকার অন্য পাড়ায় থাকতেন। তিনি একটি দোকানে কাজ করতেন। বেথুয়াডহরীতে কম মূল্যে জমি পেয়ে তিনি কিনে নেন।[১৭০]

কেস স্টাডি ৮

মতিলাল সরকার, মানিকগঞ্জ সদর থানার জিলাইল গ্রামে (মিতরা গ্রাম এর পাশে) কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তিনি জানান যে ঢাকা থেকে যখন অনেক লোক এসেছে তিনিও তখন আসেন। তিনি জানান তার এলাকার হিন্দুরা একজনের সাথে আরেকজন এসেছে। প্রথম বাসস্থান গড়ে তোলেন কমলনগরে। তিনি বেথুয়াডহরীতে ১৪,০০০ টাকা দিয়ে ১০০ শতক জমি কিনেছিলেন। এ অঞ্চলে সবাই এভাবেই এসেছে। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করেন। তার বাবার কাপড়ের ব্যবসা ছিল।[১৭১]

কেস স্টাডি ৯

মনতোষ সরকার ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ভারতে থাকেন। না। ১৯৬৪ সালের রায়টের সময় তিনি প্রাইমারী স্কুলে পড়তেন। তাদের হরিরামপুর থানার চৌকিঘাটা গ্রামে কোন দাঙ্গা হয়নি। তার বাবা, বড় দাদা, জ্যাঠামশাই সকলেই চাকুরী করতেন। তার বাবা আলীপুরদুয়ার চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুরা রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় একটি চুক্তি ছিল যে, যতদিন হিন্দুরা পূর্ববাংলা থেকে আসবে ততদিন ভারত সরকার তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তবে পরে তা দেয়নি

[১৬৮] নিতাই বল্লভ সাহা, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা
[১৬৯] নিতাই সাহা, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা
[১৭০] গোপাল সাহা, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা
[১৭১] মতিলাল সরকার, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা

Dhaka University Institutional Repository

ভারত সরকার। তবে সেই সহযোগিতার আশায় অনেকে এসেছেন। তাদের আত্মীয়- স্বজনরা স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই চলে এসেছেন। প্রথম কলকাতার বেলেঘাটায় ছিলেন, তার কাকারা এখনও ঐ বাড়িতেই থাকেন।[১৭২]

কেস স্টাডি ১০

সুধীর চন্দ্র মুখার্জী ১৯৪৯/৫০ সালের দিকে ঢাকা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসেন। তার পরিবারের কলকাতায় রেডিয়েন্ট প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬/এ, এস এন ব্যানার্জী রোড এ প্রেসের ব্যবসা ছিল সেটার দেখাশুনার জন্য তাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের প্রেস থেকে বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেয়া হত।[১৭৩]

কেস স্টাডি ১১

বাদল সেন বলেন যে, ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় অযথা হয়রানির ভয়ে অনেকে দেশত্যাগ করে। অন্যসব কারণ অর্থনৈতিক। তিনি মনে করেন যে, পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্য যে তারা কিছু লোকের কথায় মিসগাইড হয়েছেন। সে সময় বাড়ি ঘরের মালপত্র আনার পারমিশন ছিল। তাই তখন যারা এসেছেন তাদের অধিকাংশ মালপত্র নিয়ে এসেছেন।[১৭৪]

কেস স্টাডি ১২

সদানন্দ ঘোষ বলেন যে, ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর তার বাবা তাদের নিয়ে চলে আসেন। তারা দাঙ্গার শিকার হয়ে নয়, এমনি চলে যান। সবাই একসঙ্গে দেশ ত্যাগ করেন। কাকারাও তাদের সঙ্গেই দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে সবার দেশত্যাগ করার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল। যে যতটা পেরেছে সরকার থেকে সাহায্য নিয়েছে। তার বাবা নেতাজীনগর কলোনিতে জায়গা পেয়েছিলেন। তারা তিন ভাই এ কলোনিতে থাকেন। অন্য ৪ ভাই ও ১ বোন বিয়ে করে অন্য জায়গায় থাকে।[১৭৫]

কেস স্টাডি ১৩

ঢাকা শহরের রায়ের বাজারের পুল পাড় এর বাসিন্দা গদাধর পাল। বয়স ৬৫/৬৬, পেশায় স্বর্ণকার। তার পিতা মৃত অমৃতলাল পাল ছিলেন কুমার। তারা বংশ পরম্পরায় মাটির কাজই করতেন। আত্মীয় স্বজনরাও মাটির কাজ করতেন। রায়ের বাজারের হিন্দুদের অধিকাংশই মাটির কাজ করতেন। এ অঞ্চলের কোন লোকই ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার পূর্বে দেশত্যাগ করেনি। তবে দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেশত্যাগ করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। তিনি মনে করেন যে সেখানে তারা ভারতে ভাল সুযোগ সুবিধা পেয়েছে বলে চলে গিয়েছে। ভারত সরকার মাইগ্রেশন দেয়াতে তারা চলে গিয়েছেন। তার বাবাও চলে যাওয়ার জন্য পৈতৃক বাড়ি বিক্রয় করে টাকা যোগার করেছিলেন। যেদিন যাবেন বলে স্থির হয়েছিল সে রাত্রে সে টাকাসহ বাক্স চুরি হয়ে যায় বলে তিনি আর যেতে পারেননি।[১৭৬]

কেস স্টাডি ১৪

[১৭২] মনতোষ সরকার, ঢাকা পাড়া, থানা-বেথুয়াডহরী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবাংলা
[১৭৩] সুধীর চন্দ্র মুখার্জী, সি/৪৭, লেক গার্ডেনস, কলকাতা
[১৭৪] বাদল সেন, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা
[১৭৫] সদানন্দ ঘোষ, নেতাজীনগর কলোনি, কলকাতা
[১৭৬] গদাধর পাল, পুলপাড়, রাযেরবাজার, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতি জানান তার আত্মীয়রা কোন প্রকার দাঙ্গার শিকার হন নাই। কাজের খোঁজে গিয়েছেন। এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে সুবিধা হয় চলে যায়। অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে সুখী হয়ে যায় এবং যখন সুযোগ হয় তখনই ভারতে চলে যায়।[১৭৭]

কেস স্টাডি ১৫

সুরীন্দ্রচন্দ্র দাস জানান যে তার চার মামা অনেক আগেই ভারতে চলে গিয়েছেন। আর তার দুই ছেলে ভারতে চলে গিয়েছে। তার ছেলে শ্বশুড়ের সম্পত্তির লোভে গিয়েছে।[১৭৮]

কেস স্টাডি ১৬

পুস্প মল্লিকের স্বামী-মরণচন্দ্র মল্লিক, রস ও চরস এর ব্যবসা করতেন। তিনি জানান যে তার দেবর ভারতে চলে গিয়েছে। তিনি দেশে কাঁচামালের ব্যবসা করতেন। তিনি নদীয়ায় জমি কিনে চলে যান। অন্য প্রতিবশী ও বন্ধুবান্ধব চলে গিয়েছে তাই তিনিও চলে গিয়েছেন। হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।
তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যেতে চায়নি আর তাদের কোন সমস্যাও নেই। যারা চলে গিয়েছে তারা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পেরেছে বলে চলে গিয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ পশ্চিমবাংলায় ছিল না।[১৭৯]

কেস স্টাডি ১৭

দুলাল সাহা, পেশা-ব্যবসা। তিনি জানান যে তার তিন মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা খুব ছোটবেলায় কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে স্কুলে পড়াশুনা করেন হেস্টেলে থেকে। তারা কোন প্রকার নির্যাতনের শিকার হন নাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা গ্রামেই ছিলেন।[১৮০]

কেস স্টাডি ১৮

বিমলা সাহা, জানান যে তার বড় ভাই ১৯৭০ সালে ভারতে চলে যায়। ভাইয়ের ছেলেরা ম্যাট্রিক পাশ করে ভারতে চলে যায়। তারা সেখানে ফলের ব্যবসা করতো পরে তারা তাদের বাবাকে নিয়ে যায়। তার মামারাও ভারতে চলে যায়। তারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়নি। হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।[১৮১]

কেস স্টাডি ১৯

শান্তিলতা চৌধুরী, তার স্বামী জমিদার ছিলেন। তিনি জানান যে তার এক ভাই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তার তিন ছেলে ভারতে থাকে। তার ভাই পূর্ববাংলায় কোন কাজকর্ম করতে পারেন নাই তাই তার মামা তাকে নিয়ে যায়। তিনি ১৯৬০ সালের পূর্বে ভারতে চলে যান। শান্তিলতা চৌধুরীর তিন ছেলে তাদের এক দাদুর সঙ্গে খুব

[১৭৭] জ্যোতি, গ্রাম- উধুর, ডাক- উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর
[১৭৮] সুরীন্দ্র চন্দ্র দাস, গ্রাম- উধুর, ডাক- উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর। স্থায়ী ঠিকানা- পাকুড়িয়া, গাজীপুর
[১৭৯] পুস্প মল্লিক, গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী
[১৮০] দুলাল সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[১৮১] বিমলা সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর

ছোটবেলায় ভারতে চলে যায়। ব্রিটিশ আমলে তার ছোট কাকা ধুপড়িতে চাকুরী করতেন পরে তার পুরো পরিবারকে সেখানে নিয়ে যান। তার এক দেবর নবদ্বীপে থাকে। তার বাবা তাকে সেখানে বাড়িঘর করে দেবার পর সে সেখানে চলে যায়।[১৮২]

কেস স্টাডি ২০

কালীপদ সাহা, জানান যে, তার তিন ভাই ৪৫/৫০ বৎসর আগে ভারতে চলে গিয়েছে। তারা এমনিতেই চলে গিয়েছেন। তারা ভারতে ব্যবসা করতেন।[১৮৩]

কেস স্টাডি ২১

আরতি রানী সাহা জানান যে, তার এক বোন ও চার ভাই ভারতে চলে গিয়েছে। তার বোন বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে যায়, বোনের স্বামীর পরিবার আগে থেকেই ভারতে থাকতো। তার বড় ভাই ভারতে পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তিনি সেখানে সরকারী চাকুরী করতেন, পরে মারা যান। তারা সবাই আসামে থাকে। হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।[১৮৪]

কেস স্টাডি ২২

রতনরানী সাহা, তার বাবার বাড়ি গ্রাম- পিপলিয়া, থানা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। তিনি জানান যে, তার তার তিন ভাই ও চার বোন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তার ভাইয়েরা চাকুরী করতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। বোনেরা তাদের স্বামীদের সাথে গিয়েছেন। তারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়ে বা ভয়ে যাননি।[১৮৫]

কেস স্টাডি ২৩

সীমা পোদ্দার জানান যে, তার পাঁচ কাকা, দুই মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় তারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে তার বড় বোনের বিয়ে হয়, সে আর ফিরে আসে নাই। তার কাকা ও মামারা ভারতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে চলে গিয়েছে। সঠিক সাল তার মনে নেই তবে তা পাকিস্তান আমলে। তাদের তেমন কোন সম্পত্তি ছিল না, দোকান ছিল, দোকান বিক্রয় করে চলে গিয়েছে।[১৮৬]

পূর্ববাংলার হিন্দুরা যে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা ভারতীয়দের মনে আগের থেকেই আশার সঞ্চার করেছিল এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পূর্ববাংলার হিন্দুদের ভারতে টেনে নেয়ার সবরকম চেষ্টা করেছেন তা ব্যর্থ হয়নি। ভারতের বিভিন্ন সেক্টরে পূর্ববাংলার হিন্দুদের অবদান সম্পর্কে প্রণতি দত্ত বলেন,

> "Agricultural sector was improved wherever migrants have settled. Being hardy and laborious, they helped to improve farming and production of food crops. Household industry, including Bidi, Pottery, Mat, Candle,

[১৮২] শান্তিলতা চৌধুরী, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[১৮৩] কালীপদ সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[১৮৪] আরতি রানী সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[১৮৫] রতন রানী সাহা, গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর
[১৮৬] সীমা পোদ্দার, বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

> Kantha Stitch, Ganjee factory and Shantipuri Than etc. has been positively effected since ellegal migrants provide cheapest labor."[১৮৭]

হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সকল সদস্য ভারতে স্থায়ী হয়েছেন তারা একদিকে যেমন নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি সাধন করেছেন, অন্যদিকে পশ্চিমবাংলাসহ ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছেন। তবে অনেকে পুনর্বাসন সুবিধা লাভের আশায় ভারতে গিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেছেন। কেননা ভারতীয়দের পক্ষ থেকে যে পরিমান পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, প্রচারণা ছিল তার থেকে অনেক বেশী। ফলে পুনর্বাসন ব্যবস্থার তুলনায় শরণার্থীর সংখ্যা হয় অনেক বেশী।

[১৮৭] Pranati Datta, Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception study, Page 344

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়
উপসংহার

১৯৪৭ সালের (স্বাধীনতা ঘোষণার) অনেক পূর্ব থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঢাকা জেলা তথা পূর্ববাংলা ত্যাগ ও ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণের পেছনে যে কারণগুলো দায়ী বলে চিহ্নিত হয়েছে সে কারণগুলোকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে ঢাকা তথা পূর্ববাংলায় বসবাস অনুপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাবলী যা হিন্দু সম্প্রদায়কে ভারতের দিকে ঠেলে দিয়েছে আর একটি হচ্ছে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে পূর্ববাংলা সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক বক্তব্য, বিবৃতি, প্রচারণা যা সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করে তাদেরকে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে আগ্রহী করে এবং পূর্ববাংলার হিন্দুদের জন্য ভারতে সৃষ্ট বসবাস উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ যা তাদেরকে ভারতে টেনে নিয়েছে। হিন্দুদের দেশত্যাগের পেছনে এ দুটো বিষয়ই সক্রিয় ছিল, কোন কারণটি বেশী ভূমিকা পালন করেছে তা এককভাবে বিশ্লেষন করা যায়না। কেননা হিন্দু সম্প্রদায় দেশত্যাগ করেছেন সেটা যেমন পূর্ববাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মুসলমান ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোকসহ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী পূর্ববাংলায় বসবাস করছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববাংলায় ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালে ব্যাপক আকারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ায় ভয়ে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক দেশত্যাগ করেন। আবার একইভাবে দেখা যায় দাঙ্গার পূর্ববর্তী সময়ে ও পরবর্তী শান্তিকালীন সময়ে এবং যে সকল এলাকায় কোনরকম দাঙ্গার ঘটনাই ঘটেনি সে সকল স্থান থেকেও দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় ঢাকা জেলার অনেক অঞ্চল যেমন আক্রান্ত হয়েছে তেমনি বেশিরভাগ অঞ্চল দাঙ্গামুক্ত ছিল, কিন্তু দেখা যায় যে ঢাকা জেলার প্রায় সকল এলাকা থেকে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে। মূলতঃ ঠেলে দেয়া ও টেনে নেয়া দুটো কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক লোক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে উচ্চবর্ণের লোকদের দেশত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাদের অধিকাংশেরই পশ্চিমবাংলায় বসবাস করার মত ব্যবস্থা ছিল, বেশীরভাগ পুরুষ সদস্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে চাকুরী করতেন। অনেক পরিবারের কলকাতা সহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি ও জমি ছিল।[১] স্বাধীনতাকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সরকার সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অপশন ঘোষণা করলে হিন্দুরা ভারতে ও মুসলমানরা পাকিস্তানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে স্বাধীনতার সূচনালগ্নেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একটি বড় অংশ দেশত্যাগ করে।[২] উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধিকাংশেরই পশ্চিমবাংলায় গিয়ে বসবাস করার মত ব্যবস্থা ও আত্মীয় স্বজন ছিল। কলকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গার বিভৎসতা ও দেশ বিভাগের সম্ভাবনায় শঙ্কিত সম্পদশালী হিন্দুদের একাংশ পাকিস্তান প্রশাসন কায়েম হবার পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বিকল্প, বাসস্থান নির্মাণ, বিনিময় বা বাড়ি ভাড়া করে দেশত্যাগ করে ছিলেন অথবা স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন।"[৩] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী বলেন,

> "পুরুষানুক্রমে মুসলমানগণ হিন্দু বাড়িতে যে সীমাহীন অমর্যাদা, অপমান, অবহেলা ভোগ করেছে পাকিস্তান হওয়ার পর তাদের সেই অন্ধকার যুগের অবসান ঘটল বলেই তারা আনন্দিত বোধ করল। --- অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমানদের সেই আনন্দ প্রকাশের রীতি, পদ্ধতি ও ভাষায় সমাজের মান মর্যাদাকে আঘাত করল এবং ঐ সকল ঘটনার সংশ্লিষ্ট হিন্দুগণ তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে দেশত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করল।"[৪]

---

১ পরিশিষ্ট দেখুন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

২ পরিশিষ্ট দেখুন, বাদল সেন, কলকাতা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

৩ ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), পৃষ্ঠা ১৬

৪ ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশত্যাগ পরবর্তীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য শ্রেণীর সদস্যদেরকেও দেশত্যাগে প্রভাবিত করবে এবং তারা পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের পক্ষ থেকে পরিবারের একজন সদস্য। পরবর্তীতে তার এ আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।[৫]

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেলেও অনেকেরই জমি, বাড়ি ঘর রয়ে গিয়েছিল পূর্ববাংলায়, যার অধিকাংশই তারা বিক্রয় করে দিয়েছিল আবার অনেকেরই সম্পত্তি রয়ে গিয়েছিল পূর্ববাংলায় যা পরবর্তীতে সরকার, মাইনরিটি বোর্ড কর্তৃক কিছু বন্দোবস্ত দেয়া হয়, অস্থাবর সম্পত্তি কিছু সরকারী কর্মকর্তা, মাইনরিটি বোর্ড কর্তৃক নিলামে বিক্রয় করে ট্রেজারিতে জমা করা হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ টাকা মালকদের পশ্চিমবাংলার ঠিকানায় মানি অর্ডারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ শ্রেণীর দেশত্যাগ ও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে Sattyanarayan Bhattacharya বলেন,

> "The practices of the family as described above is not only natural and unavoidable under the circumstances but it also followed by many other persons of whatever community who earn their living in India and have their homestead in Pakistan."[৬]

স্বাধীনতার অনেক পূর্ব থেকেই মুসলীম লীগ এর প্রচারণা ছিল স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। পূর্ববাংলার জমিদারদের অধিকাংশ এবং তাদের নায়েব গোমস্তারা ছিলেন হিন্দু। মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাই তারা সচেতন ছিলেন যে জমিদারী আইন বিলুপ্ত হলে তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অধিকাংশ উচ্চবর্ণের সদস্যই আগে থেকেই পশ্চিমবাংলায় ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আর যারা ব্যবস্থা করতে পারেন নি তাদের ভোগ করতে হয়েছে সীমাহীন দুর্ভোগ। অনেক পরিবারের একজন সদস্য সম্পত্তি বিক্রয় করে দিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করেছেন ফলে তারাও পূর্ববাংলায় বা পশ্চিমবাংলায় যেখানেই থেকেছেন তাদেরকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে বর্গা চাষীদের কিছু আইনি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেও অধঃ ইজারা বন্ধ করার নামে ১৯৫০ সালের EBSATA তে এই মর্যাদার প্রসঙ্গটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেহেতু বর্গাদারদের কোন দলীল নেই, সুতরাং বর্গা জমিতে তার অধিকারের কোন লিখিত প্রমানও নেই, ফলে হিন্দু জমিদার বা মালিকরা দেশত্যাগ করলে সাধারণ হিন্দু চাষীরা আইনী সমস্যার সম্মুখীন হয়। অসহায় হয়ে পরে সাধারণ কৃষক শ্রেণী।[৭]

ইংরেজ আমলে সরকারী প্রশাসনের পাল্টা শক্তি কেন্দ্র হিসেবে গ্রামাঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলসমূহ যথা- কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি ও গ্রন্থগার প্রভৃতি গণসংগঠনগুলি গ্রামবাসীদের মস্তবড় সহায়ক শক্তিরূপে বিবেচিত হতো। এদের শতকরা ৯৯.৯ ভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা তৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনরূপ সামাজিক দায়িত্ব পালন করলেন না এমন কি, ভারতে চলে যাওয়ার পূর্বে অপর হিন্দুদের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা বা কোন পরামর্শ প্রদানও করলেন না।[৮]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত যারা পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে তারা অধিকাংশ উচ্চবর্ণের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবি শ্রেণী, যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না শ্রমভিত্তিক কাজ

---

[৫] Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol.10, File-Jan, 53/ 441. GOEB

[৬] Satyanarayan Bhattacharya, Home, Political (C.R) B Proceedings, Vol.10, File- Jan 53/425. Page 35 GOEB

[৭] নজরুল ইসলাম, ভূমি সংস্কারের আরও একটি উদ্যোগ এবং তার ফলশ্রুতি, সমাজ নিরীক্ষণ, ৯/ ১৯৮৩, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

[৮] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

করা। নিম্ন শ্রেণীর কৃষক সহ অন্যান্য পেশাজীবি শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ছিল ব্যাপক। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার ফলেই প্রথম কৃষক সহ অন্যান্য শ্রমজীবি শ্রেণী দেশত্যাগ করে। আর এই দাঙ্গার পেছনে কাজ করেছে ভারতীয়দের পূর্ববাংলার হিন্দুদের প্রতি অতি উৎসাহ এবং পূর্ববাংলার সরকার ও জনগণ সম্পর্কে উস্কানীমূলক অসত্য প্রচারণা যা তারা করেছে তাদের নিজেদের স্বার্থেই।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধিকাংশেরই পশ্চিমবাংলায় গিয়ে বসবাস করার মত ব্যবস্থা ও আত্মীয় স্বজন ছিল। কলকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গার বিভৎসতা ও দেশ বিভাগের সম্ভাবনায় শঙ্কিত সম্পদশালী হিন্দুদের একাংশ পাকিস্তান প্রশাসন কায়েম হবার পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বিকল্প, বাসস্থান নির্মাণ, বিনিময় বা বাড়ি ভাড়া করে দেশত্যাগ করে ছিলেন অথবা স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন।”[৯] শতীস চন্দ্র দাস তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন,

> “Hindus from East Bengal are coming to West Bengal mostly out of panic and else out of a sense of frustration. The bulk of those who are evacuating East Bengal are from the middle class bhodralogs. They used to earn their living by sharing the produce of their soil cultivated on borga system or by following one and other of the trades or professions.”[১০]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশীর ভাগ হিন্দু ভদ্রলোকের পক্ষে পুরোনো পদ্ধতিতে আয় করা সম্ভব ছিল না। ফলে তারা দেশত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় আশ্রয়গ্রহণ করে আয় করার ব্যবস্থা করে নেয় তাদের পুরোনো পদ্ধতিতে। “It is a fact that it requires extraordinary courage to continue to live in a village from where all those amongst the Hindus, who have any facilities for coming away, had left.”[১১]

১৯৪০-৪৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরকারের রেশনিং প্রথা চালুর ফলে এ সময় কলকাতায় আশ্রয়প্রার্থীর হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ফলে বিহার ও পূর্ববাংলা বিশেষ করে নোয়াখালী থেকে অনেক লোক কলকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করে। এ সময় মোট আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে ৫% দাঙ্গার কারণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।[১২]

১৯৪৬-৫০ সময়কালে ১৯৪৬ সাল থেকেই পূর্ববাংলা থেকে ধীরে ধীরে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটছিল। তা চলে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশী দেশত্যাগ হয় ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে।[১৩]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগের পেছনে কয়েকটি কারণ দায়ী। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্ববর্তী সময়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ববাংলা ত্যাগ ছিল সম্পূর্ণভাবে মানসিক ও অর্থনৈতিক। হিন্দু উচ্চ শ্রেণীর মনে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল যে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে তারা পূর্বের ন্যায় তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে না। পূর্ববাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও তারা প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তারা তাদের এই আধিপত্য হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব থেকেই পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় চলে যান যেখানে তাদের আগে থেকেই সামাজিক,

---

[৯] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

[১০] Satis Chandra Das Gupta. , Khadi Pratisthan, P.O Sodepur, 24 Pargana, West Bengal. Home Political (C.R), B Proceedings Vol. 44, File No.July `48/ 60,.GOEB

[১১] Satis Chandra Das Gupta, ibid,

[১২] THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO- ECONOMIC SERVAY 1954-55,1957-58, Page 196

[১৩] ibid, Page 198

অর্থনৈতিক অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালী জাতির একতার প্রশ্নে বাঙ্গালী হিন্দু নেতাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ও রাজনীতিবীদ আবুল মনসুর আহমদ বলেন,

> "ঊনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি সাহিত্যিক ও রাষ্ট্র নেতারা 'বাংগালী জাতিত্ব' 'বাংলার বিশিষ্ট' 'বাংলার কৃষ্টি' 'বাংলার স্বাতন্ত্র' ইত্যাদি প্রচার করতেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ভোটাধিকার প্রসারে বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার মেজরিটি মুসলমানদের হাতে চলিয়া যাইবে এটা পরিষ্কার হইয়া গেলে হিন্দুদের মুখে বাংগালী জাতিত্বের কথা বাংলার কৃষ্টির কথা, আর শুনা গেল না। তার বদলে 'ভারতীয় জাতি' 'ভারতীয় কৃষ্টি' 'মহাভারতীয় মহাজাতি' ও 'আর্য সভ্যতার' কথা শুনা যাইতে লাগিল।"[১৪]

১৯৪৮ সালে পূর্ববাংলার হিন্দুদের দেশত্যাগের পেছনে যে ভীতি কাজ করেছে তা প্রথমত: সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বক্তব্যের ফলে। তারা বিভিন্ন সময় ভারতীয় সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেছিলেন পূর্ববাংলায় সসস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার জন্য। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ভীতি বৃদ্ধি পায় ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক হায়দ্রাবাদ দখলের ফলে। এর পূর্বে পূর্ববাংলায় বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। হায়দেরাবাদের পতনের পর হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ববাংলায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য ভারতীয় সরকারকে পরামর্শ প্রদান করতে থাকে। এ সময়ে পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। এতে বলা হয়,

> "But when Hyderabad fell, numerous fifth columnists, encouraged by public and private talk accross the border, and actively assisted by organisation in the Indian dominion, got busy and among other things, started a systematic whispering campaign that the invasion of East Bengal was now a matter of days."[১৫]

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতাকালীন সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের ফলে মুসলমানরা পূর্ববাংলায় চলে আসতে শুরু করে। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায় ভীত হয়ে পড়ে তাদের ওপর নির্যাতনের ভয়ে।

তৃতীয়তঃ এ সময়ের ভারতীয় পত্রপত্রিকায় পূর্ববাংলা সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ভীতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। 'Statesman' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি 'পূর্ব পাকিস্তানের উপর ভারতীয় সরকারের The economic blockade' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখে যা পড়ে হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণী হতাশ হয়ে পড়ে।[১৬]

চতুর্থতঃ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন, সম্মান, সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুর নিরাপত্তাহীনতার চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করতে থাকে যার ফলে সকলের মনে সাধারণভাবেই ধারণা জন্মায় যে, পুর্ববাংলায় হিন্দুদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অধিকার কোনভাবেই নিরাপদ নয়।

পূর্ববাংলা সরকার প্রেসনোটের মাধ্যমে এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের যে মানসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে তারা দেশত্যাগ করে যাচ্ছিল তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে,

---

[১৪] আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫

[১৫] Home,. Political.(CR), B Proceedings, Vol 4, File no. Jan 1951/242-248, page 3 GOEB

[১৬] ibid, page 3

> "Propagation by certain Indian leaders and others of what is called the "Spiritual theory" which is producing an adverse psychological effect upon the minds of the minorities in Pakistan."[১৭]

এমনি পরিস্থিতিতে প্রশাসনের হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের অপশন দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনা এবং তৎস্থলে মুসলিম কর্মচারীদের আগমন হিন্দুসমাজের মানসিকতায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফেলতে সহয়তা করল।[১৮] ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক পক্ষপাতীত্বলাভে সচ্ছল বা প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুগণ অথবা তাদের প্রযত্নে সাধারণ হিন্দুগণও অধিকতর সুযোগ সুবিধা লাভে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রশাসন থেকে হিন্দু কর্মচারীদের সিংহভাগ স্বপরিবারে ভারতে চলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক প্রশাসনের হাল ক্রমে বিপরীত দিকে ধাবিত হতে থাকে।[১৯] সাধারণ হিন্দুরা নিজেদেরকে অসহায় ও নিরপত্তাহীন ভাবতে শুরু করে যা তাদের দেশত্যাগকে ত্বরান্বিত করে। এ সময় পূর্ববাংলায় বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটে এবং কিছু সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করা গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়।[২০]

বিজয়গড়ের বাসিন্দা বাসুদেব সেনগুপ্ত জানান যে তারা স্বাধীনতার পরই পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। তার মামার বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গে তাই তারা দেশভাগের আগে থেকেই সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করে এবং দেশভাগের পরেই পূর্ববাংলা ত্যাগ করে।[২১]

মর্যাদা হারানোর ভীতি যেমন ঠেলে দেয়া হিসেবে কাজ করেছে তেমনি তাদের মনে এই ভীতি সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল, এটা ভারতে তাদের টেনে নিয়েছে, ভারতে তাদের বসবাসের সংস্থান ছিল এটাও তাদের টেনে নিয়েছে, কেননা যাদের ভারতে কোন সংস্থান করা ছিল না তারা প্রথম ধাপে পূর্ববাংলা ছেড়ে যায়নি। পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে ভারতে বসবাস উপযোগী ব্যবস্থা সৃষ্টি করে পূর্ববাংলা ত্যাগ করেছেন। অনেকে কিছু না করতে পেরে পূর্ববাংলায় ফিরেছে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় যে, ঠেলে দেয়ার পাশাপাশি টেনে নেয়ার ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৯৫০ সালে বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামে একজন আসামী গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় , সে ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা সে সময়কার পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা বিবৃতি দিতে থাকে। ফলে পশ্চিমবাংলায় শুরু হয় দাঙ্গা। পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার কারণে কয়েক লক্ষ মুসলমান পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সবিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করে। পূর্ববাংলায় ৫/৬ দিনের মধ্যে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও ভারতীয় মহল থেকে অব্যাহতভাব প্রচারণা চলতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার হলে দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে অনেক হিন্দু মুসলমান নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।[২২]

---

[১৭] Government Press Note, 28 October, 1948, Home, Political(CR),. B Proceedings, Vol 4, File no Jan 1951/ 242-248, page 4 GOEB
[১৮] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[১৯] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
[২০] Home, Political. (CR), B Proceedings, Vol 4, File no Jan 1951/ 242-248, page 4 GOEB
[২১] বাসুদেব সেনগুপ্ত, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১০৬
[২২] বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে

কিন্তু ভারতে চুক্তি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ভারতীয় বিভিন্ন মহল থেকে ভারতীয় সরকারকে লোক বিনিময়, পূর্ববাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে থাকে। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে যেসকল কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছিল তাতে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে ভারতে ডেকে নেয়ার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষ্যিত হয়।[২৩]

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত যারা পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে তারা অধিকাংশ উচ্চবর্ণের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী শ্রেণী, যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না শ্রমভিত্তিক কাজ করা। নিম্ন শ্রেণীর কৃষক সহ অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ছিল ব্যাপক। স্বাধীনতাকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে ভারতে সংঘটিত দাঙ্গার ফলে পশ্চিমবাংলায় কর্মরত পূর্ববাংলার মুসলমান, ভারতীয় কর্মজীবী বিশেষ করে মুসলমান শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের একটি বড় অংশ ভারত ত্যাগ করে ফলে সেখানে শ্রমিক ও কৃষিজীবী শ্রেণীর শুন্যতা সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতে তথা পশ্চিমবাংলায় ভদ্রলোক শ্রেণীর থেকে বেশী প্রয়োজন ছিল কর্মজীবী শ্রেণীর। যার প্রয়োজনীয়তার কথা পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী ও সরকারী মহল থেকে বিভিন্ন সময়ে আলোচিত হয়েছে। সভা সমিতিতে ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তারা তাদের এই প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি তারা পূর্ববাংলার চেয়ে পশ্চিমবাংলায় সুযোগ সুবিধা বেশী ও কাজের কোন অভাব নেই এবং ভারতীয় সরকার পূর্ববাংলার হিন্দুদের সকল প্রকার সহযোগিতা করবে বলে একটি মিথ তৈরী করে। পূর্ববাংলার হিন্দুদের প্রতি অতি দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তৃতা বিবৃতিতে পূর্ববাংলার হিন্দুদের বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশার বিবরণ দিয়ে একদিকে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে ভীত ও ভারতীয়দেরকে সহানুভূতিশীল করে তুলেন, অন্যদিকে ভারতীয় জনগণ ও সরকারের সহযোগিতার, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বর্ণনা দিয়ে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। পূর্ববাংলার শরণার্থীদের প্রয়োজনীতা তুলে ধরে।

বাংলা ভাগের ফলে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয় কৃষি উৎপাদনে। কারণ পূর্ববাংলা ছিল কৃষিপণ্যের উৎস। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় ভারত। পূর্ববাংলার পাট দিয়ে চলত পশ্চিমবাংলার পাটকলগুলো। পশ্চিমবাংলায় কোন পাট উৎপাদন হত না। কারণ পাট উৎপাদনের জন্য যে কঠিন শ্রমের প্রয়োজন তা পশ্চিমবাংলার কৃষকরা করতে পারতো না। একমাত্র ভরসা ছিল পূর্ববাংলার কৃষক। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার ফলেই প্রথম কৃষকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী দেশত্যাগ করে। আর এই দাঙ্গার পেছনে কাজ করেছে ভারতীয়দের পূর্ববাংলার হিন্দুদের প্রতি অতি উৎসাহ এবং পূর্ববাংলার সরকার ও জনগণ সম্পর্কে উস্কানীমূলক অসত্য প্রচারণা যা তারা করেছে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে।

কলকাতা শহরে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময়কালে দেশত্যাগ করেছে ৫২.২%। তবে এদের দেশত্যাগের পেছনে দাঙ্গা ছাড়াও অনেক কারণ ছিল। পরবর্তীতে শরণার্থীদের মধ্যে কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণের সকল কারণ বিশ্লেষণ করে একটি জরিপে দেখানো হয় যে, শুধুমাত্র দাঙ্গা আক্রান্ত হয়ে ২.৯% শরণার্থী কলকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করেছে।[২৪]
২.৯% ঠেলে দেয়ার কারণে দেশ ত্যাগ করেছে, বাকী অংশের দেশ ত্যাগের পেছনে রয়েছে টেনে নেয়ার কারণ। দ্বিতীয় কারণটি কার্যকর না থাকলে হয়তো প্রথম কারণটি কার্যকর হতনা।
সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনায় ১৯৫০ সালের দাঙ্গাকে অর্থনৈতিক কারণে সংঘটিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। তিনি বলেন যে পাকিস্তানীদের আসামে অনুপ্রবেশ এই অর্থনৈতিক সংকটের কথাই প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি এ সময় পূর্ববাংলা থেকে মুসলমানদের বার্মায় অনুপ্রবেশের ঘটনার উল্লেখ করেন।[২৫]

---

[২৩] বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে নবম অধ্যায়ে
[২৪] THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO- ECONOMIC SERVAY 1954-55,1957-58, Page 198-200 GOWB
[২৫] স্যোসালিষ্ট, স্যোসালিষ্ট পার্টির মুখপত্র, ২য় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা, ১৯ মার্চ ১৯৫০, Home, Political (C.R), B Proceedings, vol.56, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্থানে ফসল ভাল না হওয়ায় তার কতগুলি জেলায়, বিশেষ করে খুলনায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাই অনটনের অবস্থায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বাস্তুত্যাগের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল হয়। তাদের অনুযোগ হল তাদের দুর্দশায় সরকারের পক্ষ হতে উপযুক্ত ত্রাণমূলক ব্যবস্থা করা হয়নি এবং সেই কারণেই বাধ্য হয়ে অনশনে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা দেশত্যাগী হয়েছে। এ ধরনের কারণ আগে কখনো হয়নি, তবে একথাও ঠিক যে তা দেশ বিভাগের আনুসঙ্গিক ফল। এই কারণে এই বছরের মাঝামাঝি হতে আগমনের হার ক্রমশ বেড়ে যায়। নূতন ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদের আগমনের হার কমে যায়।[২৬]

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কাশ্মিরের হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র কেশ চুরির ঘটনা ঘোষণা করা হলে পশ্চিমবাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথমে প্রতিবাদ আন্দোলন ও পরে দাঙ্গা শুরু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে খুলনার দৌলতপুর এলাকায় সেখানকার মিল শ্রমিকদের মিছিল বের হয়। তারাই পরবর্তীতে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। তারা বিভিন্ন বাড়ি, দোকানপাট, গাড়ি আক্রমণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ জানুয়ারি থেকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিল সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় পেশাদার গুন্ডা বাহিনীর নেতৃত্বে বিভীষিকার ন্যায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় কয়েক লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করে। ১৯৫০ সালের পর ১৯৬৪ সালের মধ্যে পূর্ববাংলায় বড় ধরনের কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটে নি। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গাও ভারতে সংঘটিত দাঙ্গারই ধারাবাহিকতা।

১৯৫০-১৯৬৪ সময়কালে যেসকল শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আর এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল জনবল। এ প্রয়োজন পূরণ হয় ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গাজীপুর এলাকার অধিকাংশ ব্যক্তি জানান যে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পূর্বে তাদের কেউ দেশত্যাগ করেনি।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায় মানস রায় এর ভাষায়,

> "কলোনির শুরুটা মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের নিয়ে–যার সঙ্গে জুড়েছিল বাম আন্দোলন। কলোনি গঠনের প্রক্রিয়াটি দেখাশুনার ভার পরে একটি কমিটির ওপর। এরা ছিলেন শিক্ষাবিদ বা আইনজীবী, নাগরিকত্বের ভাষা এঁদের জানা, আর ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আনা কিছুটা সামাজিক পুঁজি। যারা শেষ পর্যন্ত কলোনিতে এল তারা মূলতঃ মধ্যবিত্ত, তাদেরইতো যোগাযোগের জোর–যার থেকে লোকবাছাই। যারা এ বাছাইতে পড়ল না–জেলে, সুতোর মিস্ত্রি, ঘরামি নাপিত– এরা বিশেষ ঐ ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নিজেদের সীমাবদ্ধ করলেন। ---- কলোনিতে যখন এক ধরনের স্থিতিশীলতা এলো, ভদ্রলোক উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হয়ে গেলেও নতুন নতুন দাঙ্গার বিস্তারে ৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অক্লান্ত অতিথির আগমন ঘটেই চলল সে প্রবাহ চলল ছয়ের দশকের অনেক দূর পর্যন্ত। এক সময় এখান থেকেই আমরা আমাদের কাজের মেয়ে পেয়ে যাব।"[২৭]

পূর্ববাংলার কিছু কিছু সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তহীনতা তৈরী করে। যা তাদেরকে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ উচ্চবর্ণের (যাদের আশ্রয়ে তারা ছিল) বড় অংশ দেশত্যাগ করেছে। ইংরেজ আমলে সরকারী প্রশাসনের পাল্টা শক্তি কেন্দ্র হিসেবে গ্রামাঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলসমূহ যথা-কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি ও গ্রন্থগার প্রভৃতি গণসংগঠনগুলি গ্রামবাসীদের মস্তবড় সহায়ক শক্তিরূপে বিবেচিত হতো। এদের শতকরা ৯৯.৯ ভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে তৎকালীন পরিস্থিতিতে কোন রূপ সামাজিক দায়িত্ব পালন করলেন না এমন কি, ভারতে চলে যাওয়ার পূর্বে অপর হিন্দুদের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা বা কোন পরামর্শ প্রদানও করলেন না।[২৮]

---

[২৬] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃষ্ঠা ১৯৩

[২৭] মানস রায়, কাঁটা দেশে ঘরের খোজ, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫

[২৮] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

ঢাকা জেলায় বিশেষ করে পূর্ববাংলার অন্যান্য শহরের মত ঢাকা শহরে সরকারী অফিস আদালত, কর্মকর্তা কর্মচারীদের ও ভারত থেকে আগত শরণার্থীদের বাসস্থানের জন্য অনেক বাড়ি, জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হলে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাড়ি, জমি অধিগ্রহণ করে। এ সময় শুধুমাত্র হিন্দু বাড়িই অধিগ্রহণ করা হয়নি, অনেক মুসলিম মালিকানাধীন বাড়িও অধিগ্রহণ করা হয়। তবে শহরের প্রায় ৮৫% বাড়ি যেহেতু হিন্দু মালিকানাধীন এবং তাদের অধিকাংশ বাড়িতে দুই একজন বৃদ্ধ সদস্য বা বাড়ির কেয়াটেকার ছাড়া কোন লোক ছিল না তাই অধিগ্রহণকৃত বাড়ির মধ্যে হিন্দু মালিকানাধীন বাড়ির সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশী।

ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ শরণার্থীদেরকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছেন তাদের রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে। পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে দেশ ত্যাগ করেন সে দলকে সমর্থনের বিনিময়ে। শরণার্থীদের নিকট কংগ্রেস জনপ্রিয় ছিল না। আর কংগ্রেসের প্রতি অসমর্থনকেই হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে আরও বেশি বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে একদিকে তারা পূর্ববাংলার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রচার করে হিন্দুদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে হিন্দুদের দেশত্যাগে উৎসাহী করে তোলে এবং অন্যদিকে শরণার্থী পুনর্বাসনে কংগ্রেস সরকারের দুর্বলতাকে প্রচার করে সরকার বিরোধী জনমত গঠন করতে থাকে। বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে কমিউনিস্ট, স্যোসালিস্ট, বৈপ্লবিক স্যোসালিস্ট, কে.এম.পি.পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ফরোয়ার্ড ব্লক নকশাল হিন্দুদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিজেদের জনবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।[২৯] অনেক স্থানে পূর্বে কোন লোকসভা বা বিধান সভার আসন ছিল না কিন্তু পুনর্বাসন এলাকাগুলোতে নূতন আসন সৃষ্টি করা হয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারনে। শরণার্থীদের বড় অংশের নিকট একটি বিশেষ আস্থা ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ওপর।[৩০] 'Politics saw in this human misery a great chance to build up a vote bank.'[৩১]

দেশবিভাগের পূর্বে হিন্দুরা যেন দেশবিভাগে রাজী করায় এই বলে যে, ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হবে এবং তারা পুনরায় পূর্ববাংলায় তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার নিয়েই দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার বিচার, শাসন, ও পুলিশ বিভাগ ও বিভিন্ন অফিসে নিযুক্ত অসংখ্য সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার মূলধন, গচ্ছিত অর্থ, মূল্যবান অলংকারসহ সকল স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। দুর্বল হয়ে পড়ে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি। প্রশাসন, ব্যবসার এই শুন্য স্থান দখল করে নেয় অবাঙ্গালি ও ভারত থেকে আগত মুসলমানরা। একদিকে তাদের নিজেদের অত্যাচারিত হওয়ার ক্ষোভ যার কারণে তারা ভারত ত্যাগ করে এসেছে অন্যদিকে পূর্ববাংলার স্থানীয় মুসলমানদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এ সকল ভারত থেকে আগত মোহাজেররা। ফলে এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই শিকার হয় তাদের কর্তৃত্তের। পাঞ্জাবী সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বিহারী মুসলমান শরণার্থীরা বাঙ্গালীদের কাছে বিদেশী। এই পাঞ্জাবী ও বিহারীদের নিয়েই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের দুর্বলতার কারণ দেখিয়ে হিন্দুরা দেশত্যাগ করেছে। এ বিষয়গুলো হিন্দুদের দেশত্যাগের ক্ষেত্রে ভারতে ঠেলে দেয়া হয়েছে বলেই ব্যাখ্যা করা যায়। সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার এর বিরুদ্ধে অনেক হিন্দু বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চমহলের নির্দেশে তদন্ত করে তার সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার কখনো কখনো অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। তবে তারা এ অভিযোগগুলো পূর্ববাংলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট না করে করতেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট। যা পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের ভারতের প্রতি দুর্বলতারই প্রতিফলন।[৩২]

---

[২৯] Pranati Datta, , Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception study, Page 351

[৩০] 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার বেলঘরিয়া প্রতিনিধি, ২৭ জুলাই ১৯৫২

[৩১] Pranati Datta, op-cit, Page 351

[৩২] সপ্তম অধ্যায়ে এ সকল অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে

দাঙ্গার সময়কাল ব্যতীত বিভিন্ন কারণে অনেক হিন্দু দেশত্যাগ করেছে, সে সকল কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কেউ কেউ বলেছে তাদের বাড়ি বেদখল হয়েছে, কারও প্রতিবেশীরা বাড়িতে চুরি করেছে, কারও গরু চুরি হয়েছে যার ফলে সে আর চাষ করতে পারবে না, কারও গাছের ফল চুরি করেছে বাচ্চারা, কারও মুরগি চুরি হয়েছে ইত্যাদি। কোন কোন শিক্ষিত লোক অভিযোগ করেছে যে তার সহকর্মীরা তার সঙ্গে ঠাট্টা করে। তারা অভিযোগ করে যে এ সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারী প্রশাসন বা পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি তাই তারা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেছেন। কোন একজন মানুষ বা একটি পরিবারের নিজেদের বাড়িঘর, চাষের জমি, ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে দেশত্যাগ করার জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা বলাই বাহুল্য। আর এ সকল বিষয়ে একটি দেশের সরকারী প্রশাসন বা নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা কোন কোন সময় প্রাসঙ্গিক। যদিও এসকল সমস্যা সাধারণত স্থানীয় নেতৃবৃন্দই সমাধান করে থাকেন।[৩৩]

এ প্রসঙ্গে কলকাতার কিছু কিছু হিন্দু নেতৃবৃন্দ নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও সাংবাদিক সম্মেলনে একদিকে ভারতে উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ভারতীয় সরকার ও সাধারণ জনগণকে উদ্বাস্তুদের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে এবং অন্যদিকে পূর্ববাংলায় হিন্দু সম্প্রদায় কতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তার সত্য/অসত্য বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করে পূর্ববাংলায় অবস্থানকারী ও তাদের পশ্চিমবাংলায় অবস্থানকারী আত্মীয় স্বজনদের মনে ভীতিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। পূর্ববাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও পূর্ববাংলার থেকে ভারতকেই নিজের দেশ বলে মনে করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা বিভিন্ন সময় তাদের বক্তব্য থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং এরাই তফসীলি হিন্দুদেরকে নিজেদের কাজের স্বার্থে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়েছে। উদ্বাস্তুদের অনেকেরই ভরসা ছিল যে, স্বাধীন ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানাতে শিয়ালদহ স্টেশনে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা রাখবেন। (পূর্ববঙ্গেরই ছেলে প্রফুল্ল ঘোষ তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী) তিনি অবশ্যই উদ্বাস্তুদের অভ্যর্থনা, আশ্রয়দান ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন।[৩৪] কারণ দেশ বিভাগের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, গান্ধীজী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ জাতীয় নেতারাই ঘোষণা করেছেন যে, দেশ বিভাগের জন্য যদি সংখ্যালঘুদের পাকিস্তানে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে ভারতই তাদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন দেবে। এ বিষয়গুলোও অবশ্যই হিন্দুদেরকে ভারতের দিকে টেনে নেয়ার কারণ হিসেবেই উল্লেখ্য। পূর্ববাংলার শরণার্থীরা ভারতের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে এটা অনুধাবন করেই বিভিন্ন সময় পশ্চিমবাংলা ও ভারতীয় সরকারকে উৎসাহিত করেছেন। শরণার্থীরা অনেক সময় আশ্রয় গ্রহণকারী দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে। Ron Remond বলেন, "Refugees can also be agents of development if they are given the opportunity to contribute to the national economy by using their skills and productive capacities."[৩৫]

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এসকল কার্যক্রমের সহযোগিতা করেছে ভারতীয় প্রচার মাধ্যম। একদিকে পূর্ববাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সরকারী ও সাধারণ মুসলমান জনগণ কর্তৃক নির্যাতনের সত্য/অসত্য বিভিন্ন ঘটনার চিত্র তুলে ধরে পূর্ববাংলা হিন্দুদের বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপোযোগী বলে ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও সাংবাদিক সম্মেলনে দেয়া বক্তব্য এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন উদ্যোগের প্রচার করে পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে প্রলোভন সৃষ্টি করেছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষের মনে পারস্পরিক সন্দেহ এবং হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে মিহির সেন তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন,

[৩৩] সপ্তম অধ্যায়ে এ সকল অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে

[৩৪] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

[৩৫] Chirantan Kumar, Migration and Refugee issue Between India and Bangladesh, Page 66-67

Dhaka University Institutional Repository

"সদ্য আহৃত স্বাধীনতা, হিন্দু সমাজে উচ্চবর্গীয়দের প্রাক্তন ভেদাচারের যন্ত্রণা, যৌবনিক প্রদাহ প্রশমনের সহজ উপায় এবং সর্ব্বোপরি প্রতিশোধ স্পৃহাজনিত রিরংসা- যা প্রতিনিয়ত পত্র পত্রিকা থেকে আহৃত, তার প্রকোপ এড়ানো এদের পক্ষে সহজ ছিল না।"[৩৬]

এ প্রচারণার প্রভাবে যে বিপুল সংখ্যক দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই হিন্দুদেরকে ভারতে টেনে নেয়া হিসেবেই ব্যখ্যা করা যায়। প্রথম পর্যায়ে হিন্দু উচ্চবর্ণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপকহারে দেশত্যাগের পেছনেও শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপত্তাহীনতা নয়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাও তাদেরকে পূর্ববাংলা ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। ডাঃ বিধান রায় বলেন,

"The economic security of the middle class people has also suffered greatly as a result of the gradual disintegration of the joint family system and the general loss of their landed property."[৩৭]

পূর্ববাংলা ত্যাগকারী পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীর ভাগের আয়ের উৎস ছিল পূর্ববাংলার জমি থেকে আয়। ফলে এই শ্রেণীরই চাকুরীর সমস্যা বেশী দেখা দেয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পশ্চিমবাংলা সরকার ভারতীয় সরকারের সঙ্গে একত্রিতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। তারা চাকুরীর বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যা যুবক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ভারতীয় বিভিন্ন পুনর্বাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সহযেগিতা শ্রমিক শ্রেণীর দেশ ত্যাগের ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা পালন করেছে সেম্পর্কে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সে সম্পর্কে বলা হয়,

"The resson for their coming is continued rise in cost of living in the East Bengal and the lure of handsome cash dole by the Govt. of India. These doles amount to Rs.15/- per head per month and if an average person has family of six members the family gets Rs. 105/- per month which is about three times the average income of a laboure in East Bengal. Many have made it a business to come and draw their cash bonus for the maximum period possible, then go back for a while and come back again under another asumed name."[৩৮]

নিম্ন মধ্যবিত্তদের দেশত্যাগের পেছনের কারণ হিসেবেও কলকাতায় চাকুরীর আকর্ষণ হিসেবেই ব্যাখ্যা করে বলা হয়,

"Their earning members usually work in Calcutta and they kept their families in East Bengal for Economic reasons. Now that the cost of living in East Bengal is higher than in Calcutta they bring their families to Calcutta."[৩৯]

পূর্ববাংলায় শান্তিপূর্ণ অবস্থা সত্যেও হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে কলকাতা থেকে উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার ১৯৪৮ সালের ১১ নভেম্বর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এক চিঠিতে লিখেন,

"Seeking the reason as to why Hindus are leaving East Bengal where a peaceful and friendly atmosphere prevails, one comes to the conclusion

---

[৩৬] মিহির সেন, বিষাদ বৃক্ষ, পৃষ্ঠা ৪৩

[৩৭]. Bidhan Chandra Roy, Towards a Prosperous India, Speeches and Writings of Bidhan Chandra Roy

[৩৮] Home, Political (C.R), B Proceedings, vol. 4, File No. B May `52/ 242-248, Page 99 GOEB

[৩৯] ibid, Page 99

Dhaka University Institutional Repository

> that it is due to the machination of an interested section of persons who are against Pakistan and are guided by false political motives."[৪০]

ঢাকা জেলা ত্যাগকারী বর্তমানে বর্ধমান জেলার কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রামে ঢাকা কলোনিতে বসবাসকারী বাসিন্দা গনেশ চক্রবর্তী, অঞ্জলী চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন কুণ্ডু, মায়া সাহা, ঝর্ণা সাহা এবং তাদের অন্যান্য আত্মীয়রা সকলেই এ এলাকায় স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন নিজেরা স্বল্পমূল্যে জমি ক্রয় করে।[৪১]

১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পেছনেও ছিল ভারতীয়দের উস্কানীমূলক প্রচারণা ও সেখানে সংঘটিত দাঙ্গার পরিনাম। ১৯৬৩ সালে ভারতে গ্রহণ করা হয় দন্ডকারণ্য প্রকল্প সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের বর্ণনা দিয়ে পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করে হিন্দুদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা টেনে নেয়া, তবে এটা ঠিক যে যখন দেশত্যাগ শুরু হয়েছে তখন দেশত্যাগকারীর সংখ্যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বা গৃহীত পুনর্বাসন ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশী হয়েছিল। ফলে যারা গিয়েছেন তাদের অধিকাংশ সীমাহীন দুর্ভোগে পতিত হয়েছেন।

বিভিন্ন সময়কালে দেশত্যাগের সংখ্যা এবং দেশত্যাগের সম্প্রদায়গত পার্থক্য এবং সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা যায় যে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ও সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপত্তাহীনতার কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেনি এর পেছনে একদিকে ভারতে সংঘটিত অনেক ঘটনা যেমন হায়দেরাবাদে ভারতীয় সরকারের পুলিশী এ্যাকশন, কাশ্মীরে অভিযান ইত্যাদি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারণা, শরণার্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্য ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং প্রচার মাধ্যমের পূর্ববাংলার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা দেশ ত্যাগকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে সদ্য স্বাধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং অন্যদিকে পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ যা হিন্দু মুসলিমসহ সকল সম্প্রদায়কে মোকাবেলা করতে হয়েছে। আর এ সমস্যাগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগকে প্রভাবিত করেছে।
গাজীপুর এলাকায় কিছু অঞ্চলে বেশীরভাগ লোকই ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার ফলে দেশত্যাগ করেছে। পূবাইলে কোন দাঙ্গা না হলেও সেখান থেকে অনেক লোক চলে গিয়েছেন। পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দুদের ঢাকা জেলার অন্যান্য এলাকায় যারা চলে গিয়েছেন সে সকল লোকেরা কেন গিয়েছেন তা তাদের আত্মীয়রা জানেন না, বা এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার ফলে তারা পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন আবার অনেকে গোপনে চলে গিয়েছেন এবং আত্মীয়দের সাথে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। ঢাকা জেলায় অবস্থানকালে তারা বেশীরভাগই প্রতিবেশীদের দ্বারা কোন হয়রানির শিকার হয়নি। তাদের স্থানীয় সাধারণ মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল।[৪২]

বর্ধমান জেলার কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রামে ঢাকা কলোনি, নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী থানার ঢাকা পাড়া এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারীরা কেউই দাঙ্গা বা কোন হয়রানির শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেননি, বর্ধমান জেলার কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রামের ঢাকা কলোনি, নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী থানার ঢাকা পাড়া এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ তাদের সাক্ষাৎকারে জানান যে তারা দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগ করেননি, কয়েকজন জানান তাদের এলাকার পূর্বে দেশত্যাগকারী উচ্চবর্ণের লোকদের পরামর্শে তারা দেশত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস শুরু করেন। তারা সকলেই বলেছেন যে সেখানে কম মূল্যে জমি কিনতে পেরে তারা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়েছেন। ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ঢাকা জেলার প্রায় চার/ পাচঁশত পরিবারের সকলেই

[৪০] ibid, Page 87
[৪১] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
[৪২] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

সেখানে ঢাকার তুলনায় স্বল্পমূল্যে বেশি জমি কিনতে পেরেছেন বলে তারা সেখানে স্থায়ী আবাস গড়েছেন। তাদেরকে সহায়তা করেছেন ঢাকা ত্যাগকারী তাদের এলাকার উচ্চবর্ণের লোকেরা। তারা দাঙ্গা বা কোনরকম হয়রানির শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেননি। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং তাদের ঢাকার বাড়ির উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যারা আগে পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছিলেন।

তাদের এলাকার পূর্বে দেশত্যাগকারী উচ্চবর্ণের লোকদের পরামর্শে তারা দেশত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস শুরু করেন। তারা সকলেই সেখানে কম মূল্যে জমি কিনতে পেরে সেখানে স্থায়ী আবাস গড়েছেন। তাদেরকে সহায়তা করেছেন ঢাকা ত্যাগকারী তাদের এলাকার উচ্চবর্ণের লোকেরা। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং তাদের ঢাকার বাড়ির উচ্চশ্রেণীর প্রতিবেশীরা, যারা আগে থেকেই পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন।[৪৩]

নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী থানার ঢাকা পাড়া এলাকা গড়ে উঠেছে ঢাকা জেলা ত্যাগ করে বর্তমানে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হিন্দুদের দ্বারা। সে অঞ্চলটিতে পূর্বে ছিল মুসলমান প্রধান এবং অল্প কয়েকটি হিন্দু পরিবার বসবাস করত। বেশীরভাগ এলাকা ছিল পতিত। বেথুয়াডহরী রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বেশীরভাগ ঢাকা জেলার উদ্বাস্তুদের আগমনে। ঢাকা পাড়ায় ঢাকা জেলার প্রায় চার পাঁচশ পরিবারের বাস। তাদের সকলে পরিচিত ও আত্মীয় স্বজনদের সহায়তায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেখানে কম মূল্যে জমি ক্রয় করে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলেন।[৪৪] শক্তিগড়ের বাসিন্দা সন্দীপ সেনগুপ্ত তার অভিজ্ঞতায় বলেন, "রিফিউজিরা দলবদ্ধভাবে এসেছে। অথবা একজনের টানে অন্যজন এসেছে। সেই টানটাই প্রধান।-----এই নয় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেই এসেছে।"[৪৫]
ঢাকা জেলা থেকে দেশত্যাগের ক্ষেত্রে দাঙ্গার প্রভাবের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় যেমন বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও এতে পূর্ববাংলার হিন্দুদের কাজের সুযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান ও এর প্রচার, প্রচার মাধ্যমের অসত্য প্রচারণা এবং পূর্ববাংলার হিন্দুদের জন্য ভারতীয় তথা পশ্চিমবাংলা সরকারের বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পের অতিরঞ্জিত বর্ণনা একদিকে তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরী করেছে, অন্যদিকে তাদের ভারতে বসবাস করাকে (অর্থনৈতিক ও সামাজিক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে) অধিক নিরাপদ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়কে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। পূর্ববাংলার হিন্দুদের পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার পেছনে কিছু কারণ যা টেনে নেয়া হিসেবে কাজ করেছে তার ব্যাখ্যা করে প্রণতি দত্ত বলেন,

> Geographic proximity of Bangladesh and West Bengal, the linguistics and cultural similarities, same food habit, homo ethnic climate, belief of getting shelter cordiality, fellow felling, acceptance power of people of West Bengal have contributed to the movements of population from Bangladesh to West Bengal."[৪৬]

গ্রামের উদ্বাস্তু কৃষকেরা শুধু বাস্তু জমিতে বসতি স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি। জংলা, হাজা-মজা, জলে ডোবা, জমিকে নিজ প্রচেষ্টায় চাষযোগ্য করে তুলে সোনার ফসলে ভরে দিয়েছেন। নতুন নতুন ফসলের চাষ গড়ে তুলেছেন।[৪৭] কলোনীগুলিতে রাস্তা তৈরী করা, জল নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা

---

৪৩ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার
৪৪ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
৪৫ সন্দীপ সেনগুপ্ত (সাক্ষাৎকার), ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২২৪
৪৬ Datta, pranati, op-cit, page-335
৪৭ অনিল সিংহ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, পৃষ্ঠা ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ও পরিচালনা, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনা- এসবকেও উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। লেখাপড়ার জন্য স্কুল নেই এরকম কোন কলোনি দুর্লভ। সাধারণ মানুষের সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হলে যে কি ঘটনা ঘটতে পারে জবরদখল সমস্ত কলোনিতে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।[৪৮]
ভারতে পাট উৎপাদনে পূর্ববাংলার কৃষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "কৃষক পরিবারগুলি নিজেরাই ঋণের টাকায় জমি কিনে এইসকল জমি উৎসাহ সহকারে চাষ করেছিল। এ অঞ্চলে ডাঙ্গা জমি পাট চাষের বেশ উপযুক্ত। পূর্ববাংলার চাষী পাট চাষে বেশ দক্ষ। অথচ পশ্চিমবাংলায় পাট চাষ বেশী প্রচলিত ছিল না। এরাই এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পাট চাষের প্রবর্তন করেছিল। এভাবে তারা জাতীয় কৃষি ও শিল্পকে বাঙলা বিভাগের পর নূতন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতার পর [পূর্বে] পাট উৎপন্ন হত পূর্ববঙ্গে এবং কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহৃত হত পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর দুই তীরে অবস্থিত পাটকলগুলিতে। বাঙলা বিভাগের পর পাটকলগুলির কাচাঁমাল হিসেবে পাট সংগ্রহ করা এক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছিল। তখন এই নূতন পুনর্বাসনপ্রাপ্ত এই চাষী পরিবারদের উৎপাদিত পাটই তাদের এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছিল। বর্তমানে পাটকলে ব্যবহারের জন্য পাটের চাহিদা সম্পর্কে আমাদের দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে তার প্রধান কারণ পূর্ববঙ্গ হতে বিতাড়িত এই কৃষক পরিবারের উদ্যম।"[৪৯]

বৃহত্তর কলকাতা শহরের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্ম সংস্থান হয়েছিল বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত জণগোষ্ঠীর। কলকাতাই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জমিদার ও বণিক ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র। আর পূর্ববাংলা এবং আশে পাশের অঞ্চলসমূহ ছিল পশ্চাৎভূমি। তেমনই ছিল প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসস্থল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা সারা ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক মঞ্চ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ছিলেন বাঙ্গালী এবং তারা কলকাতাতেই থাকতেন।[৫০] দাঙ্গা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। যদিও ১৯৫০ সালের পূর্বে পূর্ববাংলায় বা ঢাকা জেলার কোথাও বড় ধরনের কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। ১৯৬১-১৯৭৪ সময়কালে ১.১ মিলিয়ন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক দেশত্যাগ করে।[৫১] এসময়কালে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব পরে। ঢাকা জেলা ত্যাগকারী শরণার্থীরা বেশিরভাগ আশ্রয় গ্রহণ করে কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়ায়। তবে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পেশার সঠিক হিসাব জানা যায়নি কারণ তারাই আশ্রয়গ্রহণ করেছে যাদের পরিবারের কোন সদস্য আগের থেকেই পশ্চিম বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করছে অথবা চাকুরি সূত্রে বসবাস করছে।[৫২] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশ থেকে অনেক হিন্দু ও মুসলমান জনগণ দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের মধ্যে হিন্দুদের একটি অংশ ভারতে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।
বিভিন্ন সময়কালে দেশত্যাগের সংখ্যা এবং দেশত্যাগের সম্প্রদায়গত পার্থক্য এবং সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা যায় যে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপত্তাহীনতার কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেনি, এর পেছনে একদিকে সদ্য স্বাধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং অন্যদিকে পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরন যা হিন্দু মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়কে মোকাবেলা করতে হয়েছে, অন্যদিকে ভারতে সংঘটিত অনেক ঘটনা যেমন হায়দেরাবাদে ভারতীয় সরকারের পুলিশী এ্যাকশন, কাশ্মীরে অভিযান ইত্যাদি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

---

[৪৮] অনিল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩
[৪৯] হিনন্ময় বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭
[৫০] আতিউর রহমান, ভাষা আন্দোলনের আর্থ সামাজিক পটভূমি, পৃষ্ঠা ৬১
[৫১] . Sharifa Begum, Population Birth, Death and Growth Rate in Bangladesh, page 87
[৫২] Report on the Sample Servay for the estimating the Socio Economic Characteristics of displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the West Bengal, page 2

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে মুসলমান প্রধান পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বাভাবিকভাবে এক ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তৈরী হয়। যদিও হিন্দু মুসলমান সাধারণ লোকের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল। সে সময়ের পূর্ববাংলার প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতা অন্যদিকে কিছুসংখ্যক লোভী মানুষের ভূমি, সম্পদ ইত্যাদির প্রতি প্রলোভন, কিছুসংখ্যক সরকারী কর্মকর্তার দুর্ব্যবহার ইত্যাদির শিকার হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সৃষ্টি হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ববাংলা ত্যাগ করতে শুরু করে। এই ভীতি ও অনিশ্চয়তাকে আরও বেশী বাড়িয়ে তোলে ভারতীয় সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে ভারতে ডেকে নেয়ার প্রবণতা, বিভিন্নভাবে পূর্ববাংলার হিন্দুদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন ঘটনার অসত্য ও উস্কানিমূলক বক্তব্য পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় প্রচার করে হিন্দুদের মনে ভীতি বাড়িয়ে তাদেরকে দেশত্যাগে প্রভাবিত করা হয়। কারণ পশ্চিমবাংলার কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল পূর্ববাংলার দক্ষ কৃষক, শ্রমিক সহ দক্ষ জনবলের। ভারতীয় সুযোগ সুবিধার প্রলোভন না থাকলে পূর্ববাংলার হিন্দুরা তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো কিন্তু তারা সে প্রতিরোধ গড়ে না তুলে তাদের নিজেদের আবাস ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করাটাই তাদের জন্য যুক্তিযক্ত ও নিরাপদ মনে করেছেন। তারা যে প্রলোভনে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার বেশীর ভাগই হয়তো পূরণ হয়নি, তাদেরকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তবুও অব্যাহত থেকেছে হিন্দুদের দেশত্যাগ। তবে এটা ঠিক যে, ভারতীয়রা পূর্ববাংলা থেকে যত সংখ্যক দেশত্যাগের আশা করেছিল, তার থেকে পূর্ববাংলা ত্যাগের হার ছিল প্রয়োজন ও পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশী, ফলে যারা গিয়েছেন তাদের অধিকাংশ সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়েছেন প্রয়োজনীয় বাসস্থান ও কাঙ্ক্ষিত সুযোগের অভাবে।
প্রবাসী পত্রিকায় হিন্দু বাস্তুত্যগীদেরকে নিজ বাসস্থানেই যেন থাকার চেষ্টা করে তার পরামর্শ প্রদান করে বলা হয়,

> "বহু বাস্তুহারা চতুর রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ী ভাগ্যান্বেষীর পাল্লায় পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে সামান্য শেষ সম্বল তাহাদের হাতে ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে বীরের ন্যায় বাস্তুরক্ষার শেষ চেষ্টা করার প্রচুর মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি।"---
> "বাস্তুত্যাগী দুঃখীর দল রাজনৈতিক দাবাবড়ের ছকে খেলার ঘুঁটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয় দিকের মুষ্টিমেয় কতকগুলি চতুর লোক ইহাদের লইয়া এখনও বড়ের চাল চালিতেছেন। এই অভাগাদের নানা লোকে নানা ফন্দি দিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে যার ফলে তাহাদের দুর্দ্দশার অবসান হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। মাঝখান হইতে একদল প্রতারক মেকী বাস্তুহারা নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে।"[৫৩]

যে সকল ব্যাংকাররা পূর্ববাংলা থেকে তাদের পুঁজি কলকাতায় নিয়ে গিয়েছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের ৫ আগস্ট Statesman পত্রিকার এক প্রবন্ধে লেখে,

> "There is no body to finance trade ; but they also admit that they have diverted funds to Calcutta (so not to have all our eggs in one basket") and that the biggest factor in the decline of trade is the BLOCKADE along the Indian border."[৫৪]

হিন্দু সম্প্রদায়ের ভারতে যাওয়ার আগ্রহের একটি অন্যতম প্রধান কারণ ধর্মীয়। ধর্মীয় পুণ্যস্থানগুলো প্রায় সবই পড়েছে ভারতে। হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাঁ আছে তাই হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবে। সকালে উঠে জলশুদ্ধের মন্ত্র হচ্ছে "গঙ্গেঁচ যমুনে চৈব গোদাবরি, স্বরস্বতি, নর্ম্মদে, সিন্ধু কাবেরী জনেহস্মিন সলিধিং কুরু"।[৫৫]

---

[৫৩] প্রবাসী, ৫০শ ভাগ, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ্য-১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯
[৫৪] Home, Political (C.R), B Proceedings, vol. 4, File No. B 1949/ 242-248, Page 99
[৫৫] সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ রিপোর্ট, ৩য় অধিবেশন ১৯৪৯, ১৬ মার্চ ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১৪৩

ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিচারে সে সময় ভাল মুসলমান শিক্ষক যে সত্যিই অপ্রতুল ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী বঙ্গীয় শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং হাকিম বলতে অবশ্যই মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মানুষই ছিল। দেশভাগের পর তারা যখন পূর্ববাংলার মাটি ছেড়ে সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে পশ্চিমবাংলায় পাড়ি দেন। এরা উদ্বাস্তু হয়ে সেখানে যাননি। এদের পশ্চিমবাংলায় কিছু সহায় সম্বল ছিল, তাদের ব্যবস্থা সেখানে করাই ছিল।[৫৬] তাদের অনুপস্থিতিতে পূর্ববাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, কোর্টকাচারী, অফিস আদালতে এক ব্যাপক শুন্যতার সৃষ্টি হয়।--ভূমিলোভি যারা, তারা হয়তো কিছু তাৎক্ষণিক লাভের আশায় হিন্দুদের বিতাড়িত করতে উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপক মুসলমান সমাজ অন্তত সে সময়ে এ দেশত্যাগ চাননি।[৫৭] পূর্ববাংলার সাধারণ সমাজ, হিন্দু, মুসলমান এদের উপর বড়ই নির্ভরশীল ছিল। এরা দেশ ছাড়লে তাদের স্থায়িত্ব অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।[৫৮]

পূর্ববাংলা সরকারের অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল, কলকাতার তুলনায় ঢাকা একটি মফস্বল শহর মাত্র, সমাজ ব্যবস্থা অনুন্নত, নিরাপত্তাহীনতা এগুলো হচ্ছে দেশত্যাগের কারণ হিসেবে অন্য দেশে ঠেলে দেয়া আর সুবিধাজনক দেশে বা স্থানে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতির ফল লাভ, উন্নত সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় দেশত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে অন্য দেশের পক্ষ থেকে টেনে নেয়া। পূর্ববাংলার বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ববাংলা ত্যাগ করেছেন, (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অধিকাংশ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী স্বীকার করেছেন ভারতে বেশি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির কারণে ভারতে স্থায়ীভাবে বাসস্থান গড়ে তুলেছেন) আর মুসলমানরা পূর্ববাংলায় অবস্থান করেই তাদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, অধিকার আদায় করেছে এবং তার চূড়ান্ত ফলশ্রুতিই হচ্ছে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। ঢাকা জেলাসহ অন্যান্য হিন্দুদের দেশত্যাগের পেছনে ঠেলে দেয়া কারণগুলোর পাশাপাশি টেনে নেয়ার কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

[৫৬] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৭
[৫৭] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৪- ১৬৫
[৫৮] মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

পরিশিষ্ট ১

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ কতিপয় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর ১৯৫৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি **"পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০"** বিলটি পাশ করে। এবং ১০ মে ১৯৫১ তারিখে গভর্নর জেনারেল বিলে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই আইন কার্যকর করার মাধ্যমে সকল জমিদারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ করা হয় এবং জমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আইনে ভূমি ব্যাবস্থাপনা আইনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনগুলো হল

১. সরকার খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করে। সরকার খাজনা আদয়ের অধিকার অর্জনের পর জমিদারদের প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত হয়।

২. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের ফলে জমিদারগণ সংশ্লিষ্ঠ ভূমির ওপর মালিকানা স্বত্ব হারায় এবং সে ভূমিতে সরকারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. এ আইন প্রবর্তনের পূর্বে খাজনা গ্রহিতা হিসেবে যে অধিকার জমিদারদের উপর অর্পিত ছিল, এ আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে উক্ত অধিকার সরকারের উপর বর্তায়। অর্থাৎ আইন কার্যকর হওয়ার পর পর সরকার সরাসরি খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করে।

৪. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ঠ জমিতে রায়তি স্বত্ত্ব অর্জন করতে হলে সরকারকে যথাযথ ও ন্যায়সংঙ্গত খাজনা প্রদানে রায়ত বাধ্য থাকবে।

৫. জমিদারদের অধীনে যে সমস্ত চাকরান ও নানকার প্রজা ছিল তারাও কতগুলো শর্ত সাপেক্ষেতাদের ভোগ দখলী জমিতে রায়তি স্বত্ত্ব অর্জন করে।

৬. সরকারের খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জনের পর জমিদার ও অন্যান্য খাজনা গ্রহিতাগণ ক্ষতিপূরণের তালিকা মোতাবেক সরকারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার অর্জন করে।

৭. একইভাবে তারা তাদের উদ্বৃত্ত খাস জমি আইনত নিজ নামে রাখার অধিকার অর্জন করে। তার জন্য তারা সরকারকে নির্ধারিত খাজনা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

৮. সকল জমিদার ও মধ্যস্বত্ত্বভোগী রায়তের অভিহিত হন। অর্থাৎ তারা সকলেই সরকারের অধীনে প্রজা বলে গন্য হন।

৯. এ আইনের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমান খাস জমি ব্যতীত উদ্বৃত্ত সরকারী খাস জমি সরকারের ওপর দায়মুক্ত অবস্থায় বর্তায়।

১০. করমুক্ত ও নিস্কর জোত খাজনার আওতায় আনা হয়। সরকার এ জোত জমার ন্যয়সংগত খাজনা নির্ধারণ করে দেন।

১১. রায়তের অধীনের রায়তগণ অর্থাৎ বর্গাদারদের রায়তের মর্জাদায় উন্নীত করা হয়।

১২. জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য যে সমস্ত কাছারি বাড়ি ছিল তাও সরকারের অধীনে নেয়া হয়।

১৩. কোন স্বত্বাধিকারীর জমির অভ্যন্তরে কোন খনিজ পদার্থ থাকলে তা সরকারের।

১৪. একইভাবে হাট বাজার, ফেরীঘাট, মৎসক্ষেত্র ও বন সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের ওপর বর্তায়।

১৫. রায়ত তার জোত জমার অর্ন্তভূক্ত জমি ৮৩ ধারা মতে তার ইচ্ছানুযায়ী দখলে রাখতে এবং ব্যবহার করতে পারবে। জমির মালিক, রায়ত মারা গেলে তার জমিজমা তার ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনের নিয়মানুযায়ী উত্তরাধিকারের ওপর বর্তায়। তার উত্তরাধিকারীর ওপর সে জমির স্বত্ব থাকিবে। উত্তরাধিকারী না থাকিলে মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর বর্তিবে।

১৬. রায়তগণ সংশ্লিষ্ঠ জমি হস্তান্তর করার অধিকার অর্জন করে।

১৭. কোন রায়ত যদি তার জোত জমা উইল না করে উত্তরাধিকার বিহীন অবস্থায় মারা যায় অথবা খাজনা পরিশোধ ও চাষাবাদের ব্যবস্থা না করে অন্যত্র চলে যায় বা একাদিক্রমে ৫ বৎসর জমিজমা চাষাবাদের ব্যবস্থা না করেন তাহলে তার রায়তি স্বত্ব বিলোপ হয়ে যাবে। রায়ত যদি ইজারা বা বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রজা সৃষ্টি করে তবে সে জমিতে তার স্বত্ত্ব লোপ পাবে। এ রকম স্বত্ত্ববিহীন জমিতে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নোটিশ ও রায় প্রদান করে দখল নিবে। [ধারা ৯২-৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২

১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন ভূমি আইন

The East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act, Act XIII of 1948
The East Bengal Avacuees Administation of Property Act, Act VIII of 1949
The East Bengal Avacuees (Restoration oF Pssession) Act, Act XXIII of 1951
The East Bengal Avacuees (Administation of Immovable Property) Act, Act XXIV of 1951
The East Bengal Prevention of transfer of Property and Removal of Documents and Records Act of 1952
Act XXXIX 1954
The Avacuees Administation of Immovable of Property (Amendent) Act, Act 1 of of 1955
The Pakistan Administation of Avacuees Property Act, Act XII of 1957
The Ordinance XXVIII OF 1960
The East Pakistan Distured Persions (Rehabilitation) Ordinance No. 1 of 1964
The Defence of Pakistan Ordinance No. XXIII of 1965
The Enemy Property (Custody and Resistration) Order of 1965
Rule 119 Under the Defence of Ordinance 1965: Requisition of Property
The East Pakistan Enemy Property (Lands and Buldings) Administation and Disposal Order of 1966

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৩

পূর্ববাংলার সরকার ও মুসলমান বিরোধী লিফলেট

হিন্দু! জাগ্রহি!!

দিন আগত ঐঃ—হিন্দু! আত্মবোধে সচেতন হউন!
আর যেন কোন হিন্দু আত্মঘাতী বুদ্ধি ও কৃতঘ্নতা এই দুই মহাপাপ
পরিত্যাগে দ্বিধা না করেন।

প্রতিবেশী হিন্দুর অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগও স্বজাতি প্রেম যদিও স্বধর্ম্মী হিন্দুনারী ও শিশুদের উপর রমজান পর্ব্ব উপলক্ষে মুশলমান কর্তৃক কাফের জ্ঞানে পাশবিক ও অমানুষিক অতর্কিত অত্যাচারের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি তাহাদের সেই দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ যতটুকু প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার জন্য সর্ব্বদাই আমরা হিন্দু ভায়েরা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুরা যেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অনন্ত শক্তিরূপিনী জগন্মাতার কাছে শক্তিভিক্ষা করিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হই,—আমরা যে এতকাল ধরিয়া আত্মঘাতী বুদ্ধি এবং কৃতঘ্নতা ও আত্মাবমাননা করিয়া আসিয়াছি——যে পাপের হিন্দু শাস্ত্র মতে কোন প্রায়াশ্চিত্তই নাই——সেই মহাপাপের যতটুকু হয় ততটুকু প্রায়শ্চিত্তের জন্ত আমরা এই বিষয়গুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালান করিয়া চলিব :—

(১ম) অত্যাচারী বিধর্ম্মী মুশলমানের বিরুদ্ধে সহস্র গুণে প্রতিশোধ গ্রহণ। অত্যাচারীর সর্ব্ব বিষয়ে জীবিকা ও বসবাসের পথ রুদ্ধ করা ও সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সহিত অসহযোগ।

(২য়) যাহারা এই জন্মভূমি পবিত্র হিন্দুস্থানকে তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে চান না, তাহারা আমাদের শত্রুস্থানীয়, সুতরাং তাহাদের কাছে সামান্য সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও বাসের জন্য বিক্রয় বা উপভোগ করিতে দিবার সময় আমরা যেন ভুলিয়া না যাই——সেই ভূমি দেওয়ার অর্থ নিজ গর্ভধারিণী জননীকে এবং কন্যা ও ভার্য্যাকে বিক্রয় ও উপভোগ করিতে দেওয়া।

(৩য়) মুশলমান জাতীয় কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না, তাহাদের কোন প্রকার যানবাহন ব্যবহার বা পণ্যদ্রব্য ক্রয় এমনকি কোন প্রকার সাংসারিক প্রয়োজনে তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, বিশেষ করিয়া অন্দরমহলের ও ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখা প্রভৃতি বিষয়ে সাবধানতাসহ সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(৪র্থ) যাহারা হিন্দুর জমিতে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ, হিন্দুনারীর সতীত্বনাশ, হিন্দুদের দেবীর মন্দির ধ্বংস ও কলুষিত করা এবং হিন্দুর আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধাপ্রদানকে নিজেদের ধর্ম্মপালন করা মনে করে এবং ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রতিপালন উপলক্ষে আমাদের মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর যোনিদ্বার ও গুহ্যদ্বার তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা এক করিয়া এবং যে মায়েদের স্তনের দুগ্ধ পান করিয়া আমরা হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করি সেই স্তন কাটিয়া দিয়া যাহারা পশুত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ধর্ম্মপালন করিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, সেই শত্রুদের ছদ্ম মিষ্ট ব্যবহারে ভুলিয়াও যেন কোন সম্বন্ধ স্থাপন না করি এবং এই নৃশংসতার বার্থা কোন অজুহাতেই যেন না ভুলিয়া আমরণ স্মরণে রাখি।

(৫ম) যে মুশলমানের দল ৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে এবং ৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টে হিন্দু নির্য্যাতন করিয়া তাহাদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, তাহারা যে আমাদের চির শত্রু এবিষয়ে সর্ব্বদাই আমাদের চেতন থাকিতে হইবে এবং একজন হিন্দু জীবিত থাকিতেও কোন হিন্দু যেন তাহাদের কীর্ত্তি কলাপ ভুলিয়াও ক্ষমা না করে।

Dhaka University Institutional Repository

2)

(৬ষ্ঠ) মনে রাখিবেন পারিলে আমরা যেন আমাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থের একটি কানাকড়িও আমাদে
শত্রুকে দিয়া তাহার জীবনধারণে সহায়তা না করি কারণ তাহারা সজীব হইয়া আমাদের মা'বোনদের ধর্ষণ করিবে
সুতরাং মা'বোনদের ধর্ষণে সহায়তা করা নপুংসক ভিন্ন অন্য রক্তমাংসের শরীর ধারী কোন মানুষের কর্ত্তব্য নহে।

(৭ম) মুশলমানেরা বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, দুভিক্ষভাণ্ডার প্রভৃতি জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠা
চাঁদা না দিয়াও এমনকি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কোন অংশ ক্রয় না করিয়াও সরকারী সহায়তাও আমাদের আত্মঘা
অতি উদারতার সুযোগ লইয়া অন্যায় ভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত চক্ষু দেখাইয়া আমাদের অপেক্ষা অ
সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং ত্রুটি হইলে যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া যাইতেছে ইহা স্মরণ রাখিবেন।

এক্ষণে ১৬ই আগষ্টের বীভৎস অত্যাচারের পরও কি আমাদের জ্ঞান হইবে না? চক্ষু ফুটিবেনা? ইহা হ
কায্যতঃ জিন্না বলিয়াছে দানকালে নিজ স্বধর্ম্মী ভিন্ন কোন বিধর্ম্মীকে মৃতপ্রায় দেখিলেও তা
দেওয়া দানের একটি কানাকড়িও যেন তাহার জন্য ব্যয়িত না হয়। এই আদর্শে দান করিয়া যে-আদর্শ তাহার স্বধর্ম্মী
সে শিক্ষা দিয়াছে এই একই আদর্শে দান করিয়া আমাদের হিন্দুদানবীরগণ ও অনুন্নত হিন্দু দরিদ্রহিন্দুর প্র
মুক্তহস্ত হউন এবং হিন্দুর সাহায্য হইতে মুশলমানদের বঞ্চিত করুন। তাহাতে অনেক হিন্দু বালক বালিকা ও ত
তরুণীরা মুশলমানদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে——দানে নাম কম হইলেও ধর্ম্ম কম হইবে ন
দেহত্যাগের পর আত্মার সদ্‌গতিতে কোন প্রকার বাধা আসিবে না।

(৮ম) মুশলমানেরা যত বড় শত্রু হউক না কেন, তাহাপেক্ষা বেশী শত্রু ধর্ম্মত্যাগী কালাপাহাড়ী
তাহাপেক্ষা আরও বেশী শত্রু যাহারা স্বধর্ম্মে থাকিয়াও বিধর্ম্মী শত্রুকে সহায়তা করে—সেই বিভীষন দিগকে
কখনও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না ভুলি।

(৯ম) হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্নও অন্য যাহারা হিন্দুস্থানকেই তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া আন্তরিক ভাবে মানি
লন এবং সেই মত সেবা করেন তাহারা বিধর্ম্মী হইলেও ভ্রাতৃতুল্য ব্যবহার পাইবার যোগ্য।

(১০ম) বিধর্ম্মী যবনদের মধ্যেও যদি কেহ অনুতপ্ত হইয়া আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাদের আ
শুদ্ধি প্রাপ্ত হিন্দুভ্রাতা বলিয়া যেন জ্ঞান করি।

(১১শ) যাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিম্বা ক্ষুদ্রদলগত স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে দেশের এবং দশের বৃহ
স্বার্থকে বলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না এবং আমাদের এই মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা নষ্ট করিতেও ইতস্ততঃ করে
তাহারা আমাদের মাতৃঘাতী পরম শত্রু। তাহাদের চিনিয়া রাখা দরকার এবং অবিলম্বে তাহাদের সেই অপক
হইতে যাহাতে চিরকালের মত ইহ জগত অথবা ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

"বন্দেমাতরম্"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া অপর হিন্দুকে উপলব্ধি করাইয়া পাঠের পর নষ্ট না করিয়া
অপরকে পড়িতে দিবেন।

সূত্রঃ Home, Political (CR) Vol. 59, GOEB

Dhaka University Institutional Repository

১৭.১.১৯৬৪

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘর-বাড়ী পোড়ান হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে। এমন কি জনাব আমীর হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাহাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রী নিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুণ্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি: আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

মনে রাখিবেন, আজ ঢাকা শহরে যে জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইতেছে উহা আমাদের নিজেদের সম্পত্তি এবং নিজেদের ভাই-বোনদের জীবন। এই গুরুতর ক্ষতি পূর্ব বঙ্গেরই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর গুরুতর আঘাত হানিবে। আরও মনে রাখিবেন, সীমান্তের অপর পারে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে উহাকে মূলধন করিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর দুর্বৃত্ত সারা প্রদেশে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া লুণ্ঠন ও অন্যান্য উপায়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চক্রান্তে মাতিয়াছে। ইহাদিগকে একটি বিশেষ কায়েমী স্বার্থবাদী মহল হইতে প্ররোচনা ও সাহায্য দেওয়া হইতেছে। সর্বশক্তি দ্বারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই দুষমনদের আজ রুখিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এই ঘাতক শ্রেণীর ছুরি আমাদের সকলের জীবন ও সম্পত্তির উপর উদ্যত হইবে। আমাদের চোখের সম্মুখে আমাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হইবে, পূর্ব বঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে, পূর্ব বঙ্গের মানুষ নিজগৃহে পরবাসী হইবে।

পূর্ব বাংলার জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমরা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি।

- ❋ **প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন।**
- ❋ **গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন।**
- ❋ **পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন।**

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি,
পূর্ব পাকিস্তান।

CC

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৫

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কারণের শতকরা হার ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসনের শতকরা হার ১৯৪৬-১৯৭০

Table 3.1. *Reasons why refugees fled from East Bengal, 1946–1970*

(figures in lakhs (100,000s))

Year	Reasons for influx	Totals	Into West Bengal	Into other states
1946	Noakhali riots	0.19	0.14	0.05
1947	Partition	3.44	2.58	0.86
1948	'Police action' by India in Hyderabad	7.86	5.90	1.96
1949	Communal riots in Khulna and Barisal	2.13	1.82	0.31
1950	Ditto	15.75	11.82	3.93
1951	Kashmir agitation	1.87	1.40	0.47
1952	Worsening of economic conditions; persecution of minorities; passports scare	2.27	1.52	0.75
1953	———	0.76	0.61	0.15
1954	———	1.18	1.04	0.14
1955	Unrest over declaration of Urdu as *lingua franca*	2.40	2.12	0.28
1956	Adoption of Islamic constitution by Pakistan	3.20	2.47	0.73
1957	———	0.11	0.09	0.02
1958	———	0.01	0.01	—
1959	———	0.10	0.09	0.01
1960	———	0.10	0.09	0.01
1961	———	0.11	0.10	0.01
1962	———	0.14	0.13	0.01
1963	———	0.16	0.14	0.02
1964	Riots over Hazratbal incident	6.93	4.19	2.74
1965	———	1.08	0.81	0.27
1966	———	0.08	0.04	0.04
1967	———	0.24	0.05	0.19
1968	———	0.12	0.04	0.08
1969	———	0.10	0.04	0.06
1970	Economic distress and coming elections	2.50	2.32	0.18
TOTALS		52.83	39.56	13.27

Source: P. N. Luthra, *Rehabilitation*, Publications Division, New Delhi, 1972, pp. 18–19.

পরিশিষ্ট ৬

ভারতে হিন্দু শরণার্থীদের আয় ভিত্তিক তালিকা ও সরকারী সাহায্য

Break-up of the total number of families according to suitable income groups (as per the sample survey)

Type and number of colonies	No. of families having no income	No of families having Income upto Rs. 200 p.m.	No. of families having income from Rs. 201 to Rs. 250 p.m.	No. of families having income from Rs. 251 to Rs. 350 p.m.	No. of families having income from Rs. 351 to Rs. 500 p.m.	No. of families having income above Rs. 500 p.m.	Total No. of families in 25 surveyed colonies
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(a) Government-sponsored colonies (19) :							
Urban ...	17	378	82	74	57	42	650
Rural (ST) ...	5	117	9	5	7	7	150
Rural (Agri) ...	2	139	6	2	1	nil	150
Total	24	634	97	81	65	49	950
(b) Squatters' colonies (6) :							
Urban ...	3	156	20	16	9	2	206
Rural ..	4	80	3	8	3	2	100
Total ...	7	236	23	24	12	4	306
Grand total of (a) & (b) : ...	31 (2.46%)	870 (69.30%)	120 (9.55%)	105 (8.36%)	77 (6.12%)	53 (4.21%)	1256 (100%)

পরিশিষ্ট ৭

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির জেলাভিত্তিক অবস্থান

জেলা	জবর-দখল কলোনি সংখ্যা				সরকারী কলোনি সংখ্যা	প্রাইভেট কলোনি সংখ্যা	মোট কলোনি সংখ্যা
	অনুমোদিত	৬০৭ গ্রুপ	১৭৫ গ্রুপ	১৪৯ গ্রুপ			
কলকাতা	১১	১৩	১০	৬২	–	–	৯৬
উত্তর ২৪ পরগণা	১৩৮	১১০	৮৬	৮৫	২৭২	৫০	৭৪১
দক্ষিণ ২৪পরগণা	৪৪	৩৭	১৫	–	৬৮	১৩	১৭৭
নদীয়া	৩৭	৬৫	১০	–	৬০	৪৭	২১৯
মুর্শিদাবাদ	–	১৩	০১		২৭	১৫	৫৬
হাওড়া	২৯	৩১	৩১		২৩	১২	১২৬
হুগলী	১১২	৩৮	০৯		৬৩	১৯	২৪১
বর্ধমান	৪৮	৬৬	০৫		২৯	৪২	১৯০
মেদিনীপুর	১৭	০৯			৫৪	০৩	৮৩
বাঁকুড়া	০৯	২৯			০৩		৪১
বীরভূম	৪৭	২২	০৭		১৯	০১	৯৬
দার্জিলিং	৭৬	১৭			০৪		৯৭
জলপাইগুড়ি	৯৮	৩৯			১৪	১৮	১৬৯
কুচবিহার	১৭	২৬			১৬	২৬	৮৫
মালদহ	১২৮	৩৮			১৫	৪২	২২৩
উত্তর দিনাজপুর	১৪৭		১		১২	১২	১৭২
দক্ষিণ দিনাজপুর	৪০	৫২					৯২
মোট সংখ্যা	৯৯৮	৬০৫	১৭৪	১৪৭	৬৭৯	২৯৯	২৯০৪

সূত্রঃ অনিল সিংহ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৭৫

পরিশিষ্ট ৮

পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের ঢাকায় অবস্থানকারী আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাবলী ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ

"সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা ১৯৪৭-৭১" বিষয়ের গবেষণাকর্মের প্রয়োজনে আমাকে বৃহত্তর ঢাকা জেলার দেশত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে কিছু বিষয়ে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই আমি আপনার নিকট নিম্নের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর কামনা করছি।

নাম : পেশা :
পিতার নাম পেশা :
বয়স
বর্তমান ঠিকানা
স্থায়ী ঠিকানা
আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?
ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
তার বর্তমান পেশা কি?
তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
তিনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সমপত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েলিন?
হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা?
ভারতে অবস্থানকারী আত্মীয়ের ঠিকানা (সম্ভব হলে) বলুন
আপনি ভারতে যান নাই কেন?

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ১

ঢাকা শহরের রায়ের বাজারের পুল পাড় এর বাসিন্দা গদাধর পাল। বয়স ৬৫/৬৬, পেশায় স্বর্ণকার। তার পিতা মৃত অমৃতলাল পাল ছিলেন কুমার। তারা বংশ পরম্পরায় মাটির কাজই করতেন। আত্মীয় স্বজনরাও মাটির কাজ করতেন। রায়ের বাজারের হিন্দুদের অধিকাংশই মাটির কাজ করতেন। এ অঞ্চলের কোন লোকই ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার পূর্বে দেশত্যাগ করেনি। তবে দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেশত্যাগ করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। তিনি মনে করেন যে সেখানে তারা ভারতে ভাল সুযোগ সুবিধা পেয়েছে বলে চলে গিয়েছে। ভারত সরকার মাইগ্রেশন দেয়াতে তারা চলে গিয়েছেন। তার বাবাও চলে যাওয়ার জন্য পৈতৃক বাড়ি বিক্রয় করে টাকা যোগার করেছিলেন। যেদিন যাবেন বলে স্থির হয়েছিল সে রাত্রে সে টাকাসহ বাক্স চুরি হয়ে যায় বলে তিনি আর যেতে পারেননি।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তার চাচা, মামারা সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ভারতে চলে গিয়েছেন। তবে তারা দেশত্যাগ করার সময় কিছু বলে যাননি, গোপনে তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিয়ে চলে গিয়েছেন। তিনি মামাদের কাছ থেকে নানার রেখে যাওয়া সম্পত্তি কিনতে চাইলে তার কাছে বিক্রয় না করে গোপনে অন্য লোকের কাছে বিক্রয় করে চলে যান। তারা কেন গিয়েছেন সে সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে বলেন যে, দাঙ্গার সময় দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করে সেখানকার ইট ভাটার শ্রমিকরা আর তাদের সহযোগিতা করে মোহাম্মদপুরে আশ্রয়গ্রহণকারী ভারত থেকে আগত বিহারীরা। প্রথম দাঙ্গা শুরু হয় মোহাম্মদপুরের বাশঁবাড়ি এলাকায়, পরে তা রায়ের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।
তাদের কোন মেয়েদের নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি।

কেস স্টাডি ২

নিতাইচন্দ্র বিশ্বাস, ঢাকার মোহাম্মদপুরে বাঁশবাড়ি রোডে বসবাসকারী হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। বয়স প্রায় ৮০। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। তিনি বাংদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। তার পৈত্রিক নিবাস জয়দেবপুর থানার পলাশোনা গ্রামে। তার পিতা মৃত দেবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস পেশায় ছিলেন কৃষিজীবী ও স্বর্ণকার।
তার মামারা, বোন, দুই পিশি ভারতে চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তার বোন ও পিশিদের শ্বশুড়বাড়ি ছিল টঙ্গী থানার ভাদাম গ্রামে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় এ গ্রামে অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার বোন ও পিশিদের বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। তার বোন ও এক পিশি জলপাইগুড়িতে ও আরেক পিশি দন্ডকারণ্যে চলে যায়। তার বোনের স্বামী প্লাম্বার মিস্ত্রী ছিল। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় তিনি অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন।
তার মামার বাড়ি ছিল ধামরাই থানার চুন্না গ্রামে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তারা ভারতের আসামে চলে যায়। তারা যাওয়ার সময় তাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে যান। তার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কেউ বাংলাদেশে নেই। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কেউ ভারতে যায়নি।
তার মতে ১৯৫০সালের দাঙ্গার সময় সরকার ঠিকমত প্রটেকশন দিতে পারেনি তবে তখন লোক কম মারা গিয়েছে কিন্তু সম্পত্তি দখল ও লুটপাট হয়েছে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় লোক বেশী মারা গিয়েছে। ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের পাশাপাশি পূর্ববাংলার কিছু লোকও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিল। দাঙ্গার সময় গরীব হিন্দু লোকেরাই বেশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কারণ ধনীদের কলকাতায় বিষয় সম্পত্তি ছিল বলে তারা আগেই চলে গিয়েছিল। এ

অঞ্চলের বর্ণ হিন্দুরা মুসলমান ও তফসীলিদের ঘৃণা ও অত্যাচার করত। যার ফলে পরবর্তীতে মুসলমানদের অনেকে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুর ওপর অত্যাচার করত। জমিদারদের বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি ছিল কলকাতায়, সেখানকার আরাম আয়েশ ছেড়ে এখানে থাকেনি। তারাই প্রথমে পরিবার পরিজন সহ দেশত্যাগ করে চলে যায়। তফসীলি সম্প্রদায় পরবর্তীতে নিজেদের নিরাপত্তাহীন ভেবে চলে যায়। অনেক হিন্দু লোক তাদের জমি দুই তিনজনের কাছেও বিক্রয় করেছে। হয়তো তারা বিক্রয়ের সময় ন্যায্য দাম পেত না বলেই এটা করেছে।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে তিনি জানান যে, এ সময় আদমজী জুট মিল থেকে দাঙ্গা শুরু হয়ে পরে ঢাকা শহর সহ আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিল্প এলাকাগুলোতে দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ শিল্প এলাকাগুলোতে ভারত থেকে আগত বিহারী শরনার্থীরা বেশী ছিল। বাঙ্গালী বিহারী সম্পর্কের অবনতি ঘটে। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে বিহারীদের সাথে অনেক বাঙ্গালীও অংশগ্রহণ করে। রায়েরবাজার থেকে কাসিমপুর পর্যন্ত প্রায় ১৫০ টি হিন্দু প্রধান গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। শুধু বাঁশবাড়ি গ্রাম বাদে। এখানে দুইজনকে চাকু মারা হলে একজন মারা যায়। রায়েরবাজরে মারা যায় ১১ জন। অন্যান্য এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আহত ও নিহত হয়।

তিনি জানান যে, ১৯৫০ সালে তাদের পলাসোনা গ্রামে কেন দাঙ্গা হয়নি বলে তার বাবা দেশত্যাগ করেন নি। আর ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তিনি সরকারী চাকুরী করতেন এবং বাস করতেন মোহাম্মদপুরের বাঁশবাড়িতে। এ সময় বাঁশবাড়িতে তেমন কোন সমস্যা হয়নি বলে তিনি চলে যাননি। সে সময় তার বাবা বেচে ছিলেন না। তার এলাকায় তার কোন সমস্যা হয়নি। তার বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনরা তার সাথে কোনরকম অসৌজন্যমূলক আচরন করেননি। তাই তিনি দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তাও করেননি।

কেস স্টাডি ৩

মনির চন্দ্র পাল, পিতা- স্বর্গীয় লক্ষণ চন্দ্র পাল, ঠিকানা- গ্রাম: বেলুড়, থানা সোনারগাঁও। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। বয়স-৮০

তার বড় ভাই, শ্বশুড়, মামা এবং আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে বড় ভাই, মামার ছেলেরা গিয়েছে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর এবং শ্বশুড়ের ছেলেরা পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে তারা তাদের বাবাকে নিয়ে গিয়েছে।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় মামাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারা তাদের মুসলমান বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে সুযোগমত চলে যায়। তাদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হলে তার বড় ভাই দেশত্যাগ করে। তিনি সরকারী চাকুরি করতেন বলে যেতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কোন আত্মীয় কলকাতায় ছিল না।

বড় ভাই তার সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই। বর্গাদাররা সেগুলো দখল করে নেয়। মামারা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা তাদের সম্পত্তি কম দামে বিক্রয় করে গিয়েছেন। কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই।

তার মতে দাঙ্গার কারণে নিরাপত্তার অভাব বোধ এবং সুবিচার পাওয়ার আশা ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় ভয়ে তারা ইনভেস্ট করেনি। বেকার সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা ছিল। অনেকে চাকুরি না পেয়ে চলে গিয়েছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ফিরে আসেন।

কেস স্টাডি ৪

চিনু রানী, পিতা- সুধাংশ মুখার্জী। শ্বশুড়- হরিপদ চক্রবর্তী, ঠিকানা-১১২ ঠাকুর দাস লেন, বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা। তার বয়স ৫৫/৫৬।

তিনি জানান যে তার কাকা শ্বশুড় ভারতে চলে গিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া করতে গিয়েছিলেন আর আসেননি। তিনি তার সম্পত্তি তার মায়ের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।

তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই।

তার মতে যার যখন ইচ্ছে হয় চলে যায়।

কেস স্টাডি ৫

সীমা পোদ্দার, পিতা- ব্রজগোবিন্দ দত্ত, শ্বশুড়- জগন্নাথ পোদ্দার, ঠিকানা- ৭ নং ঠাকুরদাস লেন, বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা। তার পাঁচ কাকা, দুই মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধর সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে তার বড় বোনের বিয়ে হয়, সে আর ফিরে আসে নাই। তার কাকা ও মামারা ভারতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে চলে গিয়েছে। সঠিক সাল তার মনে নেই তবে তা পাকিস্তান আমলে।

তাদের তেমন কোন সম্পত্তি ছিল না, দোকান ছিল, দোকান বিক্রয় করে চলে গিয়েছে।

কেস স্টাডি ৬

পরিক্ষীত সাহা, পিতা- প্রাণবল্লভ সাহা, ঠিকানা- ৭ নং ঠাকুরদাস লেন, বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা। পেশা- ব্যবসা। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম আমতা, থানা ধামরাই

তিনি জানান যে, তার চার মামা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন তারা আর ফিরে আসেন নাই। তার কাকাত ভাইয়েরা কলকাতায় ব্যবসা করতেন, পরে তার কাকা ছেলেদের কাছে চলে যান। তারা কেউই কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।

তার কাকাত ভাইয়েরা যাওয়ার সময় কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে যান আর কিছু সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে। তার পরিবারের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। তিনি মনে করেন পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে যান। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য ভারতে যান। তিনি ময়মনসিংহ এলাকায় যুদ্ধ করেন।

কেস স্টাডি ৭

গণেশ চন্দ্র চৌধুরী, পিতা-মৃত শতীষচন্দ্র চৌধুরী, ঠিকানা- ৩ নং বানিয়ানগর, নারিন্দা, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম চুরাইন, থানা- নবাবগঞ্জ, জেলা- ঢাকা। বয়স- ৯৫। তিনি প্রথম জীবনে চাকুরী করতেন। তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি তার এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি তার এলাকায় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দাঙ্গার সময় শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তার ইউনিয়নে বা তার আশেপাশে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। তিনি জানান যে তার দূর সর্ম্পকের কিছু আত্নীয় স্বজন দেশত্যাগ করেছেন তবে তার ঘনিষ্ঠ কেউ দেশ ছেড়ে যায়নি। যারা গিয়েছেন তারা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যেই দেশত্যাগ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কেউ কেউ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কেউ ভয়ে দেশত্যাগ করেছেন আবার কেউ কলকাতায় চাকুরী করতেন।

হিন্দুদের দেশত্যাগ সম্পর্কে তার ধারণা যে, একটি দেশের সামগ্রিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যারা বাম রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের বেশির ভাগই দেশ ছেড়ে চলে যায়। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন। তিনি নিজেও বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অনেকবার হয়রানির শিকার হয়েছেন। তার বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কিরণশংকর রায়, জ্যোতি বসু, গোপাল বসাক, অতুল গাঙ্গুলী, ধীরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ।
তার কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। যারা চলে গিয়েছেন তাদের সম্পত্তি তারা বিক্রয় করে গিয়েছেন কিছু রয়েছে যা তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোগ করছেন।

কেস স্টাডি ৮

নিরোদ চন্দ্র নন্দী, পিতা- বিনোদ চন্দ্র নন্দী। তিনি দোহার থানার শিমুলিয়া গ্রামের ‘কবি নজরুল উচ্চ বলিকা বিদ্যালয়’ এর প্রধান শিক্ষক। স্থায়ী ঠিকানা-১৩১/১ গঙ্গাধরপট্টি, ঝিটকা, মানিকগঞ্জ। তার এক কাকা ১৯৭১ সালের পরপরই ভারতে চলে যান। কিন্তু তিনি কেন গিয়েছেন তা তার জানা নেই। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তিনি কৃষি কাজ করতেন। ভারতে গিয়েও কৃষি কাজই করতেন। হিন্দুদের দেশত্যাগের সর্ম্পকে তার ধারণা যে, যারা যায় তারা মনে করে যে, ভারতে গিয়ে তারা নিরাপদে থাকবে।
কাকার সম্পত্তি তাদের কাছে বিক্রয় করে গিয়েছেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।

কেস স্টাডি ৯

মনতোষ ভৌমিক, পিতা- ডাঃ উপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক। তিনি দোহার থানার শিমুলিয়া গ্রামের ‘কবি নজরুল উচ্চ বলিকা বিদ্যালয়’ এর সহকারী শিক্ষক। তার স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম- মরিচট্যাক, থানা-সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ। বয়স ৬০।
তিনি জানান যে, তার কাকা, মামা, মাসী, পিসি সবাই স্থায়ীভাবে ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় চাকুরী করতেন। পরে তারা আর ফিরে আসেন নাই। তার দুই ভাই চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পর ভারতে চলে গিয়েছেন।
তারা তাদের সম্পত্তি ভাইদের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন।
তাদের গ্রামে কোন মুসলমান নেই তাই তাদের গ্রামে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়নি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সর্ম্পকে তিনি মনে করেন যে, এখানে যারা উচ্চ শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী তারা তাদের মান সম্মান বজায় রাখতে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগ করে চলে যান। দেশ বিভাগের পর তাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার জন্যই চলে গিয়েছেন।
অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।

কেস স্টাডি ১০

গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোদত, পিতা-বীরেন্দ্র চন্দ্র মোদত, ঠিকানা:- গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোষ্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার। বয়স ৬০। তিনি চাউলের ব্যবসা করেন। তার এক জ্যাঠা পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরপরই ভারতে চলে যান। তিনি বাজারে দোকারদারী করতেন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই চলে যান। সে সময় কোন গন্ডোগোল ছিল না। তিনি কোনরকম নির্যাতনের শিকার হন নাই। পরিবেশ শান্ত ছিল।

তিনি যখন চলে যান তখন তার বাবা জীবিত ছিলেন বলে তার কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না।

তার পরিবারের কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হয় নাই।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা তাদের নিজেদের ইচ্ছে হয়েছে বলে চলে গিয়েছেন। বন্ধুরা গিয়েছে তাই তারাও গিয়েছেন।

কেস স্টাডি ১১

ননী গোপাল সাহা, পিতা- মৃত গণেশ চন্দ্র সাহা, ঠিকানা:- গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোষ্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার। বয়স ৫৫। পেশা- শিক্ষকতা। তার এক কাকা ১৯৭৩ সালে ভারতে চলে গিয়েছেন। তিনি ফরিদপুরে ব্যবসা করতেন। ফরিদপুর থেকে ঢাকায় আসার পথে ডাকাতি হয়। পরে আবার বাড়িতে ডাকাতি হয়। এর পর পরই তিনি চলে যান। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।

তার কাকা যাওয়ার সময় তার সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ কলকাতায় যায়নি।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন এক এক জন এক এক কারণে চলে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশেই ছিলেন।

কোন রকম নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি।

কেস স্টাডি ১২

প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী, পিতা- ডাঃ পিয়ুষকান্তি চক্রবর্তী, ঠিকানা- গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোষ্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার। পেশা- ঔষধের ব্যবসা। বয়স-৫৫/৫৬

তিনি জানান যে তার বাবার দুই কাকা ভারতে স্থায়ীভাবে চলে যান। একজন ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন, তিনি ডাক্তারী করতেন। আরেকজন পরে যান, তিনি ব্যবসা করতেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি এলাকার রাজনৈতিক চাপেই চলে গিয়েছেন।

তার বিষয় সম্পত্তি প্রশান্তকুমারদের দখলেই আছে।

তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিনা তা তার জানা নেই।

তার নানা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন, তিনি শিক্ষক ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে, অনেকের অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, আবার অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে চলে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অর্পিত আইনের কারণে তার দাদার সম্পত্তি তিনি সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়ে ভোগ করছেন, যেটা সে নিজে এমনিতেই অধিকারী। ১৯৭১ সালে তারা দেশেই ছিলেন।
কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি।

কেস স্টাডি ১২

ডাঃ ননী গোপাল চক্রবর্তী, পিতা-ডাঃ সন্তোষকুমার চক্রবর্তী। ঠিকানা- গ্রাম- দক্ষিণ শিমুলিয়া, পোষ্ট- মেঘুলা, থানা- দোহার। তিনি জানান যে, তার দুই মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। একজন ডাক্তার ছিলেন, আরেকজন কলকাতায় পড়াশুনা শেষ করে নেভীর অফিসার ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ভারতে যান। তিনি পড়তে গিয়েছিলেন। তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।
তিনি সম্পত্তি রেখেই চলে গিয়েছিলেন। সেগুলো এখন মুসলমানদের দখলে আছে। হিন্দু আইনে যেহেতু মেয়েরা পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় না তাই তার মা কোন সম্পত্তি পায়নি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে, অনেকের আত্মীয়-স্বজন চলে যাওয়াতে অন্যরাও চলে গিয়েছে।
অর্পিত আইনের ফলে তার পরিবারে কোন সমস্যা হয়নি।
কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। এ এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক সবসময়ই ভাল।

কেস স্টাডি ১৩

কালীতারা চৌধুরী, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি মারা যান।) পিতা- মৃত ফণীভূষণ রায় চৌধুরী ছিলেন জমিদার। ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর।
১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পূর্বেই তার দুই ভাই ভয়ে সবকিছু ফেলে রেখে কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় তাদের ব্যবসা ছিল। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর তারা ক্ষতিপূরণ পান।
তার স্বামী যায়নি বলে তিনি যেতে পারেননি। তিনি বলেন যে, তিনি না গিয়ে ভুল করেছেন। যারা গিয়েছে তারা সকলেই বাড়ি গাড়ি করেছেন আর তিনি এখানে পড়ে আছেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশেই ছিলেন। সম্পত্তি নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি। তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সেখানে যায়।

কেস স্টাডি ১৪

বিজয় গোবিন্দ সাহা, পিতা-ঈশ্বর কৈলাশ চন্দ্র সাহা, ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর। তিনি ব্যবসা করতেন। বয়স-৮৩/৮৪।
তিনি জানান যে, তার মামী ভারতে চলে গিয়েছেন তার ছেলের কাছে। তার ছেলে ছোটবেলা থেকেই কলকাতায় থাকতো। কলকাতায় তার এক মামা থাকতেন, তার কাছেই অন্য মামার ছেলেরা থাকতো। তার মামা যতীন্দ্র মোহন সাহা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন। তিনি কলকাতায় টিনের ব্যবসা করতেন। আগে বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন পরে আর আসেননি।
তার মামী যাওয়ার সময় সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছেন। তার সম্পত্তি নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি।

অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার পরিবারের কোন সমস্যা হয়নি।
মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেশেই ছিলেন।

কেস স্টাডি ১৫

রতনরানী সাহা, পিতা- মৃত উপেন্দ্রলাল সাহা বয়স ৬৫/৬৬, স্বামী- বিজয় গোবিন্দ সাহা, ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর। তার বাবার বাড়ি গ্রাম- পিপলিয়া, থানা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।
তিনি জানান যে, তার তার তিন ভাই ও চার বোন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তার ভাইয়েরা চাকুরী করতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। বোনেরা তাদের স্বামীদের সাথে গিয়েছেন। তারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়ে বা ভয়ে যাননি।
তার বাবার বাড়ির বিষয় সম্পত্তি তার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি তা বিক্রয় করে দেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার পরিবারের কোন সমস্যা হয়নি।
মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেশেই ছিলেন।

কেস স্টাডি ১৬

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, পিতা-গোকূল চন্দ্র সাহা। ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর (এটা তার মামার বাড়ি)। তার বাবার বাড়ি গ্রাম-গড়পাড়া, ইউনিয়ন-গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ সদর।
তিনি ব্যাংকে চাকুরী করেন। তার পিতা আসামে কাঠের ব্যবসা করতেন।
তিনি জানান যে, তার বড় ভাই ১৯৬৩/৬৪ সালের দিকে ভারতে চলে যান। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে এখানে কিছু করতে না পেরে ভারতে চলে যান। ১৯৪৭ সালের পরে তার ঠাকুরদাদা ভারতে চলে গিয়েছিলেন।
গড়পাড়ায় তাদের প্রায় ৭০/৮০ শতাংশ জমি ছিল, সেটা অন্যরা ভোগ করছে। তার ঠাকুরদাদা চলে যাওয়ার সময় তার সম্পত্তি বিক্রয় করে যেতে পারেন নি, পরেও তা আর বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তার ভাইয়ের কোন সম্পত্তি ছিল না। নারায়নগঞ্জে তাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল, ১৯৪৭ সালের পূর্বে দাঙ্গায় তা ক্ষতিগ্রস্থ হলে এই ক্ষতি আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।
১৯৪৭ সালের পূর্বে কেউ কলকাতায় থাকেনি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা হিন্দুরা অর্থনৈতিক ছাড়াও মানসিকভাবে নির্যাতিত বলেই চলে গিয়েছেন। এছাড়া যাদের কোন আত্মীয় ভারতে প্রতিষ্ঠিত তারাই বেশী গিয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধের সময় তার পরিবার ভারতে ছিল। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

কেস স্টাডি ১৭

আরতি রানী সাহা, পিতা- ঈশ্বর ফণীভূষণ সাহা। ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর।
তিনি যানান যে, তার এক বোন ও চার ভাই ভারতে চলে গিয়েছে। তার বোন বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে যায়, বোনের স্বামীর পরিবার আগে থেকেই ভারতে থাকতো। তার বড় ভাই ভারতে পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তিনি সেখানে সরকারী চাকুরী করতেন, পরে মারা যান। তারা সবাই আসামে থাকে।

সম্পত্তি বলতে এই বাড়িটা (বর্তমানে বসবাস করছেন) তাকে দিয়ে গিয়েছিল।
অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার কোন সমস্যা হয়নি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।

কেস স্টাডি ১৮

কালীপদ সাহা, পিতা- মৃত কানাইলাল সাহা। ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর। বয়স ৯৫/৯৬। তিনি জানান যে, তার তিন ভাই ৪৫/৫০ বৎসর আগে ভারতে চলে গিয়েছে। তারা এমনিতেই চলে গিয়েছেন। তারা ভারতে ব্যবসা করতেন। সম্পত্তি বলতে এই ভিটাবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই যা তিনি ভোগ করছেন।

কেস স্টাডি ১৯

শান্তিলতা চৌধুরী, স্বামী-মৃত সত্যেন্দ্র কুমার চৌধুরী (জমিদার ছিলেন) ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর। তিনি জানান যে তার এক ভাই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তার তিন ছেলে ভারতে থাকে। তার ভাই পূর্ববাংলায় কোন কাজকর্ম করতে পারেন নাই তাই তার মামা তাকে নিয়ে যায়। তিনি ১৯৬০ সালের পূর্বে ভারতে চলে যান। শান্তিলতা চৌধুরীর তিন ছেলে তাদের এক দাদুর সঙ্গে খুব ছোটবেলায় ভারতে চলে যায়। বৃটিশ আমলে তার ছোট কাকা ধুপড়িতে চাকুরী করতেন পরে তার পুরো পরিবারকে সেখানে নিয়ে যান। তার এক দেবর নবদ্বীপে থাকে। তার বাবা তাকে সেখানে বাড়িঘর করে দেবার পর সে সেখানে চলে যায়।
তার দাদার সম্পত্তি তার বড় বোনকে দিয়ে যান। তাদের বায়রা গ্রামে কিছু সম্পত্তি ছিল সেটা তারা নিজেরা ভোগ করেন না দেখাশুনা করার লোক নেই বলে আবার অর্পিত আইনেও পড়ে নাই। তাদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল কিন্তু তার স্বামী ঠিকমত খোজখবর না রাখায় সেগুলো বর্গাচাষীরাই ভোগ করছে।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।

কেস স্টাডি ২০

বিমলা সাহা, পিতা মৃত অযোধ্যানাথ সাহা। বয়স- ৮৫, ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর।
তিনি জানান যে তার বড় ভাই ১৯৭০ সালে ভারতে চলে যায়। ভাইয়ের ছেলেরা ম্যাট্রিক পাশ করে ভারতে চলে যায়। তারা সেখানে ফলের ব্যবসা করতো পরে তারা তাদের বাবাকে নিয়ে যায়। তার মামারাও ভারতে চলে যায়। তারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়নি।
তাদের অল্প কিছু সম্পত্তি ছিল সেগুলো তারা কম দামে বিক্রয় করে চলে যায়। তার শ্বশুড় বাড়ির সকলে তাদের নিজেদের সম্পত্তি নিজেরা ভোগ করছে।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ২১

দুলাল সাহা, পিতা-রবীন্দ্রকুমার সাহা, পেশা-ব্যাবসা, ঠিকানা- গ্রাম ও ইউনিয়ন- বেতিলা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর। বয়স ৫০।
তিনি জানান যে তার তিন মামা ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা খুব ছোটবেলায় কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে স্কুলে পড়াশুনা করেন হোস্টেলে থেকে।
তারা কোন প্রকার নির্যাতনের শিকার হন নাই। তার নানা নিজে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি তারা নিজেরা তাদের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করছেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা গ্রামেই ছিলেন।

কেস স্টাডি ২৩

পুস্প মল্লিক, স্বামী-মরণচন্দ্র মল্লিক, রস ও চরস এর ব্যবসা করতেন। ঠিকানা-গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী।
তিনি জানান যে তার দেবর ভারতে চলে গিয়েছে। তিনি দেশে কাঁচামালের ব্যবসা করতেন। তিনি নদীয়ায় জমি কিনে চলে যান। অন্য প্রতিবশী ও বন্ধুবান্ধব চলে গিয়েছে তাই তিনিও চলে গিয়েছেন।
তাদের গ্রামে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা হয়নি তবে ১৯৬৪ সালে এই গ্রামের আশেপাশের এলাকায় দাঙ্গা হয় ফলে এ গ্রামের অনেক লোক ভয়ে ভারতে চলে গিয়েছে।
তিনি তার সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে যান।
অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।
তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যেতে চায়নি আর তাদের কোন সমস্যাও নেই। যারা চলে গিয়েছে তারা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পেরেছে বলে চলে গিয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ পশ্চিমবাংলায় ছিল না।

কেস স্টাডি ২৩

স্মারক দেবী। পিতা- হরিভক্ত। তার পিতা বড় গৃহস্থ ছিলেন কৃষিকাজ করতেন। ঠিকানা-গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী। বয়স-৬৫ বৎসর। তার বাবার বাড়ি গাজীপুরের হায়দরাবাদ গ্রামে। তিনি জানান যে তার তিন ভাই, মা, চাচী, চাচাত ভাই এবং দেবর দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছেন।
তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরে ভয়ে চলে গিয়েছেন। খাইলকুর গ্রামে কোন দাঙ্গা না হলেও এ এলাকার অনেক লোক ভয়ে চলে গিয়েছে। এ গ্রামের সকল হিন্দুরাই নিম্নবর্ণের।
১৯৬৪ সালে টঙ্গীর মিল কারখানার শ্রমিকরা দাঙ্গা করে। দাঙ্গার সময় তার বাবার বাড়ি লুট হয়েছে। এমনকি ঘর ভেঙ্গে টিন ও নিয়ে গিয়েছে। তবে জ্বালিয়ে দেয়নি। এলাকার মুসলমানরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে।
তাদের অনেক জমি ছিল। তারা যাওয়ার সময় সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছেন। তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়েনি।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়। আর ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর বেশী চলে গিয়েছে।

তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যায়নি তাই তিনিও যান নাই। যারা চলে গিয়েছে তারা সম্পত্তি বিক্রয় করতে পেরেছে বলে চলে গিয়েছে।
১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ পশ্চিমবাংলায় ছিল না।

কেস স্টাডি ২৪

মধুমালা, স্বামী- যোগেশচন্দ্র সরকার, পিতা- হরিমোহন মন্ডল। ঠিকানা-গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী। বয়স-৬৫ বৎসর। তার বাবার বাড়ি গাজীপুরের বাসন ইউনিয়নের আতর গ্রামে। তিনি জানান যে তার বাবা, মা, ভাই, বোন, দুই চাচা ও ননদরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছেন। তার ননদের বাড়ি ছিল ধরপাড়া ইউনিয়নের সাতাইশ গ্রামে।
তারা কৃষিকাজ করত। ভারতে গিয়েও তারা জমি কিনে কৃষিকাজ করছে।
তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছেন।
১৯৬৪ সালে টঙ্গীর মিল কারখানার শ্রমিকরা দাঙ্গা করে। দাঙ্গার সময় তার বাবার বাড়ি লুট হয়নি বা কোন নির্যাতনের শিকার হয়নি। তবে তার শ্বশুড় বাড়িতে মাঝে মাঝে চুরি হত। গরু চুরি হত, চুরি করে দূরে নিয়ে ছেড়ে দিত। এখানে উগ্র টাইপের কিছু লোক এগুলো করতো।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়, এছাড়া ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভয়ে চলে গিয়েছে। খাইলকুর গ্রামের হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর বাইরের লোকেরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে ভয় ডর দেখানোর পর আস্তে আস্তে লোকজন কমে যায়। মাসে দুই তিনবার করে চুরি হত। তবে বর্তমানে একটি সমস্যা হচ্ছে বিয়ের সমস্যা।
তারা তাদের সম্পত্তি তারা বিক্রয় করে গিয়েছে।
১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ কলকাতায় ছিল না।
তার শ্বশুড় ও স্বামী গ্রাম ছেড়ে যায়নি তাই তিনিও যান নাই। তবে তারা যেতে চেয়েছিলেন,তার শ্বশুড় আট বিঘা জমি বিক্রয় করেছিলেন। ১৯৭১ সালে শ্বশুড় মারা যান। এলাকার সুলতান মিয়া এবং আফসারউদ্দীন নামে দুই লোক তাদের বসত ভিটা ও সাত/ আট বিঘা জমি বেনামে দলিল করে নেয়। চৌদ্দ বৎসর কেস চালানোর পর তার তারা মামলায় জয়লাভ করে, পরবর্তীতে পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাওয়ায় আর ভারতে চলে যাওয়া হয়নি।
নারী নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটেনি।
আত্মীয় স্বজনরা বাস করে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায়।

কেস স্টাডি ২৫

বসন্তকুমার সরকার, পিতা- মৃত শরৎকুমার সরকার ছিলেন কৃষক। তিনি পেশায় প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক বর্তমানে আইনজীবী। বয়স প্রায় ৫৫। ঠিকানা- -গ্রাম-খাইলকুর, ডাক- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-টঙ্গী।
তিনি জানান তার ৪ চাচা, জ্যাঠাত ভাই সহ এলাকার আশেপাশের ৫টি বাড়ির লোক সকলেই ভারতে চলে গিয়েছে। এখানে অবস্থানকালে তারা সকলেই কৃষিকাজ করতেন। ভারতে তারা কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ ব্যবসা ও কেউ চাকুরি করেন। তারা ১৯৬৯/ ১৯৭০ সালে ভারতে চলে যান। তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছে।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় টঙ্গী এলাকার মিল কারখানার শ্রমিকরা দাঙ্গায় সক্রিয় ছিল। এদের বেশীরভাগই ছিল নোয়াখালীর লোক ও বিহারীরা। তাদের সঙ্গে এলাকার মাতব্বর শ্রেণীর কিছু লোক দাঙ্গাকারীদেরকে সাহায্য করেছে। খাইলকুর গ্রামে লুট হয়েছে তবে কোন মানুষ মারা যায়নি। তাদের লাভ ছিল লুটের মাল হস্তগত করা। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরই এ এলাকার লোকেরা ভয়ে ভারতে চলে যায়।

তিনি নিজে ১৯৭১ সালের পূর্বে একবার ভারতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার চল্লিশ হাজার টাকার হুন্ডি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফেরত আসেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় চলে গিয়েছিলেন আবার ফেরত আসেন। তার বাবা বাদে অন্য শরিকরা চলে গিয়েছে। তার বাবা ভয় পেলেও বাধ্য হয়ে থেকেছে যে সকল জমিজমা ছিল সেগুলো নষ্ট হওয়ার ভয়ে আর যায়নি। তার নিজের ভারতে বাড়ি ও সম্পত্তি আছে তবে তিনি এখনও স্থায়ীভাবে চলে যান নাই।

তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই তবে তার একজন শরিকের জমি অর্পিত আইনে পড়েছে।

তার আত্মীয়রা কুঁচবিহার ও নদীয়ায় থাকেন।

কেস স্টাডি ২৬

সুরীন্দ্র চন্দ্র দাস, পিতা-মনমোহন দাস ছিলেন গৃহস্থ। বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম- উধুর, ডাক- উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর। স্থায়ী ঠিকানা- পাকুড়িয়া, গাজীপুর। তিনি তার শ্বশুড়বাড়িতে থাকেন। তিনি একজন মুদি দোকানদার। বয়স- ৭৫। তিনি জানান যে তার চার মামা অনেক আগেই ভারতে চলে গিয়েছেন। আর তার দুই ছেলে ভারতে চলে গিয়েছে। তার ছেলে শ্বশুড়ের সম্পত্তির লোভে গিয়েছে।

তিনি জানান উধুর গ্রামে কোন হাঙ্গামা হয়নি। তবে তার পৈতৃক বাড়ি পাকুড়িয়ায় বাড়িঘর লুট হয়েছে, জমিতে আগুন দিয়েছে তবে কোন শারীরিক নির্যাতন হয় নাই।

হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা লুটপাটের ভয়েই তারা চলে গিয়েছে।

১৯৪৭ সালের পূর্বে তাদের কেউ কলকাতায় ছিল না।

তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই।

তার ইচ্ছা নাই বলে তিনি যান নাই। তিনি গীর্জার ফাদারের সঙ্গে ঋণদানের কাজ করতেন। ১৯৭১ সালে ফাদারের কাছে ভারতে যাওয়ার জন্য সাহায্য চান যুদ্ধে মারা পড়ার ভয়ে। তখন ফাদার তাদেরকে বলেন যে ভারতে যাওয়ার জন্য দশ হাজার করে টাকা দেবেন তবে শর্ত দেন যে ভারতে গিয়ে মরতে পারবেন না। এ কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে মরতে হলে নিজের দেশেই মরবেন। অনেকে তার বাবাকে সাহায্যের আশ্বাস দিলে তারা আর দেশ ছেড়ে যান নাই।

কেস স্টাডি ২৭

সদানন্দ দাস, পিতা- উপেন্দ্রচন্দ্র দাস ছিলেন একজন কৃষক। তিনি নিজেও একজন কৃষক। বয়স ৫০/৫৫, বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর।

তিনি জানান যে তার কাকা ও জ্যাঠাশ্বশুড় ভারতে চলে গিয়েছেন। তারা দেশে কৃষিকাজ করত। ভারতে চা এর দোকান চালায়।

তারা ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভারতে চলে যায়। তিনি বলেন যে, এখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যা ছিল না। তাদের ভারতে যেতে ভাল লেগেছে তাই চলে গিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। তখন তারা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তার কাকার প্রায় ছয়/ সাত বিঘা জমি ছিল। মাত্র সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করে চলে গিয়েছে। তারা জানতেও পারেন নাই।
তারা কোনরকম নির্যাতনের শিকার হন নাই।
তাদের কোন সম্পত্তি অর্পিত আইনে পড়ে নাই। তবে তাদের প্রতিবেশী সুরীন্দ্র দাস তাদের সব সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। কয়েক বৎসর পর সুরীন্দ্র দাস তাদের বাড়িতে এলে তার বাবা সুরীন্দ্র দাসকে মারতে উদ্যত হলে তের পাখি জমি ফেরত দেয়।
তার কাকা ভারতে মুর্শিদাবাদে থাকে।
তার বাবা দেশ ছেড়ে যেতে চান নাই। তিনি বলেন মরলে নিজের বাড়িতেই মরব।

কেস স্টাডি ২৮

অগ্নিমোহন দাস, পিতা- মৃত মহীন্দ্রনাথ দাস, কৃষিকাজ করতেন। তিনি নিজেও একজন কৃষক। তার ছেলেরা বিদেশে চাকুরি করে। বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা- গাজীপুর সদর। বয়স ৭০।
তার মেয়ের শ্বশুড় ও তার পরিবার ভারতে চলে গিয়েছে। দেশে তিনি কৃষিকাজ ও ব্যবসা করতেন। তবে তার মেয়ের জামাই ঢাকায় থাকে।
১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভারতে চলে যায়।
সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে গিয়েছে।
তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।
অগ্নিমোহন দাস এর মতে ভারতকে নিজের দেশ মনে করে তাই তারা ভারতে চলে যায়।
তাদের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই বা নষ্ট হয় নাই।

তিনি জানান তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নাই। দাঙ্গার সময় ভয়ে অন্য এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মেম্বার তাকে চলে যেতে বললেও তিনি যান নাই। তিনি বলেন ভারতে গেলে তাদের সারাদিন সারা বৎসর কাজ করতে হবে আর এখানে ছয়মাস কাজ করে বাকী ছয় মাস আরামে থাকে।

কেস স্টাডি ২৯

যুগলরানী দাস, স্বামী- মনোরঞ্জন দাস। পিতা-নগেন্দ্র দাস এর ছিল মাছের আড়ৎ। বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর। বাবার বাড়ি ঢাকার রাজারবাগ, দক্ষিণ গাঁও। বয়স-৫৫।
তিনি জানান যে, তার কাকা ১৯৬৪ সালের রায়টের পর ভারতে চলে গিয়েছিল। ভারত সরকার তখন রেশন কার্ড দিয়েছিল তাই সে চলে গিয়েছিল তবে সুবিধা করতে পারেনি বলে তিন মাস পরে ফিরে এসেছে। তার কাকার মাছের ব্যবসা ছিল।
১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তাদের বাড়ি লুট হয়েছিল। দাঙ্গা শুরু হলে তারা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন।
তাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন সমস্যা হয় নাই।
হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে তার ধারণা যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে চলে যায়।

কেস স্টাডি ৩০

নাম : শ্রীমতি পেশা : গৃহিনী
পিতার নাম : মৃত শ্রীচরণ দাস পেশা : গৃহস্থ ছিল
বয়স : ৮০
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর
স্থায়ী ঠিকানা : বাবার বাড়ি পাকুড়িয়া, গাজীপুর, মামার বাড়ি গাজীপুরেই
প্রশ্ন : আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?
উত্তর : আমার মামা চলে গিয়েছে। দাদা দিদিও চলে গেছে। আমার জ্যাঠাত ভাইয়েরা গিয়েছিল, আবার এসে পড়েছে।
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
উত্তর : জায়গা জমি ছিল না। মানুষের কাজকর্ম করতো
প্রশ্ন : তার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : জানা নেই
প্রশ্ন : তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : তিনি রায়টের আগেই চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন : তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর : মানুষের জায়গায় থাকতো, কাজের খোজে চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন: তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : কোন সম্পত্তি ছিল না
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েলিন?
উত্তর : না
প্রশ্ন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর : এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে সুবিধা হয় চলে যায়।
প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
উত্তর : না
প্রশ্ন : অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা?
উত্তর : না। আমার স্বামীর কিছু জমি ছিল তা থেকে কিছু বিক্রয় করেছে আর কিছু আছে।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে যান নাই কেন?
উত্তর : আমার স্বামী ভয় পেলেও যায় নাই। যারা গেছে তারা বলেছে যে ঐ দেশে থাকা খাওয়ার কষ্ট, তো কষ্ট করলে নিজের দেশেই করবো।

কেস স্টাডি ৩১

নাম : জ্যোতি পেশা : গৃহিনী
স্বামীর নাম : নরেশচন্দ্র,
পিতার নাম : গোপালচন্দ্র দাস, পেশা : ইলিশের ব্যবসা করতো
বয়স : ৬০
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর
স্থায়ী ঠিকানা : বাবার বাড়ি পাকুড়িয়া, গাজীপুর, মামার বাড়ি গাজীপুরেই
প্রশ্ন : আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?
উত্তর : আমার মামারা চলে গিয়েছে, আমার চাচা, আমার ভাসুর, আমার মামা শ্বশুড়রা ভারতে চলে গেছে।
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
উত্তর : মামা কৃষিকাজ করতো, চাচা মাছের ব্যবসা করতো, মামাশ্বশুড় গৃহস্থ ছিল।
প্রশ্ন : তার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : জানা নেই
প্রশ্ন : তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : তিনি রায়টের পর চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন : তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর : কাজের খোজে চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন: তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : চাচা সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছে। তবে মাপের সমস্যা আছে। মামাশ্বশুড় জমি বিক্রয় করে গিয়েছে। আমার ভাসুরকে আমার শ্বশুড় কালীগঞ্জে জায়গা দিয়েছিল সে জায়গা বিক্রয় করে চলে গিয়েছে। আমার শ্বশুর রায়টের আগে মারা গেছেন।
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েলিন?
উত্তর : না কোন প্রকার দাঙ্গার শিকার হন নাই।
প্রশ্ন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর : এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে সুবিধা হয় চলে যায়। অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে সুখী হয়ে যায় এবং যখন সুযোগ হয় তখনই ভারতে চলে যায়।
প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
উত্তর : না
প্রশ্ন : অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা?
উত্তর : না। আমার স্বামীর কিছু জমি ছিল তা থেকে কিছু বিক্রয় করেছে আর কিছু আছে।
প্রশ্ন : আপনার পরিবারের মেয়েদের কোন সমস্যা হয়েছে?
উত্তর : না
প্রশ্ন : অভিবাসনকারী আত্মীয়ের ঠিকানা জানা থাকলে বলুন
উত্তর : দিল্লীতে থাকে, ঠিকানা জানা নেই
প্রশ্ন : আপনি ভারতে যান নাই কেন?

উত্তর : আমার বাবা যায় নাই কারণ বাবার কাজ করার মত লোক ছিল না। সেখানে আমার বাবা যে কাজ করবে সে কাজ বাবার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। আমরা রায়টের পর এই জায়গা বদলী করে গিয়েছিলাম তবে ভারতে জায়গা না পেয়ে ফিরে আসি। ঘর বাড়ি করে থাকতেছি।

কেস স্টাডি ৩২

নাম : রূপচাঁন দাস পেশা : কৃষিকাজ
পিতার নাম : মৃত মণিলাল দাস পেশা : গৃহস্থ ছিল
বয়স : ৮০
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর
প্রশ্ন : আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?
উত্তর : আমার মা এর জ্যাঠাত ভাইয়েরা গিয়েছে
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
উত্তর : কৃষিকাজ করতো
প্রশ্ন : তার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : জানা নেই
প্রশ্ন : তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৬৪ সালের রায়টের পর চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন : তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর : রায়টের সময় তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাই তারা চলে যায়।
প্রশ্ন: তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : সম্পত্তি বিক্রয় করে গিয়েছেন
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েলিন?
উত্তর : রায়টের সময় তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার প্রচুর মালামালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে
প্রশ্ন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর :
প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
উত্তর : না
প্রশ্ন : অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে যান নাই কেন?
উত্তর : এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। মামাদের গ্রামে দাঙ্গার পর ভয়ে তারা চলে যায়। আমার বাবা, চাচা কেউই যান নাই, কারণ প্রয়োজন হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ৩৩

নাম-অনিতা রানী দাস
পিতা-অতুল চন্দ্র দাস
বয়স- ৩২
বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম- উধুর, ডাক উলুখোলা, থানা গাজীপুর সদর
প্রশ্ন : আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?
উত্তর : আমার কাকা, কাকী, চাচাতো ভাই বোনেরা গিয়েছে
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
উত্তর : তাদের প্রচুর জমি ছিল তাই কৃষিকাজ এর উপরই নির্ভরশীল ছিল।
প্রশ্ন : তার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : জানা নেই
প্রশ্ন : তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার ভয়ে তারা চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন : তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর : রায়টের সময় তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাই তারা চলে যায়। তখন তাদের বাড়ি ঘর, টাকা পয়সার প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রতিবেশী মুসলমানরা দাঙ্গায় সরাসরি অংশ নেয় তাই তারা ভয়ে ভারতে চলে যায়।
প্রশ্ন: তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : সম্পত্তি কিছু বিক্রয় ও কিছু বিনিময় করে গিয়েছেন।
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েলিন?
উত্তর : রায়টের সময় তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার প্রচুর মালামালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ সময় তার অর্থসম্পদ, বাসন কোসন অনেক কিছু লুট হয়েছে।
প্রশ্ন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর : এই গ্রামে কোন সমস্যা নেই প্রায় সবই হিন্দু। যার যেখানে নিরাপত্তা ও সুবিধা আছে বলে মনে হয় সে সেখানে চলে যায়।
প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
উত্তর : না

কেস স্টাডি ৩৪

নাম : বলাইচন্দ্র দাস পেশা : কৃষিকাজ
পিতার নাম- হরিন্দ্রচন্দ্র দাস পেশা : কৃষিকাজ
বয়স-৩৮
বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম- উজিরপুর, ডাক- পূবাইল, গাজীপুর
স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- উজিরপুর, ডাক- পূবাইল, গাজীপুর
প্রশ্ন: আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?

উত্তর: আমার বোন, ভগ্নিপতি ও তার পরিবারের সকলেই ভারতে চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
উত্তর: কৃষিকাজ
প্রশ্ন: তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তারা ভারতে চলে যায়।
প্রশ্ন: তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
প্রশ্ন: তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর: সব ফেলে রেখে চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন: তিনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর: না
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েলিন?
প্রশ্ন: হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় এ পরিবারের অনেকে মারধর এর শিকার হয়
প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
উত্তর: না
প্রশ্ন: অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা?
উত্তর: না
ভারতে অবস্থানকারী আত্মীয়ের ঠিকানা (সম্ভব হলে) বলুন

কেস স্টাডি ৩৫

নাম : প্রফুল্লচন্দ্র দাস পেশা : চাকুরী
পিতার নাম : মহেন্দ্রচন্দ্র দাস
বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম- সোরল, ডাক-পূবাইল
প্রশ্ন: আপনার কোন নিকট আত্মীয় স্থায়ীভাবে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন কিনা?
উত্তর: আমার মেয়ে ও তার স্বামী ভারতে চলে গিয়েছে।
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে তার পেশা কি ছিল?
উত্তর : কৃষিকাজ
প্রশ্ন: তার বর্তমান পেশা কি?
প্রশ্ন: তিনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর থেকে।
প্রশ্ন: তার ভারতে অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভয়ে দেশত্যাগ করে।
প্রশ্ন : তিনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : ফেলে রেখে গিয়েছে।

প্রশ্ন: তিনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সমপত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর: না
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? তিনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।
প্রশ্ন: হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের উল্লেখযোগ্য কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর ভয়ে ও অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেন।
প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের পূর্বে আপনার কোন আত্মীয় ভারতে অবস্থান করতেন কিনা?
উত্তর: না
প্রশ্ন: অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা?
উত্তর : না
ভারতে অবস্থানকারী আত্মীয়ের ঠিকানা (সম্ভব হলে) বলুন
উত্তর: জি-২,৩০৭, চার্মউড ভিলেজ, সুরুজকান্ত রোড, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা, ভারত
প্রশ্ন: আপনি ভারতে যান নাই কেন?
উত্তর: আমার ইচ্ছে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৯

পূর্ববাংলা ত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাবলী ও সাক্ষাৎকার

"সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সামাজিক অর্থনৈতিক দিক: ঢাকা জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা ১৯৪৭-৭১" বিষয়ের গবেষণাকর্মের প্রয়োজনে আমাকে বৃহত্তর ঢাকা জেলা দেশত্যাগকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট থেকে কিছু বিষয়ে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই আমি আপনার নিকট নিম্নের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর কামনা করছি।

নাম :
বয়স :
পিতার নাম ও পেশা :
বর্তমান ঠিকানা
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
আপনার বর্তমান পেশা কি?
আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

কেস স্টাডি ১

মায়া সাহা, পিতা- রাইচরণ সাহা, স্বামী- রঞ্জিত সাহা। ঢাকার সাভার থানার পুন্ড্রা গ্রামে ছিল বাবার বাড়ি। শ্বশুড় বাড়ি ছিল ধামরাই থানার বেলিশ্বর গ্রাম। পেশা- গৃহিনী
বর্তমান ঠিকানা- ঢাকা কলোনি, গ্রাম-সাতগাছিয়া, থানা কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
মায়া সাহা ও তার পরিবার ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে, দাঙ্গার সময় তাদের গ্রাম আক্রান্ত হলে সে সময় তাদের বাড়িতে রান্না হচ্ছিল, সব কিছু ফেলে ভয়ে তারা পালিয়ে আসেন। তাদের সব কিছুই ফেলে পালিয়ে যান।
পশ্চিমবাংলায় গিয়ে তারা সাতগাছিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। আর্থিক অবস্থা ভাল

কেস স্টাডি ২

ঝর্ণা সাহা, পিতা-হরগোবিন্দ সাহা, স্বামী স্বর্গীয় নগেন্দ্র সাহা,
ঢাকায় বসবাস করতেন শ্বশুড় বাড়ি ধামরাই থানার বেলিশ্বর গ্রামে। পেশা- গৃহিনী
বর্তমান ঠিকানা- ঢাকা কলোনি, গ্রাম-সাতগাছিয়া, থানা কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
মায়া সাহা ও তার পরিবার ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে, দাঙ্গার সময় তাদের গ্রাম আক্রান্ত হলে তারা সব কিছু ফেলে ভয়ে তারা পালিয়ে আসেন।
তাদের সব কিছুই ফেলে পালিয়ে যান।
পশ্চিমবাংলায় গিয়ে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তারা সাতগাছিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন।
আর্থিক অবস্থা ভাল

কেস স্টাডি ৩

ফণিভূষণ ভৌমিক, পিতা- ঈশ্বর রশিকলাল ভৌমিক, ঢাকার হরিরামপুর থানার বয়রা গ্রামে বাস করতেন।
বর্তমান ঠিকানা- ঢাকা কলোনি, গ্রাম-সাতগাছিয়া, থানা কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
তাদের ফলের ব্যবসা ছিল।
তিনি ও তার পরিবার ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর দেশত্যাগ করেন।
তবে কোন ভয়ে নয়। গ্রামের সকলে চলে আসছিল তাই তারাও দেশত্যাগ করেন।
তারা সাতগাছিয়ায় জমি কিনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন।
তাদের বিষয় সম্পত্তি প্রতিবেশী হিন্দুদেরকে দিয়ে দেন, পরবর্তীতে তা নদীতে ভেঙ্গে যায়।
পশ্চিমবাংলায় গিয়ে তারা সাতগাছিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তার মামা থাকতেন, তার কাছেই উঠেছিলেন, পরে জমি কিনে স্থায়ী হন। তিনি জানান যে, সে সময় ঢাকার তুলনায় কম মূল্যে কিনতে পেরেছিলেন তাই অনেক জমি ক্রয় করেন। আর্থিক অবস্থা ভাল

কেস স্টাডি ৪

গনেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা- স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন এডভোকেট।

মানিকগঞ্জের উলাইল গ্রামে বাস করতেন।
বর্তমান ঠিকানা- ঢাকা কলোনি, গ্রাম-সাতগাছিয়া, থানা কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। তিনি কলকাতায় পড়াশুনা শেষ করে আবার পূর্ববাংলায় ফিরে স্কুলে চাকুরী নেন। কাঠালিয়া প্রাইমারী স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন। পরবর্তীতে সৈয়দাবাদ ও মানিকনগর স্কুলে চাকুরী করেন। সাতগাছিয়ায় তিনি সাতগাছিয়া সেকেন্ডারী স্কুলে ক্লার্ক ছিলেন।
১৯৬৩ সাল থেকে স্থায়ীভাবে সাতগাছিয়ায় বসবাস করতে শুরু করেন স্ত্রীর পরামর্শে। তার ছেলেরা বড় হচ্ছিল তাদের পড়াশুনার জন্য স্ত্রীর পরমর্শে পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। তার শ্বশুড় বাড়ির লোকেরা অনেক আগেই পূর্ববাংলা ত্যাগ করেন। সে সময় আত্মীয় স্বজনরা সকলেই দেশত্যাগ করে তাই তিনিও দেশত্যাগ করেন। তিনি জানান যে তাদের চারটি শরিক অনেক আগেই দেশত্যাগ করেছিল।
তিনি বা তার পরিবার কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তারা গ্রাম ছাড়ার পর তাদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছিল, তখন অনেক ক্ষতি হয়। তাদের বাড়িতে শুধু ডাকাতি হয়েছিল তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি যে বিল্ডিং এ থাকতেন সেখানে কোন আক্রমন হয়নি।
প্রথমে হিলি বর্ডরের কাছে বাবুরঘাটে বসবাস শুরু করেন পরে স্বল্পমূল্যে জমি ক্রয় করে সাতগাছিয়ায় স্থায়ী হন।
মানিকগঞ্জে ৪/৫ খাদা (১৭ শতাংশে ১ পাখি ও ৬ পাখিতে ১ খাদা)। সম্পত্তি তার বড় ভাই সব একাই বিক্রয় করে দেন।
আর্থিক অবস্থা ভাল। ছেলেরা ভাল চাকুরি করে। মেঝ ছেলে স্টেট ব্যাংকে চাকুরী করে।
তিনি আরও জানান, তাদের সামাজিক অবস্থান ভাল ছিল। তার ছোট কাকা বিক্রমপুরের বেলতলী হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বড় কাকা বেউথা রাজবাড়ির ম্যানেজার ছিলেন আর পদ্মা নদীর পাড়ে ইলিশের আড়ৎদারী করতেন। আর এক কাকা কবিরাজ ছিলেন। ময়মনসিংহ এলাকায় বড় বড় মহারাজাদের চিকিৎসা করতেন।

কেস স্টাডি ৫

অঞ্জলী চক্রবর্তী, পিতা- নরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, স্বামী- গনেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার নালী গ্রামে বাস করতেন। তার বাবা ঢাকা কলেজ ও পরে হরগঙ্গা কলেজ এ চাকুরী করতেন।
বর্তমান ঠিকানা- ঢাকা কলোনি, গ্রাম-সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
১৯৪৭ সালে তার চাকুরিজীবী বাবা অপশনে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে কাজে যোগ দেন। তখন তার বয়স ১৩/১৪ বছর। পিতার সঙ্গে সপরিবারে দেশত্যাগ করেন।
তিনি গৃহিনী। স্বামী স্কুলে চাকুরী করতেন।
তারা গ্রাম ত্যাগ করার পর তাদের বাড়িতে লুটপাট হয়।
তার স্বামীর বাড়ির সম্পত্তি তার জ্ঞাতিরাই দখল করেছিল।
আর্থিক অবস্থা ভাল, ছেলেরা সকলে ভাল চাকুরী করে।

কেস স্টাডি ৬

মনোরঞ্জন কুন্ডু, পিত-স্বর্গীয় জগেশ্বর কুন্ডু, বাড়ি ছিল মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থানার হাসারা গ্রামে। তিনি বরিশালে মুদি দোকানদারী করতেন।

বর্তমান ঠিকানা- ঢাকা কলোনি, গ্রাম-সাতগাছিয়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা
দেশভাগের সময় সবাই যখন দেশত্যাগ করছিল তখন তিনিও দেশত্যাগ করেন, ১৯৫০ সালের মুলাদি রায়টের পর। তারা নিজেরা কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তাদের বাড়িও আক্রান্ত হয়নি।
ভিটাবাড়ি ছাড়া তার কোন সম্পত্তি ছিল না।
১৯৫২ সালে সাতগাছিয়ায় যান আগের পরিচিত লোকজনের মুখে শুনে। অন্যান্য আত্নীয় স্বজনরা দেশত্যাগ করে তাই তিনিও দেশত্যাগ করেন। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি।

কেস স্টাডি ৭

নাম : দীলিপ সরকার
পেশা : সোনাডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রায় ৩০ বৎসর।
পিতার নাম: ঈশ্বর জিতেন্দ্রনাথ সরকার
বয়স-৬০
বর্তমান ঠিকানা: ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম উজানপাড়া, পোষ্ট-লেছরাগঞ্জ, থানা-হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর: ছাত্র
প্রশ্নঃ আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: ১৯৬৪ সাল থেকে।
প্রশ্ন: আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের রায়টের পর বাবার একমাত্র সন্তান ও একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে ভীতিজনক পরিস্থিতিতে এখানে পাঠায়। ১৯৬৭ সালে বাবা মা আসেন।
প্রশ্ন: আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর: পুরোগ্রাম হিন্দু ছিল। রাইমোহন পালের হাতে বাবা সব দলিল পত্র দিয়ে দেন।
তার ষড়যন্ত্রেই আগে থেকেই পাসপোর্ট তৈরী করিয়ে ভীতিজনক পরিস্থিতি তৈরী করে আমার বাবা মা কে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। আগেই স্বাক্ষর করিয়ে নেয়া হয়। পাশে ছিল একটি মৌলভী পরিবার তারা পরে সব সম্পত্তি দখল করে নেয়। পরে সে সম্পত্তি পদ্মায় ভেঙ্গে যায়।
প্রশ্ন: আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর: না
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন? উত্তর: না
প্রশ্ন: ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর: কাকারা আগের থেকেই কলকাতায় থাকতো, আমি কাকাদের কাছে ছিলাম।
প্রশ্ন: ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর: ভাল

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ৮

নাম : মেঘলাল সাহা
পিতার নাম: ঈশ্বর ফকিরচাঁদ সাহা
বর্তমান ঠিকানা : ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম গালিমপুর, থানা: নওয়াবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা
প্রশ্ন: আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর: কাঁচামালের ব্যবসা
প্রশ্ন: আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: বাংলা ১৩৪৮ সাল থেকে এখানে কাজ করতাম। বাবা মা আসেন ১৯৬৩ সালে।
প্রশ্ন: আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর: সবাই চলে আসছিল তাই আমিও চলে আসি। কম দামে বেশী জমি কিনে এখানে চলে আসি। এ অঞ্চলে ৪০০/৫০০ পরিবার সকলেই একই কারণে অর্থাৎ কম দামে বেশী জমি কিনে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।
প্রশ্ন: আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন? আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর: তারেখ শেখ নামে একজন বুক বাইন্ডারের অধীনে বাবা চাকুরী করতেন, সে সম্পত্তি বদলীর কথা বলে নিয়ে নেয় তবে এখানে কিছু দেয়নি।
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর: না
প্রশ্ন: ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর: কলকাতায় চাকুরী করতাম। ১৯৬২ সালে বেথুয়াডহরীতে আসি।
প্রশ্ন: ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর: ভাল।

কেস স্টাডি ৯

নাম : নিতাই বল্লভ সাহা
বয়স: ৭০/৭৫
পিতার নাম: গোবিন্দচন্দ্র সাহা
বর্তমান ঠিকানা : ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম: মেঘুলা, থানা: দোহার, জেলা: ঢাকা
প্রশ্ন: পূর্ববাংলায় পেশা কি ছিল?
উত্তর: আমাদের মেঘুলা বাজারে সুতার ব্যবসা ছিল। ৬টি গুদাম ছিল।
প্রশ্ন: আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর: ব্যবসা
প্রশ্ন: আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর: ১৯৫০ সালে।

প্রশ্ন: আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর: সবাই চলে আসছিল তাই পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছিল আমিও চলে আসি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন আসে তখন তারা আমাদেরকে উৎসাহিত করে। প্রথমে দাদা এসে ব্যবসা শুরু করে পরে আমরা সবাই আসি। কম দামে বেশী জমি কিনে এখানে চলে আসি। আগে যারা এসেছে তারা আমাদেরকে জমি কিনতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন: আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন? আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

উত্তর: সলিম খার কাছে জমি বিক্রয় করেছি আর জলিল মাঝি ছিল আমাদের কর্মচারী তাকে গুদাম দিয়ে আসি। না ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? উত্তর: না

প্রশ্ন: ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

উত্তর: প্রথমে কলকাতায়। আমার ছয় বোন চার ভাই পশ্চিমবাংলায় থাকে।

প্রশ্ন: ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর: প্রথমে ছিল মুদি ব্যবসা।

কেস স্টাডি ১০

নাম : নিতাই সাহা

বয়স: ৭০/৭৫

বর্তমান ঠিকানা: ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম মাহতাবপুর, থানা: নওয়াবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা

প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তর: ছাত্র ছিলাম

প্রশ্ন: আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর: ঔষধের ব্যবসা

প্রশ্ন: আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর: ১৯৫০ সাল থেকে

প্রশ্ন: আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর: ১৯৫০ সালে চারিদিকে অশান্তি দেখে আমাদের বাবা আমাদের পাঠিয়ে দেন। আমাদের বাড়ি ছিল ফাকা জায়গায়। আমার বাবাকে প্রতিবেশীরা দর্শনা পর্যন্ত দিয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : একটা জমি বাদে বাবা সব জমি বিক্রয় করে দিয়ে আসেন।

প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

উত্তর : না

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার প্রশ্ন হয়েছিলেন?

উত্তর : আমরা কোন নির্যাতনের শিকার হইনি। আমাদের গ্রামে কোন সমস্যা হয়নি।

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর : প্রথমে কলকাতায়ছিলাম। আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে এখানে আসি। এখানে জায়গা কিনে বাড়ি করে আমরা আসি। এখানে সবাই এভাবে এসেছে।
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : ভাল। বেথুয়াডহরী হাসপাতালের সামনে ঔষধের দোকান আছে।

কেস স্টাডি ১১

নাম : গোপাল সাহা
পিতার নাম : মৃত বিনোদ সাহা
বর্তমান ঠিকানা : ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানাঃ গ্রাম পাকুড়িয়া, থানা শিবালয়, মানিকগঞ্জ
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : কৃষিকাজ
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : দোকানে কাজ করতাম।
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে।
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : সবাই এসেছে তাই আমিও এসেছি। আমরা দুই ভাই একসাথে এসেছি। কম মূল্যে জমি পেয়ে আমি কিনে নেই।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : বিক্রি করে এসেছি।
প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর : না
প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : এই এলাকায়ই অন্য পাড়ায় ছিলাম।
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : ভাল

কেস স্টাডি ১২

নাম : মতিলাল সরকার
পিতার নাম জ্যোতিস চন্দ্র সরকার
বর্তমান ঠিকানা : ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: জিলাইল, মিতরা গ্রাম এর পাশে, থানা : মানিকগঞ্জ সদর
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : ছোট ছিলাম
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। বাবার কাপড়ের ব্যবসা ছিল।
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : সঠিক সাল মনে নেই
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : : যখন ঢাকা থেকে লোক এসেছে। বিশেষ করে আমাদের এলাকায় একজনের সঙ্গেই আরেকজন এসেছে। ১৪,০০০ টাকা দিয়ে ১০০ শতক জমি কিনেছিলাম। এ অঞ্চলে সবাই এভাবেই এসেছে।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : কিছু কিছু বিক্রয় করেছি।
আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর : না
প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : কমলনগরে
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : ভাল

কেস স্টাডি ১৩

নাম : মনতোষ সরকার (কায়স্ত)
পেশা : ব্যবসা
পিতার পেশা : আলীপুরদুয়ার চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন,
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম ও পোষ্ট: চিবুড়িয়া, থানা: নবদ্বীপ পাড়া, জেলা : নদীয়া
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: চৌকিঘাটা, পোষ্ট : আমতাগঞ্জ, থানা : হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : ছোট ছিলাম
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : আমি ব্যবসা করি।
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছিল। বাবা, বড় দাদা, জ্যাঠামশাই সকলেই চাকুরীর করতেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় একটি চুক্তি ছিল, যতদিন হিন্দুরা পূর্ববাংলা থেকে আসবে ততদিন ভারত সরকার তাদের সম্পুর্ণ

সহযোগিতা করবে। তবে পরে তা দেয়নি ভারত সরকার। তবে সেই সহযোগিতার আশায় অনেকে এসেছেন। আমাদের আত্মীয়- স্বজনরা স্বাধীনতা ঘোষনার আগেই চলে এসেছেন।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : আমাদের সম্পত্তি দুই কায়স্থ ও সাহারা ভোগ করছে। আমাদের গ্রামে আর ছিল নমঃশুদ্ররা। আমাদের সম্পত্তি আমরা সঠিক দামে বিক্রয় করতে পারিনি। কারণ আমাদের আত্মীয়- স্বজনরাই গোপনে শত্রুতা করেছেন। মুসলমানরা কোন সমস্যা তৈরী করেনি। আমার শ্বশুড়বাড়ি ছিল দিয়াবাড়ি গ্রাম। তারা জমিদার ছিলেন, তারা যে সিন্দুক ভর্তী স্বর্ণ ও অন্যান্য সম্পত্তি ফেলে এসেছিলেন তা তাদের হিন্দু নায়েবরাই নিয়ে নিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

উত্তর: না

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? উত্তর : না। ১৯৬৪ সালের রায়টের সময় আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়ি। আমাদের এলাকায় কোন দাঙ্গা হয়নি।

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

উত্তর : আমরা প্রথম বেলেঘাটায় ছিলাম, কাকারা এখনও ঐ বাড়িতেই থাকেন।

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : মোটামুটি

কেস স্টাডি ১৪

নাম : মতিলাল সরকার

পিতার নাম জ্যোতিস চন্দ্র সরকার

বর্তমান ঠিকানা : ঢাকা পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: জিলাইল, মিতরা গ্রাম এর পাশে, থানা : মানিকগঞ্জ সদর

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তর : ছোট ছিলাম

প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর : আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। বাবার কাপড়ের ব্যবসা ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর : সঠিক সাল মনে নেই

প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর : : যখন ঢাকা থেকে লোক এসেছে। বিশেষ করে আমাদের এলাকায় একজনের সঙ্গেই আরেকজন এসেছে। ১৪,০০০ টাকা দিয়ে ১০০ শতক জমি কিনেছিলাম। এ অঞ্চলে সবাই এভাবেই এসেছে।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : কিছু কিছু বিক্রয় করেছি।

আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

প্রশ্ন :ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তর : না

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : কমলনগরে
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

কেস স্টাডি : ১৫

নাম : সুধীর চন্দ্র মুখার্জী
বয়স : ৯০
পিতার নাম :
বর্তমান ঠিকানা : সি/ ৪৭ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা, রেডিয়েন্ট প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬/এ, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: বিক্রমপুর, থানা- শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : পরিবারের দিনাজপুরে চাউলের আড়ৎ ছিল এবং কলকাতায় প্রিন্টিং প্রেস ছিল
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : অবসরপ্রাপ্ত
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৪৯/৫০ সালের দিকে ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আসি
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : কলকাতায় প্রেসের ব্যবসা ছিল সেটার দেখাশুনার জন্য চলে আসতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রেস থেকে বিভিন্ন পোষ্টার, লিফলেট প্রভৃতি বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেয়া হত।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : মামার সম্পত্তি পেয়েছিলাম, মামার ছেলেমেয়ে ছিল না। বিক্রয় করে দিয়েছি।
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর : না
প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : কলকাতাতেই
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : ভাল।

কেস স্টাডি : ১৬

নাম : গৌরীপদ ভট্টাচার্য
বয়স : ৮০
পিতার নাম : স্বর্গীয় ডাক্তার লালমোহন ভট্টাচার্য
বর্তমান ঠিকানা : এ/ ১৩১ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা,

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: সাকতা কালীবাড়ি, থানা-পাড়জোয়ার, মুন্সিগঞ্জ। ঢাকা শহরে গোয়াল নগর, রায় সাহেব বাজার মোড় ও কোর্ট স্ট্রীটের কাছে, নওয়াবপুর রোড

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলাম। ১৯৪৮ সালে পাশ করি। আমাদের কনভোকেশনের সময়ই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর : অবসরপ্রাপ্ত

প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর : ১৯৪৯ সালের দিকে। এম.এ পাশ করে আসি।

প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৪৯ সালে প্রথম বিভাগ পেয়ে পাশ করি সে সময় এ বিভাগে দুটো পোষ্ট খালি ছিল। বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. আব্দুল হালিম, তিনি বলেন যে মাইনোরিটি বলে আমাকে শিক্ষক হিসাবে নেয়া হবে না। মেদিনীপুরে মহিষাদল কলেজে চাকুরী নিয়ে চলে আসি। আমি ঢাকার বলে আমাকে আশুতোষ কলেজে তখন নেয়া হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : ঢাকার বাড়িটা হক সাহেব কিছু টাকা দিয়ে কিনে নেন। গ্রামের সম্পত্তি কিছু করা হয়নি। বাবা ঔষধের দোকান ছিল , ডিসপেন্সারীর সব ফেলে আসেন।

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তর : ১৯৫০ সালের রায়টের সময় আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হলে আমার মা, বাবা, দাদা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসেন। সরকারী লোকেরা তাদের প্রথমে একটি ক্যাম্পে নিয়ে যায়, পরে প্লেনে করে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়।

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

উত্তর : মেদিনীপুরে। ১৯৬৩ সালে আমি লেক গার্ডেন্স এ আর দাদা যোধপুর পার্কে বাড়ি করি।

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগে অধ্যাপক ছিলাম। ১৯৭১ সালে এপার বাংলা ওপার বাংলা বলে একটা পত্রিকা বের করতাম। শেখ মুজিবুর রহমানের পর একটি পেম্পলেট বের করেছিলাম। আমার লেখা বই আছে নাম- ‘RENAISSANCE AND FREEDOM MOVEMENT IN BANGLADESH’

কেস স্টাডি ১৭

নাম : সন্ধা চক্রবর্তী

বয়স : ১৯৪৭ সালের আশ্বিন মাসে আমার জন্ম

স্বামীর নাম : সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী

বর্তমান ঠিকানা : অরবিন্দ নগর, কলকাতা

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: ষোলঘর, থানা- শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ

প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর : গৃহিনী

প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর : সন্ধ্যা চক্রবর্তী জানান ১৯৪৬ সালের রায়টের সময় তারা তাদের শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রাম ত্যাগ করেন। এ এলাকায় তারা কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। পিশিমা আগরতলা রাজবাড়ির বৌ ছিলেন, তার কাছে তাদের পরিবারের সবাই আসেন।

প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর : পিশিমা আগরতলা রাজবাড়ির বৌ ছিলেন, তার কাছে আমার পরিবারের সবাই আসেন।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : সম্পত্তি কিছু করা হয়নি।

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা?

উত্তর : না

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : ভাল।

কেস স্টাডি ১৮

নাম : সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী

বয়স : ৭০

পিতার নাম ও পেশা: স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চক্রবর্তী। বাবা রেল বিভাগে কাজ করতেন।

বর্তমান ঠিকানা : অরবিন্দ নগর, কলকাতা,

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম: রয়্যাল, সাভার, জায়া জয়মন্ডপ, থানা- সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। মামার বাড়ি নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজার থানায়।

প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর : অবসরপ্রাপ্ত, মিলিটারী একাউন্ট ডিপার্টমেন্টে এ কাজ করতেন।

প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর : ১৯৪৬ সালে

প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর : সত্যেন্দ্র চক্রবতী জানান যে ১৯৪৬ এর ভয়াবহ রায়টের প্রেক্ষাপটে বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসেন। তার সিংগাইর থানার রয়্যাল গ্রামের বাড়িতে কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : দখল হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তর : না

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

উত্তর : প্রথমে বিভিন্ন আত্মীয় বাড়ি পরে এখানে।

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ১৯

নাম : প্রলয়শংকর চক্রবর্তী
বর্তমান ঠিকানা : কলকাতার ঠিকানা দিতে আগ্রহী নন, লিভারপুল, লন্ডন প্রবাসী
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রাম- শাসাইল, ঢাকা
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর: স্কুলের ছাত্র ছিলাম। ১৯৪৬ সালে আমার বয়স ছিল ৯/১০
প্রশ্ন: আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর: ডাক্তার
প্রশ্ন: আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৪৬ সাল থেকে
প্রশ্ন: আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর: ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে
প্রশ্ন: আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর: ছেড়ে আসার পর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
প্রশ্ন: আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর : না
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা?
উত্তর : না
প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : কলকাতার দমদমে
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি? উত্তর : ভাল

কেস স্টাডি ২০

নাম : শ্রী দীপক রঞ্জন গুহ
বর্তমান ঠিকানা: ২৩১/১ স্বামীজী সরণী, কলকাতা-৩০
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: ১৩২ নং হৃষিকেষ দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : ছোট ছিলাম
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : চাকুরি করতাম, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ১৩ আগষ্ট
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ও সে সময়কার পরিস্থিতি
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।
প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর : না
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন? আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি
প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : প্রথমে ভবানীপুর এস.বি কোয়ার্টার, কিছুদিন পরে ৯/বি মোহনলাল স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলকাতা
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : মোটামুটি

কেস স্টাডি ২১

নাম : বাদল সেন
বয়স : ৮০
বর্তমান ঠিকানা : রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা : গ্রামের বাড়ি ছিল নারায়ণগঞ্জে, ঢাকার গেন্ডরিয়ায় বাস করতাম।
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : বাদল সেন জানান যে, তিনি ঢাকায় ব্যবসা করতেন, তিনি অল পাকিস্তান হোসিয়ারী শিল্পের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, নারায়নগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আওয়ামি লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যশোরের রবিউল আলম, আ.স.ম আব্দুর রব, সিরাজুল আলম খান, নূরে আলম সিদ্দিকী, ফকির সাহাবুদ্দীন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান (২০০৯ সাল) তার বন্ধু।
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : ব্যবসা
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর : ১৯৭১ সালের আগে থেকেই কলকাতায় আসা যাওয়া ছিল।
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : সঠিক কোন কারণ নেই
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : বাড়ির দখল দেয়া হয়নি।কিছু বিক্রয় করেছি কিছু রয়েছে। গেন্ডারিযার বাড়ি ১৯৪৭ সাল থেকে ভাড়া দেয়া হয়, পরের দিকে আমাকে বাড়িতে ঢুকতেও দেয়া হয়নি, ভাড়াও দেয়া হয়নি। পরে মেজর ডালিমের বাবা কাদের সাহেব বাড়িটি কিনে নেন।
প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর : না
প্রশ্ন : ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর : বাড়ির দখল দেয়া হয়নি। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে আসি তবে পরে ফিরে গিয়েছিলাম। পরে আস্তে আস্তে সব ঠিক করে পাসপোর্ট নিয়ে দুই ভাই চলে আসি।

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর : কলকাতায়।
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : ভাল
প্রশ্ন : পূর্ববাংলা থেকে দেশত্যাগের কারণ ও সে সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?
উত্তর : কিছু স্বার্থান্বেসী রাজনৈতিক কারণে এসব হয়েছে। এতে সাধারন মানুয়ের কোন ভূমিকা ছিল না, তারা পরিস্থিতির শিকার। দেশত্যাগের প্রধান কারণ আমি মনে করি চাকুরীতে অপশন দেয়ার ঘোষণা। ৮০% অফিসার হিন্দু। তারা অপশন দিয়ে ভারতে চলে আসা সাধারণ লোকের মধ্যে প্যানিক তৈরী হয়, তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরী হয়। অপশন না হলে দেশত্যাগ শুরু হত না বলে আমার মনে হয়। যদি চাকুরীতে অপশন দেয়া না হত তা হলে দেশত্যাগের ঘটনা এভাবে ঘটত না।
১৯৫০ সালে একটি দাঙ্গা হল ঢাকায়। ঢাকা দাঙ্গার একটি কেন্দ্র ছিল। তখন কিছু মাইগ্রেশন হল। অশিক্ষিতরাই বেশী রয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সমস্যার সৃষ্টি করে।
১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় অনেক লোক চলে আসে।
১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় অযথা হয়রানির ফলে অনেকে দেশত্যাগ করে। অন্যসব কারণ অর্থনৈতিক। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা কিছু লোকের কথায় মিসগাইড হয়েছি।
সে সময় বাড়ি ঘরের মালপত্র আনার পারমিশন ছিল।

কেস স্টাডি ২২

নাম : সুনন্দা ঘোষ
বয়স : ৭৫
বর্তমান ঠিকানা: বলেন নি
পিতার নাম : সুধাংশু রঞ্জন রায়
পিতার পেশা: তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: বর্তমান ওয়ারী পোষ্ট অফিস, ঢাকা। আমরা থাকতাম বাবার সঙ্গে কলেজ কোয়ার্টারে
প্রশ্ন: ঢাকায় অবস্থানকালে আপনার পেশা কি ছিল?
উত্তর : আমি বিদ্যাময়ী গার্লস্ কলেজে পড়তাম। বড় দাদা কলেজে আর ছোট ভাই স্কুলে যায়নি।
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম, পরে ছেড়ে দিয়েছি কারণ স্বামীর ছিল বদলীর চাকুরী, তার বারবার বদলীর কারণে শিক্ষকতা ও রিসার্স এর কাজ ছেড়ে দেই। বর্তমানে সমাজ সেবা করি। একটি উইমেন্স কনজ্যুমার কো-অপারেটিভ স্যোসাইটির সঙ্গে যুক্ত। নারী সেবা সঙ্ঘের লাইফ মেম্বার। বাড়িতে পাড়ার কাজের মেয়েদের একটি স্কুল চালাই। তাদেরকে বাংলা, অংক এবং ব্যাংক ও পোষ্ট অফিসের কাজ শেখানো হয়। এছাড়া ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিও পড়ানো হয়।
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: ১৯৫০ সাল থেকে
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি? সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার বাবা সুধাংশু রঞ্জন রায় তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। ঢাকার বাড়িটি বর্তমান ওয়ারী পোষ্ট অফিস, ঢাকা। পূর্ববাংলায় আমরা থাকতাম বাবার সঙ্গে কলেজ কোয়ার্টারে। ১৯৫০ সালের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ও সে সময়কার পরিস্থিতির কারণে বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বাবা আমাদের ভাইবোনদের পাঠিয়ে দেয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও আমার বাবা বা আমরা কখনো আসবো ভাবিনি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার আগে কোন সমস্যা ছিল না। রায়টের সময় খুব ট্রাজিকভাবে আমাদের আসতে হয়েছে। ওখানে রায়টে অংশগ্রহণ করে বিহারী মুসলমানরা। যারা তখন ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে পূর্ববাংলায় শরণার্থী হিসেবে গিয়েছিল। তাদের সাথে কিছু স্থানীয় লোকেরা যোগ দেয়। তবে কলেজের মুসলমান ছাত্ররা ও শিক্ষকরা আমাদেরকে রক্ষা করেছিল। বাবার মুসলমান সহকর্মীরা সবসময় সাথে থাকতেন। তখন বাবা মা আমাদের পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার এক বন্ধু আমাদের ঢাকায় আমাদের ওয়ারীর বাড়িতে নিয়ে আসেন । বাড়িতে কেউ ছিল না। আমরা খালি বাড়িতে উঠলাম। পরে সেখানে আরও কয়েকটি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আমরা আসার সময় বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। এমনভাবে আসি যেন কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা চলে আসছি। আমার এক কাকার একটি এয়ারওয়েজ ছিল তার একটি প্লেন আমাদের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের সাথে আরও কয়েকজন আত্মীয় স্বজন ছিলেন। আমরা অনেক কষ্টে কুর্মিটেলা এয়ারপোর্টে পৌছাই। আমাদের যে প্লেনে আসার কথা ছিল তার আগের প্লেনের সকল যাত্রীদের মেরে ফেলা হয়। আমাদের সব কিছু কেড়ে নেয়া হয়েছিল। আমরা কলকাতা পৌছাই একেবারে খালি হাতে।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

উত্তর : না

ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তর : আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি তবে ভয়ে আমরা বাড়িতে থাকতাম না, পরে পালিয়ে আসি। আসার সময় আমরা সঙ্গে যা এনেছিলাম তা কেড়ে নেয়া হয় এয়ারপোর্টে।

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

উত্তর : আমার কাকা ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, তার কাছেই উঠেছিলাম।

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : ভাল

কেস স্টাডি ২৩

নাম- সদানন্দ ঘোষ

পিতা- অনাথবন্ধু ঘোষ

বর্তমান ঠিকানা- নেতাজীনগর কলোনি

পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম- ষোলঘর, থানা- , মুন্সিগঞ্জ

বয়স-৬৫

পেশা- শিপ বিল্ডার্সের কাজ করতাম, বর্তমানে রিটায়ার্ড।

প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তর: ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর বাবা চলে আসেন।
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর বাবা আমাদের নিয়ে চলে আসেন। আমরা দাঙ্গার শিকার হয়ে নয়, এমনি চলে আসি। সবই একসঙ্গে আসি। কাকারাও চলে আসে। সবার চলে আসার পেছনে অর্থনৈতিক কারন ছিল। যে যতটা পেরেছে সরকার থেকে সাহায্য নিয়েছে।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : বাবা ফরিদপুরে ব্যবসা করতেন। ঢাকায় গ্রামের বাড়ি ছিল কিছু করা হয়নি। পরে আর যাওয়া হয়নি।
প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?
উত্তর : না
ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?
উত্তর: আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি। আমরা ফরিদপুরে থাকতাম
প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?
উত্তর: এই কলোনিতেই। আমরা তিন ভাই এখানে থাকি। অন্য ৪ ভাই ও ১ বোন বিয়ে করে অন্য জায়গায় থাকে।
প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?
উত্তর : মোটামুটি। আমি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। এখানে ক্লাবের, পাঠাগারের মেম্বার। কলোনি কমিটির মেম্বার, ক্লাব সংগঠনের প্রেসিডেন্ট।

কেস স্টাডি ২৪

নাম-সত্রাজিত নাগ চৌধুরী
পিতার নাম- দীনেশ নাগ চৌধুরী, জমিদার ছিলেন।
বর্তমান ঠিকানা- বিদ্যাসাগর কলোনি
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম– বারদী, থানা-বৈদ্যের বাজার, নারায়নগঞ্জ
প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?
উত্তর : আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতাম, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত
প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?
উত্তর: ১৯৪৭ সাল থেকে
প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?
উত্তর : ১৯৪৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর জমিদারীর আয় কমে গিয়েছিল ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আমার বাবা চাকুরি করতে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, পরে পরিবারের সকলেই চলে আসে। আমি ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসে পড়াশুনা করি। আমরা চার ভাই এখানে এই কলোনিতেই পাশাপাশি বাড়িতে বাস করি। আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই।
প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?
উত্তর : ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না কারণ জমিদারদের শুধুমত্রি খাজনা আদায়ের অধিকার ছিল।।
প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

উত্তর : না

ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তরঃ আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : মোটামুটি। আমি ও আমার স্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

কেস স্টাডি ২৫

নাম-নিতাই লাল গাঙ্গুলী
পিতার নাম- মাখন লাল গাঙ্গুলী
বর্তমান ঠিকানা- বিজয়গড় কলোনি
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানাঃ গ্রাম– ইছাপুর, থানা-লোহজং, মুন্সিগঞ্জ

প্রশ্নঃ ঢাকায় আপনার পেশা কি ছিল?

উত্তরঃ আমি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে চাকুরি করতাম।

প্রশ্ন : আপনার বর্তমান পেশা কি?

উত্তর : আমি আলীপুর কোর্টে একজন আইনজীবি

প্রশ্ন : আপনি কত সাল থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থান করছেন?

উত্তরঃ ১৯৫৭ সালের থেকে। কলকাতায় এসে আইন পাশ করি।

প্রশ্ন : আপনার ভারতে অভিবাসনের কারণ কি?

উত্তর : রাজনৈতিক কারনে। আমি কমিউনিস্ট পার্টি করতাম। বাবা, মা আগে এসেছেন। পরে আমি আসি।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে অভিবাসনের সময় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কি করেছেন?

উত্তর : ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি ভারতীয় কারও সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করেছেন কিনা?

উত্তর : না

ঢাকায় অবস্থানকালে আপনি কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা? আপনি কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তরঃ আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি। রাজনৈতিক কারনে আমকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে। আমি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে চাকুরী করতাম। রাজনৈতিক কারনে আমাকে চাকুরী থেকে ছাটাই করা হয়েছিল পরে আবার চাকুরীতে যোগ দেই। বাবা বিজয়গড় কলোনিতে একটি প্লটের ব্যবস্থা করেই কলকাতায় স্থায়ী হন।

প্রশ্ন : ভারতে প্রথম কোথায় বাসস্থান গড়ে তোলেন?

উত্তর : প্রথম থেকেই এই কলোনিতে।

প্রশ্ন : ভারতে আপনার সামাজিক অবস্থান কি?

উত্তর : মোটামুটি

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ২৬

নাম-জয়শ্রী গাঙ্গুলী
পিতার নাম- মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী,
স্বামী- নিতাই লাল গাঙ্গুলী
বর্তমান ঠিকানা- বিজয়গড় কলোনি
পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানাঃ গ্রাম– কুমারভোগ, থানা-লোহজং, মুন্সিগঞ্জ
পেশা-স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন, বয়স-৬০/৬৫
আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আমাদের বাড়ি ডেপুটি বাড়ি নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরপরই আমরা চলে আসি। আমার বাবা, কাকারা কলকাতায় চাকুরি করতেন। আমি খুব ছোট ছিলাম। আমরা কোন নির্যাতনের শিকার হইনি। আমাদের কোন দাঙ্গার শিকার হতে হয়নি। আমরা প্রথমে আমার পিসির বাড়িতে উঠি। ঢাকার সম্পত্তি কিছু বিক্রয় করা হয়েছে, কিছু ছিল।

কেস স্টাডি ২৭

নাম অভিজিত দে, বর্তমান ঠিকানা-১০ মৃগেন্দ্রলাল রোড, কলকাতা, পূর্ববাংলায় আবাস স্থান ও ঠিকানা: গ্রাম– ইছাপুর, থানা-লোহজং, মুন্সিগঞ্জ। তিনি জানান যে, তার পরিবার কোন নির্যাতনের শিকার হন নাই। তারা সকলে পূর্ববাংলা ত্যাগ করছিল তাই তার পরিবারও কলকাতায় চলে আসেন।

তথ্যসূত্র

বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস্ এ সংরক্ষিত সরকারী নথিপত্র

Department - Home, B Proceedings.
Branch- Political (C.R), year- 1947-1962, Vol. 1-56
Political year- 1947-1960, Vol. 65-168
Police year- 1947-1962, Vol. 8o-168
Record year- 1947-1961.Vol. 2-20

Department - Police
Branch – Police, year- 1947-1954, Vol.1- 7

Department - Public Relation, B Proceedings.
Branch- Public Relation, year-1947- 1958. Vol. 1-15
P.T.D. Year-1952-1955, Vol. 1-6

Department -Finance and Revenue, B Proceedings
Branch – Requisition, year-1947-1956

Department – Judicial, year-1947-1962

পশ্চিমবাংলা জাতীয় আর্কাইভস্ এ সংরক্ষিত সরকারী নথিপত্র

Department - Home, B Proceedings
Branch- Political (C.R), West Bengal Government
Political, West Bengal Government

পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট সমূহ

- Annual Land Revenue Administration Report, 1963-64, Board of Revenue, Government of East Pakistan, 1969
- Babgladesh District Gazetters Dacca 1975
- Census of India 1931. Vol.V, Part-1, Bengal and Sikkim. Calcutta
- Census of India 1941. Vol. IV Bengal, Calcutta, 1943
- Census of Pakistan 1951. Vol.1, Karachi, 1953
- Census Report of East Pakistan 1951, vol. 3, East Bengal, Karachi, 1953
- Census of Pakistan 1961, Vol. 2, East Bengal, Dacca, 1964
- Census Report of Pakistan 1961, Vol. 1, Karachi, 1964
- Census Report of Bangladesh 1974, National Series, Dacca, 1977
- Bangladesh Population census report-1981, National Series. Dhaka, 1983
- Report of the Dacca Riots Enquiry Committee, 1940, Government of Bengal, Home Department, Political, Calcutta, 1942

- East Bengal Legislative Assembly Proceedings, Official Report
- The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, part 1, no. 2.-(1) Karachi, 1961
- Decision relating to the Annexure to the Prime Ministers' Agreement
- Decision relating to the Annexure to the Prime Ministers' Agreement
- East Bengal Evacuees Bill 1951
- Land Revenue commission Report, Bengal, Vol 1
- Proceedings of the Chief Secretaries Conference,
- Report on Inter Dominion Agreement
- Report on the Prime Ministers' Agreement
- গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান, ঢাকা জেলা, বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস, ১৯৭৪
- বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস ১৯৭৪, বুলেটিন ২, ঢাকা
- কুষ্টিয়া জেলা গেজেটিয়ার
- ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৭৫
- বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৮৪
- বাংলা পিডিয়া, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

ভারতীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট সমূহ

- A handbook of govt. policy and plan for the resettlement of refugee population June 1948, July 1948
- Annual Financial Statement of the govt. of West Bengal 1968-69
- Census Report of India 1931
- Committee of the Review of Rehabilitation Work in West Bengal, Ministry of Labor, Employment and Rehabilitation, 11th Report, 1973
- Committee of the Review of Rehabilitation Work in West Bengal, Ministry of Labor, Employment and Rehabilitation, 15th Report, 1974
- Decision of the Cabinet, Budget meeting 1954-55, 1956-57
- Lok Sabha Debates
- Memorandum on the Case of the Govt. of West Bengal to Finance Commission, 1951
- Memorandum on subsidiary point requested by the Third Commission 1961
- Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal, October 1957
- Relief and Rehabilitation of displaced persons in West Bengal 1956
- Rehabilitation of refugees: a statistical survey 1955
- Report on the Sample Survey for the estimating the Socio Economic Characteristics of displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the West Bengal, Calcutta, 1951
- Report on Rehabilitation of displaced persons From East Pakistan At ex-camp Sites in West Bengal, Committee of the Review of Rehabilitation Work in West Bengal, Ministry of Labor, Employment and Rehabilitation, 1969
- Report on the Sample Survey for Estimating on Socio- Economic Characteristics of Displaced Persons Migrating from Eastern Pakistan to the state of West Bengal, 1951
- R.R. Committee's Report, Prefected by Samar Mukharjee, Chairman, R.R Committee, West Bengal Government, Calcutta, 1981

- The City of Calcutta: A socio Economic Servay 1954-55,1957-58
- The Assam Evacuee Property Act, 1951
- THE CITY OF CALCUTTA: A SOCIO ECONOMIC SERVAY 1954-1955, 1957-58, Calcutta, West Bengal State Govt.
- Tripper Evacuee Property Ordinance, 1951
- West Bengal Evacuee Property Ordinance, 1951
- West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Official Report

গবেষণা মূলক গ্রন্থাবলী

- কুসুম লতা, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ভৌগলিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ (এম. এস.সি থিসিস), ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (অপ্রকাশিত) ১৯৯৭
- ভূঞা, মোঃ হাফিজুর রহমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব, ১৮৫৪-১৯৬০, পিএইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (অপ্রকাশিত)
- Abul Barkat, Shafique uz Zaman, Azizur Rahman, Avijit Podder- Political Economy of the Vested Property Act in Rural Bangladesh,
  Association for Land Reform and Development, 1997
- Chaudhury, Pronati, Refugee in West Bengal, Occasional Paper 55, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, 1983
- Chatterjee, H. Partition of Bengal- A Study of political Economic and Financial Implication of partition
- Khan, Masihur Rahman Khan- Pattern of external Migration to and from Bangladesh 1901-1961, Pattern of External Migration to and from Bangladesh.1901-1961, The Bangladesh Economic Review, Vol.2. No.2 1974,
- Kabir, Mohammad Ghulam, Minority Politics in Bangladesh, VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD, New Ddlhi, 1980
- Skeldon, Ronald, MIGRATION IN SOUTH ASIA: AN OVERVIEW, The Population Division, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Bangkok 1983

আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থাবলী

- আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাবমহল, বাংলা বাজার, ঢাকা। ২০০৬
- আহমেদ, কামরুদ্দীন, বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী, জোবেদা খানম, ঢাকা, ১৯৭৯
- --পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২
- আহমেদ, তাজউদ্দীন এর ডায়রী ১৯৪৯-৫০, প্রতিভাস, ঢাকা ২০০০
- আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম, ভারত স্বাধীন হল, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, অনুবাদ- সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬
- খান, আতাউর রহমান, স্বৈরাচারের দশ বছর, খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা, ১৯৭০
- গাঙ্গুলী, ইন্দুবরণ, কলোনি স্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), ইন্দু বরণ গাঙ্গুলী, কলকাতা, ১৯৯৭
- ঘোষ, শংকর, হস্তান্তর, স্বাধীনতার অর্ধশতক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , ২০০১
- চক্রবর্তী, ত্রিদিব (সম্পাদনা), ধ্বংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ, সেরিবার্ন স্কুল অব কালচারাল টেক্সট্স্ অ্যান্ড রেকর্ডস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ২০০৭।

- দেবী, মৈত্রেয়ী, এত রক্ত কেন? নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৭০
- বসু, প্রতিভা, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, শ্রাবণ-১৪০৩ বাং
- মুকুল, এম.আর.আখতার, চল্লিশ থেকে একাত্তর, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২
- মোহাইমেন, মোঃ আব্দুল, দুই দশকের স্মৃতি, প্রকাশক- মোঃ আব্দুল মোহাইমেন, ঢাকা, ১৯৮৬,
- রায়, অন্নদা শংকর, যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, মিত্র এন্ড ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৯
- লোহিয়া, রামমনোহর, ভারত ভাগের অপরাধী যারা, সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট, কলকাতা
- সেন গুপ্ত, মিহির, বিষাদ বৃক্ষ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৫
- সিংহ, অনিল, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ, বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৫
- Ghosh, S.K., RIOTS Prevention and Control, Calcutta EASTERN LAW HOUSE, Calcutta, 1972

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

- রহমান, আতিউর, ও আজাদ, লেনিন, ভাষা আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০
- আলম, এম ইরতাজ, বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসন আইন, বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৮৮
- আলী, রাও ফরমান, বাংলাদেশের জন্ম, মুনতাসির মামুন অনুদিত, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদনা) বাংলাদেশের (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩
- উমর, বদরুদ্দীন, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, (২য় খন্ড) মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫
- ----------চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০
- কামাল, আহমেদ, পূর্ববাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তিঃ জনগনের প্রতিক্রিয়া, কালের কল্লোল বাংলাদেশ, ১৯৪৭- ২০০০, মৌলি প্রকাশনি, ঢাকা, ২০০১
- খান, আতাউর রহমান, স্বৈরাচারের দশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭০
- ঘোষ, সুনীতি কুমার, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা ২০০১
- ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদনা) দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা ২০০৮
- চ্যাটার্জী, জয়া, বাংলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ, ১৯৩২-৪৭, অনুবাদ- আবু জাফর, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০৩
- চৌধুরী, তপন রায়, বাঙাল নামা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭
- ত্রিপাঠী, অমলেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০
- দে, অমলেন্দু, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, কলকাতা ১৯৯১
- ফারুক, আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, দেশভাগ দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯৪
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেষকুমার, দাঙ্গার ইতিহাস, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৯ বাং
- বিশ্বাস, সুকুমার, তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কলকাতার সংবাদপত্র, বাংলা একাডেমী
- মুকুল, এম. আর আখতার, ভাষানী মুজিবের রাজনীতি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৮৯
- মোহাইমেন, মোঃ আবদুল, দুই দশকের স্মৃতি, মোঃ আবদুল মোহাইমেন, ঢাকা ১৯৮৬
- রহমান, মাহবুবুর , বাংলাদেশের ইতিহাস- ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৯
- সাইদ, আবু আল, সাতচল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯
- সাইদ, আবু আল, দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১
- সিকদার, অশ্রুকুমার, ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

- সিকদার, আনসারউদ্দীন, অর্পিত ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন ভূমি সংস্কার ও ঋণ সালিশি আইন সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন এবং সরকারী দাবী আদায় আইন, ফিবকো প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯
- হক, আব্দুল, লেখকের রোজনামচায়চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, সম্পাদক-নূরুল হুদা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা
- হক, মেসবাহুল, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭
- হান্নান, মোহাম্মদ, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৫২, সাগর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪
- হোসেন, আবুল, ভারত বিভাগ ও অন্যান্য লেখা, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৯
- Biswas, Sukumar, and Sato, Hiroshi, RILIGION AND POLITICS IN BANGLADESH AND WEST BENGAL, A STUDY OF COMMNUL RELATIONS, Joint research Programme series No. 99, INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES, Tokyo 1993
- Chakrabarti, Prafulla. Kumar, Marginal Men: The Rfugees and the Left Political Syndrome in West Bengal, Naya Udyog, Kolkata 1999
- Chatterji, Joya, The Spoil of partition BENGAL AND INDIA, 1947-67, Cambridge University press India Pvt. Ltd., New Delhi, 2007
- Goswami, Omkar, Industry, Trade, and Peasant Society the Jute Economy of Eastern India 1900-1947, Oxford University Press, Delhi, 1991
- Guha, Samar, Non Muslim behind the Curtain of East Pakistan, Calcutta: Author, 1950
- Hasmi, Taj Ul- Islam, Pakistan as a Peasant Utopia The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947, Westvew Press, United States of America, 1992
- Hasan, Mashirul (Edited) – India's Partition: Process, Strategy and Mobilization, Oxford University Press, Delhi 1997
- Islam, M.Nazrul - Pakistan and Malayasia Geographic and Demographic Dimention A Comparative Study in National Integration, Sterling Publishers Privet Limited, New Delhi, 1985
- Roy, Bidhan Chandra, Towards a Prosperous India, Speeches and Writings of Bidhan Chandra Roy, Atulya Ghosh, Chairman, Board of Editors, Calcutta,1964,
- Samadder, Ranabir, The Marginal Nation: Transborder Migration From Bangladesh to West Bengal, Sage Publilishing House, Delhi 1999
- Sen Gupta, Joty, Eclips of East Pakistan, RENCO., Calcutta, 1963
- WATTAL, P.K, , The Population problem in India, BENNET, COLMAN and co.Ltd. Bombay, Calcutta, London
- A Theory of Migration' University of Pennsylvania, jstoor 2060063,

প্রবন্ধ

- ইসলাম, বেদু, আমিনুল, সতীর্থ সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা, স্মৃতিময় ১৯৬৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনীস দিলীপ দত্ত, ঢাকা, ২০০০
- ইসলাম, এম আতাহারুল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (প্রবন্ধ) বাংলাদেশের ইতিহাস (অর্থনৈতিক) সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৯৩
- ইসলাম, নজরুল, ভূমি সংস্কারের আরও একটি উদ্যোগ এবং তার ফলশ্রুতি, সমাজ নিরীক্ষণ, ৯/ ১৯৮৩, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র,
- কামাল, আহমেদ, পূর্ববাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তিঃ জনগনের প্রতিক্রিয়া, কালের কল্লোল বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০, মৌলী প্রকাশনি, ঢাকা, ২০০১
- চক্রবর্তী, দীপেশ, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা, পুঁজা সংখ্যা ২০০৫
- চট্যোপাধ্যায়, পার্থ, বাংলার ভূমিসম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িকতা ১৯২৬-১৯৩৫ পৃষ্ঠা-৫৩, সমাজ নিরীক্ষণ, ২৬/ ১৯৮৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র
- বসু, সুগত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বাংলাদেশের (অর্থনৈতিক) ইতিহাস, সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৯৩

- ভট্টাচার্য, পঙ্কজ, মধুভান্ডার, স্মৃতিময় ১৯৬৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০
- ভৌমিক, নিরঞ্জন, জীবন-দর্পণ, ঐতিহাসিক ৯ম বর্ষ, প্রধান সম্পাদক- অরুণ দাশগুপ্ত, কলকাতা
- মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ, জবরদখলের স্মৃতি, ঐতিহাসিক, সম্পাদক- অরুণ দাসগুপ্ত, কলকাতা
- সিদ্দিকী, কামাল, পাকিস্তান আমলে ভূমি-সংস্কার আইন, বাংলাদেশের (অর্থনৈতিক) ইতিহাস, সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৯৩
- সালেহ উদ্দীন, গাজী, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেশন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র পত্রিকা, ৪৪/ ১৯৯২ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র,
- রশীদ, সৈয়দ মাহবুব ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা, স্মৃতিময় ১৯৬৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০
- রায়, মানস কাটা দেশে ঘরের খোজ, ধ্বংস ও নির্মাণ, ত্রিদীব চক্রবর্তী সম্পাদিত, সেরিবার্ন স্কুল অব কালচারাল টেক্সট্‌স্‌ অ্যান্ড রেকর্ডস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
- সাহা, বিমল কুমার, ভূমি সংস্কার পল্লী উন্নয়ন: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের তুলনামুলক বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, একবিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪১০ (বাংলা) বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
- রহমান, মাহবুবুর, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, বাংলাদেশের ইতিহাস (রাজনৈতিক) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩
- Ahmed, Syed, Subinfeudation in the Land System of East Bengal, Pakistan Economic Journal, August 1950,(Quarterly), Vol. 2, No.1,
- Begam, Sarifa -Population Birth, Death and Growth Rate in Bangladesh : census Estimates, The Bangladesh Development Studies, Vol.xviii, June 1990, No.2
- Bose, Pradip Kumar, Refugee in West Bengal:Institutional Practoces and Contested Identities, Mahanirban Calcutta Research Group, Calcutta, 2000
- Datta, Pranati, Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception study, The Qualitqatative Report 9-2
- Gangapadhyay, Balan, Reintegrating the displaced, refracturing the domestic: a report on experience of Uday Vila, Refugees in West Bengal, 2009,
- Islam, M.Nazrul, Pakistan and Malayasia Geographic and Demographic Dimention A Comparative Study in National Intregration, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1985
- Khan, Masihur Rahman, Pattern of external Migrationto and from Bangladesh. 1901-1961, The Bangladesh Economic Review, Vol.2. No.2 1974
- Kudaisya, Gyanesh `DIVIDED LANDSCAPES, FRAGMENTED IDENTITIES: EAST BENGAL REFUGEES AND THEIR REHABILITATION IN INDIA 1947-79' (Article), FRDOM, TRAUMA, CONTINUITIES, Editors-D.A Low, Howard Brasted
- Kumar, Chirantan, Migration and Refugee issue Between India and Bangladesh, Scholar's Voice: A new way of thinking, Vol.1, No1, Biannual Publication of Centre for Defence Studies Research and Development, 2009
- Studies on Contemporary South Asia, No. 2, Sage Publications, New Delhi, 1995
- Lambert, Richard D., RELIGION, ECONOMICS, AND VIOLENCE IN BENGAL Background of the Minorities Agreement, Middle East Journal, V. 4 1950 (July)
- Mohammad Raihan Sharif, ABOLITION OF ZAMINDARI A FINANCIAL PROPOSITION, Pakistan Economic Journal, August 1950,(Quarterly), Vol. 2, No. 1
- Ray, Manas, Growing Up Refugee, History Workshop Journal, Issue 53, Calcutta, 2002
- Skeldon, Ronald, MIGRATION IN SOUTH ASIA: AN OVERVIEW, The Population Division, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Bangkok 1983

Dhaka University Institutional Repository

পত্রপত্রিকা, সাময়িকী

- দৈনিক আজাদ
- দৈনিক ইত্তেফাক
- দৈনিক সংবাদ
- যুগান্তর
- আনন্দবাজার
- সত্যযুগ
- সাপ্তাহিক পাকিস্তানী খবর
- সাপ্তাহিক দেশ
- ষাম্মাসিক প্রবাসী
- ঐতিহাসিক
- Amritabazar Patrika
- Daily Observer
- Daily Morning News
- DAWN
- Hindusthan Standard
- Statesman

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী, দোহার, সুত্রাপুর, রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করে তাদের যে সকল আত্মীয় দেশত্যাগ করে চলে গিয়েছে তাদের দেশত্যাগের কারণ, তাদের সামাজিক অবস্থান, তাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হয়েছে, ভারতে তাদের অবস্থান কেমন সে সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

দোহার থানার মেঘুলা গ্রামে পাঁচ জন বয়স্ক লোকের তিনজন স্থায়ী নাগরিক এবং দুইজন অস্থায়ী নাগরিক (যাদের স্থায়ী নিবাস মানিকগঞ্জে ও সোনারগাঁয়ে), নবাবগঞ্জ থানার একজন, টংগী থানার চারজন, পূবাইল থানার পাচঁজন, মানিকগঞ্জ এর সদর থানার পাচঁজন, সুত্রাপুর থানার দশ জন, রায়েরবাজারে একজন, মোহাম্মদপুরে একজন এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে টংগী থেকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ জানান যে তাদের এলাকা থেকে ১৯৬৪ সালের পূর্বে কোন দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেনি। পূবাইল, দোহার, নবাবগঞ্জ, সোনারগাঁ, মানিকগঞ্জ থেকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ জানান যে তাদের এলাকায় কোন দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি, তবে তাদের আত্মীয়রা কেন চলে গিয়েছে তা তারা জানেননা। তবে কেউ কেউ বলেন যে তাদের আত্মীয়রা পড়তে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

ঢাকা জেলা ত্যাগ করে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব হয়নি তাদের সাক্ষাৎকার প্রদানের অস্বীকৃতির কারণে। পরবর্তীতে পশ্চিমবাংলার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে এ বিষয়ে সহায়তা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। তাদের সহায়তায় পরবর্তীতে ২০০৯ সালে জুলাই এবং ২০১০ সালের জানুয়ারি ও আগষ্ট মাসে আমি পশ্চিমবাংলায় গমন করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কলকাতার যাদবপুর, বাঘাযতীন কলোনী, বিদ্যাসাগর কলোনি, বিজয়গড় কলোনি, রাণীকুঠি, লেক গার্ডেনস্, বর্ধমান জেলার কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রামে ঢাকা কলোনি, নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী থানার ঢাকা পাড়া এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি। এদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।